ধর্ম-দর্শন

[The Philosophy of Religion]

কল্যাণচন্দ্র গুপ্ত
এম, এ, পি, আর, এস, ডি, লিট,
অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
ও
অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ,
অধ্যাপক, বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন, কলিকাতা।

দাশগুপ্ত প্রকাশন
সি-১৫, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

বৈশাখ ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ

প্রকাশক :
শ্রীশিশিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
সি-১৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

প্রাপ্তিস্থান :
১। মহেশ লাইব্রেরী
শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১
২। এন্. কে. চ্যাটার্জী
জ্যোৎস্না লজ,
পোঃ সোদপুর, জেলা—২৪ পরগণা

মুদ্রাকর :
শ্রীহরিপদ সামন্ত
কে. বি. প্রিণ্টার্স
১।১এ গোয়াবাগান স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

ভূমিকা

আজকাল ধর্ম-দর্শন, অর্থাৎ ধর্ম-সম্পর্কীয় দার্শনিক আলোচনা দর্শনের একটি বিশেষ বিভাগ বলে স্বীকৃত হয়। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সাধারণত যে সকল স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র দর্শনে 'অনার্স' নিয়ে পাঠ করেন তাঁদের পক্ষে ধর্ম-দর্শন অবশ্যপাঠ্য। প্রধানত তাঁদের প্রয়োজন মিটাবার উদ্দেশ্যেই এই বই লেখা হয়েছে। আমাদের ধর্ম-চেতনা এবং প্রধান প্রধান ধর্মীয় বিশ্বাসগুলি সম্বন্ধে দার্শনিক আলোচনা এবং জগতের চরমতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের বিচার-বুদ্ধি যে সব সিদ্ধান্তে পৌঁছায়, তাদের সঙ্গে এই ধর্ম-চেতনা ও ধর্মীয় বিশ্বাসগুলির সামঞ্জস্য আছে কিনা তা, নির্ণয় করবার চেষ্টা করাই ধর্ম-দর্শনের কাজ। এই চেষ্টার ফলে আধুনিক দর্শনে যে সব মতবাদের উদ্ভব হয়েছে, প্রধানত সেগুলির তুলনামূলক আলোচনা করাই এই বইয়ের উদ্দেশ্য। এই বই পড়ে শিক্ষার্থীরা ধর্মতত্ত্ব, দর্শন প্রভৃতি সম্বন্ধে বিখ্যাত মনীষীদের লেখা মৌলিক গ্রন্থগুলি পড়তে উৎসাহিত হ'বেন বলেই আমরা আশা করি।

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থির করেছেন যে, পরীক্ষার্থীরা বি, এ, অনার্স এবং এম, এ, পরীক্ষাতেও বাঙ্গলায় উত্তর লিখতে পারবেন। সেই জন্য বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চ মানের পাঠ্যপুস্তক লেখার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে; কারণ বর্তমানে এ ধরনের বই নেই বললেও চলে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও এই অভাব দূর করবার চেষ্টায় এগিয়ে এসেছেন। সরকারী সাহায্যে এ পর্যন্ত যে কয়খানি পাঠ্যপুস্তক রচনার ব্যবস্থা হয়েছে, এই বই তাদের একটি।

বর্তমানে বাঙ্গলাভাষায় দর্শন ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় উচ্চশ্রেণীর নির্ভরযোগ্য পাঠ্যপুস্তক রচনার পথে অনেক বাধা আছে। প্রথম ও প্রধান বাধা অনভ্যাসের জড়তা। এ দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরা বহুদিন ধরে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশ করবার জন্য ইংরাজী পড়তে এবং ইংরাজীতে লিখতে এমন অভ্যস্ত হয়েছেন যে, তাঁদের পক্ষে বাঙ্গলায় লেখা রীতিমত দুরূহ ব্যাপার। দ্বিতীয় বাধা, এই ধরনের বই রচনা করতে হ'লে যে সব পারিভাষিক শব্দের প্রয়োজন তাদের সম্বন্ধে বাঙ্গলাভাষার দৈন্য। তৃতীয়ত আছে দর্শন ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে বাঙ্গলাভাষায় লিখিত মৌলিক বইয়ের অপ্রাচুর্য। চতুর্থত, উপযুক্তসংখ্যক পাঠকের অভাব। দেশে সাধারণ শিক্ষার যথেষ্ট

বিস্তার না হ'লে উচ্চ মানের বইয়ের বহুল প্রচার হওয়া অসম্ভব। এই সব বাধার কোনটিই অলঙ্ঘ্য নয়।

এই বইয়ে ধর্ম-তত্ত্বের বিষয়গুলি সরল ও সহজ ভাষায় আলোচনা করা হয়েছে। অধিকাংশ জায়গায় বাঙলা পারিভাষিক শব্দের ইংরাজী প্রতিশব্দ দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এই বিষয়ের জন্য যে পাঠ্যসূচী নির্দিষ্ট করা আছে, প্রধানত সেই অনুযায়ী বিভিন্ন অধ্যায়-গুলি লেখা হয়েছে। ছাত্রদের সুবিধার জন্য প্রতি অধ্যায়ের শেষে একটি নির্বাচিত পুস্তক-তালিকা দেওয়া হয়েছে।

এই বই প্রধানত পরীক্ষার্থীদের জন্য লেখা হ'লেও আমরা মনে করি যে, সাধারণ পাঠকেরাও এটি পড়ে উপকৃত হ'বেন।

কল্যাণচন্দ্র গুপ্ত
ও
অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

ধর্ম-দর্শনের প্রকৃতি ও বিষয়-বস্তু

1 ধর্ম-দর্শন দর্শন-শাস্ত্রের একটি বিভাগ

দর্শন-শাস্ত্রের যে বিভাগে ধর্মের[1] প্রকৃতি, কার্য ও মূল্য, ধর্ম-চেতনার প্রামাণ্য এবং চরমসত্তার প্রকৃতির প্রকাশ হিসাবে ধর্ম-চেতনার সামর্থ্য ও উপযোগিতা সম্বন্ধে বিচার করা হয়, তাকে ধর্ম-দর্শন অথবা ধর্ম-তত্ত্ব (Philosophy of Religion) বলা হয়। দর্শন-শাস্ত্রের অন্যান্য বিভাগের মত ধর্ম-দর্শনেও কতকগুলি তথ্য পর্যালোচনা করা হয় এবং সেইগুলির ভিত্তিতে ধর্ম সম্বন্ধে কতকগুলি সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার চেষ্টা করা হয়। মানুষের ধর্ম-চেতনা ও যে সব ব্যাপারের মাধ্যমে সেই ধর্ম-চেতনা আত্মপ্রকাশ করে থাকে, যেমন, ধর্মীয় ভাবাবেগ, আসক্তি প্রভৃতি মানসবৃত্তি, ঈশ্বর, দেবদেবী, আত্মা, পরলোক, প্রভৃতি সম্বন্ধে নানারূপ ধারণা ও মতবাদ, ধর্মীয় আচার, বিধি-নিষেধ, সামাজিক নিয়ম, প্রথা, সংস্থা, ব্যবহার প্রভৃতি—সেই সমস্তই ধর্ম-দর্শনের আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের আকর। কিন্তু কেবলমাত্র এই তথ্যগুলিকে বর্ণনা করা, অথবা এগুলিকে সুবিন্যস্ত করাই ধর্ম-দর্শনের কাজ নয়। আমাদের ধর্ম-বিশ্বাস কিভাবে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়, আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ কিভাবে ধর্ম-বিশ্বাস, ধর্মীয় আচার ও আচরণকে প্রভাবিত করে, বিখ্যাত সাম্প্রদায়িক ধর্মগুলির ঐতিহাসিক পটভূমিকা ও তুলনামূলক মূল্যায়ন—এই ধরণের আলোচনা মুখ্যতঃ ধর্ম-দর্শনের বিষয়-বস্তুর অন্তর্গত নয়। ধর্ম-চেতনার চরম উৎস এবং প্রকৃত স্বরূপ কি ইহা অনুসন্ধান করা এবং ধর্ম-চেতনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা সমগ্র জগতের স্বরূপ সম্বন্ধে যে সকল মত বা বিশ্বাস পোষণ করে থাকি তাদের যাথার্থ্য নির্ণয় করাই প্রকৃতপক্ষে ধর্ম-দর্শনের কাজ। ধর্ম-চেতনার মনোবিদ্যাসম্মত বিশ্লেষণ, ধর্ম-সম্বন্ধে ঐতিহাসিক গবেষণা এবং সাম্প্রদায়িক ধর্মগুলির তুলনামূলক আলোচনা এবং ধর্ম-দর্শনের মধ্যে পার্থক্য আছে।

(1 'ধর্ম' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'যাহা ধরিয়া রাখে,' যা মানব-সমাজকে ধরে রাখে অর্থাৎ রক্ষা করে তা-ই ধর্ম। ধর্মের এই অর্থ করলে নীতি, সদাচার, সততা প্রভৃতিকে ধর্ম বলা যায়। 'ধর্ম' শব্দের আর একটি অর্থ 'বিশেষ গুণ'—যেমন আগুনের ধর্ম 'দাহিকা শক্তি' এখানে 'Religion'-এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'ধর্ম' শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে।) *

ধর্ম-দর্শনে ধর্মকে সমগ্র জগতের চরমসত্তার সঙ্গে সংযুক্ত করে দেখা হয়। আমাদের ধর্ম-বিশ্বাসগুলি মূলতঃ আমাদের কল্পনার সৃষ্টি না এদের বস্তুগত সত্যতা আছে, এগুলি কোন কোন বিশেষ অবস্থায় বা বিশেষ পরিবেশের প্রভাবে আমাদের মনে উৎপন্ন হয় এবং বিকাশপ্রাপ্ত হয়, না এদের মাধ্যমে আমরা জগতের চরম সত্তার প্রকৃতির পরিচয় পেয়ে থাকি এই হল ধর্ম-দর্শনের মূল বিচার্য বিষয়। সুতরাং ধর্ম-দর্শনের আলোচনা-পদ্ধতি হবে দার্শনিক পদ্ধতি। ইতিহাস বা প্রাকৃত-বিজ্ঞানে যে সব পদ্ধতি অবলম্বন করে 'আমরা নানা বিষয়ে সিদ্ধান্ত কবি ধর্ম-দর্শনে সে সব পদ্ধতির উপযোগিতা নেই।

2 ধর্ম-দর্শন ও ধর্ম-বিজ্ঞান

প্রচলিত অর্থে বিজ্ঞান বলতে আমরা সাধারণতঃ জগতের কোন এক অংশের অন্তর্গত বস্তু ও ঘটনাসমূহের যথাযথ ও সুসংহত জ্ঞানের সমষ্টি বুঝি। যে সব বস্তু বা ঘটনা পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষার বিষয় হবার উপযোগী কেবল সেগুলিই বিজ্ঞানের সামগ্রী (Data) হতে পারে, কোনও বস্তুর বা সমগ্র জগতের চরম সত্তা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা বিজ্ঞানের কাজ নয়। সুতরাং আমরা সাধারণভাবে বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে বলে মনে করি তারই পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম-বিজ্ঞান ও ধর্ন-দর্শনের সম্বন্ধ বুঝাতে হবে। ধর্ম-চেতনাকে একটি মানসিক অবস্থা বা ক্রিয়া বিবেচনা করে এটি যে সব ব্যাপারের মধ্য দিয়ে আত্ম-প্রকাশ করে, যেমন বিবিধ ধর্মীয় ক্রিয়া-কলাপ (উপাসনা, প্রার্থনা, নৃত্য-গীত প্রভৃতি), আচার-ব্যবহার, সামাজিক প্রথা, নিয়ম, সাহিত্য, শিল্প-কলা, স্থাপত্য-ভাস্কর্য প্রভৃতি--সেগুলিকে পর্যবেক্ষণ করে, বিভিন্ন ধর্মের তুলনা করে, ধর্মের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করাই ধর্ম-বিজ্ঞানের কাজ। এই বিজ্ঞান আমাদের ধর্ম-বিশ্বাসের যাথার্থ্য অর্থাৎ ইহা জগতের চরম সত্তার কোন সন্ধান দিতে পারে কি না তা আলোচনা করে না। ধর্ম-বিজ্ঞান আমাদের জ্ঞান-জগতের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে ধর্ম সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে এবং সেগুলির মধ্যে কতকগুলি নিয়ম আবিষ্কার করে সেগুলিকে একসূত্রে গ্রথিত করবার চেষ্টা করে। ইহা মানুষের সবরকম ক্রিয়াকে ধর্ম-বিশ্বাস কিভাবে প্রভাবিত করেছে তা নির্দেশ করে এবং ধর্ম-বিশ্বাসের উপর আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করে। সুতরাং ধর্ম-বিজ্ঞানের প্রধান ভিত্তি হচ্ছে পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞান এবং এর সিদ্ধান্তগুলি প্রত্যক্ষ-জগতের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। ধর্ম-বিজ্ঞান যে সব তথ্য নিয়ে

আলোচনা করে ধর্ম-দর্শন তাদের অন্তর্নিহিত ধর্ম-বিশ্বাসগুলির তাৎপর্য এবং যাথার্থ্য নির্ণয় করবার চেষ্টা করে। যে ধর্ম-দর্শন ধর্ম-বিজ্ঞানের সাহায্যপুষ্ট নয়, ধর্ম-চেতনার বিচিত্র এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রকাশগুলির সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক থাকে না এবং তা কতকগুলি বাস্তবতা-বর্জিত, প্রত্যক্ষ-পূর্ব বিচারের সমষ্টিমাত্র হয়ে দাঁড়ায়। অপরপক্ষে, দার্শনিক ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন না করে কেবলমাত্র ধর্ম-বিশ্বাস বা ধর্ম-চেতনা সম্পর্কিত কতকগুলি প্রত্যক্ষলব্ধ তথ্য সংগ্রহ করে তাদের সুবিন্যস্ত করতে পারলেই আমাদের মন সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হয় না, আমাদের বিচার-বুদ্ধির অন্তর্নিহিত প্রয়োজন মিটাবার জন্যই আমরা ধর্ম-বিশ্বাসগুলির সত্যতা পরীক্ষার চেষ্টা করতে বাধ্য হই। সুতরাং ধর্ম-দর্শন এবং ধর্ম-বিজ্ঞান পরস্পরের পরিপূরক। কেহ কেহ বলেন যে, আমাদের ধর্ম-বিশ্বাসগুলি শেষ পর্যন্ত সত্য কি না তা নির্ণয় করবার কোন উপায় নেই, এমন কথাও কেহ কেহ বলেছেন যে, আমাদের ধর্ম-বিশ্বাসগুলি কেবলমাত্র আমাদের কল্পনাপ্রসূত এবং বাস্তব-জগতে তাদের অনুরূপ কিছু নেই। এই সব মতবাদ অনুসারে হয় ধর্ম-দর্শন বলে কিছু হতে পারে না, নতুবা ধর্ম-সম্পর্কিত ব্যাপারগুলি বর্ণনা করা এবং তাদের সুবিন্যস্ত করাই এর একমাত্র কাজ বলে গণ্য করা উচিত। এই সব মতবাদের পর্যালোচনা আবশ্যক।

3 ধর্ম-দর্শন ও ঈশ্বর-তত্ত্ব

দর্শন শাস্ত্রের যে বিভাগে ধর্ম-চেতনা, ধর্ম-বিশ্বাস প্রভৃতির যথার্থ তাৎপর্য ও সত্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় তা-ই ধর্ম-দর্শন এবং যে বিভাগে ঈশ্বরের অস্তিত্ব, তাঁর প্রকৃতি, জড়জগৎ ও মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্বন্ধ প্রভৃতির আলোচনা করা হয়, তা-ই ঈশ্বর-তত্ত্ব (Theology) ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসকে যদি ধর্মের প্রধান অঙ্গ বলে বিবেচনা করা হয় তাহলে ধর্ম-দর্শন এবং ঈশ্বর-তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য করা একটু কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু তাহলেও এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য করা প্রয়োজন। ঈশ্বর-তত্ত্বে আমরা প্রধানতঃ ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ, ঈশ্বর-সম্বন্ধে কোন ধারণা সর্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত, তাঁর প্রকৃতি ও গুণাবলী এবং জড় জগৎ ও সসীম জীবদের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্বন্ধ প্রভৃতি আলোচনা করি। কতকগুলি বিষয়, যেমন, আমাদের ইচ্ছার স্বাধীনতা, আত্মার অমরত্ব, পরকাল প্রভৃতি, ঈশ্বর-বিশ্বাসের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে যুক্ত না হলেও সেগুলিকেও সাধারণতঃ ঈশ্বর-তত্ত্বের বিষয়-বস্তুর অন্তর্গত বলে মনে করা হয়ে থাকে, কিন্তু এগুলিকে দার্শনিক দৃষ্টি-ভঙ্গী থেকে বিচার করা প্রয়োজন।

ধর্ম-দর্শনের বিষয়-বস্তু ঈশ্বর-তত্ত্বের বিষয়-বস্তুর অপেক্ষা অধিক ব্যাপক। আমাদের ধর্ম-চেতনাকে বিশ্লেষণ করা, এর মৌলিক উপাদানগুলি পর্যালোচনা করা, এবং এই উপাদানগুলির মধ্যে কোনগুলির যথার্থ মূল্য আছে এবং কোনগুলির নাই, দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এইগুলি আলোচনা করাই ধর্ম-দর্শনের কাজ। আমরা সাধারণ বিচার-বুদ্ধিদ্বারা চালিত হয়ে আমাদের ধর্ম-চেতনাকে যেভাবে ব্যাখ্যা করে থাকি বা আমাদের ধর্ম-বিশ্বাসগুলিকে যেভাবে গঠন করে থাকি তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে সেগুলি কতদূর বিচারসহ, তাদের পরস্পরের মধ্যে যথার্থ সঙ্গতি আছে কি না, তাদের প্রকৃত তাৎপর্য এবং মূল্য কি. এই সব আলোচনা করা ধর্ম-দর্শনের কাজ। মানুষের সমগ্র জীবনের সঙ্গে ধর্ম-চেতনার কি সম্বন্ধ, এবং সমগ্র জগৎ সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান আছে তার সঙ্গে আমাদের ধর্ম-চেতনা যে সব সত্যের আভাস দেয় তাদের যথার্থ সঙ্গতি আছে কি না ধর্ম-দর্শন এটাও নির্ণয় করবার চেষ্টা করে।

যাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না (যেমন, বৌদ্ধ ও জৈন-মতাবলম্বীরা), অথচ কোন অতীন্দ্রিয় সত্তা বা সার্বিক নিয়মের (যেমন, কর্মফলের নিয়ম) উপর নির্ভরশীল তাঁদেরও ধর্ম-চেতনা আছে এটা স্বীকার করলে ঐরূপ ধর্ম-চেতনাও ধর্ম-দর্শনের বিষয়-বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হবে। সুতরাং ধর্ম-দর্শন ও ঈশ্বর-তত্ত্বের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও আছে। কিন্তু এদের মধ্যে সম্বন্ধ আছে বলেই এদের একই সঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন। বস্তুতঃ ঈশ্বর-তত্ত্ব ধর্ম-দর্শনেরই একটি অঙ্গ।

4 প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম ও স্বাভাবিক ধর্ম

পাশ্চাত্য দার্শনিক ও ধর্ম-বেত্তারা ধর্মকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করে থাকেন, যথা—প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম (Revealed Religion) এবং স্বাভাবিক ধর্ম (Natural Religion)। যে সব ধর্মের মূল নীতিগুলিকে কোন মহাপুরুষ বা ধর্ম-প্রবক্তার মাধ্যমে প্রাপ্ত ঈশ্বরের বাণীর উপর সাক্ষাৎভাবে প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করা হয় তারাই হল প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম (যেমন খ্রীষ্টধর্ম, ইস্‌লাম, হিন্দুধর্ম)। এই সব ধর্মের অনুবর্তীরা বিশ্বাস করেন যে, তাঁদের ধর্ম-গ্রন্থে ঈশ্বরের অস্তিত্ব, ঈশ্বরের প্রকৃতি, জগৎ ও মানবাত্মার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ, জীবাত্মার শুভাশুভ, পরমা গতি প্রভৃতি সম্বন্ধে যা যা বলা হয়েছে তা অভ্রান্ত সত্য, এবং শাস্ত্রে ঈশ্বরের যে সব আদেশ লিপিবদ্ধ আছে সেগুলি বিনা দ্বিধায় অবশ্য পালনীয়। এই ধর্ম-শাস্ত্রগুলিতে যে সব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে সেগুলি বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে পাওয়া যায়

না এবং কোনও রকম বিচার-বিতর্কের-বিষয় হতে পারে না। অপরপক্ষে, একশ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মতে মানুষ তার স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে ঈশ্বরের প্রকৃতি, মানবাত্মার স্বরূপ প্রভৃতি সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং সেই জ্ঞানকে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করে সুফল লাভ করতে পারে। আমরা কোন বিশেষ ধর্ম-প্রবক্তা বা ধর্ম-শাস্ত্রের সাহায্য না নিয়েও কেবলমাত্র আমাদের স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে যে ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করি তাকে স্বাভাবিক ধর্ম বলা যায়। কোন বিশেষ একটি ধর্ম-শাস্ত্রে ঈশ্বর সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে ধর্মবেত্তাদের সাহায্যে আমরা তা বোঝবার চেষ্টা করতে পারি, আবার, আমাদের সাধারণ বুদ্ধি ঈশ্বর সম্বন্ধে যা বলে তাকে দার্শনিক বিচারের বিষয় করতে পারি। দর্শনের যে বিভাগে আমাদের স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করি সেই সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় তাকে স্বাভাবিক ঈশ্বর-তত্ত্ব (Natural Theology) বলা হয়।

প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম এবং স্বাভাবিক ধর্ম, প্রত্যাদিষ্ট ঈশ্বর-বাদ এবং স্বাভাবিক বুদ্ধি-জাত ঈশ্বরবাদের মধ্যে এইভাবে পার্থক্য করলে স্বভাবতই আমাদের মনে হতে পারে যে, প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম বা ঈশ্বর-বাদের সঙ্গে ধর্ম-দর্শনের কোনও সম্পর্ক নেই। কারণ, দর্শন যদি বিচারমূলক আলোচনা হয় এবং দার্শনিক বিচারের মূলনীতি যদি এই হয় যে, বিচার-বুদ্ধির কষ্টিপাথরে যাচাই করে যা গ্রহণযোগ্য বলে মনে হবে আমরা কেবলমাত্র তা-ই গ্রহণ করব, এবং ঈশ্বর যদি বিচারবুদ্ধির সম্পূর্ণ অগম্য হন তাহলে প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরসম্বন্ধে কোন দার্শনিক বিচার হতে পারে না।

বহু ধার্মিক ব্যক্তি এই মত পোষণ করেন যে, ঈশ্বর সসীম জীবের কাছে সাক্ষাৎভাবে আত্ম-প্রকাশ না করলে জীবের পক্ষে তাঁকে জানা অসম্ভব। কোন অবতার, ধর্ম-প্রবক্তা অথবা মহাপুরুষের জীবন ও বাণীর মধ্য দিয়ে তিনি আত্ম-প্রকাশ করেন। এইভাবে ঈশ্বরের আত্ম-প্রকাশের ফলে আমরা তাঁর সম্বন্ধে যে জ্ঞানলাভ করি তাকে আমাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। এ সম্বন্ধে দার্শনিক বিচারের কোন অবকাশ নেই। আবার কেউ কেউ বলেন যে, ঈশ্বর একমাত্র অনুভূতিগম্য। বিচার, যুক্তি-তর্ক প্রভৃতির সাহায্যে ঈশ্বরের স্বরূপ জানবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই। এমন কি, প্রত্যাদিষ্ট শাস্ত্রও ঈশ্বর-সম্বন্ধে আমাদের কেবলমাত্র ইঙ্গিত দিতে পারে কিন্তু যথার্থ জ্ঞান দিতে পারে না[2]।

2 ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ করবার উপায় হিসাবে প্রত্যাদেশ, মরমী অনুভূতি প্রভৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পরে করা হবে।

এইসব মতবাদ সত্য হলে প্রকৃতপক্ষে ধর্ম-দর্শনের কোনও বিষয়-বস্তু থাকে না। কারণ, ঈশ্বর যদি বিচার-বুদ্ধির অগম্য হন তাহলে তাঁর সম্বন্ধে কোনও দার্শনিক আলোচনা হতে পারে না, এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস যদি ধর্মের প্রধান অঙ্গ হয় তাহলে ধর্ম সম্বন্ধেও দার্শনিক আলোচনা হতে পারে না। বুদ্ধিবাদী দার্শনিকেরা কিন্তু বলেন যে জ্ঞানের প্রকৃতি বিচার করে দেখলে বুঝা যায় যে, কোনও বস্তু বা তত্ত্বই বিচার-বুদ্ধির নাগালের বাইরে থাকতে পারে না। "কোন বস্তু বা তত্ত্ব এইরকম যে বিচার-বুদ্ধিদ্বারা তাকে জানা যায় না"--এরকম উক্তি স্ববিরোধী। কারণ, কোন বস্তু বা তত্ত্ব বুদ্ধির নাগালের বাইরে হলে সেটা যে অজ্ঞেয় তা-ই বা জানা যাবে কি উপায়ে ? সুতরাং ঈশ্বর-তত্ত্ব সম্বন্ধে দার্শনিক আলোচনা হতে পারে না এই বিশ্বাস ভ্রান্ত।

5 ধর্ম-চেতনা, নীতিবোধ, সৌন্দর্যবোধ ও জ্ঞান-পিপাসা

ধর্ম-চেতনার সঙ্গে নীতি-বোধ ও সৌন্দর্য-বোধের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। বস্তুতঃ ধর্ম, নীতি ও রসানুভূতি পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত বলা চলে। যে বস্তু বা অবস্থা আমাদের চরম কাম্য, যার চাইতে উৎকৃষ্ট আর কিছুই হতে পারে না, যা পেলে আমরা পরিপূর্ণ শান্তি লাভ করি তাকে পরম পুরুষার্থ বা নিঃশ্রেয়স (Summum Bonum—The Highest Good) বলা হয়। আমরা সকলেই কোনও না কোনও ভাবে এই নিঃশ্রেয়স লাভ করার চেষ্টা করে থাকি। অসৎকর্ম থেকে নিবৃত্ত হয়ে সৎকর্ম করা, কু-প্রবৃত্তি দমন করা, সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া—এগুলি হল আমাদের নৈতিক প্রচেষ্টার অঙ্গ। কর্তব্য-বোধ, নৈতিক দায়িত্ব বোধ, কু-প্রবৃত্তি, নীচতা, হীনতা, অসদাচরণের প্রতি ঘৃণা--এগুলি হল নীতি-বোধের মূল উপাদান। সৎ প্রবৃত্তির অনুশীলন ও সদাচরণ যাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়েছে আমরা তাঁকে সাধু ব্যক্তি (Good man) বলি ও শ্রদ্ধা করি। সাধু ব্যক্তির চরম লক্ষ্য হল নিঃশ্রেয়স লাভ, এবং তিনি নিজের চেষ্টায় এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে চান। তাঁর নৈতিক আদর্শকে যতদিন পর্যন্ত না তিনি নিজ জীবনে রূপায়িত করতে পারেন ততদিন পর্যন্ত তাঁর মনে শান্তি নেই। কেউ কেউ আবার সৌন্দর্যে অনুরক্ত। সৌন্দর্য উপভোগ এবং সৌন্দর্যসৃষ্টি এই দুয়েতেই তাঁদের বেশী অনুরাগ। তাঁরা সুন্দরের পূজারী। কবিতা, সঙ্গীত, চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও অন্যান্য চারুশিল্পের মাধ্যমে সৌন্দর্য সৃষ্টি করা, সৌন্দর্য উপভোগ করা এবং সকলকে তাঁদের অনুভূতির অংশীদার করাতেই তাঁদের

আনন্দ। আদর্শ সৌন্দর্যকে রূপায়িত করাই তাঁদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য। কেউ কেউ আছেন আবার জ্ঞান-পিপাসু। সকল রকম জ্ঞান লাভের চেষ্টা করাই তাঁরা তাঁদের জীবনের প্রধান কাজ বলে মনে করেন। জগৎ সম্বন্ধে চরম সত্য লাভ করাই তাঁরা নিঃশ্রেয়স বলে মনে করেন। জ্ঞানীর চরম লক্ষ্য হল 'সত্য', সাধুব্যক্তির চরম লক্ষ্য হল 'শিব' আর সৌন্দর্যরসিক ব্যক্তির চরম লক্ষ্য হল 'সুন্দর'।

ধর্ম-চেতনায় জ্ঞান-পিপাসা, নৈতিক প্রচেষ্টা এবং সৌন্দর্যানুভূতি ও সৌন্দর্যসৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা এই তিনেরই স্থান আছে। ধর্ম-প্রাণ ব্যক্তি জগতেব চরমতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করবার জন্য আগ্রহী হন, সাধু জীবন যাপন করে মানব সেবার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেন, আবার তেমনই জগৎ সম্বন্ধে, বিশেষতঃ জগতের চরম আশ্রয় ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁর অনুভূতিকে সৌন্দর্য-রসে সিক্ত করে সকলের কাছে প্রকাশ করেন। যিনি ধার্মিক তিনি তত্ত্বান্বেষী হবেন, নীতি ও সদাচারপরায়ণ হবেন এবং সর্বত্র কুশ্রীতা ও মালিন্যের বদলে সুন্দরের অভিব্যক্তি দেখতে চাইবেন এটাই আমরা সকলে আশা করে থাকি। ধর্ম-প্রাণ ব্যক্তির উপাস্য দেবতা ঈশ্বর সত্য, শিব ও সুন্দরের সমন্বয়। তিনি অনন্তজ্ঞানস্বরূপ। তিনি আমাদের ধীশক্তিকে সত্যের দিকে চালনা করে থাকেন, তিনি সর্ব-মঙ্গলময় এবং তিনিই সকল সৌন্দর্যের মূলাধার। এইজন্য আমরা দেখি যে প্রত্যেক দেশে ও প্রত্যেক সম্প্রদায়ে ধর্ম-বোধ বিজ্ঞান ও দর্শন-চর্চার প্রেরণা দিয়েছে, সকল লোককে সাধু জীবন যাপন করবার জন্য নির্দেশ দিয়েছে এবং শিল্পীদের শিল্প-সাধনায় উৎসাহ দিয়েছে। ধার্মিক ব্যক্তি যে নিঃশ্রেয়স লাভের জন্য সাধনা করেন সেটি পরম পরিপূর্ণতার আদর্শ।

ধর্ম-জীবনের উদ্দেশ্য আমাদের চরম অভীষ্ট সিদ্ধি বা পরম শ্রেয়কে লাভ করা। কিন্তু জ্ঞানী, সাধু বা সৌন্দর্যরসিক নিজেদের চেষ্টায় তাঁদের অভীষ্ট সিদ্ধির আশা করেন, আর ধর্ম-প্রাণ ব্যক্তি কোনও বৃহত্তর বা মহত্তর সত্তার কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্ম-সমর্পণ করেই তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছাতে চান। তিনি ঈশ্বরকে তাঁর পরিত্রাতা বলে বিশ্বাস করেন। "হে ঈশ্বর, আমার নিজের কোনও ক্ষমতা নেই, তুমি আমার প্রতি করুণা করে আমাকে সকল পাপ ও দুঃখ-দুর্দশা থেকে উদ্ধার কর"—এই হল সাধক বা ভক্তের মর্মের বাণী।

ধর্ম-দর্শনের আলোচনায় ধর্ম-চেতনার প্রকৃতির এই বৈশিষ্ট্যের কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধর্মের ঐতিহাসিক উৎপত্তি

ধর্ম-দর্শনের অন্যতম প্রধান কাজ হ'ল ধর্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা। ধর্ম বলতে কি বোঝায়, ধর্ম কি করে, ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে ধর্ম কি উদ্দেশ্যই বা সাধন করে, আমাদের ধর্ম-বিশ্বাসগুলি কতদূর সত্য ইত্যাদি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হয় ধর্ম-দর্শনে। কিন্তু ধর্মের স্বরূপ ও কার্যাবলী ব্যাখ্যা করতে হ'লে ধর্মের ঐতিহাসিক এবং মানসিক উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। ঠিক কি অবস্থায় আদি যুগে মানুষের মনে ধর্ম-চেতনার উদ্ভব হয়েছিল, ধর্মের আদি ও প্রাথমিক রূপ কি ছিল, কি উদ্দেশ্যে মানুষ ধর্মের দিকে অগ্রসর হ'ল, কি ভাবে এবং কেনই বা স্থূল অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে ধর্মের বর্তমান স্তরে ক্রমোন্নতি ঘটল, ইত্যাদি প্রশ্নের আলোচনা ব্যতিরেকে ধর্মের স্বরূপ নির্ণয় করা সম্ভব নয় ; এবং এই ব্যাপারে আমরা নৃবিদ্ (anthropologist) ও মনোবিদ্‌দের (psychologist) কাছে অনেক সাহায্য পেতে পারি। অতএব ধর্ম-দর্শন আলোচনার প্রথমেই আমরা ধর্মের উৎপত্তি নিয়ে আলোচনা করব।

এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে। কোন বস্তুর উৎপত্তি ও মানবজীবনে তার তাৎপর্য বা মূল্যের প্রশ্ন ঠিক এক নয়। এ-কথা যেমন বিজ্ঞান, নীতি ও শিল্পের ক্ষেত্রে সত্য, তেমনই ধর্মের ক্ষেত্রেও সত্য। যদি দেখা যায় ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল কতকগুলি অন্ধ বিশ্বাসের মধ্যে, অত্যন্ত স্থূল ব্যবহারিক প্রয়োজনে, তাহলেও উন্নত অবস্থায় ধর্মের মূল্য মানব-জীবনে কিছুমাত্র কমে না। আরম্ভ যে ভাবেই হয়ে থাকুক না কেন, কোন বস্তুর চরম মূল্যায়ন হয় তার পরিস্ফুটনের মধ্যে, তার কৃতির মধ্যে। কিন্তু তবু ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য ও মানবজীবনে তার সঠিক স্থান নির্ণয় করতে হ'লে, ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের আলোচনা একান্তভাবে আবশ্যক।

ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনা আরম্ভ হয় মাত্র গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে টাইলর (Tylor)-এর "আদিম সংস্কৃতি" (Primitive Culture) নামক গ্রন্থের মাধ্যমে। কিন্তু এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক মতবাদগুলি আলোচনা করার পূর্বে কয়েকটি প্রাচীন ও বর্তমানে অপ্রচলিত মতবাদের উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই মতবাদগুলির

বৈজ্ঞানিক মূল্য না থাকলেও ঐতিহাসিক মূল্য আছে; আর সেই কারণেই ধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে দার্শনিক আলোচনায় তাদের নির্দিষ্ট স্থান থাকা আবশ্যক। এগুলির মধ্যে আমরা মাত্র দুটি মতবাদের আলোচনা করব; কারণ, এই দুটি মতবাদই বর্তমানে প্রায় ম্রিয়মাণ ও অপ্রচলিত হলেও এক সময় এগুলি বহুল-প্রচারিত ছিল। এই দুটি মতবাদ হ'ল ঈশ্বর-প্রত্যাদেশ-বাদ ও অতিবর্তী-ঈশ্বরবাদ।

(a) **ঈশ্বর-প্রত্যাদেশবাদ** (Theory of Revelation)—এই মত অনুযায়ী ধর্মের উৎপত্তি ঘটেছিল কোন আদিম ও বিশেষ ধরণের প্রত্যাদেশ থেকে। ঈশ্বর বহু প্রাচীনকালে কোন ব্যক্তিবিশেষের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন বা তাঁর ধর্মীয় আদেশ প্রেরণ করেছিলেন। সেই ব্যক্তিই পরবর্তী কালে ঈশ্বরের বিশেষ আদেশ বা উপদেশ সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। অতএব এই মত অনুযায়ী ঈশ্বর-আদিষ্ট ব্যক্তিরাই জগতে ধর্মের প্রচার করেছেন। এই মতবাদ ইহুদী, খ্রীষ্ট ও ইসলাম ধর্মের ঈশ্বরতত্ত্বে (theology) বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এই মতে আদি ধর্ম-মত ছিল এক ধরণের একেশ্বরবাদ যা' পরবর্তী কালে বহু দেববাদের রূপ নিয়েছে।

কিন্তু এই প্রত্যাদেশবাদ সম্বন্ধে বলা যায় যে, এই মত ধর্মের উৎপত্তির ব্যাখ্যা করেছে অনেক বেশী বুদ্ধিবাদী ও যান্ত্রিক পদ্ধতিতে। মানুষের মন যেন প্রত্যাদেশের পূর্বে ধর্মহীন ছিল এবং ঈশ্বর যেন তার কাছে সহসা ধর্মের তত্ত্ব প্রকাশ করলেন। কিন্তু এই ধরণের কল্পনা একেবারেই অমনোবিদ্যা-সুলভ। কারণ, ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ পাবার পূর্বে মানুষের চেতনা ধর্মশূন্য ছিল এ কথা যদি সত্য হয়, তাহলে কি করে তার পক্ষে ঈশ্বরদত্ত ধর্মের তত্ত্ব গ্রহণ করা সম্ভব হ'ল? যে মন বা চেতনার স্বরূপের মধ্যে ধর্মের কোন অস্তিত্বই নেই, সেই মন বা চেতনার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে বাইরের থেকে আসা ধর্মের তত্ত্ব গ্রহণ করা অসম্ভব। অবশ্য প্রত্যাদেশবাদে ধর্মের বাস্তবতার কথা বলা হয়েছে। ধর্ম যে মানুষের ব্যক্তিগত কল্পনা ও ইচ্ছা-প্রসূত ব্যাপারমাত্র নয়, মানব জীবনে ধর্ম-চেতনার যে একটা বাস্তব ভিত্তি আছে তা এই মতবাদে স্পষ্টতঃ স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু ধর্ম যদি প্রকৃতই প্রত্যাদেশের মাধ্যমে মানুষের কাছে এসে থাকে, তাহ'লে তা এসেছে পর্যায়ক্রমে মানুষের চেতনার ক্রমবিবর্তনের পথে। ঈশ্বর যদি প্রত্যাদেশের মাধ্যমে মানুষের কাছে নিজেকে প্রকাশ করে থাকেন, তাহলে তা করেছেন এমনভাবে ক্রমে ক্রমে যে, মানুষের চেতনাও তার জন্য ধীরে ধীরে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রস্তুত হয়েছে। সুতরাং ধর্মের সকল তত্ত্ব

নিশ্চয়ই আদি মানবের কাছে সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত হয় নি। তাছাড়া, মানুষের কাছে ঈশ্বরের এই আত্মপ্রকাশ ঘটেছে মানুষের সমগ্র জীবনকে প্রভাবিত করে, কেবলমাত্র কতকগুলি ধারণারূপে নয়। বিবর্তনবাদ এই কথা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, সব কিছুর মত মানুষের মনেরও ক্রমবিবর্তন ঘটেছে আদিকাল থেকে আধুনিক কালে। যে সব উন্নত ধারণা ও তত্ত্ব আদি প্রত্যাদেশে মানুষের কাছে প্রকাশ করা হয়েছিল বলে প্রত্যাদেশ-বাদীরা মনে করেন, সেগুলি যে আদি মানবের চেতনার পক্ষে গ্রহণ ও ধারণযোগ্য ছিল তা কল্পনা করা যায় না। আধুনিক সুসভ্য সুসংস্কৃত মানুষের কাছে যা সহজগ্রাহ্য, আদিম মানবের চেতনায় তা ছিল দুর্বোধ্য, অজ্ঞেয়। সুতরাং ধর্মের আদিম রূপ যে প্রত্যাদেশের মত এত সুসম্পূর্ণ ও সুসংহত ছিল না, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

(b) অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ (Deism)—ধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে দ্বিতীয় মতটি হ'ল অষ্টাদশ শতকের ইংরেজ অতিবর্তী ঈশ্বরবাদীদের মত। এঁরা প্রত্যাদেশবাদ খণ্ডন করে মানুষের বুদ্ধি ও যুক্তিক্ষমতার মধ্যেই ধর্মের উৎসের সন্ধান পেয়েছেন। এঁদের মতে ধর্মের মূল সত্যগুলি, অর্থাৎ, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, আত্মার অবিনশ্বরতা, নীতির প্রাধান্য ইত্যাদি সত্যগুলি যুক্তি ও বুদ্ধিগ্রাহ্য; এবং যেহেতু বুদ্ধি ও যুক্তিক্ষমতা মানুষের সহজাত, অতএব এই সব সত্য স্বাভাবিকভাবেই আদি মানুষের বুদ্ধির কাছে প্রতিভাত হয়। কিন্তু পরবর্তী কালে ধূর্ত পুরোহিতরা, অনুষ্ঠান ও আচারগত ধর্মের সৃষ্টি করে। এই সব পুরোহিতদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষের সহজ বিশ্বাস ও ভয়ের সুযোগ নিয়ে তাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখা ও তাদের ওপর যথেচ্ছ কর্তৃত্ব করা। সুতরাং বিশুদ্ধ ধর্ম ছিল আদি মানুষের বুদ্ধির কাছে প্রকাশিত স্বাভাবিক ধর্ম। এই স্বাভাবিক ধর্ম পুরোহিত-প্রবর্তিত প্রথা ও অনুষ্ঠানের দ্বারা দূষিত হয় নি। এই ঈশ্বরবাদ অবশ্য খ্রীষ্টীয় প্রত্যাদেশকে অস্বীকার করে নি, এবং বাইবেলকেও অগ্রাহ্য করে নি। অতিবর্তী ঈশ্বরবাদীদের মতে খ্রীষ্টীয় প্রত্যাদেশ বা বাইবেলে এমন কিছু নেই যা মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধি দ্বারা গ্রাহ্য নয়। অবোধ্য ও রহস্য-ময় প্রত্যাদেশকেই তাঁরা সমালোচনা করেছেন। বুদ্ধির প্রাধান্য স্বীকার করায় এই ঈশ্বরবাদীদের এক অর্থে বুদ্ধিবাদী বলা যায়; এবং ধর্মকে তাঁরা স্বাভাবিক মনে করেন বলে, তাঁদের মতবাদকে স্বভাববাদও বলা চলে। যাই হ'ক, অতিবর্তী ঈশ্বরবাদীদের মতে ধর্মের দু'টি প্রধান উৎস—মানুষের বুদ্ধি হ'ল স্বাভাবিক বিশুদ্ধ ধর্মের উৎস এবং পুরোহিতদের স্বেচ্ছাকৃত প্রতারণা হ'ল আচারগত ঐতিহাসিক ধর্মগুলির উৎস। স্বাভাবিক ধর্ম বলতে

তাঁরা সমস্ত ধর্মের মধ্যে যে সব সাধারণ বা সামান্য বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায় সেগুলির কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। কারণ, তাঁদের মতে এগুলিই হ'ল সমস্ত ধর্মের মূল কথা। এই মত সরবেরীর লর্ড হার্বার্ট (Lord Herbert of Cherbury) ও জন টুল্যাণ্ড (John Toland) প্রথম প্রবর্তন করেন। পরে অবশ্য কিছু ফরাসী চিন্তানায়ক এই মত গ্রহণ করেন অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে। এই বিষয়ে প্রথমোক্ত দুই দার্শনিকের লেখা প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৬৬৩ ও ১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দে।

ধর্মের উৎস সম্বন্ধে এই মতবাদ পরবর্তীকালে সমালোচিত হয়েছে। প্রথমত, এই মত অমনোবিদ্যাসুলভ। কারণ, এই মতে ধর্মের উৎস হিসেবে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে বুদ্ধিকে; অথচ ধর্মের উৎপত্তির ব্যাপারে মানুষের আবেগ ও অনুভূতির মূল্য কিছু কম নয়; এবং এই আবেগ ও অনুভূতিকে বাদ দিয়ে মানব মনে ধর্মের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করাও সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, পূর্বোক্ত মতবাদের মত এই মতবাদেও মানব-মনে ধর্মের ক্রমবিবর্তনকে স্বীকার করা হয় নি। অন্য সব কিছুর মত মানুষের ধর্ম-চেতনারও ক্রমবিবর্তন ঘটেছে আদিকাল থেকে আধুনিক কালে। আদিম মানুষের বুদ্ধি এত উন্নত ছিল যে, ধর্মের সকল মূল তত্ত্ব তার কাছে স্পষ্টত প্রতিভাত হয়েছিল—এ-কথা কল্পনা করা যায় না। সুতরাং এই মতবাদে ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে ইতিহাস-চেতনার অভাব দেখা যায়।

তৃতীয়ত, সমস্ত ঐতিহাসিক ধর্মগুলিই যে পুরোহিতদের কপটতা ও স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে, এটি ঐতিহাসিক সত্য নয়। যদিও এ-কথা ঠিক যে, পুরোহিতরা অনেক সময়ই মানুষের ধর্মীয় আবেগকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগিয়েছে, কিন্তু তা সম্ভব হয়েছে, মানুষ পূর্বের থেকেই ধর্মীয় ভাবে ভাবিত ছিল বলেই। যা স্বাভাবিক ভাবে মানুষের চেতনার মধ্যে বর্তমান ছিল, তা'-ই তারা কাজে লাগিয়েছে মাত্র। পুরোহিতরা ধর্মের স্রষ্টা নয়, ধর্মের রক্ষাকর্তা। ধর্মের প্রকৃত প্রবক্তা ও স্রষ্টা ছিলেন মহাপুরুষ ও অবতারগণ। এঁদের কেউই ধর্মের আচারগত দিকটির বিশেষ কোন মূল্য দেন নি। প্রকৃতপক্ষে কোন মহৎ ধর্মের ঐতিহাসিক উৎপত্তিই পুরোহিতদের থেকে হয়নি। ধর্মের এই ধরণের পুরোহিতবাদী ব্যাখ্যা দেন কার্ল মার্কস্ (Karl Marx) উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে, অবশ্য সম্পূর্ণ অন্য দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। এ সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করব।

ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে অবৈজ্ঞানিক মতবাদগুলির আলোচনার পর

আমরা এখন ধর্মের উৎস সম্পর্কীয় আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতবাদগুলি আলোচনা করব। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ধর্মের উৎস সম্পর্কে আলোচনায় আমরা নৃবিদ্ ও মনোবিদ্দের সাহায্য পেতে পারি, অর্থাৎ ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা দু'টি দৃষ্টিকোণ থেকে হ'তে পারে। নৃবিদ্যার দৃষ্টিতে ধর্মের ঐতিহাসিক উৎপত্তি নিয়ে আলোচনা করা হয়। মানব জাতির বিবর্তনের ঠিক কোন্ পর্যায়ে তার মনে ধর্মের উদয় হয়? মানুষের ধর্মীয় প্রকৃতির প্রাথমিক প্রকাশ কি ভাবে ঘটেছিল? ধর্মের প্রাথমিক রূপই বা কি ছিল, যা থেকে পরবর্তী কালে অন্যান্য ধর্মের বিবর্তন ঘটে বলে সিদ্ধান্ত করা যায়?—ইত্যাদি প্রশ্ন নৃবিদ্যার আলোচ্য। অপরপক্ষে মনোবিদ্যার কাজ হ'ল ধর্মের মানসিক উৎস অনুসন্ধান করা। কেবল উৎপত্তিকালে নয়, সর্বকালে ও সর্বক্ষেত্রে ঠিক কোন্ মানসিকতা মানব-মনে ধর্মীয় ভাবের ভিত্তি? মানব মনের ঠিক কোন্ আবেগ, উদ্দেশ্য, প্রেরণা বা অভাববোধ তার মধ্যে অতিপ্রাকৃত সত্তার অনুভূতি জাগায় এবং সেই সত্তার সঙ্গে নিজের জীবনকে মিলিত করতে ও তদনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করতে সাহায্য করে? মানুষের মানসিক গঠনের মধ্যে এমন কি আছে যা তাকে এমন ধরণের ক্রিয়া অনুষ্ঠানে অনুপ্রাণিত করে যাকে ধর্মীয় অনুষ্ঠান আখ্যা দেওয়া যেতে পারে? —এই সব প্রশ্নের আলোচনা হয় মনোবিদ্যায়। তবে এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই উভয় দৃষ্টিভঙ্গী পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র নয়, অর্থাৎ, একটির আলোচনায় অপরটির সাহায্য বিশেষভাবে প্রয়োজন। নৃবিদ্যা একান্তভাবে মনোবিদ্যানির্ভর। কারণ, আদি মানবের আচার-ব্যবহার ও জীবন-যাত্রার কোনো লিখিত ইতিহাস নেই, সুতরাং নৃবিদ্যার সিদ্ধান্তগুলি প্রায়ই মনোবিদ্যানির্ভর অনুমানমাত্র। আদিম মানবের ব্যবহার জানা সম্ভব নয় বলেই নৃবিদ্কে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আধুনিক কালের আদিম ও বন্য মানুষের ব্যবহার ও মানসিকতা এবং শিশু-মনস্তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত করতে হয়। যে কোন সামাজিক প্রথা বা অনুষ্ঠান সম্বন্ধে এ কথা যেমন সত্য, ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কেও ঠিক তেমনই সত্য। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে বর্তমান কালের আদিম ও বন্য মানবের জীবনে ধর্মের অস্তিত্ব ও রূপ সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া গেলেও আদিম ও প্রাথমিক অবস্থায় ধর্মের রূপ ঠিক কি ছিল এ সম্বন্ধে অনুমান বা আন্দাজ করা যায় মাত্র, সঠিক, নির্ভুল সিদ্ধান্ত করা যায় না। অতীত, বিশেষতঃ সেই প্রাগৈতিহাসিক অতীত, আমাদের কাছে অনেকাংশেই অন্ধকারাচ্ছন্ন ও চির-অজ্ঞাত। আমাদের সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য অনেকাংশেই নির্ভর করে আদিম মানবের মনোবৃত্তি সম্বন্ধে আমাদের মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টির ওপর। সুতরাং

আমরা প্রথমে ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কীয় কতকগুলি আধুনিক নৃবিদ্যাগত মতামত আলোচনার পর এ সম্বন্ধে মনস্তাত্ত্বিক আলোচনা করব; কারণ, আমরা পূর্বেই বলেছি, আদি মানবের আচার-ব্যবহার অনুষ্ঠান-প্রথা সম্বন্ধে কোন আলোচনাই মনস্তাত্ত্বিক আলোচনাকে বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ হ'তে পারে না। অবশ্য স্থানাভাবে আমরা অপেক্ষাকৃত প্রধান নৃবিদ্যাগত মতবাদগুলি নিয়েই আলোচনা করব, এবং আশাকরি এগুলি থেকেই আদি মানবের ধর্ম-জীবন ও ধর্ম-চিন্তা সম্পর্কে সাধারণ ধারণায় আসা সম্ভব হবে।

(a) টাইলর (Tylor) প্রবর্ত্তিত সর্বপ্রাণবাদীয় মতবাদ (Animism)— টাইলর তাঁর "আদিম সংস্কৃতি" (Primitive Culture) নামক গ্রন্থে এই মতবাদ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর এই গ্রন্থকে এই বিষয়ে প্রথম ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে প্রামাণিক গ্রন্থ বলা যায়। দুই খণ্ডে রচিত টাইলর-এর এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭১ সালে। টাইলর এই গ্রন্থে দেখাতে চেয়েছেন, মানব সংস্কৃতির বিবর্তনের কোন এক স্তরে মানুষ পর্বত, গাছ, নদী, মেঘ ইত্যাদি প্রাকৃতিক বস্তুগুলিকে তার নিজের মতই সজীব বলে মনে করত। এই সব প্রাকৃতিক বস্তুর ওপর সে তার নিজের ব্যক্তিত্ব ও অভিজ্ঞতাও আরোপ করত। সে কল্পনা করত যে, তার নিজের ক্রিয়া-কলাপ যেমন তার নিজের ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হয়, ঠিক সেই রকমই প্রাকৃতিক বস্তুগুলির ক্রিয়া-কলাপের মূলেও তাদের ইচ্ছা কাজ করে। আর টাইলর-এর মতে এই ধরণের প্রাণবাদী ধারণাকে ভিত্তি করেই আদিম মানবের জীবনে ধর্মের আবির্ভাব ঘটে। মানুষ যখন কল্পনা করত যে, তার প্রাকৃতিক পরিবেশের সমস্ত বস্তুই সজীব ও সপ্রাণ, তখন সে তাদের মধ্যে কোন কোন প্রাকৃতিক শক্তিকে, যাদের সে বিশেষভাবে শক্তিমান বলে বিশ্বাস করত, সন্তুষ্ট করতে চাইল এবং যাদের সে দুষ্ট বা শত্রু বলে কল্পনা করত তাদের দূর করতে ও এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করল। এই সব বিভিন্ন নৈসর্গিক শক্তির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াসের মধ্যে দিয়েই আদি ধর্মের সৃষ্টি।

যদিও টাইলর-এর গবেষণা আদিম সংস্কৃতি ও ধর্ম সম্পর্কে নৃবিদ্যায় অনেক আলোকপাত করেছে, যদিও আজ একথা প্রায় সর্বজনস্বীকৃত যে, মানব সংস্কৃতির একটি স্তরে সর্বপ্রাণবাদ প্রায় বিশ্বজনীন ছিল, তবুও আদিম ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত নির্বিচারে গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমত, সর্বপ্রাণবাদ ও ধর্ম ঠিক এক জিনিস নয়। সর্বপ্রাণবাদকে বস্তুতঃ এক ধরণের আদিম বা প্রাথমিক দর্শন বলা যায়। অবশ্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, টাইলর সর্বপ্রাণবাদকে ঠিক প্রাথমিক ধর্ম বলেননি।

তাঁর মতে সর্বপ্রাণবাদ হ'ল আদি ধর্মের ভিত্তিস্বরূপ। কিন্তু তবুও বলা যায়, যে-কোন সপ্রাণ প্রাকৃত বস্তুই মানুষের মনে ধর্ম-চেতনা জাগায় নি। এদের মধ্যে মাত্র কতকগুলিকেই সে পূজা করত অথবা কেবলমাত্র তাদের সঙ্গেই সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস করত। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, সর্বপ্রাণবাদী মানুষের মনেও ধর্ম-চেতনা ও ধর্মীয় আবেগের অন্য উৎস ছিল। পূজ্যের মধ্যে পূজক এমন কিছু পায় যা' তার চেতনা তার অনুভূতিকে বিশেষভাবে আন্দোলিত করে। পূজার মধ্যে আছে নির্বাচন। মানুষ, সে আদিমই হোক আর আধুনিকই হোক, যাকে পূজা করে শ্রদ্ধা করে, তাকে অপর সকলের থেকে পৃথকরূপে দেখে। কিন্তু এই নির্বাচন সব সময়ই কোন না কোন উদ্দেশ্যের দ্বারা নির্ধারিত হয়। সুতরাং আদি মানবের ধর্ম্মীয় আচরণের মূলেও কোন উদ্দেশ্য ছিল। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মীয় আচরণের মূল কথা হ'ল, মানুষ অতিপ্রাকৃত সত্তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়। কিন্তু এই অতিপ্রাকৃতের ধারণা ও সর্বপ্রাণবাদ এক নয়। নদী, পাহাড়, মেঘ ইত্যাদি প্রাকৃতিক বস্তুগুলিকে সপ্রাণ কল্পনা করলেও, এগুলি আদিম মানবের কাছে স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক বলেই বিবেচিত হ'ত। এগুলির প্রত্যেকটিই যে তার কাছে শ্রদ্ধেয় ও পূজ্য বলে স্বীকৃত হয়েছিল তা নয়। সুতরাং যাকে সে পূজা করত তাকে অতিপ্রাকৃত বলে বিশ্বাস করত, আর তার সেই বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত থাকত রহস্যবোধ, শ্রদ্ধা, বিস্ময়, ভক্তিমিশ্রিত ভয় ইত্যাদি। সুতরাং ধর্ম যে সর্বপ্রাণবাদকে ভিত্তি করে উদ্ভূত হয়েছিল তা নয়, বরং বলা যায় আদি মানবের ধর্ম-চেতনা তার সর্বপ্রাণের ধারণা ও বিশ্বাসের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, দর্শন হিসেবেও সর্বপ্রাণবাদকে আদিম বা প্রাথমিক বলা যায় না। কারণ, এই বিশ্বাসের মূলে আছে আত্মা বা প্রাণ সম্পর্কে মানুষের ধারণা। কিন্তু আদিম মানবের কল্পনায় আত্মা বা প্রাণের স্পষ্ট ধারণার অস্তিত্ব মনস্তত্ত্বের বিচারে স্বীকার করা যায় না। আত্মা বা প্রাণ সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হয় মানসিক বিবর্তনের উচ্চতর স্তরে। কিন্তু তাই বলে এ-কথাও স্বীকার করা যায় না যে, সেই উচ্চতর স্তরে পৌঁছনোর পূবে মানব মনে ধর্ম-চেতনার উদ্ভব হয় নি। কারণ, অতি আদিকাল থেকেই যেখানেই মানুষের অস্তিত্ব দেখা গেছে, সেখানেই কোন না কোন এক রূপে ধর্মের অস্তিত্বও দেখা গেছে। সুতরাং সর্বপ্রাণবাদ স্তরের পূর্বে মানুষের ধর্মের কি রূপ ছিল তা অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে এ সম্বন্ধে আরও আধুনিক গবেষণায়।

(b) হার্বার্ট স্পেন্সর (Herbert Spencer)-এর প্রেত-বাদ (Ghost-Theory)—এই মতের প্রধান প্রবক্তা হলেন হার্বর্ট স্পেন্সর। তাঁর মতে ধর্মের উৎপত্তি হয় প্রেতরূপে আবির্ভুত পূর্বপুরুষ পূজার মধ্যে। অতি প্রাচীন কাল থেকেই সর্বদেশে মৃত পুরুষদের আত্মার প্রতি পূজা, উপহার ইত্যাদি নিবেদন করার প্রথা প্রচলিত। হার্বর্ট স্পেন্সরের মতে এইটিই ছিল প্রাথমিক ধর্ম। সজীব মানুষের নিয়ন্ত্রণ-বহির্ভূত মৃত পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে ভীতি থেকেই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের উৎপত্তি। তাঁর মতে সর্বপ্রাণবাদ প্রকৃতপক্ষে এই প্রেতপূজা বা মৃত পূর্বপুরুষ পূজা থেকেই গৃহীত। •কারণ, আদি মানুষ কল্পনা করত যে, তাদের মৃত পূর্বপুরুষরাই কতকগুলি প্রাকৃতিক বস্তুকে আশ্রয় করে বাস করে এবং এই কারণেই সেই সব প্রাকৃতিক বস্তুগুলি (নদী, গাছ, পাহাড় ইত্যাদি) পূজ্য।

এই মতবাদ প্রাচীন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের বিশেষ রূপের সম্পর্কে ধারণা দিলেও মনস্তাত্ত্বিক বিচারে এটি গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমত, প্রেতপূজা ও ধর্ম ঠিক এক নয়। মানুষ অতি প্রাচীন কাল থেকেই মৃত ব্যক্তির আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে এবং তার উদ্দেশ্যে উপহার ইত্যাদি নিবেদন করে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই কারণে মৃত পূর্বপুরুষমাত্রকেই সে দেবতা জ্ঞান করে এ-কথা জোর করে বলা যায় না। অনেক ক্ষেত্রেই মৃত ব্যক্তির আত্মাকে তুষ্ট করার চেষ্টা করা হয়, যাতে সে কোন রকম ক্ষতির কারণ না হয়। প্রেতপূজা ব্যাপারটা নায়ক-পূজারই আর এক রূপ। কিন্তু নায়কপূজা ও দেবপূজা বা ঈশ্বরপূজা ঠিক এক জিনিষ নয়। এমন অনেক আদি জাতি আছে যারা প্রেতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে কিন্তু প্রেতকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করে না।

দ্বিতীয়ত, এই মতে সর্বপ্রাণবাদকে প্রেতপূজা থেকে গৃহীত একটি বিশিষ্ট ধর্ম বলে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রেতপূজাকেই সর্বপ্রাণবাদের একটি বিশিষ্ট রূপ বলা যায়। যারা যে-কোন প্রাকৃতিক বস্তুকে সপ্রাণ বলে কল্পনা করে তাদের পক্ষেই মৃত ব্যক্তির আত্মার অস্তিত্ব কল্পনা করা সম্ভব। যাই হোক, এই উভয় মতেই স্বীকার করা হয়েছে যে, মানুষের ধর্ম-চেতনার মূলে আছে প্রাণ বা আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলেছি যে, মানুষ আত্মা সম্বন্ধে ধারণা করতে শিখেছে তার মানসিক বিবর্তনের অনেক উচ্চস্তরে। আদিম মানুষের পক্ষে দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব কল্পনা করা সম্ভব ছিল না। এ-কথা শিশু-মনস্তত্ব ও আধুনিক অসভ্য ও বন্য জাতিগুলির আচার-ব্যবহার থেকেই অনুমান করা যায়। এই কারণেই প্রেতপূজাকে প্রাথমিক বা আদিম ধর্ম বলা যায় না।

মৃত পূর্বপুরুষদের আত্মাকে পূজা করবার পূর্বে মানুষের মধ্যে ধর্ম-চেতনার অস্তিত্ব ছিল না, এ কথা কল্পনা করার চেয়ে আত্মার ধারণা স্পষ্ট হবার পূর্বেও মানব মনে ধর্মচেতনার অস্তিত্ব ছিল, এই সিদ্ধান্তই বেশি যুক্তিযুক্ত। আসলে ধর্ম হ'ল একটি জটিল ব্যাপার এবং কোন একটি মাত্র প্রথা বা সামাজিক অনুষ্ঠানের সাহায্যে ধর্মের উৎপত্তির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। নানা অনুভূতি আবেগ ও নানা ধরণের ইচ্ছা ইত্যাদি থেকে ধর্মের উৎপত্তি। সুতরাং হার্বর্ট স্পেন্সরের ব্যাখ্যায় অতিসরলীকরণ দোষ ঘটেছে, বলা যায়।

(c) **'টোটেম' প্রথা** (Totemism)—অনেকের মতে 'টোটেম' পূজাই পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্ম। 'টোটেম' প্রথা আসলে একটি জটিল ব্যাপার। উত্তর আমেরিকার 'লোহিত ভারতীয়' (Red Indian)-দের মধ্যে এই প্রথার বিশেষ প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। অন্যান্য আদি জাতির মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত। উত্তর আমেরিকার আদিবাসিদের কাছে 'টোটেম' এক জাতীয় প্রাণী অথবা উদ্ভিদ (এবং দৃষ্টান্ত অতি বিরল হলেও) কখন কখন বা জড়বস্তু, যার সঙ্গে তারা বংশগত সম্পর্ক স্বীকার করে। তারা মনে করে যে, এই বিশেষ জাতীয় প্রাণী (সর্প, বৃষ, মেষ ইত্যাদি) তাদের সমগোত্রীয় এমন কি তাদের পূর্বপুরুষ। এই 'টোটেম'-এর সঙ্গে সম্পর্ক থাকার জন্যেই তারা নিজেদের একই গোষ্ঠী বা গোত্রের অন্তর্ভূত বলে মনে করে, এবং অনেক সময়েই 'টোটেম' অনুযায়ী তাদের গোত্রের নামকরণও হয়। টোটেম-কে ঠিক দেবতা বলে গণ্য করা না হলেও তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখা হয় এবং সেই অনুযায়ী তার প্রতি আচরণও করা হয়। 'টোটেম'কে সাধারণ জাগতিক প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয় না; বিশেষ অনুষ্ঠান বা উৎসব ছাড়া তাকে হত্যা করা বা খাদ্যরূপে গ্রহণ করাও হয় না। 'টোটেম' অর্থে সব সময়ই কোন এক বিশেষ জাতীয় প্রাণী বা উদ্ভিদকেই বোঝানো হয়, একটিমাত্র প্রাণী বা উদ্ভিদকে নয়। 'টোটেম' প্রথা সম্পর্কীয় মতবাদ এক সময় (খ্রীষ্টীয় উনিশ শতকের শেষভাগ ও বিংশ শতকের প্রথমভাগ) বিশেষ প্রচলিত ছিল। এই মতের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন রবার্টসন স্মিথ (Robertson Smith)। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর "সেমীয়দের ধর্ম" (Religion of the Semites) গ্রন্থে তিনি এই মত বিশেষ যুক্তি ও তথ্য সহকরে ব্যাখ্যা করেন। পরবর্তী কালে জীবন্স (Jeavons) তাঁর ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "ধর্মের ইতিহাসের ভূমিকা" (An Introduction to the History of Religion গ্রন্থেও এই মত সমর্থন করেন। যদিও রবার্টসন স্মিথ-এর মত ধর্মের বৈজ্ঞানিক

আলোচনাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে, তবুও তথ্যের ভিত্তিতে এই মতকে ঠিক স্বীকার করা যায় না। জীভন্স 'টোটেম' প্রথাকে প্রাথমিক ধর্ম বলেছেন। প্রাক্-'টোটেম' ধর্মের অস্তিত্ব স্বীকার করলেও এই অবস্থা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান কল্পনাভিত্তিক বলে জীভন্স মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে প্রাক্-'টোটেম' যুগের ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না; কাজেই প্রাণিপূজাকেই প্রাথমিক পূজাবিধি বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। এই প্রাণিপূজার স্তরে মানুষ ছিল একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী; এবং বহুদেববাদ আসে পরবর্তী কালে এই বিশ্বাসের বিচ্যুতি থেকে।

নৃবিদ্যায় 'টোটেম' পদটির সঙ্গে আরও একটি পদও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এই পদটি হল 'টাবু' (Taboo)। পলিনেসীয় (Polynesian) এই পদটির অর্থ কোন বস্তু বা ব্যক্তির পবিত্র (অথবা অপবিত্র) প্রকৃতি, সেই বস্তু সম্বন্ধে যাবতীয় নিষেধ ও সেই সব নিষেধ মান্য বা অমান্য করার জন্য যে শুচিতা বা অশুচিতা ঘটে সেগুলি। Encyclopaedia Britannica গ্রন্থে বলা হয়েছে 'টাবু' নৈতিক বিধি-নিষেধ, আইনগত নয়।[1] বর্তমানে অবশ্য 'টাবু' বলতে প্রধানত পবিত্র ও অপবিত্র বস্তু ও সেই সম্বন্ধে বিধি-নিষেধকেই বোঝানো হয়। অতএব 'টাবু'র ধারণার সঙ্গে অসাধারণত্বের ধারণা জড়িত আছে; আর পলিনেসীয় ভাষায় 'টাবু'র বিপরীত পদ হ'ল 'নোয়া' (noa), অর্থ, 'সাধারণ'। যেখানেই 'টোটেম' প্রথা প্রচলিত আছে, সেখানেই 'টোটেম' সম্বন্ধে 'টাবু'ও প্রচলিত আছে; অর্থাৎ 'টোটেম' সম্বন্ধে যে-সব বিধি-নিষেধ আছে সেগুলিকেই 'টাবু' বলা হয়। একদিক থেকে 'টাবু'কে 'মানা'র বিপরীত ধারণা বলা যায়। 'মানা' সদর্থক ও অস্তিবাচক পদ, 'টাবু' নঞর্থক ও নাস্তিবাচক। 'টোটেম'-এর মধ্যে 'মানা' আছে বলে বিশ্বাস করা হয়; আর সেই কারণেই 'টোটেম'-এর বিশিষ্টতা। আবার 'টোটেম' সম্বন্ধে কতকগুলি 'টাবু' বা বিধিনিষেধ মেনে চলা হয়। সুতরাং 'টোটেম' প্রথার মধ্যেই 'টোটেম' সম্বন্ধে 'টাবু' বা বিধি-নিষেধের প্রচলন দেখা যায়। 'টাবু'র মাধ্যমেও 'টোটেম'এর বৈশিষ্ট্যই সূচিত হয় নঞর্থকভাবে। 'মানা' পদের অর্থ পরবর্তী আলোচনায় স্পষ্ট হবে।

আদি ধর্মের ব্যাখ্যা হিসেবে টোটেমবাদ গ্রাহ্য নয়। নৃবিদ্যার আধুনিক গবেষণায় প্রমাণ হয়েছে যে, সমস্ত ধর্মই যে 'টোটেম' প্রথার মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়েছে, এ-কথা সত্য নয়। 'টোটেম' প্রথা খুবই প্রাচীন, সন্দেহ নেই, কিন্তু এই প্রথা সর্বত্র প্রচলিত ছিল কি না, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের

1 Encyclopaedia Britannica, 1969. Art. Tabu.

2

অবকাশ আছে। এমন অনেক আদিম জাতি আছে, যাদের মধ্যে 'টোটেম' প্রথার প্রচলন নেই, অথচ তাদের মধ্যে গোষ্ঠী বা দলভেদ আছে। যেমন, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে বা সিংহলের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে 'টোটেম' প্রথা দেখা যায় না ; অথচ এই জাতিগুলির আদিমতা কম নয়। আবার কোন কোন জাতির মধ্যে 'টোটেম' প্রথার চলন থাকলেও, 'টোটেম'কে তারা ঠিক দেবতা বা ঈশ্বর-জ্ঞানে পূজা করে না। এক কথায় বলতে গেলে, 'টোটেম' প্রথাকে ঠিক আদিম ধর্ম বলা যায় না, যদিও অনেক আদিম ধর্মের সঙ্গেই 'টোটেম' প্রথার সম্পর্ক আছে। অতএব 'টোটেম' প্রথাকে ঠিক আদিম ধর্ম না বলে একে একটি আদিম সমাজ ও গোষ্ঠী-বন্ধন প্রথা বলা যায়। ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী দুর্খঁ্যা (Durkheim) 'টোটেম' প্রথাকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে ধর্ম হ'ল একটি সামাজিক ব্যাপার। ধর্মের মূল কথা হ'ল এক রহস্যময় শক্তির অনুভূতি। এই শক্তিকে আদিম মানুষ অলঙ্ঘ্য বলে মনে করত। কিন্তু যে রহস্যময় শক্তির প্রভাব সে নিজের উপর অনুভব করত তা' ছিল সমাজের শক্তি। 'টোটেম' ছিল এই সামাজিক শক্তির প্রতীক, এবং 'টোটেম'কে মানার অর্থ হল ব্যক্তির ওপর সমাজের এবং সামাজিক প্রথা, রীতি-নীতি ইত্যাদির প্রাধান্যকে মেনে নেওয়া। 'দুর্খঁ্যা'র বিরুদ্ধে বলা যায় যে, ধর্ম সামাজিক ব্যাপার হলেও 'টোটেম' প্রথা ধর্মের প্রাথমিক রূপ কি না, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। তা ছাড়া 'টোটেম'-এর শক্তি কোন রহস্যময় নৈর্ব্যক্তিক শক্তি হলেও সেটি সামাজিক শক্তি বলে আদি মানবের কাছে বিবেচিত হয় নি। কারণ, আদিম মানবের মনে সমাজ সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না, এবং সে যে-শক্তিকে স্বীকার করত, তার কোন নির্দিষ্ট রূপও ছিল না, তা' ছিল এক অস্পষ্ট রহস্যময় কোন নৈর্ব্যক্তিক শক্তি। যা'ই হ'ক, 'দুর্খঁ্যা'র মত সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করা না গেলেও এর মধ্যে যে কিছু সত্য আছে, সন্দেহ নেই। কারণ 'দুর্খঁ্যা' স্বীকার করেছেন যে, আদিম মানব-মনে ধর্মের উৎপত্তি হয় এক রহস্যময় অতিমানবীয় ও নৈর্ব্যক্তিক শক্তির অনুভূতি থেকে এবং তৎসম্পর্কিত আবেগ বা প্রক্ষোভ (emotion) থেকে, কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিসত্তা বা আত্মা ইত্যাদির বোধ থেকে নয়। সুতরাং তিনি ধর্মের প্রাক্-প্রাণবাদীয় অবস্থার কথা স্বীকার করেছেন। আমরা এখন এই প্রাক্-প্রাণবাদীয় আদিম ধর্মের সম্পর্কে আলোচনা করব।

প্রাক্-প্রাণবাদীয় (Pre-animistic) ধর্ম : 'মানা'র ধারণা—আধুনিক নৃবিদ্ ও গবেষকদের মতে ধর্মের উৎপত্তি হয় এক প্রাক্-প্রাণবাদীয় অবস্থায়,

অর্থাৎ যে অবস্থায় মানব-মনে 'প্রাণ' বা চেতন পদার্থের ধারণা স্পষ্ট হয় নি। তাঁদের মতে 'ইন্দ্রজাল' (magic)-এর মতই ধর্মের উৎপত্তি হয় আদিম মানব-মনে এক বা একাধিক নৈর্ব্যক্তিক রহস্যময় শক্তির অস্পষ্ট ধারণা এবং সেই শক্তি বা শক্তিসমূহের প্রতি ভক্তিমিশ্রিত ভয়ের অনুভূতি থেকে। এই শক্তি 'মেলানেসীয়' (Melanesian) দ্বীপপুঞ্জের আদিম অধিবাসীদের ভাষায় 'মানা' বলে ব্যক্ত হয়েছে। আরও অন্য অনেক আদিম ভাষাতেও এই শক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়; এবং বিভিন্ন দেশের আদিম সংস্কৃতিতে এই জাতীয় কোন এক শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাসের প্রমাণও পাওয়া যায়। 'মানা' পদটি মেলানেসীয় আদিবাসীদের ভাষায় পাওয়া গেলেও ঐ রহস্যময় নৈর্ব্যক্তিক শক্তিকে বোঝানোর জন্য নৃবিদ্যায় ঐ পদ ব্যবহার করা হয়। নৃবিদ্যায় এই 'মানা' শব্দ সর্বপ্রথম সাধারণ অর্থে প্রয়োগ করেন 'বিশপ কার্ডিংটন' (Bishop Cordinton) তাঁর "মেলানেসীয়গণ" (The Melanesians) গ্রন্থে। আদিম মনে এই 'মানা'র আবেগগত মূল্য থাকলেও এর সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা বিশেষ কিছুই ছিল না। সুতরাং আদিম মানবের কাছে 'মানা'র বুদ্ধিগত রূপ ঠিক কি ছিল তা জানা যায় না, এবং তা জানতে গেলে হয়ত তার আদিম ও সরল মানসিকতাকেই অস্বীকার করতে হবে। কারণ, মানব-সংস্কৃতির সেই আদি যুগে মানব-মনে কোন বস্তু সম্বন্ধে, বিশেষত কোন অতীন্দ্রিয় ও বিমূর্ত (abstract) বস্তু সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট ধারণার অস্তিত্বের কথা কল্পনা করার অর্থ মানব-মন ও মানব-সংস্কৃতির ক্রমবিবর্তন ও ক্রমোন্নতিকে অস্বীকার করা। বস্তুত আদি মানবের কাছে 'মানা' এক সর্বব্যাপী অতীন্দ্রিয় শক্তি যা অদ্ভুত ভাবে কাজ করতে পারে এবং যে-কোনও বস্তুর মধ্যে বিশিষ্ট রূপে প্রকাশিত হতে পারে। এর ব্যক্তিক বা নৈর্ব্যক্তিক কোন নির্দিষ্ট রূপ না থাকলেও এটি ঠিক জড়-শক্তি নয়, এক রহস্যময় মানসিক শক্তি বা চিৎ-শক্তি। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, আদি মানবের মনে জড় ও চেতনের পার্থক্য মোটেই স্পষ্ট ছিল না। এই শক্তি সর্বত্র ব্যাপ্ত থাকলেও কোন বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে কখন কখন ঘনীভূত হয় এবং এই শক্তির উপর মানুষ নিজের ভাল বা মন্দের জন্য নির্ভর করে। এই রহস্যময় শক্তিই অসাধারণ ব্যক্তি, বস্তু বা ঘটনার মধ্যে প্রকাশিত হয়। কোন ব্যক্তি যদি কোন কাজে বিশেষ পারদর্শিতা বা শক্তির পরিচয় দেয়, তাহলে তার মধ্যে 'মানা' আছে বলেই তা সম্ভব হয়। এই 'মানা' কোন জড় বস্তুকেও আশ্রয় করে থাকতে পারে, এবং তা ধারণ করলে মানুষ সেই শক্তিকে কাজে লাগাতে পারে। এর থেকেই মাদুলি বা ঐ

জাতীয় কোন বস্তু-ধারণ-প্রথার প্রচলন হয়। যে-অস্ত্র দিয়ে শত্রু অথবা শিকারের উপর মারাত্মক আঘাত করা যায়, তার মধ্যেও 'মানা' আছে। এই 'মানা'র জন্যই কোন 'টোটেম' প্রাণীর মধ্যে বিশেষ শক্তি থাকে বা সেই প্রাণী বিশেষ ভাবে পূজ্য বলে বিবেচিত হয় এবং 'টোটেম'-আশ্রিত 'মানা'কে আহরণ করার জন্যেই বিশেষ উৎসবে বা অনুষ্ঠানে 'টোটেম' ভক্ষণ করা হয়। 'মানা'র অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস ও 'মানা'র ব্যবহার সম্বন্ধে এই ধরণের অনেক উদাহরণই নৃবিদ্‌দের রচনায় পাওয়া যায়। এখানে মনে রাখতে হবে যে, 'মানা'র ধারণার সঙ্গে জড়িত থাকে গভীর আবেগ ও অনুভূতি। সুতরাং আদি মানবের কাছে 'মানা' কেবল একটি বাস্তব শক্তিমাত্র নয়, 'মানা' হ'ল এমন এক শক্তি যার ব্যাপারে তার আছে গভীর আবেগ, আছে ভক্তিমিশ্রিত ভয়, আছে বিস্ময়।

এই 'মানা'র ধারণার মধ্যেই ইন্দ্রজাল ও ধর্মের এক এবং সামান্য (common) উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাক্-প্রাণবাদীয় ধর্ম ছিল অতীন্দ্রিয় সর্বব্যাপী এক শক্তির ব্যাপারে মানুষের ভক্তিমিশ্রিত ভয়, রহস্য-বোধ ও বিস্ময় থেকে উদ্ভূত। এই মানসিকতা সর্বপ্রাণের ধারণার তুলনায় প্রাচীন ও আদিম। অতএব দেখা গেল যে, ধর্মের উৎস ও প্রাথমিক রূপ সম্বন্ধে নৃতাত্ত্বিক প্রশ্নের যথাযথ উত্তর মেলে মনোবিদ্যায়। আদিম ধর্মের উৎসের সন্ধান করতে হবে আদি মানবের মানসিকতার মধ্যে, বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিস্থিতিতে উদ্ভূত তার নানা অনুভূতি ও আবেগসঞ্জাত নানা প্রতিক্রিয়ার মধ্যে।

ইন্দ্রজাল (Magic) ও ধর্ম

অতি প্রাচীনকাল থেকেই ধর্মের সঙ্গে ইন্দ্রজালের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। আদিম সংস্কৃতিতে ঐন্দ্রজালিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য করা যায় না। আদি ধর্মীয় আচার ও অনুষ্ঠানের অনেকগুলিই ঐন্দ্রজালিক; আবার ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠানের অনেকগুলিই আদি সংস্কৃতিতে ধর্মীয় বলেই গৃহীত হ'ত। ইন্দ্রজাল হ'ল কোন অতিপ্রাকৃত শক্তিকে মানুষের কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োগ করা। এর দু'টি বৈশিষ্ট্য হ'ল অতিপ্রাকৃত শক্তি ও কার্য-কারণ নীতিতে বিশ্বাস। তবে ঐন্দ্রজালিক কার্য-কারণ ঠিক বৈজ্ঞানিক কার্য-কারণ নয়। ঐন্দ্রজালিক কার্য-কারণ আসলে ভাবানুষঙ্গ-নির্ভর, বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষা বা পরীক্ষা-নির্ভর নয়। সুতরাং ইন্দ্রজাল ভ্রান্ত কার্য-কারণ কল্পনাকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। তাই ইন্দ্রজালে প্রতীকের

ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কখন ইন্দ্রজালে কোন এক শক্তিমান ও মারাত্মক জীবের শাস্তির বিধান করা হয় তারই অনুরূপ কোন জড় বা দুর্বল চেতন পদার্থকে শাস্তি দিয়ে। আবার কখন বা বিশেষ মন্ত্রপাঠ ও ক্রিয়া ইত্যাদির সাহায্যে কোন অতীন্দ্রিয় শক্তিকে বিশেষ কোন মানবিক উদ্দেশ্য সাধনের কাজে লাগানোর চেষ্টা করা হয়। এই ধরণের ক্রিয়ার সঙ্গে ঐ উদ্দেশ্যেরও সচরাচর কোন আনুষঙ্গিক সম্বন্ধ লক্ষ্য করা যায়। যা'ই হ'ক, এক কথায় ইন্দ্রজাল হ'ল এক ধরণের কল্পিতবিজ্ঞান (pseudo-science)। ইন্দ্রজালের মত ধর্মের মূলেও আছে অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস। সুতরাং আদিকাল থেকেই ধর্মীয় ও ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠান পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। ধর্মীয় আচার ও অনুষ্ঠানের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই ইন্দ্রজালের অস্তিত্ব দেখা যায়, এবং ইন্দ্রজালকেও অনেক সময়ই ধর্মীয় আবেগ ও অনুভূতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে দেখা যায়। এই কারণেই উভয়ের সম্বন্ধ নিয়ে নৃবিদ্‌দের মধ্যে অনেক গবেষণা ও আলোচনা হয়েছে। ইন্দ্রজাল ও ধর্মের মধ্যে যুক্তিগত (logical) অথবা কালগত (temporal) পূর্বতনত্ব (priority) কার? অর্থাৎ, এদের মধ্যে কোনটি কার ভিত্তি, এবং কোনটি পূর্বে ও কোনটি পরে আবির্ভূত হয়? এক কথায়, এই দু'টির মধ্যে কোন উৎপত্তিগত ও ক্রমিক সম্পর্ক আছে, না, উৎপত্তির দিক থেকে এরা পবস্পর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বাধীন, ইত্যাদি প্রশ্নে নৃবিদ্‌দের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়।

(1) কারো কারো মতে ধর্ম ইন্দ্রজালের পূর্বতন। জীভন্স তাঁর "ধর্মের ইতিহাসের ভূমিকা" গ্রন্থে বলেছেন অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস (বা ধর্ম) ইন্দ্রজালে বিশ্বাসের পূর্বতন এবং যেখানেই ইন্দ্রজালের আবির্ভাব ঘটেছে, তা ঘটেছে ধর্মের অবনতিরূপে।[2] তাঁর মতে ধর্মের আরম্ভ বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদে। পরবর্তীকালে ধর্মের মধ্যে নানা ধরণের অবিশুদ্ধি ও দোষ দেখা দেয় এবং ধর্মের আচারগত দিকটিই প্রধান হয়ে ওঠে; আর এই ভাবেই ধর্ম রূপ নেয় ইন্দ্রজালের।

জীভন্সের মতের সমালোচনায় বলা যায় যে, তিনি তাঁর গ্রন্থে ধর্ম ও ইন্দ্রজাল সম্বন্ধে তাঁর মতবাদের মধ্যে চিন্তাগত সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারেন নি। কারণ, ঐ একই গ্রন্থে এবং একই বাক্যের প্রথম অংশে তিনি স্বীকার করেছেন যে, ধর্ম ও ইন্দ্রজালের উৎস পরস্পর থেকে ভিন্ন। এই দোষ ব্যতিরেকেও জীভন্সের মত অধিকাংশ নৃবিদ্‌ই স্বীকার করেন না। অবশ্য

2 F. B. Jevons. Introduction to the History of Religion, পৃষ্ঠা 25.

তাঁর মতের উল্লেখযোগ্য ও গ্রহণীয় অংশ হ'ল এই যে, ক্রমবিবর্তন (evolution) বলতে কেবলমাত্র ক্রমোন্নতিই বোঝায় না। ধর্ম ও ইন্দ্রজাল সম্বন্ধে প্রায় সর্বজনস্বীকৃত প্রকল্পটি হ'ল, আদিম ধর্ম হ'ল অত্যন্ত স্থূল, এবং আদিম অবস্থায় ধর্ম ও ইন্দ্রজালের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য করা যায় না।

(2) ধর্ম ও ইন্দ্রজাল সম্বন্ধে দ্বিতীয় মতটি হ'ল, ইন্দ্রজাল থেকেই ধর্মের উদ্ভব ঘটেছে। *এ সম্বন্ধে এখানে স্যর জেম্‌স্ ফ্রেজার* (Sir James Frazer)-এর মত উল্লেখ করা যেতে পারে। ফ্রেজার তাঁর "স্বর্ণ শাখা" (Golden Bough) গ্রন্থে এ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, মানব-সংস্কৃতি ও চিন্তার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে ইন্দ্রজালের অস্তিত্ব দেখা যায় অপেক্ষাকৃত নিম্নতর পর্যায়ে এবং ধর্মের আবির্ভাবের পূর্বে। ফ্রেজার মনে করেন, ভাবানুষঙ্গের ভ্রান্ত প্রয়োগ থেকেই ইন্দ্রজালের উৎপত্তি। যে-সব বস্তুর মধ্যে বস্তুত কার্য-কারণ সম্বন্ধ নেই, সেই সব বস্তুর মধ্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ কল্পনাকে ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে ঐন্দ্রজালিক ব্যবহার-বিধি বা প্রথা। কিন্তু এই কাল্পনিক কার্য-কারণ সম্বন্ধ অনেক ক্ষেত্রেই মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় এবং ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠান অনেক ক্ষেত্রেই অকৃতকার্য হওয়ায় আদি মানব-গোষ্ঠীর মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল, তারা ইন্দ্রজালের অসারতা ও মিথ্যাত্ব অনুভব করে এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে অধিক সত্য ও যথার্থ ধারণার প্রয়াসী হয়, এবং প্রকৃতির সম্ভাবনাকে আরও উপযুক্ত ভাবে কাজে লাগাবার চেষ্টা করে। সুতরাং ইন্দ্রজালের ব্যাপারে মানুষের তিক্ত অভিজ্ঞতাই মানুষকে অতীন্দ্রিয় শক্তির সদ্ব্যবহারে প্রবৃত্ত করল। মানুষ তখন তারই মত ব্যক্তিত্বশালী কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী শক্তিমান সত্তা, অর্থাৎ, ঈশ্বরের কাছে নিজেকে বিনম্রভাবে নিবেদন করতে চাইল; নিজের কল্যাণের জন্য তাঁর করুণা ভিক্ষা করল। সুতরাং ইন্দ্রজালের যুগ ধীরে ধীরে পরিণত হ'ল ধর্মের যুগে। ইন্দ্রজাল ও ধর্ম, এ দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন ও পরস্পরবিরোধী মনোবৃত্তি থেকে উদ্ভূত। তাই ধর্মের উৎপত্তিতে ইন্দ্রজালের কোন প্রত্যক্ষ (positive) অবদান নেই, আছে পরোক্ষ অবদান। এক কথায়, ইন্দ্রজালের ব্যাপারে মানুষের অসফলতা ও হতাশাই মানুষের ধর্ম-চেতনার উৎপত্তির কারণ।

ইন্দ্রজাল ও ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনায় ফ্রেজারের মতে চিন্তার অনেক মূল্যবান উপাদান থাকলেও, ইন্দ্রজাল ও ধর্মকে তিনি যে-ভাবে পরস্পর বিরোধী বলে দেখিয়েছেন তা স্বীকার করা যায় না। এখানেও ধর্মের উৎপত্তির বুদ্ধিবাদী ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। আদি মানবকে অনেক বেশী

যুক্তিবাদী বলে কল্পনা করা হয়েছে। ধরে নেওয়া হয়েছে, আদি মানব এমন ছিল, যার পক্ষে ইন্দ্রজাল ও ধর্মের মধ্যে তুলনা করে কোন্‌টি গ্রহণ-যোগ্য তা স্থির করা সম্ভব ছিল। তাছাড়া, ইন্দ্রজাল ও ধর্মের মধ্যে পার্থক্য অনেক স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ভাবে দেখানো হয়েছে। একথা সত্য যে, ঐতিহাসিক বিচারে ও মনোবিদ্যার বিচারে ইন্দ্রজাল ও ধর্ম পরস্পর থেকে পৃথক্‌। কিন্তু আদিম ও বর্বর মানুষের পক্ষে এই পার্থক্য অনুভব করা সম্ভব ছিল না। এই পার্থক্য অনুভব করবার উপযুক্ত বুদ্ধি ও বিশ্লেষণ-ক্ষমতা গড়ে উঠতে মানুষকে ক্রমবিবর্তনের অনেক স্তর পার হতে হয়েছে। আধুনিক দার্শনিকের কাছে যা স্পষ্ট, আদিম বর্বর মানুষের পক্ষে তার কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না। আদিম মানুষের মানসিকতায় যুগ-যুগান্তরের চিন্তার ফল আরোপ করার অর্থ মানুষের বুদ্ধির ও চিন্তার ক্রমবিকাশকে অস্বীকার করা। এ সম্বন্ধে ম্যারেট (Marret), হার্টল্যাণ্ড (Hartland) প্রভৃতি লেখকের আলোচনার উল্লেখ করা যেতে পারে। ম্যারেট তার "ধর্মের প্রান্তদেশ" (Threshold of Religion) গ্রন্থে বলেছেন, অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস থেকেই ইন্দ্রজাল ও ধর্ম উভয়েরই উৎপত্তি। সুতরাং মানব-মনে তাদের মূল উৎস একই। হার্টল্যাণ্ড তাঁর "আচার-অনুষ্ঠান ও বিশ্বাস" (Ritual and Belief) গ্রন্থে স্পষ্টতই ফ্রেজারের বিরুদ্ধমত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, যে-সব নিম্নতম সামাজিক সংস্কৃতির তথ্য আমাদের জানা আছে, সে-সব ক্ষেত্রে যে অনুষ্ঠান বা আচারগুলিকে ঐন্দ্রজালিক বলা হয়, ও যে আচার ও অনুষ্ঠানগুলিকে ধর্মীয় বলা হয়, তাদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা যায় না। এইজন্য এদের মধ্যে কোন্‌টি সম্পূর্ণ ঐন্দ্রজালিক ও কোন্‌টি বিশুদ্ধ ধর্মীয় আচার, তা স্থির করা সম্ভব নয়। এর প্রধান কারণ, এই ধরণের পার্থক্য আদিম মানুষের কাছে অজ্ঞাত ছিল। আসলে আদিম সংস্কৃতিতে ঐন্দ্রজালিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি (ফ্রেজার যাদের বলেছেন তেল ও জলের মতই পৃথক) সমাজ জীবনের ঐকধারার মধ্যে অবিচ্ছিন্ন ভাবে মিলিত হয়েছিল। পরবর্তী কালে মানুষের বিশ্লেষণী চিন্তাশক্তির ক্রমবিকাশের ফলে এ-দুটির মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব হয়েছে। উপসংহারে বলা যায় যে, ফ্রেজার ইন্দ্রজাল থেকে ধর্মের উৎপত্তির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা নঞর্থক। তাঁর মতে ইন্দ্রজালের অসফলতা থেকেই ধর্মের উৎপত্তি। কিন্তু ধর্মের উৎপত্তির সদর্থক ব্যাখ্যা দেওয়াও প্রয়োজন।

(3) উপরের আলোচনা থেকে এই কথাই স্পষ্ট হয় যে, ইন্দ্রজাল ও ধর্ম উভয়েরই মূল উৎস এক। এই উৎস হ'ল মানুষের রহস্যময় শক্তির অভিজ্ঞতা। কিন্তু মানব-মনের ক্রমবিবর্তনের পথে উভয়ের অসংগতি

ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং ক্রমে দেখা দেয় প্রত্যক্ষ বিরোধিতা। কিন্তু উভয়ের মৌলিক ঐক্যও প্রমাণিত হয় নানা আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে যেখানে এ-দু'টিকে সহজেই মিলিত হতে দেখা যায়। আমাদের আধুনিক উন্নত ও বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে ইন্দ্রজাল ও ধর্মের ভেদ স্পষ্ট। ধর্মের বৈশিষ্ট্য হ'ল উচ্চতর শক্তির কাছে বিনম্রতা ও আত্মনিবেদন। অপরপক্ষে ইন্দ্রজালের বৈশিষ্ট্য হ'ল উদ্ধত স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও অহংকার। উভয়েরই সম্পর্ক অতীন্দ্রিয় ও রহস্যময় শক্তির সঙ্গে। ইন্দ্রজাল এই সব শক্তিকে কাজে লাগতে বাধ্য করে বা বাধ্য করার চেষ্টা করে, কিন্তু ধর্ম প্রার্থনা, পূজা ও অনুনয়ের মাধ্যমে এই সব শক্তির সাহায্য লাভের চেষ্টা করে। ইন্দ্রজাল এই রহস্যময় শক্তিগুলিকে নৈর্ব্যক্তিক ও অনৈতিক বলে কল্পনা করে; ধর্ম এইগুলিকে ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন ও নৈতিক শক্তি বলে ধারণা করে। ধর্ম রহস্যময় শক্তিকে যখন দেবতা জ্ঞান করে তখন তার ওপর নৈতিক গুণ আরোপ করে। দেবতা কেবলমাত্র অমিত শক্তির আধার ন'ন, তিনি মঙ্গলময়ও বটে। এই মঙ্গলের ধারণাটিই ধর্মের মূল কথা এবং ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠান এই মঙ্গলময়ের ধারণার দ্বারা অনুপ্রাণিত নয়। আবার, ধর্ম প্রধানত সামাজিক। ধর্ম মানুষকে পরস্পরের সঙ্গে সামাজিক ও গোষ্ঠীবন্ধনে আবদ্ধ করে। কিন্তু ইন্দ্রজাল অসামাজিক ও কখন বা সমাজ-বিরোধী এবং গুপ্ত। ইন্দ্রজাল এই জন্য অনেক সময় 'গুপ্তবিদ্যা' বলেও পরিচিত হয়। মানুষ ধর্ম ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে। ধর্মের আছে ধর্মীয় সংস্থা (church) কিন্তু ইন্দ্রজালের ঐ ধরণের কোন সামাজিক সংস্থা নেই। প্রবণতা ও প্রকাশের দিক থেকে ধর্ম ও ইন্দ্রজালের মধ্যে এই পার্থক্য আদিকাল থেকেই বর্তমান। কিন্তু আদি মানবের পক্ষে এই ধরণের বিশ্লেষমূলক পার্থক্য অনুভব করা সম্ভব ছিল না। আবার, এই পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আদি জীবনে উভয়ের মূল ছিল এক। মানুষ তার নানা অভিজ্ঞতায় প্রাকৃতিক রহস্যময় শক্তির সম্মুখীন হয়েছে। এই শক্তিকে সে চেয়েছে জীবনযুদ্ধে নিজের কাজে লাগাতে। এই শক্তিই 'মেলানেসীয়' ভাষায় 'মানা' বলে অভিহিত। এই 'মানা'কে মানুষ কখন বা উদ্ধতভাবে বাধ্য করবার চেষ্টা করেছে তার স্বার্থসিদ্ধির জন্য, আবার কখন বা এই 'মানা'কে তুষ্ট করবার চেষ্টা করেছে পূজা ও প্রার্থনার মাধ্যমে। উভয় ক্ষেত্রেই মানুষ তার জীবনযুদ্ধে অতীন্দ্রিয় রহস্যময় শক্তির সাহায্য চেয়েছে। কিন্তু অতীন্দ্রিয়ের সাহায্য চাইলেও দু'টি ক্ষেত্রে সেই অতীন্দ্রিয়ের প্রতি মানুষের মনোবৃত্তির পার্থক্য লক্ষণীয়। এই কারণেই বলা যায়, মনোবৃত্তির দিক থেকে ইন্দ্রজাল ও ধর্ম প্রথম অবস্থা থেকেই পৃথক্, যদিও আদিম জীবনে

উভয়ের পার্থক্য নির্দেশ করা কঠিন। সুতরাং ধর্ম ও ইন্দ্রজাল পরস্পর থেকে মূলত পৃথক্ হলেও উভয়ের ঐতিহাসিক আবির্ভাব ঘটেছে একই অবস্থায় ও একই ধরণের চিন্তা ও অনুভূতির মধ্যে, অর্থাৎ, প্রাকৃতিক পরিবেশে আদি মানবের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার মধ্যে এবং রহস্যময় ও অদৃশ্য শক্তির ব্যাপারে মানুষের নানা পরীক্ষা নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে।

উপরের আলোচনা থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, আদিম অবস্থায় ধর্মের রূপ কি ছিল, এ-সম্বন্ধে নৃবিদ্যায় কিছু তথ্য পাওয়া গেলেও, ধর্মের ঐতিহাসিক উৎপত্তি ঠিক কি ভাবে হয়েছিল, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। প্রাগৈতিহাসিক মানুষের জীবন-ধারার যে-সব তথ্য পাওয়া যায়, মানব জাতির ইতিহাস ও ক্রমবিকাশের ধারা আবিষ্কারের ব্যাপারে তা অতি অল্প ও সীমিত; এবং এই স্বল্প তথ্যের ভিত্তিতে মানুষের ধর্ম-চেতনার আবির্ভাবের কাল ও অবস্থা সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। আদি প্রস্তরযুগ থেকে ঐতিহাসিক (historic) যুগে পৌঁছতে মানুষের হাজার হাজার বছর কেটে গেছে। এই সুদীর্ঘ কালের ঠিক কোন্ যুগে মানুষের ধর্ম-চেতনার উদ্ভব হ'ল, অর্থাৎ প্রাক্-ধর্মীয় অবস্থা থেকে ধর্মীয় অবস্থায় উত্তরণ ঘটল, তা নির্ণয় করা অসম্ভব। মানবজাতির ক্রমবিবর্তনের ক্ষেত্রে ভাষার মতই ধর্মেরও কোন আরম্ভ নির্দেশ করা যায় না। ভাষার প্রাথমিক ও স্থূল অবস্থার মতই ধর্মের প্রাথমিক ও স্থূল অবস্থার কিছু কিছু তথ্য পাওয়া গেলেও এদের কোনটিকেই প্রাক্-ধর্মীয় অবস্থা থেকে ধর্ম-চেতনার সূচনা বলা যায় না। এর প্রধান কারণ, প্রাক্-ধর্মীয় অবস্থা ও ধর্মীয় অবস্থার মধ্যে কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই, আর যে-যুগে মানুষের ধর্ম-চেতনা বলে কিছু ছিল না, সেই প্রাক্-ধর্মীয় অবস্থার কোন তথ্যও নৃবিদ্যায় আবিষ্কৃত হয় নি। তাছাড়া, প্রাগৈতিহাসিক মানুষের সম্বন্ধে নৃবিদ্যায় যে-সব তথ্য পাওয়া গেছে তাও বিচিত্র ও পরস্পর থেকে পৃথক্। সংস্কৃতির প্রাচীনতার সঙ্গে তার আদিমতার বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই। কোন কোন অতি প্রাচীন সংস্কৃতির মধ্যেও যথেষ্ট সূক্ষ্ম ও উন্নত ধরণের চিন্তাধারার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়; আবার, অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্কৃতির মধ্যেও স্থূল ও অনুন্নত মানসিকতার লক্ষণের অভাব নেই। আদিম সংস্কৃতির রূপও সর্বত্র এক নয়। বিভিন্ন আদিম সংস্কৃতিতে ধর্ম-চেতনার প্রকাশ হয়েছে বিভিন্ন রূপে। সর্বপ্রাণবাদ, প্রেতপূজা বা 'টোটেম'-প্রথার তুলনায় 'মানা'-বাদ আদিম হলেও 'মানা'-র ধারণার মধ্যেই যে মানুষের প্রথম ধর্ম-চেতনার উদ্ভব হয়েছিল, একথা নিশ্চয় করে বলা যায় না। আসলে, বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন রূপে ধর্ম-চেতনার উদ্ভব হয়েছে বলেই ধর্মের কোনও বিশেষ একটি রূপকে

আদিমতম ধর্ম বলা যায় না ; এবং প্রাক-ধর্মীয় অবস্থা থেকে ধর্মের উৎপত্তি বলেও কিছু নেই। প্রাক্-ধর্মীয় অবস্থা থেকে ধর্মীয় অবস্থায় পরিবর্তন কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের ব্যাপার। তাই আক্ষরিক অর্থে ধর্মের কোন ঐতিহাসিক উৎপত্তি নেই বলাই যুক্তি-যুক্ত। গ্যালোয়ে (Galloway)-ও প্রায় এই মতই পোষণ করেন। তাঁর মতে নৃবিদ্যার স্বল্প তথ্যের ভিত্তিতে ধর্মের ঐতিহাসিক উৎপত্তির কোন কাল বা অবস্থা নির্দেশ করা যায় না। সুতরাং ধর্মের উৎস আবিষ্কার করার চেষ্টা করতে হবে বাহ্য পরিবেশের মধ্যে নয়, মানুষের মানসিকতার মধ্যে। কোন এক বিশেষ পরিবেশে কোন এক বিশেষ রূপে ধর্মের আবির্ভাব ঘটেনি, ঘটেছে নানা রূপে নানা কারণে বিভিন্ন পরিবেশে মানুষের বিচিত্র মানসিক প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। আদিম মানুষের সঙ্গে আধুনিক মানুষের মানসতার কোন মৌল প্রভেদ নেই। আদিম মানুষের মধ্যে যে অনুভূতি, আবেগ বা কামনা ছিল, আধুনিক মানুষের মধ্যেও তা বর্তমান, পার্থক্য শুধু প্রকাশে, অভিব্যক্তিতে। তাই ধর্মের উৎপত্তির সফল আলোচনা হ'তে পারে মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়।

নির্বাচিত পুস্তক তালিকা

1. D. Miall Edwards—The Philosophy of Religion.
2. George Galloway—Philosophy of Religion.
3. Articles in The Encylopaedia of Religion and Ethics.

তৃতীয় অধ্যায়

ধর্মের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ

আগের অধ্যায়ে আমরা ধর্মের নৃতাত্ত্বিক উৎপত্তি নিয়ে আলোচনা করেছি এবং আদিম ধর্মের কি রূপ ছিল তা জানবার চেষ্টা করেছি। যদিও আমরা দেখেছি যে, অতীন্দ্রিয় রহস্যময় শক্তির ব্যাপারে মানুষের অনুভূতি ও আবেগই ছিল ধর্মের আদিম রূপ, তবুও ধর্মের ঐতিহাসিক উৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা কোনও স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি। কিন্তু ধর্মের স্বরূপ জানতে হ'লে তার নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক উৎপত্তির বিষয়ে জানাই যথেষ্ট নয়। কোন ধারণা, সংস্কৃতি বা সামাজিক প্রথার স্বরূপ বুঝতে হ'লে তা'র অভিব্যক্তির ও ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে সেটি কি ভাবে বিবর্তিত ও পরিণত হয়েছে, তা-ও জানা প্রয়োজন। ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়েই বস্তুটির স্বরূপ ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটিত হয়। সুতরাং ধর্মের মত এমন একটি প্রাচীন ও জটিল সামাজিক সংস্থার (institution) স্বরূপ বুঝতে হলেও তা'র বিবর্তন ও ক্রমবিকাশের ধারাটি জানা প্রয়োজন। মানবজাতির ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন স্তরে ধর্ম নানা রূপে প্রকাশিত হয়েছে। আধুনিক গবেষণায় ধর্মের এই বিচিত্র প্রকাশের সম্বন্ধে নানা তথ্যও উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। কিন্তু তা' সত্ত্বেও ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয় নি। এ-সম্বন্ধে অনেক প্রশ্নই আজও অমীমাংসিত ও আমাদের সিদ্ধান্তগুলি অনেকাংশেই কল্পনা (speculation) ও অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং তথ্য কিছু থাকলেও তার মধ্য থেকে ধর্মের ক্রমবিকাশের ধারাটি নিশ্চিতভাবে আবিষ্কার করা সহজসাধ্য নয়।

বিভিন্ন যুগে ধর্মের যে বিভিন্ন রূপে প্রকাশ ঘটেছে তার আলোচনার প্রধান অসুবিধা হ'ল, এ-সম্বন্ধে নানা তথ্যের উপযুক্ত সংকলন ও শ্রেণী-বিভাগ নিয়ে। মানুষের নানা ধর্মবিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করে এগুলির পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণয় ও ধর্মগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য মতভেদ আছে। এইসব শ্রেণীবিভাগ অনেক ক্ষেত্রেই আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রহণযোগ্য নয়। তাত্ত্বিকেরা অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী ত্যাগ করে বিশেষ

মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর বদলে কল্পনার (imagination) আশ্রয় নিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে 'টাইলে' (Tiele-)র মত উল্লেখ করা যেতে পারে; কারণ, বিভিন্ন ধর্মের শ্রেণীবিভাগের ব্যাপারে টাইলে ধর্মগুলির বাস্তব ও বিষয়মুখ (objective) বৈশিষ্ট্যগুলিকেই ভিত্তি করেছেন। টাইলে তাঁর "ধর্মীয় বিজ্ঞানের উপাদান" (Elements of the Science of Religion) গ্রন্থে ধর্মমতগুলিকে প্রধানত দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন: 'প্রাকৃত ধর্মসমূহ' (Nature Religions) এবং 'নৈতিকধর্মসমূহ' (Ethical Religions)। টাইলের শ্রেণীবিভাগ তত্ত্বের দিক থেকে যথাযথ মনে হলেও ব্যবহারিক দিক থেকে উপযুক্ত নয়। অনেক ধর্মকেই তিনি নৈতিক ধর্ম বলে আখ্যা দিয়েছেন, অথচ এগুলির মধ্যে উভয় শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যই লক্ষ্য করা যায় বলে 'গ্যালোয়ে' মত প্রকাশ করেছেন। এই কারণে গ্যালোয়ে (Galloway) ঐতিহাসিক পরিণতির দিক থেকে ধর্মগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। তাঁর মতে মানব-জাতির ধর্মের ক্রমপরিণতি পর্যালোচনা করলে ধর্মের ইতিহাসে দু'টি প্রধান ও উল্লেখযোগ্য যুগসন্ধিক্ষণ লক্ষ্য করা যায়। এদের প্রথমটি হল, আদিম গোষ্ঠীধর্মের (Tribal Religion) জাতীয় ধর্মে (National Religion) রূপান্তর ও দ্বিতীয়টি, জাতীয় ধর্মের বিশ্বজনীন ধর্মে (Universal Religion) পরিণতি।[1] সুতরাং গ্যালোয়ে বিভিন্ন ধর্মকে মোটামুটি তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন: আদিম গোষ্ঠীধর্ম, জাতীয় ধর্ম ও বিশ্বজনীন ধর্ম। এই শ্রেণী-বিভাগের প্রধান সুবিধা এই যে, এই তিন রকমের ধর্মের মধ্যে পার্থক্য বেশ স্পষ্ট ও এই শ্রেণী-বিভাগে সাঙ্কর্য (overlapping) দোষ এড়িয়ে চলা সম্ভব। গ্যালোয়ের এই শ্রেণী-বিভাগ এডওয়ার্ডস্ (Edwards) ও যুক্তিসংগত বলে স্বীকার করেছেন। সুতরাং বর্তমান অধ্যায়ে আমরা এই শ্রেণী-বিভাগের ভিত্তিতেই ধর্মের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করব।

(A) আদিম গোষ্ঠী-ধর্ম (Tribal Religion)

আদিম ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা আমরা আগেই করেছি। আমরা দেখেছি যে, মানুষের আদি ধর্ম-চেতনার মধ্যে মোটামুটি দুটি স্তরভেদ আছে। একটি হল, প্রাক্প্রাণবাদীয় ধর্ম-চেতনা, আর অপরটি হল, সর্বপ্রাণবাদীয় ধর্ম-

1 George Galloway, The Philosophy of Religion, পৃষ্ঠা 89.

চেতনা। প্রাক্‌প্রাণবাদীয় স্তরে মানুষ অতীন্দ্রিয় রহস্যময় শক্তিকে অনুভব করেছে, আর তার সম্বন্ধে মানব-মনে দেখা দিয়েছে বিস্ময় ও ভক্তিমিশ্রিত ভয়। এই সব গভীর অনুভূতি ও ভাবাবেগ থেকেই আদি ধর্ম রূপ নিয়েছে। এই অস্পষ্ট অজ্ঞাত অতীন্দ্রিয় শক্তিই মেলানেসীয় ভাষায় 'মানা' বলে অভিহিত ও নৃতাত্ত্বিক আলোচনায় ঐ নামেই পরিচিত। পরবর্তী যুগে, অর্থাৎ আদি মানব-সংস্কৃতির উন্নততর স্তরে মানুষ প্রাকৃতিক বস্তুগুলিকে সপ্রাণ বলে কল্পনা করেছে। মানুষ কল্পনা করেছে যে, বৃক্ষ, নদী, পর্বত, এরা সকলেই তার নিজের মতই সজীব ও সপ্রাণ। কিন্তু এই প্রাণবাদীয় স্তরের মধ্যেও দুটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। প্রথমাবস্থায় মানুষ প্রাকৃতিক বস্তু ও তাদের প্রাণ, এ দুটিকে পৃথক্‌ বলে কল্পনা করতে পারত না। এই বস্তু-গুলিই তার কাছে প্রাণী বলে মনে হ'ত। অবশ্য প্রাণী বলে বোধ হ'ত বলেই যে, সে তাদের সকলকেই পূজা করত বা তাদের সকলের সম্বন্ধেই যে তার গভীর ভাবাবেগ ছিল, এমন নয়। তাদের মধ্যে মাত্র কয়েকটির ব্যাপারেই তার অনুভূতিকে মোটামুটি ভাবে ধর্মীয় অনুভূতি বলা যায়। কিন্তু ধীরে ধীরে সজীব প্রকৃতির ধারণা থেকে জীবন ও প্রাণের ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। আদিম মানব-মনে দেহাতিরিক্ত প্রাণের ধারণা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রেতপূজার আবির্ভাব এই স্তরেই। বিশেষত মানুষের স্বপ্নের অভিজ্ঞতা থেকেই এই ধারণার উৎপত্তি। সে-যুগে স্বপ্ন ও জাগ্রত অবস্থার মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব ছিল না। স্বপ্নের অভিজ্ঞতা মানুষের কাছে জাগ্রত অভিজ্ঞতার মতই বাস্তব ও সত্য বলে বিবেচিত হত। স্বপ্নের অভিজ্ঞতা থেকেই তার ধারণা হল যে, তার দেহ এক জায়গায় অচল অবস্থায় থাকলেও তার পক্ষে অন্য পরিবেশে অন্য অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব। তাছাড়া যাদের দেহ অনেক আগেই নষ্ট হয়ে গেছে, এমন অনেক মৃত আত্মীয় ও পূর্বপুরুষের সাক্ষাৎ সে স্বপ্নের মধ্যে পায়। এই সব অভিজ্ঞতা থেকেই আদিম মানবের মনে ধীরে ধীরে দেহাতিরিক্ত আত্মার ধারণার উৎপত্তি হ'ল। মানুষ এইভাবে দেহের ও আত্মার মধ্যে প্রভেদ কল্পনা করতে শিখল।

(a) আদিম গোষ্ঠী-ধর্মের বৈশিষ্ট্য

প্রাক্‌ প্রাণবাদীয়, প্রাণবাদীয় ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের আদিম গোষ্ঠী-ধর্মের স্বরূপ ও প্রকৃতি আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। কারণ, এগুলি আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এখানে আমরা আদিম গোষ্ঠী-ধর্মের কতকগুলি

বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করব, এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য পর্যায়ের ধর্মের সঙ্গে আদিম গোষ্ঠী-ধর্মের সাদৃশ্য ও পার্থক্য দেখানো সম্ভব হবে।

(1) প্রথমেই আদিম সংস্কৃতিতে কার্য-কারণের ধারণার উল্লেখ করা যেতে পারে। এই ধারণা আদিম ইন্দ্রজাল ও ধর্মের ধারণার মধ্যে নিহিত। সে যুগে মানব-মনে কারণতার ধারণা ছিল সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ও খেয়াল-খুসির ব্যাপার। মানুষ এই ব্যাপারে 'কাকতালীয়' নীতির যথেচ্ছ প্রয়োগ করত।• তার পক্ষে দুটি ঘটনার মধ্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ প্রমাণ করার দায়িত্ব বা প্রয়োজনীয়তা ছিল না। তাই সে নিজের সুবিধা ও কল্পনা অনুযায়ী যে কোনও কালিক পৌর্বাপর্যকেই কাবণতা বলে কল্পনা করত। যখন সর্বপ্রাণবাদ বহুল প্রচলিত ছিল, তখন মানুষ নিজেকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও অনির্দেশ্য আত্মাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ও প্রভাবিত বলে কল্পনা করত, এবং আত্মা বলতে যা বুঝত, তার ক্রিয়া-কলাপ সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা যায় না বলে বিশ্বাস করত। আদিম মানুষ অস্পষ্ট ও অবোধ্য সব কিছুকেই অতীন্দ্রিয় আত্মার ক্রিয়া বলে মনে করত। অসুস্থতা, উন্মত্ততা ইত্যাদি সব কিছুকেই সে কোন আত্মার 'ভর' বলে মানত। সুতরাং আদিম মানুষ দেবতার ধারণা দিয়ে কোন কিছুকেই বৈজ্ঞানিক অর্থে যাকে ব্যাখ্যা করা বলে, তা করতে পারত না। সে ব্যাখ্যা ছিল অনেকাংশেই অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ। কারণ, আদিম মানসিকতায় চিন্তা বা অভিজ্ঞতার মধ্যে আকারগত সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যের মূল্য বিশেষ ছিল না। আর সেই জন্যই সে বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে মৌলিক পার্থক্যও অনুভব করত না ; জড় ও চেতন, মানুষ ও পশু, দেহ ও মন, তার কাছে মূলত ভিন্ন জাতীয় পদার্থ বলে বিবেচিত হ'ত না। তার কল্পনায় একের সঙ্গে অপরের মিলন অতি সহজেই সম্ভব হ'ত—কোন পশু সহজেই মানুষের রূপ ধরতে পারত বা কোন বৃক্ষের আত্মা মানুষের মধ্যে অবতীর্ণ হতে পারত। এই সব স্বাধীন, বাধাহীন কল্পনাকে ভিত্তি করেই পরবর্তী কালে পুরাণের সৃষ্টি।

(2) জড় ও চেতনের অভেদ কল্পনার মধ্যেই আদিম গোষ্ঠী-ধর্মের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এই বৈশিষ্ট্য হল, আদিম মনে আত্মার ধারণা। আধুনিক কালে আত্মা বলতে আমরা যা বুঝি, আদিম মনে আত্মার ধারণা ছিল তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আদিম মন আত্মাকে জড়বস্তু থেকে পৃথক বলে কল্পনা করতে পারত না। তার কাছে আত্মা ছিল এক ধরণের ছায়াময় সূক্ষ্ম দেহ। এই ছায়াময় সূক্ষ্ম দেহের আশ্রয়ের জন্য কল্পনা করা হ'ত একটি স্থূলদেহের। অতীন্দ্রিয় ও সূক্ষ্ম হলেও সম্পূর্ণ দেহাতিরিক্ত আত্মার কল্পনা সে যুগে সম্ভব ছিল না। জড়বস্তুকে বাদ দিয়ে কোন

ভাবময় সত্তার কল্পনার অক্ষমতা বিশেষ ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে 'টোটেম'-প্রথার মধ্যে, 'টোটেম' আসলে গোষ্ঠীগত ও সামাজিক একতার প্রতীক। এই একতা বহুর মধ্যে পরিব্যাপ্ত, কিন্তু বহুর সমষ্টি মাত্র নয়। একই গোষ্ঠীর সমস্ত ব্যক্তির এই আভ্যন্তরিক ঐক্যের ধারণা করা আদিম মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই যা অতীন্দ্রিয় ও ভাবময় তাকে সে চিন্তা করত কোন মূর্ত ধারণা ও প্রতীকের সাহায্যে। তাই 'টোটেম' দেখা দিল জাতীয় বা গোষ্ঠীগত ঐক্যের স্থূল ও মূত প্রতীক হিসেবে।

(3) আদিম চিন্তায় ও কল্পনায় যেমন স্থূলতা ছিল, তেমনই স্থূলতা ছিল আদিম আকাঙ্ক্ষা ও নৈতিক আদর্শের মধ্যেও। আদিম মানুষকে সব সময়েই প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ ও অন্যান্য মানব-গোষ্ঠীর সঙ্গে যুদ্ধ করে বাঁচতে হ'ত। সুতরাং দেবতার কাছে তার প্রার্থনাও ছিল নিত্য-প্রয়োজনীয় বস্তুর বিষয়ে। সে দেবতার কাছে প্রার্থনা করত খাদ্যের জন্য, প্রার্থনা করত শত্রুনাশের জন্য, প্রার্থনা করত নিজের জীবন রক্ষার জন্য। সুতরাং আদি ধর্মে ছিল দেবতার সঙ্গে ভক্তের দেওয়া-নেওয়ার সম্বন্ধ। অবশ্য কেবল দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্কই আদি ধর্মের একমাত্র বৈশিষ্ট্য না হলেও, দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক ছিল আদি ধর্ম-চেতনার একটি প্রধান অঙ্গ। সুতরাং আদি ধর্ম অনেকাংশেই জাগতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই গড়ে উঠেছিল। আর এই স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াসকে আদিম ধর্মের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য বলা যায়।

(4) গোষ্ঠীধর্মগুলির চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হ'ল, তাদের পারস্পরিক অত্যন্ত-ভিন্নতা। কোন গোষ্ঠীর দ্বারা পূজিত দেবতা কেবল মাত্র সেই গোষ্ঠীরই দেবতা বলে স্বীকৃত হ'ত। অন্য গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিদের ভিন্ন দেবতার পূজক বলে চিহ্নিত করা হ'ত। আদি যুগে গোষ্ঠী-চেতনা ও গোষ্ঠীধর্মচেতনা এতই কঠোর ছিল যে, বিশেষ ধর্মীয় দীক্ষা-পদ্ধতি ছাড়া কোন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্ভব ছিল না। বিশেষ গোষ্ঠীর ধর্মানুষ্ঠানে একমাত্র সেই গোষ্ঠীর লোকেদেরই অধিকার আছে বলে বিবেচিত হ'ত। তাছাড়া গোষ্ঠী-ধর্মের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান অত্যন্ত কঠোরভাবে পালিত হ'ত। এমনকি বিশেষ প্রয়োজন বোধেও সেগুলির পরিবর্তন করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং আদিম ধর্ম ছিল অত্যন্ত কঠোর অনুষ্ঠান-প্রধান। এইসব অনুষ্ঠান পালিত হ'ত অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে। ফলে নতুন কোনো ধারণা বা চিন্তার দ্বারা আদি ধর্মের পক্ষে অনুপ্রাণিত হওয়া সম্ভব ছিল না। যা প্রচলিত আছে, তা'-ই ধ্রুব ও শাশ্বত বলে মনে করা হ'ত। সুতরাং আদি ধর্মের পক্ষে উদারতর ধর্মের পর্যায়ে উন্নীত হওয়া সহজ ছিল না।

(5) গোষ্ঠী ধর্মের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল, দেবতাদের সম্বন্ধে ধারণার অস্পষ্টতা। বৈশিষ্ট্য ও চরিত্রের দিক থেকে বিভিন্ন দেব-দেবীর মধ্যে পার্থক্য মোটেই নির্দিষ্ট ছিল না। এমনকি স্বভাবের দিক থেকে মানুষের সঙ্গেও তাদের বিশেষ পার্থক্য করা হ'ত না। মানুষের তুলনায় আদিম দেবতাদের প্রাধান্য ছিল মাত্র শক্তি ও চাতুর্যে। এই আদিম দেবতাদের কতকগুলিকে মানুষের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ও নানা বিষয়ে মানুষের সাহায্যকারী ও কতকগুলিকে মানুষের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ও ক্ষতিকারক বলে মনে করা হ'ত। মানুষ বন্ধুভাবাপন্নদের পূজা ও উপহার দিয়ে সন্তুষ্ট করতে চাইত আর শত্রুভাবাপন্ন শক্তিগুলিকে চাইত এড়িয়ে চলতে। কখন কখন তাদের রোষদৃষ্টি থেকে মুক্ত থাকার জন্যও তাদের সন্তুষ্ট রাখতে চাইত বা তারা যাতে বিরক্ত না হয় তারই চেষ্টা করত। সেই অস্পষ্ট ধর্ম-চেতনার যুগে মানুষ কি ভাবে যে এক দেবতাকে অপর দেবতা থেকে পৃথক্ করত তা সঠিক ভাবে বলা যায় না। নৃত্য, গীত, দীক্ষা ইত্যাদি নানা আচার-অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল বটে, তবে এগুলির অধিকাংশই কোন না কোন ঐন্দ্রজালিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে জড়িত ছিল, বিশুদ্ধ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ছিল না। ফলে আদি ধর্ম আচার-অনুষ্ঠান ও অন্ধবিশ্বাসের ভারে ভারাক্রান্ত ছিল। এই অবস্থা থেকে সহজে মুক্ত হওয়ার শক্তি এই সব গোষ্ঠী-ধর্মের মধ্যে ছিল না এবং কোন বৈপ্লবিক কারণে এই কঠোর গোষ্ঠী-চেতনা ও গোষ্ঠী-বন্ধনের অবলুপ্তি ছাড়া গোষ্ঠী-ধর্মের উন্নয়ন সম্ভব ছিল না। কারণ, সে-যুগে গোষ্ঠী-ধর্ম বিশেষভাবে গোষ্ঠী-চেতনার সঙ্গে যুক্ত ছিল।

আদিম গোষ্ঠী-ধর্মের যে-সব বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হ'ল, সেগুলি থেকে গোষ্ঠী-ধর্মের অন্ধকার দিকটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বলা যায়, আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ উন্নত ও উদার ধর্ম-চেতনার পক্ষে অনুপযোগী ছিল। সীমিত গোষ্ঠীজীবনের অবলুপ্তি ছাড়া মানব-সমাজে ধর্মের উদারতর পর্যায়ে পরিণতি সম্ভব ছিল না। সুতরাং উদার ধর্মের আবির্ভাবের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন ছিল গোষ্ঠীজীবনের অবলুপ্তির। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও আদিম ধর্মের মধ্যে উন্নততর ধর্মের বীজ নিহিত ছিল। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, আদিম গোষ্ঠীধর্মের মধ্যেও কতকগুলি স্তরভেদ লক্ষ্য করা যায়। সর্বপ্রাণবাদীয় স্তরে সপ্রাণ প্রকৃতি-পূজা থেকে ক্রমে দেহাতিরিক্ত আত্মার ধারণার আবির্ভাবকে আদিম ধর্ম-চেতনায় নিশ্চিত উন্নতির লক্ষণ বলে চিহ্নিত করা যায়। আবার, অনির্দিষ্ট আত্মার বা দেবতার পূজার স্তর থেকে আদিম ধর্ম যখন ধর্ম-বন্ধনের ভিত্তিতে গোষ্ঠী-চেতনার স্তরে উন্নীত হ'ল,

তখনও তার মধ্যে উচ্চতর ধারণার আভাস পাওয়া যায়। পূর্বপুরুষ-পূজার মাধ্যমে গোষ্ঠী ও সমাজ-চেতনা দৃঢ়তর হ'ল। মানুষ গোত্রদেবতাকে পূজা করতে গিয়ে সামাজিক ও সাধারণ স্বার্থের প্রতি আনুগত্য অনুভব করল। আদিম সর্বপ্রাণবাদের মধ্যে আধুনিক ও সুসভ্য মানুষের স্বাভাবিক নৈতিক চেতনার অস্তিত্ব ছিল না, একথা সত্য, কিন্তু সামাজিক ও গোষ্ঠীগত আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি বর্বর মানুষের এই আনুগত্যের মধ্যেই উত্তরকালের উন্নত নৈতিক ও সামাজিক চেতনার মূল উপ্ত ছিল। কারণ, এই আনুগত্যের মাধ্যমেই মানুষ প্রথম সর্বসাধারণের কল্যাণের তুলনায় ব্যক্তি-স্বার্থের ন্যূনতা অনুভব করল। এই সামাজিক কল্যাণের বা জনকল্যানের আদর্শই পরে রূপ নিয়েছে উচ্চতর নৈতিক আদর্শের। এ ছাড়াও আদি সমাজে যে জন্মগত ও রক্তের সম্বন্ধের ধারণা মানুষকে গোষ্ঠীবদ্ধ হতে সাহায্য করেছিল, তা-ই পরবর্তী যুগে বৃহত্তর ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে আধ্যাত্মিক ভ্রাতৃত্ববোধের ভিত্তি রচনা করে। প্রাকৃতিক সম্বন্ধের এই আধ্যাত্মিক সম্বন্ধে রূপান্তরই নিঃসন্দেহে ধর্ম-চেতনার উন্নতি নির্দেশ করে।

(B) জাতীয় ধর্ম (National Religion)

আদিম গোষ্ঠী-জীবন থেকে যখন ধীরে ধীরে জাতির (nation) আবির্ভাব ঘটল তখন মানব-সংস্কৃতির অন্য সব ক্ষেত্রের মত ধর্মের ক্ষেত্রেও বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল। মানব-সমাজ জাতির রূপ নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানব-চেতনার প্রসার ঘটল। বৃহত্তর পরিবেশে বিভিন্ন ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার ফলে ব্যক্তির চেতনা ও ভাবনার প্রসার ঘটল। ধর্মজীবনেও এতদিন যা ছিল প্রকৃতিপূজা ও ব্যক্তি-স্বার্থ বা গোষ্ঠীস্বার্থ-সিদ্ধির উপায়মাত্র, তা'র মধ্যে নৈতিক চেতনার উদ্ভব হ'ল। ফলে, বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ বা মঙ্গলের আদর্শ ব্যক্তিস্বার্থ ও গোষ্ঠীস্বার্থের তুলনায় মহত্তর ও অনুসরণীয় বলে স্বীকৃত হ'ল।

আমরা আগেই বলেছি যে, আদিম গোষ্ঠী-জীবন ছিল সঙ্কীর্ণ ও সীমিত। মানুষ তখন তার জৈবিক প্রয়োজন মেটাতেই ব্যস্ত ছিল। জীবন ধারণের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করতেই তার সমস্ত সময় অতিবাহিত হ'ত। ইতর প্রাণীর সঙ্গে মানুষের তখন বিশেষ পার্থক্য ছিল না। তাকে বাঁচতে হ'ত নির্দয় প্রকৃতি আর অন্যান্য শত্রুগোষ্ঠীর সঙ্গে যুদ্ধ করে। এই স্থূল জৈবিক প্রয়োজনসর্বস্ব জীবনে তার পক্ষে সূক্ষ্ম ও গভীর বিষয়ে দার্শনিক চিন্তা বা কল্পনা (speculation) ছিল অসম্ভব। তার মানসিকতার

সংস্কারের জন্য প্রয়োজন ছিল আরও নিশ্চিন্ত, আরও নিরুদ্বেগ জীবনের, প্রয়োজন ছিল সেই পাশব স্থূল প্রয়োজনসর্বস্ব জীবন থেকে মুক্তির। উন্নত ও মহত্তর ধর্ম-জীবনের জন্যও কঠোর বাহ্য পরিবেশের পরিবর্তনের প্রয়োজন। দৈনন্দিন অনিশ্চয়তা থেকে মুক্ত না হ'লে মানুষের পক্ষে উন্নত আধ্যাত্মিক জীবনের কল্পনা সম্ভব নয়। কিন্তু আদিম গোষ্ঠী-জীবনে তা ছিল দুষ্প্রাপ্য।

আদিম গোষ্ঠী-জীবন থেকে কি ভাবে জাতীয় জীবনে মানুষের উত্তরণ ঘটল তার সঠিক ইতিহাস আমাদের জানা নেই; কারণ, মানুষের সেই পরিণতির কোন লিখিত ইতিহাস নেই। তাই এ-ব্যাপারে আমাদের অনেকাংশেই নির্ভর করতে হয় অনুমানের উপর। আদিম অবস্থায় মানুষ প্রধানত পশু ও মৎস শিকার করে ও বনের ফল-মূল আহরণ করেই জীবন ধারণ করত। এর তুলনায় উন্নত জীবন এল যাযাবর গোষ্ঠীর মধ্যে। এরা দলবদ্ধভাবে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় বিচরণ করত। যাযাবরদের মধ্যে আদিম গোষ্ঠীর তুলনায় উন্নত ধরণের সংঘবদ্ধতা দেখা দিল। কেননা, এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়াতে দলের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সংহতির প্রয়োজন বেশি। কিন্তু এই অবস্থায়ও তাদের বাহ্য পরিবেশ স্থায়ী ও নিশ্চিন্ত জীবনের পক্ষে উপযুক্ত ছিল না। কারণ, তাদের বৃহৎ ভূভাগের মধ্যে বিচরণ করে বেড়াতে হ'ত, আর সেই বৃহৎ ভূভাগের প্রাকৃতিক পরিবেশ সর্বত্র শান্ত ও নিশ্চিন্ত জীবন যাপনের উপযোগী ছিল না। এই অবস্থায় তাদের ধর্ম-জীবন ছিল সরল, ও তারা নির্দিষ্ট দেবদেবীর পূজা করত। প্রাচীন সেমীয় (Semites) ও পারসীক (Persian)-দের ইতিহাসে এই ধরণের ধর্ম দেখা যায়। এই যাযাবর অবস্থায় মানুষ স্বভাবিক ভাবেই পশুপালন করত, ও যে-সব পশু তাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী ও প্রয়োজনীয় ছিল, অন্য পশুর তুলনায় তাদের শ্রদ্ধার ও কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে দেখত। কিন্তু সভ্যতার আবির্ভাবের আগে মানুষের পক্ষে আরও স্থায়ীভাবে বসবাসের প্রয়োজন হয়েছিল। যাযাবর মানুষ ক্রমে চাষ করতে শিখল। এই চাষবাসের মাধ্যমে মানব-জীবনে এল স্থায়িত্ব, এল নিশ্চিন্ততা। খাদ্য সংগ্রহ অপেক্ষাকৃত সহজ হ'ল; কারণ, প্রকৃতির উপর মানুষের নির্ভরতা অনেকাংশে কমে গেল। ফলে, তার বিশ্রাম ও চিন্তার সুযোগ মিলল। তাছাড়া চাষবাসকে ভিত্তি করে জনসংখ্যাও ঘনীভূত হ'ল, সৃষ্টি হ'ল নগর, জনপদ। সমাজ-জীবন হ'ল আরও সংঘবদ্ধ, সুসংহত। পারস্পরিক সম্পর্ক ও আদান-প্রদানের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেল। সমাজ-জীবনের এই

পরিবর্তনের প্রভাব পড়ল ধর্ম-জীবনেও। নির্দয় ও কঠোর প্রকৃতির পাশ থেকে অংশত মুক্ত হয়ে মানুষ সুযোগ পেল সূক্ষ্ম চিন্তার অনুশীলনের, উন্নত আদর্শ অনুসরণের।

ছোট ছোট গোষ্ঠীগুলি কি ভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বৃহত্তর জাতিতে পরিণত হ'ল তা'র সঠিক ইতিহাস জানা না থাকলেও অনুমান করা যায় যে, এই একীভবন আরম্ভ হয় আভ্যন্তরিক প্রেরণায় নয়, বাইরের শক্তির চাপে। আদিম গোষ্ঠীগুলি ছিল সামাজিক রীতি, আচার, অনুষ্ঠান, ধর্ম ইত্যাদির ব্যাপারে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। আচার-অনুষ্ঠানের সম্বন্ধে রক্ষণশীলতাও তাদের কম ছিল না। ফলে, প্রাচীন সামাজিক প্রথা ও লোকাচারগুলির একীকরণ সহজ ছিল না, অন্তত তাদের স্বাভাবিক ভাবে মিলিত হ'ওয়ার কোন আন্তরিক প্রেরণা ছিল না। এই সব বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী প্রথম একত্রিত হ'ল অপর কোন শক্তিমান গোষ্ঠীর অধীনে। অধিক শক্তিমান গোষ্ঠীগুলি নিজেদের স্থান ও অধিকারের পরিধি অতিক্রম করে অপেক্ষাকৃত দুর্বল গোষ্ঠীগুলির উপর প্রাধান্য বিস্তার করে তাদের উপর কর্তৃত্ব করত। ফলে, একই শক্তির অধীনস্থ একাধিক গোষ্ঠী ধীরে ধীরে একত্রিত হতে বাধ্য হ'ল। সুতরাং প্রথমে যা ছিল বিভিন্ন গোষ্ঠীর সমষ্টি-মাত্র, তা ক্রমশ আভ্যন্তরিক পরিবর্তনের ফলে এক ও অভিন্ন জাতিতে পরিণত হ'ল। গোষ্ঠীর এই একীভবনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় মিশরীয় ও রোমক জাতির উৎপত্তির ইতিহাসে। গোষ্ঠী-জীবনের সীমা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হ'ওয়ার ফলে সমাজ-জীবনের সর্বক্ষেত্রেই পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিল। প্রাচীন রীতির পরিবর্তে এল নতুন রীতি। আদিম গোষ্ঠী-জীবনের পক্ষে যা উপযুক্ত ছিল, বৃহত্তর জাতীয় জীবনে তা অনুপযুক্ত বলে প্রমাণিত হ'ল। পুরাতন প্রতিশোধ প্রথার স্থান নিল আইন ও ন্যায়বোধের ভিত্তিতে শাস্তির ব্যবস্থা। সমাজ-জীবনে এল নানা ধরণের কর্ম-বিভাগ ও বৈচিত্র্য। প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠানের জায়গায় এল সমাজ-স্বীকৃত নানা ধরণের সংস্থা (institution)। বিবর্তন ঘটল ব্যক্তির চেতনায়। মানুষের দৃষ্টি নিজের বা গোষ্ঠীর স্বার্থকে অতিক্রম করে প্রসারিত হ'ল।

সমাজ-জীবনের এই প্রসার ধর্ম-জীবনেও প্রতিফলিত হ'ল, তবে আকস্মিক ভাবে নয়, ধীরে ধীরে, পর্যায়ক্রমে। আদিম সংস্কৃতির রক্ষণ-শীলতার বিলুপ্তি খুব সহজ ছিল না। যতদিন পর্যন্ত বৃহত্তর জাতির মধ্যেও কোন গোষ্ঠী তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারল, ততদিন পর্যন্ত তার গোষ্ঠীগত আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় পূজা-পদ্ধতিগুলিকে টিকিয়ে রাখতে চাইল অপরিবর্তনীয়রূপে। এমন কি গোষ্ঠীজীবনের সীমানা

যখন ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হ'ল, তখনও কতকগুলি ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও প্রথা টিকে রইল ঐতিহ্যের নিদর্শনরূপে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বিভিন্ন গোষ্ঠীর আচার, অনুষ্ঠান ও প্রথাগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতে লাগল। এটি সম্ভব হ'ল প্রধানত তাদের একত্রে, একই পরিবেশে ও একই শক্তির অধীনে থাকতে বাধ্য হওয়ার ফলে। বিজেতা গোষ্ঠীর ধর্ম-বিশ্বাস প্রাধান্য পেল স্বাভাবিক ভাবেই। বিজেতার জয় ও প্রাধান্যই তার দেবতার শক্তি ও মহত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করল। বিজিতের দুর্বলতা তার ধর্ম ও দেবতার দুর্বলতাই প্রমাণ করল। ফলে, বিজিতের ধর্ম ক্রমশ বিলুপ্ত হতে লাগল। এর সঙ্গে যে শক্তি অদৃশ্যভাবে জাতীয় ধর্মের উৎপত্তির পথ প্রশস্ত করছিল, তা ছিল জাতীয় জীবনে নতুন প্রয়োজন, নতুন আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের উন্মেষ। এই সব প্রয়োজন, এই সব আশা আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের পক্ষে আদিম গোষ্ঠী-ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান ও বিশ্বাসগুলি ছিল অনুপযোগী। তাদের সীমিত স্থানিক (local) প্রকৃতি বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন হয়ে পড়ল। সমাজ-জীবনের নতুন নতুন প্রয়োজন প্রাচীন সর্বপ্রাণবাদ বা আত্মবাদের পক্ষে মেটানো সম্ভব হ'ল না। নতুন ধরণের ধর্মের প্রয়োজন দেখা দিল। প্রয়োজন হ'ল আরও সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, আরও বৃহত্তর স্বার্থের রক্ষক কোন দেবতার। কিন্তু তাই বলে মানুষের কল্পনা হঠাৎ নতুন দেবতার সৃষ্টি করল না; কারণ, তাহ'লে সেই কাল্পনিক দেবতা হ'ত কৃত্রিম, জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন, ধর্মীয় আবেগ ও অনুভূতির অনুপযোগী। ধারাবাহিকতা ছাড়া ক্রমোন্নতি সম্ভব নয়। যা অতীত, যা প্রাচীন, তা'র সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে নতুনের ক্রমবিকাশ হয় না। এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। আদিম দেবদেবীর জায়গায় যে সম্পূর্ণ নতুন দেবদেবীর পূজা আরম্ভ হ'ল তা নয়, বরং প্রাচীন প্রকৃতি-পূজাকে ভিত্তি করেই এক ধরণের বহুদেববাদের সৃষ্টি হ'ল। স্থানীয় দেবতাদের তুলনায় এদের ছিল বিশ্বজনীনত্ব ও সাধারণত্ব (universality)। নৈসর্গিক শক্তি হিসেবে চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি বস্তুগুলি ছিল সকলের কাছে সমান প্রয়োজনীয়, সাধারণ স্বার্থের সাধক। আদিম গোষ্ঠীধর্মে এদের প্রাধান্য না থাকলেও এদের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। আদিম ধর্মে প্রাধান্য ছিল সেই সব বিশেষ নৈসর্গিক শক্তির বা দেবদেবীর যাদের সঙ্গে স্থানীয় গোষ্ঠী-জীবনের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। পার্বত্য গোষ্ঠীরা সাধারণত পূজা করত বিশেষ পর্বত বা প্রসবণকে; নদীর তীরে যারা বাস করত, তারা সাধারণত পূজা করত সেই নদী.কে। কারণ, এই সব প্রাকৃতিক বস্তুগুলি তাদের জীবন ধারণের পক্ষে ছিল অপরিহার্য। স্থানীয় দেবদেবীর তুলনায় গোষ্ঠী-জীবনে চন্দ্র,

সূর্য ইত্যাদি সাধারণ দেবতার প্রাধান্য কম ছিল বটে, কিন্তু এই সব বিশ্ব-জনীন ও সাধারণ দেবতার পূজারও প্রচলন ছিল। সুতরাং স্থানীয় গোষ্ঠী-স্বার্থের ক্রমাবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এই সব বিশ্বজনীন নৈসর্গিক শক্তিগুলিকে ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে জাতীয় ধর্ম ও জাতীয় দেবদেবীর কল্পনা। প্রাচীন জাতীয় দেবদেবিদের মধ্যে সকলের না হলেও অনেকেরই উৎপত্তি হয় এই ধরণের নৈসর্গিক শক্তির পূজাকে ভিত্তি করে। প্রথম অবস্থায় যে-সব দেবদেবীর কোন নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না, পরবর্তী যুগে তাদের ধারণাও কোন না কোন প্রাকৃতিক শক্তির ধারণার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। এই ধরণের অনেক দেবদেবীরই সন্ধান পাওয়া যায় বিভিন্ন দেশের জাতীয় বহুদেববাদের মধ্যে। বৈদিক যুগে 'অগ্নি' ছিলেন আগুনের দেবতা; পারসীক 'আহুর মাজদা' ছিলেন অলোক-দেবতা; ব্যাবিলনীয় 'মারদুক' (Marduk) ও মিশরীয় 'রা' (Ra) ছিলেন সৌর দেবতা। গ্রীক 'জীউস' (Zeus) ও লাতিন (Latin) 'জুপিটার' (Jupiter) ছিলেন স্বর্গ-দেবতা (heaven-gods)। পরবর্তী কালে অবশ্য এই সব দেবতার ধারণার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে, ক্রমে তাঁদের অনেকেই নির্দিষ্ট কোন নৈসর্গিক শক্তির সঙ্গে জড়িত থাকেন নি। কিন্তু নৈসর্গিক শক্তির সঙ্গে জড়িত থাকলেও গোষ্ঠী-দেবতাদের তুলনায় জাতীয় দেবতারা সকলেই অধিকতর ব্যক্তিত্ব নিয়ে প্রকাশিত হ'ন জাতীয় ধর্মে। এই ধর্মীয় রূপান্তরের আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল, আদিম গোষ্ঠী-ধর্মের স্থানীয় নৈসর্গিক দেবতারা ক্রমশ জাতীয় দেবতাদের ধারণার সঙ্গে যুক্ত ও পরে একীভূত হ'ন। সুতরাং বিভিন্ন গোষ্ঠীর মিলনের ফলে যেমন এক জাতির সৃষ্টি হ'ল, তেমনই বিভিন্ন দেবদেবী মিলিত হলেন এক মহত্তর দেবতার কল্পনার মধ্যে। প্রাচীন গ্রীক, ব্যাবিলনীয় ও মিশরীয় জাতীয় দেবতাদের অনেকের ক্ষেত্রেই এই স্থানীয় সীমিত অবস্থা থেকে মহত্তর অবস্থায় পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। গ্রীকদেশের 'এপোলো' (Apollo) ব্যাবিলনের 'মারদুক' (Marduk), মিশরের 'রা' (Ra) ইত্যাদি সকলেই প্রথমে ছিলেন স্থানীয় নৈসর্গিক অথবা নগর-দেবতা, এবং কালক্রমে এঁদের শাসন ও কর্তৃত্বের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। অবশ্য এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, জাতীয় দেবতাদের অনেকেরই উৎপত্তি স্থানীয় দেবতাদের থেকে হলেও সকলের ক্ষেত্রেই যে তা ঘটেছিল এমন নয়। বৈদিক 'ব্রহ্মা' মূলত কোন নৈসর্গিক দেবতা ছিলেন না, অথচ বিভিন্ন যাগযজ্ঞের তিনি প্রধান ফলদাতা ছিলেন। 'আফ্রোদিতে' (Aphrodite) কোন প্রাকৃতিক শক্তির প্রতিভূ ছিলেন না, তিনি ছিলেন ইন্দ্রিয়-লিপ্সার দেবী। সুতরাং এঁদের

ক্ষেত্রে কোন স্থানীয় নৈসর্গিক বস্তুর দেবীকরণ ঘটেনি; বরং কোন একটি সাধারণ ও বিশ্বজনীন ব্যাপার ক্রমে দেবত্ব লাভ করেছে।

জাতীয় জীবনে একতা ও সংহতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম-জীবনেও ক্রমে একতা ও সংহতি দেখা দিল। প্রথম অবস্থায় গ্রীক জাতি ছিল কতকগুলি নগর-রাষ্ট্রের সমামেল (confederation)। ফলে, দেবতাদের সংখ্যাও ছিল বহু এবং সকল দেবতার প্রভাব সর্বত্র সমান ছিল না। অথবা সকল দেবতার পূজাও সর্বত্র প্রচলিত ছিল না। কিন্তু জাতীয় জীবন যেখানে সংহত ছিল, সেখানে পূজা ও ধর্মীয় প্রথার মধ্যেও সমতা দেখা গেল। আর্যজাতি ভারতে আসার পর বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে এই বিস্তৃত ভূখণ্ডের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়লেও এবং স্থানীয় প্রকৃতির দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হলেও, আর্যধর্মের ক্ষেত্রে ঐক্য ও সমতা বজায় ছিল। ধর্ম-বিশ্বাসের এই একতা ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সমতা অনেকাংশে রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভর করলেও ধর্মের স্বকীয় রূপ ও বৈশিষ্ট্যের দ্বারাও অনেক সময় প্রভাবিত হয়; যেমন, বহু দেববাদের তুলনায় একেশ্বর-বাদে পূজা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ঐক্য ও সমতা অনেক বেশি দেখা যায়।

(a) জাতীয় ধর্মের বৈশিষ্ট্য

গোষ্ঠীধর্মের সঙ্গে জাতীয় ধর্মের যে-সব পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় তার কারণ অনুসন্ধান করতে হবে জাতীয় জীবনের উন্নততর সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে।

(1) প্রথমত, গোষ্ঠী-জীবন ছিল সহজ সরল ও প্রকৃতি-নির্ভর। মানুষের নিজের ও অপরের ব্যক্তিত্বের ধারণা তখনও তার কাছে স্পষ্ট হয় নি। তাই গোষ্ঠী-ধর্মে অনির্দিষ্ট ও অস্পষ্ট প্রাকৃতিক দেবতার পূজা প্রচলিত ছিল। কিন্তু বৃহত্তর জাতীয় জীবনে মানুষের ব্যক্তিত্বের অধিকতর প্রকাশ ঘটল পারস্পরিক নানা আদান-প্রদানের মাধ্যমে। মানুষ ক্রমশ নিজের ও অপরের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হ'ল। এই আত্ম-সচেতনতা প্রতিফলিত হ'ল তার ধর্মে। তার দেবতারাও গোষ্ঠী-দেবতার তুলনায় অধিকতর নির্দিষ্ট ব্যক্তিত্ব নিয়ে প্রকাশিত হলেন। আত্মসচেতনতা ও ব্যক্তিত্ববোধকে ভিত্তি করে দেখা দিল মানুষের নৈতিক চেতনা, শুভ-অশুভের বোধ। অপর দিকে তার দেবতার কল্পনায়ও যুক্ত হ'ল নৈতিকতা। মানুষের মত দেবতারাও নানা শুভ-অশুভ, ন্যায়-অন্যায় কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লেন। দেবতাদের উপর ব্যক্তিত্ব আরোপের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম হয়ে উঠল নৈতিক। ফলে,

পূজক ও দেবতার মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করা অনেক সহজ হয়ে উঠল।

(2) দ্বিতীয়ত, গোষ্ঠী-জীবনের তুলনায় জাতীয় জীবন ছিল অনেক জটিল ও বৈচিত্র্যময়। ফলে, সমাজ-জীবনে দেখা দিল নানা কর্মবিভাগ। বিভিন্ন ধরণের কাজ নির্দিষ্ট হ'ল বিভিন্ন ধরণের মানুষের জন্য। স্বাভাবিক ক্ষমতা ও প্রবণতাকে ভিত্তি করে ধীরে ধীরে এল অধিকারভেদ। ধর্মের ক্ষেত্রে দেবতাদের ব্যাপারেও কাজের ও অধিকারের ভেদ কল্পনা করা হ'ল। বিভিন্ন দেবতাকে বিভিন্ন ধরণের শক্তির ও কর্মের অধিকারী বলে মনে করা হ'ল। অনেক ক্ষেত্রে আবার স্থানীয় নৈসর্গিক দেবতাদের ক্রিয়া ও কর্তৃত্বের পরিধি প্রসারিত হ'ল। একই দেবতা একাধিক কর্মের সঙ্গে যুক্ত হলেন। ফলে, ছোট ছোট স্থানীয় দেবতাদের ধারণাও প্রসারিত ও ব্যাপ্ত হ'ল। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এই সব স্থানীয় দেবতার ধারণা মহত্তর দেবতার ধারণার মধ্যে বিলুপ্ত হ'ল। মানব-সমাজের মত দেব-সমাজেও কর্মবিভাগের স্বাভাবিক ফল হওয়া উচিত ছিল বহু দেবতার সৃষ্টি। রোমক জাতির ক্ষেত্রে এই অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু পূজা-ব্যবস্থার প্রয়োজনের পক্ষে অসংখ্য দেবতার কল্পনা ছিল অসুবিধাজনক। এই কারণেই অসংখ্য দেবতার বদলে কয়েকটি দেবতার প্রাধান্য দেখা দিল এবং সাধারণত ক্ষুদ্র ও সীমিত-শক্তি সম্পন্ন দেবতারা বিলুপ্ত হলেন। এক একটি দেবতার ব্যাপারে একাধিক কর্মভার ও কর্তৃত্ব কল্পিত হ'ল। এক দেবতার ধারণার মধ্যে একাধিক ক্ষুদ্র ও স্থানীয় দেবতার আত্তীকরণ (absorption)-এর এই প্রবণতাকে বহুদেববাদের একেশ্বরবাদে পরিণতির প্রবণতা বলা যায়। জাতীয় ধর্মের মধ্যে এই প্রবণতা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। আবার এই প্রবণতা কোথাও কোথাও একদেবপ্রাধান্যবাদ (henotheism) -এর রূপ নিয়েছে। ম্যাক্স মূলর (Max Miiller) বিশেষ করে বৈদিক ধর্মের অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে এই প্রবণতা লক্ষ্য করেন। এই যুগে যখন কোন একটি বিশেষ দেবতার (ইন্দ্র, বরুণ ইত্যাদি) প্রশস্তি করা হয়েছে, তখন তাঁকেই দেবতাদের মধ্যে সর্বপ্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আবার অন্য ক্ষেত্রে অন্য দেবতার প্রশস্তিতে সেই দেবতার প্রাধান্য স্বীকার করা হয়েছে। অতএব এই প্রাধান্য আপেক্ষিক হলেও, অন্যদের তুলনায় একের প্রাধান্য, সন্দেহ নেই। এ ব্যাপারেও দেবতাদের কল্পনায় মানুষের সমাজের ক্রমপ্রাধান্য (hierarchy) ও সমাজ-শাসন ব্যবস্থার চিত্রই প্রতিফলিত হয়েছে।

ধর্মজীবনের ঐক্য ও সমতা আবার অন্য ভাবেও প্রকাশিত হয়েছে।

কোন এক ব্যক্তিদেবতার প্রাধান্যের বদলে প্রাধান্য পেয়েছে কোন এক বিশেষ নৈর্ব্যক্তিক নীতি। প্রাচীন বৈদিক যুগে ঋগ্বেদে 'ঋত' বলতে বহির্বিশ্ব ও মনোজগতের নিয়ম ও শৃঙ্খলার নীতিকেই বোঝান হ'ত। কোন ব্যক্তি-দেবতা (ইন্দ্র বা বরুণ) এই নীতির রক্ষক ছিলেন মাত্র।

(3) তৃতীয়ত, জাতীয় ধর্মে দেবতাদের সম্বন্ধে ধারণা উন্নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক বস্তুগুলির সঙ্গে দেবতাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ক্রমে ক্ষীণতর হ'তে লাগল। দেবতারা এক উন্নত শ্রেণীর জীব বলে কল্পিত হ'তে লাগলেন। তাঁদের বাসের জন্য পৃথিবীর উর্ধ্বলোকে এক উন্নত রাজ্যের কল্পনা করা হ'ল যার নাম হ'ল 'স্বর্গরাজ্য'। গোষ্ঠী-ধর্মে দেবতারা ছিলেন জাগতিক। পৃথিবীর সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। জাতীয় ধর্মের প্রথম অবস্থায় দেবতারা প্রায় জাগতিক জীবই ছিলেন। কিন্তু সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেবতাদের জাগতিক অবস্থা থেকে বিশেষ ভাবে আধ্যাত্মিক অবস্থায় যে উত্তরণ ঘটল, তারই মধ্যে সম্ভাবনা রইল অতিজাগতিক ও আধ্যাত্মিক ধর্মের, গভীরতর বিশ্বাসের। এই গভীরতর বিশ্বাসের ও অনুভূতির কাছে জাতীয় বহুদেববাদ ক্রমে অনুপযোগী হয়ে পড়ল। ধর্মজীবনে জাগতিক স্বার্থ, সে জাতীয় স্বার্থ হলেও, ক্রমশ তার মূল্য হারিয়ে ফেলতে লাগল। মানুষের ধর্মবোধ ক্রমশ যতই আত্ম-সচেতন হয়ে উঠতে লাগল, তার আধ্যাত্মিকতা ততই জাতীয়তার সীমা অতিক্রম করে বিশ্বজনীন ধর্মের দিকে এগিয়ে চলল।

(b) পবিত্র বস্তু, ক্রিয়া ও ব্যক্তি

ধর্মের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস কেবল মাত্র ঈশ্বর বা দেবতার সম্পর্কে ধারণার বিবর্তনের ইতিহাসই নয়, ধর্মীয় বস্তু, ক্রিয়া-কলাপ ও ধর্মীয় ব্যক্তির বিবর্তনের ইতিহাসও বটে। ধর্মের ক্ষেত্রে জ্ঞানের তুলনায় প্রথমত অনুভূতি ও আচার অনুষ্ঠানের দিকটিই ছিল প্রধান। প্রাথমিক অবস্থায় ঈশ্বরের সম্পর্কে ধারণা ছিল অস্পষ্ট। অতিমানবীয় ও রহস্যময় সত্তার অনুভূতিকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল আদি ধর্ম-জীবন। এই অনুভতির স্বাভাবিক প্রকাশ হয়েছিল নানা আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে, আদিম নৃত্য-গীতে ও পূজায়। যে-ব্যাপারে অন্য সামাজিক সংস্থার সঙ্গে ধর্মের পার্থক্য করা যায়, তা হ'ল দেবতা ও অতীন্দ্রিয় শক্তির সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস।

(1) মন্দির ও পীঠস্থান—আদিম গোষ্ঠী-ধর্ম ছিল প্রধানত স্থানিক।

নির্দিষ্ট কোন একটি প্রাকৃতিক বস্তু, যেমন, কোন গাছ বা কোন নদী ইত্যাদির সঙ্গে দেবত্বের ধারণা জড়িত ছিল; এবং এই সব প্রাকৃতিক বস্তুকেই দেবজ্ঞানে পূজা করা হ'ত। এর পর জড়বস্তুর সঙ্গে দেবতার সম্পর্ক ক্রমশ ক্ষীণতর হ'ল। তখন এই সব জড়বস্তু দেবতার আশ্রয় বলে বিবেচিত হ'ত, প্রত্যক্ষ ভাবে দেবতা বলে গণ্য হ'ত না। জাতীয় ধর্মে দেবতার ব্যক্তিত্ব যখন আরও সুস্পষ্ট, আরও নির্দিষ্ট রূপ নিল, এবং জাতীয় জীবনে দেবতার ধারণা যখন আরও ব্যাপ্ত, আরও প্রসারিত হ'ল, তখন ঐ সব জড়-বস্তুর সঙ্গে দেবতার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিন্ন হ'ল বটে, কিন্তু তবুও এইগুলির মূল্য রইল দেবতার প্রিয়বস্তুরূপে। এই ভাবেই কোন বিশেষ প্রস্তরখণ্ড বা ঐ জাতীয় কোন বস্তু দেবতার প্রিয় অথবা দেবতার প্রতীক হিসেবে গণ্য হ'তে লাগল। এই প্রতীক-পূজা থেকেই প্রতিমা পূজার সৃষ্টি; আর এই প্রতীক বা প্রতিমাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল দেবালয়, মন্দির ইত্যাদি। জাতীয় জীবনে সংহতির ফলে ধর্ম-জীবনে যে সংহতি সমতা ও ঐক্য দেখা গেল, এই দেবালয়গুলিকে কেন্দ্র করে তা দৃঢ়তর হ'ল; অর্থাৎ, এই সব দেবালয় সমগ্র জাতির পক্ষে বিশেষ পবিত্র স্থান বলে গণ্য হ'ল। দেবালয়ের পবিত্রতা চিহ্নিত করা হ'ল তার চারিদিকে দেওয়াল বা বেষ্টন দিয়ে। সেটি ক্রমে হয়ে উঠল একটি পবিত্র ক্ষেত্র বা 'পীঠস্থান' এবং জাতীয় জীবনে তার বিশেষ মূল্য ছিল। জাতীয় শিল্প-সাধনার ক্ষেত্রেও এদের মূল্য কম নয়, কারণ, সে যুগের শিল্প-চেষ্টা অনেকাংশেই ধর্মকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল।

(2) **উৎসর্গ ও প্রার্থনা**—জাতীয় ধর্মে নির্দিষ্ট পবিত্র ক্ষেত্রের আলোচনার প্রসঙ্গে নির্দিষ্ট ও সুসংহত ক্রিয়া পদ্ধতির কথাও এসে পড়ে। এই ধর্মীয় ক্রিয়া পদ্ধতির দুটি প্রধান রূপ। একটি হ'ল, ধর্মীয় উৎসর্গ (sacrifice)-পদ্ধতি, ও অপরটি হ'ল, প্রার্থনা (prayer)-পদ্ধতি।

(i) উৎসর্গ—ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উৎসর্গ-পদ্ধতি অতি প্রাচীন। আদিম গোষ্ঠী-ধর্মের মধ্যেও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দেবতা বা কোন অতিমানবীয় ও অতীন্দ্রিয় সত্তার উদ্দেশ্যে নানা ধরণের উপহার উৎসর্গ করার পদ্ধতি ধর্মানুষ্ঠানের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। কিন্তু এই উৎসর্গ-প্রথার উৎপত্তি, তাৎপর্য বা ক্রমবিকাশের বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা যায় না। অতএব এ সম্বন্ধে মাত্র অসম্পূর্ণ ও সম্ভাব্য ব্যাখ্যাই দেওয়া যায়। বিভিন্ন উৎসর্গ-প্রথার মধ্যে মোটামুটি চার রকমের মনোবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, উৎসর্গ-প্রথা ছিল সরল কৃতজ্ঞতা স্বীকারের প্রথামাত্র। নিজের জীবন ধারণের প্রয়োজন সাধন, অর্থাৎ আহার, পানীয় ইত্যাদির জন্য মানুষ যে-সব

উচ্চতর শক্তি বা দেবতার উপর নিজেকে নির্ভরশীল বলে মনে করত, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ 'প্রথম ফল' ইত্যাদি বস্তু উপহার দিত। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে এই মানসিকতার পরিবর্তন ঘটল। কৃতজ্ঞতার বদলে উপহার উৎসর্গের ব্যাপারে দেখা দিল দেবতাদের সঙ্গে 'লেন-দেন'-এর মনোবৃত্তি। এই দ্বিতীয় অবস্থায় মানুষ দেবতাকে নানা উপহার উৎসর্গ করে ভবিষ্যতে তাঁর করুণা ও কৃপাদৃষ্টি লাভের আশায়। যদিও এই ধরণের ফলাকাঙ্ক্ষা করে দেবতার উদ্দেশ্যে উপহার উৎসর্গ করা যুগে যুগে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দ্বারা সমালোচিত ও নিন্দিত হয়েছে, তবুও কৃতজ্ঞতার মনোবৃত্তি থেকে ভবিষ্যতে কিছু আকাঙ্ক্ষা করার মনোবৃত্তির উদ্ভবের মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। যে করুণার জন্য দেবতার প্রতি মানুষ কৃতজ্ঞতা বোধ করে, ভবিষ্যতে সেই ধরণের কৃপা দেবতার কাছ থেকে আশা করাই স্বাভাবিক। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে এই ভবিষ্যৎ কৃপা-প্রার্থনা সম্পূর্ণরূপে দেওয়া-নেওয়ার মনোবৃত্তির রূপ নেয়। ঐন্দ্রজালিক উৎসর্গের মধ্যে এই মনোভাব বিশেষভাবে দেখা যায়। ইন্দ্রজালে উপহার উৎসর্গের দ্বারা অতীন্দ্রিয় ও অতিমানবীয় শক্তিকে যেন কিছু নিশ্চিত ফল বা সুযোগ দিতে বাধ্য করা হয়। ভারতবর্ষে বৈদিক 'কর্মকাণ্ডে' এই মনোভাব দেখা যায়। বেদের কর্মকাণ্ডে নির্দিষ্ট যাগযজ্ঞ ও উৎসর্গ ইত্যাদির দ্বারা দেবতাদের বিচিত্র ফল দানে বাধ্য করা হয়। উপযুক্ত ও বেদনির্ধারিত ক্রিয়া ও উৎসর্গদান সম্পর্ণ হলে দেবতারা ফল দিতে বাধ্য হন এবং এ-ব্যাপারে তাঁদের ইচ্ছা বা করুণার স্থান নেই—এই ধরণের বিশ্বাসই হল বেদের কর্মকাণ্ডের ভিত্তি। প্রাচীন ভারতবর্ষে এই বৈদিক কর্ম-সর্বস্বতা বিশেষ ভাবে নিন্দিত ও সমালোচিত হয়েছে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মে। বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গৌতমবুদ্ধ স্বয়ং বৈদিক ক্রিয়া-কর্মের ঘোর বিরোধী ছিলেন; এবং কারও কারও মতে বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তিই হয় বৈদিক 'ক্রিয়াকাণ্ডের' প্রতিক্রিয়ারূপে। ধর্মীয় ক্রিয়া ও উৎসর্গ-প্রথার এই চরম রূপটি বাদ দিলেও, উৎসর্গের মূলে যে দেবতাদের ভবিষ্যৎ কৃপা-লাভের উদ্দেশ্য বর্তমান ছিল, এরমধ্যে যেমন অস্বাভাবিকতা নেই, তেমনই বিশেষ নিন্দার যোগ্য অন্যায়ও কিছু নেই। তৃতীয় ধরণের উৎসর্গপ্রথা গড়ে ওঠে দেবতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ও নিকট সম্পর্ক স্থাপন করার আশায়। দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা আহার্যে অংশ গ্রহণ করে মানুষ পূজনীয়ের সঙ্গে তার নৈকট্য, তার একাত্মতা অনুভব করে। কোন কোন ক্ষেত্রে পূজক যে পূজনীয়ের সঙ্গে একই আহার্য গ্রহণ করে তাই নয়, পূজনীয়কেই আহার্যরূপে গ্রহণ করে তাঁর সঙ্গে একাত্ম হতে চায়।

আদিম 'টোটেম'-প্রথায় বিশেষ উৎসবে 'টোটেম' প্রাণীকে হত্যা করে আহার্যরূপে গ্রহণ করার মধ্যে এই মনোবৃত্তিই বর্তমান। রবার্টসন স্মিথ তাঁর 'সেমীয়দের ধর্ম' গ্রন্থে উৎসর্গ ও বলি প্রথার উৎপত্তি নির্দেশ করেছেন আদিম 'টোটেম'-প্রথার মধ্যে, যখন 'টোটেম'কে হত্যা করে খাদ্যরূপে গ্রহণ করা হ'ত দেবতার শক্তি ও সামর্থ্য নিজের মধ্যে উপলব্ধি করার উদ্দেশ্যে।[1] কিন্তু এই মত মেনে নিলে 'টোটেম'-প্রথাকেই আদিম ও সার্বিক ধর্ম বলে স্বীকার করতে হয়; কিন্তু আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি যে, এই সিদ্ধান্ত করার যথেষ্ট হেতু নেই। উৎসর্গ-প্রথার চতুর্থ রূপ হ'ল, প্রায়শ্চিত্তের রূপ। আদি ধর্মে ভীতির প্রাধান্য ছিল। সুতরাং উচ্চতর শক্তির কোপ থেকে রক্ষা পা'বার জন্য তাকে সন্তুষ্ট রাখার প্রয়োজন মানুষ বোধ করত। আর সেই উদ্দেশ্যেই সে ঐ শক্তির উদ্দেশে উপহার উৎসর্গ করত। দেবতার কাছে মানুষ কোন অপরাধ করলে তিনি রুষ্ট হন; তাঁর সেই রোষ নিবৃত্ত করার জন্য ও মানুষের সঙ্গে তাঁর পূর্বের করুণার সম্বন্ধ আবার ফিরিয়ে আনার জন্য দেবতার উদ্দেশ্যে উপহার ও বলি উৎসর্গ করা হয়। এই বলি-প্রথা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতীক-বলি বা পশুবলির রূপ নিলেও, ক্ষেত্রবিশেষে স্বেচ্ছাকৃত নরবলিরও প্রচলন দেখা যায়। এই বলি-প্রথা কেবল প্রাচীন ও জাতীয় ধর্মে নয়, উন্নত শ্রেণীর ধর্মের মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়। জাতীয় ধর্মে মানুষের নৈতিক চেতনার অগ্রগতি ও মানবতাবোধ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নর-বলি প্রথার প্রচলন ক্রমশ লুপ্ত হয় বটে, তবে প্রতীক-বলির ব্যবস্থা আজও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নি। একাধিক উন্নত শ্রেণীর ধর্মের মধ্যে বিভিন্ন রূপে প্রতীক-বলির অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। জাতীয় ধর্মে এই উৎসর্গ-পদ্ধতিগুলিও নির্দিষ্ট ও অপেক্ষাকৃত স্থায়ী রূপ নেয়।

(ii) প্রার্থনা—ধর্মীয় ক্রিয়ানুষ্ঠানে উৎসর্গ ও বলিদান-প্রথার মতই প্রার্থনা-পদ্ধতিও বহু প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত। প্রার্থনা যে-কোনও ধর্মেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। গোষ্ঠী-ধর্মে এই প্রার্থনার পদ্ধতি ছিল ক্ষেত্র ও ব্যক্তি-বিশেষে বিভিন্ন। কিন্তু গোষ্ঠী-জীবনের তুলনায় জাতীয় জীবন যখন ক্রমশ সুসংহত হল, তখন প্রার্থনা-পদ্ধতির মধ্যেও সমতা ও ঐক্য দেখা দিল। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রার্থনার ভাষা ও উচ্চারণ-ভঙ্গী ক্রমশ অনুভূতি-নিরপেক্ষ স্বাধীন পদ্ধতিতে পরিণত হ'ল এবং মানুষের কল্পনায় তা ধীরে ধীরে রহস্যময় ঐন্দ্রজালিক শক্তি অর্জন করল। ফলে, এই প্রার্থনার ভাষা

1 Robertson Smith, Religion of the Semiles, পৃষ্ঠা 213.

ও উচ্চারণের নির্ভুলতার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হ'ত এবং প্রার্থনা ও মন্ত্রের নির্ভুল ভাষা ও উচ্চারণের সাহায্যেই প্রার্থিত ফল পাওয়া সম্ভব বলে বিশ্বাস করা হ'ত। প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য ধর্মে মন্ত্রের এই বিশেষ শক্তি স্বীকার করা হ'ত। আদি গোষ্ঠী-ধর্মে প্রার্থনার উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত ব্যক্তিগত ও কখনও বা দলগত স্বার্থের সিদ্ধি। আবার এই স্বার্থও ছিল জাগতিক স্বার্থ। মানুষ যেমন তার আহার্য ও পানীয়ের জন্য, তার জীবন রক্ষা ও নিরাপদ জীবনের জন্য দেবতার উদ্দেশ্যে নানা উপহার উৎসর্গ করত, তেমনই এই সব জাগতিক স্থূল ও বস্তুগত স্বার্থের সিদ্ধির জন্যই আদিম মানুষ অতীন্দ্রিয় রহস্যময় শক্তির কাছে বা দেবতার কাছে প্রার্থনাও করত। সুতরাং সেই আদিম প্রার্থনা ছিল মানুষের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষারই প্রকাশ। এর পর যখন মানুষের নৈতিক চেতনার ক্রমশ উদয় হ'ল, মানুষ উচ্চতর নৈতিক আদর্শ ও মঙ্গলের কথা চিন্তা করতে শিখল, তখন সে তার দেবতার কাছে মহত্তর কল্যাণ কামনা করে প্রার্থনা করতে শিখল। স্থূল জাগতিক বস্তুর বদলে সে প্রার্থনা করল আত্মিক সৌন্দর্য, জীবনের পবিত্রতা,' প্রার্থনা করল ঐশ্বর্যের বদলে জ্ঞানের। প্রত্যেক উন্নত শ্রেণীর ধর্ম থেকেই এই জাতীয় মহত্তর কল্যাণের প্রার্থনার অনেক দৃষ্টান্তই দেওয়া যায়; প্রার্থনার বিষয়ের এই পরিবর্তন জাতীয় ধর্মের ক্রমবিকাশেরই এক নিদর্শন; আর এর মধ্য দিয়েই বিশ্বজনীন ধর্মের পথ প্রশস্ত হয়।

(3) **পুরোহিত ও যাজক**—জাতীয় ধর্মে একদিকে মন্দির, পীঠস্থান ইত্যাদি গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, ও আর একদিকে পূজা-পদ্ধতির অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে উৎসর্গ, বলিদান ও প্রার্থনা-পদ্ধতির নির্দিষ্টতা ও আপেক্ষিক স্থায়িত্ব লাভের সঙ্গে সঙ্গে, এই সব ক্রিয়াপদ্ধতির নির্ভুল ও যথাযথ অনুষ্ঠানের জন্য পুরোহিত বা যাজক শ্রেণীর সৃষ্টি হ'ল। এই পুরোহিত ও যাজকেরা ধর্মীয় ক্রিয়ানুষ্ঠানের ব্যাপারে বিজ্ঞ ও অধিকারী পুরুষ বলে বিবেচিত হ'ল। সুতরাং ধর্মীয় ক্রিয়ানুষ্ঠানের সূক্ষ্মতা ও কলেবর বৃদ্ধির ফলে পুরোহিত শ্রেণীর প্রাধান্য দেখা দিল; এবং বিশেষ ভাবে পবিত্র কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে পুরোহিতেরাও পবিত্র ও সমাজের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বলে গণ্য হতে লাগল। সুতরাং জাতীয় ধর্ম-জীবনে পুরোহিত-প্রথার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। যতদিন পর্যন্ত পুরোহিতেরা ধর্মানুষ্ঠানের ব্যাপারে বিজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে জনসাধারণকে নানা ধর্মীয় উপদেশ ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করত, ততদিন তারা সমাজের কল্যাণ ও নৈতিক উন্নতির ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। কিন্তু যখন এই পুরেহিত-গোষ্ঠী ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্মের অনুষ্ঠানসর্বস্বতাকে প্রাধান্য ও প্রশ্রয়

দিতে লাগল, তখন তারা সমাজের আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিপন্থী হয়ে দাঁড়াল। আর এই জায়গায়ই পুরোহিত আর দৈবপুরুষদের (prophets) মধ্যে বিরোধ দেখা দিল। সুসংহত পুরোহিত-সমাজ স্বাভাবিক ভাবেই ধর্মের ক্ষেত্রে একটি রক্ষণশীল শক্তি হিসেবে কাজ করতে লাগল, এবং যে-কোন নতুন আদর্শ বা চিন্তাধারার পক্ষে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াল। এই সব পুরোহিতেরা নিজেদের স্বার্থেই ধর্মের অনুষ্ঠানসর্বস্বতাকে টিকিয়ে রাখতে চেষ্টা করল। এরা ক্রমশ সমাজে বেশ শক্তিশালী গোষ্ঠী হয়ে উঠল ও সমাজের যে কোনও পরিবর্তন ও প্রগতির পক্ষেই বাধা হয়ে উঠল। এদের এই প্রগতি-বিমুখতা, এই রক্ষণশীলতা জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হল। এই যুগকে সমাজের বা জাতীয় জীবনের পুরোহিত-শাসিত যুগ বলা যায়। রাষ্ট্রের কর্তা বা রাজারাও এই সব পুরোহিতদের দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত হতেন। এই অবস্থা থেকে সমাজের উত্তরণ ঘটেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মাধ্যমে। বিশেষ শক্তিমান মহাপুরুষদের পক্ষেই সমাজকে এই পুরোহিত-শাসন থেকে মুক্ত করা সম্ভব হয়েছে ধর্মীয় ও সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে।

এই সব অপেক্ষাকৃত স্থায়ী অনুষ্ঠান ও পূজা-পদ্ধতি জাতীয় ধর্মের রূপ নির্ধারণে বিশেষ সাহায্য করেছে। দেবতাকে পূজা করার আগে দেবতার স্বরূপ ও প্রকৃতি জানা প্রয়োজন ; কিন্তু যে দেবতা কৃচিৎ পূজিত হ'ন, তাঁর কোন নির্দিষ্ট রূপ সর্বসাধারণের কল্পনায় থাকে না, এক এক ভক্তের কাছে তাঁর এক এক রূপে প্রকাশ হয়। কিন্তু নির্দিষ্ট ও সর্ব-সাধারণের স্বীকৃত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে দেবতার পূজা হয়, সর্বসাধারণের কাছে তাঁর একটি নির্দিষ্ট রূপ ও ব্যক্তিত্বও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই জন্যই জাতীয় দেবতাদের ব্যক্তিত্ব আদিম গোষ্ঠী-দেবতাদের তুলনায় অনেক বেশি স্পষ্ট। আসলে পূজার প্রয়োজনেই দেবতার বিশেষ রূপ ও গুণ কল্পিত হয়, এবং যে সমাজ-ব্যবস্থায় পূজা-প্রণালী যত বেশি স্থায়িত্ব ও নির্দিষ্টতা লাভ করেছে, সেই সমাজেই দেবতাদের স্বরূপ ও গুণগুলি স্থায়িরূপে নির্দিষ্ট হয়েছে। যদিও ঠিক কোন কারণে কোন বিশেষ দেবতাতে কোন বিশেষ গুণ আরোপ করা হ'ল, তা জোর করে বলা যায় না, কারণ এ ব্যাপারে আমাদের ইতিহাস-জ্ঞান বিশেষভাবে সীমিত, তবুও অনুমান করা যায়, মানুষের কল্পনা-শক্তি এ-ব্যাপারে নির্দিষ্ট পথ ধরেই এগিয়েছে। বিশেষ ধরণের পূজার প্রয়োজনেই দেবতাদের বিশেষ বিশেষ গুণ ও বিশেষ ধরণের ব্যক্তিত্বের অধিকারী বলে কল্পনা করা হয়েছে। আর দেবতাদের এই ব্যক্তিত্বকে ভিত্তি করেই মানুষের ধর্ম-চেতনায় নৈতিকতার উন্মেষ

হয়েছে। কেননা, ন্যায়-অন্যায়, সৎ-অসৎ ইত্যাদির ধারণা ব্যক্তিত্বের ধারণাকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়। জড় বা নৈর্ব্যক্তিক কোন বস্তুর কাজের ন্যায়-অন্যায় বিচার করা যায় না। এই নৈতিক চেতনার উন্মেষের ফলে পরবর্তী কালে জাতীয়তার সীমা ছাড়িয়ে মানুষের নীতিবোধকে ভিত্তি করে বিশ্বজনীন ধর্মের সূচনা হয়েছে।

(C) বিশ্বজনীন ধর্ম

এতক্ষণ যে ধর্মের আলোচনা আমরা করেছি, তা ছিল জাতীয় জীবনেই সীমাবদ্ধ। ধর্ম বলতে নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ও নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের সীমারেখার মধ্যে সীমিত ধর্মকেই আমরা বুঝিয়েছি। এই ধর্ম ছিল রাষ্ট্র ও জাতীয় জীবনের সঙ্গে একাত্ম। গোষ্ঠী-ধর্মের তুলনায় বেশি ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হয়েও দেবতারা জাতীয় জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা, ভাল-মন্দর সঙ্গেই জড়িত ছিলেন। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করা ও সাধারণের স্বীকৃত পদ্ধতিতে ধর্মের ক্রিয়া অনুষ্ঠান করা ছিল অন্যতম জাতীয় কর্তব্য। এক কথায়, ধর্ম ছিল প্রধানত আনুষ্ঠানিক। কিন্তু মানুষের ধর্ম-চেতনায় নীতিবোধের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ধর্ম-জীবনে জাতীয় ধর্মের অনুষ্ঠানিকতার মূল্য ক্রমশ হ্রাস পেতে লাগল। মানুষের ধর্মবোধ যতই আত্মসচেতন হয়ে উঠতে লাগল, ততই ধর্মের আভ্যন্তরীণ রূপটি তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। মানুষ অনুভব করল, ধর্ম কেবল অনুষ্ঠান নয়, কোন বিশেষ গোষ্ঠী বা বিশেষ জাতির নিজস্ব সম্পত্তি নয়, ধর্মে আছে সমস্ত মানুষের সমান অধিকার। এই চেতনাকে ভিত্তি করেই উৎপত্তি হ'ল বিশ্বজনীন ধর্মের। মানবতাকে আশ্রয় করে বিশ্বজনীন ধর্ম দেশ ও জাতির সীমা অতিক্রম করে প্রচারিত হ'ল দেশে দেশে। আমরা এখানে তিনটি ধর্মের নাম উল্লেখ করতে পারি। এগুলি আনুষ্ঠানিকতার পরিবর্তে প্রধানত নৈতিকতা ও মানবতাকে ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে ও উৎপত্তির স্থান ও পরিবেশের সীমা ছাড়িয়ে প্রচারিত হয় দেশে-বিদেশে। এই তিনটি ধর্ম হ'ল বৌদ্ধ, খ্রীষ্ট ও ইসলাম ধর্ম। এই তিনটি ধর্মকে বিশ্বজনীন বলে প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। হিন্দুধর্মকে এই বিশ্বজনীন ধর্মগুলির সমগোত্রীয় বলা যায় না। হিন্দুধর্মের ভিত্তি হ'ল বেদ এবং বেদের কর্মকাণ্ডকে বেদ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। যাঁরা নিজেদের হিন্দু বলে স্বীকার করেন তাঁরা বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বেদ-নির্ধারিত পদ্ধতি মেনে চলেন। এই বৈদিক ক্রিয়ানুষ্ঠানকে বাদ দিলে হিন্দুধর্মকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। বেদের অপর

অংশ জ্ঞানকাণ্ড। উপনিষদগুলি এই অংশের অন্তর্ভূত। উপনিষদের মধ্যে অতি উচ্চ মানবিক ও নৈতিক আদর্শের উল্লেখ আছে। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতেরা উপনিষদকে বেদের কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করার বিরোধী। তাঁদের মতে এই দুটি একই বেদের দু'টি অংশ ও ব্যবহারিক জীবনে বেদের কর্মকাণ্ডকে কেউই অস্বীকার করেন না। কারও কারও মতে অবশ্য বেদের কর্মকাণ্ডের কোনও পারমার্থিক মূল্য নেই। বিশেষত শঙ্করাচার্য এই মত পোষণ করেন। বেদ-ভিত্তিক বা বৈদিক হিন্দুধর্ম ভারতের জাতীয়তার সীমা ছাড়িয়ে বিশ্বের সমস্ত জাতির মধ্যে কোনও দিনই প্রচারিত হয় নি। এই কারণেই হিন্দুধর্মের প্রাচীনতা ও উচ্চ আদর্শ সত্ত্বেও এই ধর্মকে ঠিক বিশ্বজনীন ধর্ম বলা যায় না।

(1) **বৌদ্ধ ধর্ম :** উৎপত্তির দিক দিয়ে এই তিনটি বিশ্বজনীন ধর্মের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম হ'ল সর্বজ্যেষ্ঠ। এই ধর্মের উৎপত্তি হয় খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে। বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তন ও প্রচার করেন সিদ্ধার্থ। ইনি পরে গৌতমবুদ্ধ বলে পরিচিত হন। প্রাচীন ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্যধর্মের ক্রিয়াকাণ্ড ও অনুষ্ঠান-সর্বস্বতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ারূপে বৌদ্ধধর্মের জন্ম। গৌতমবুদ্ধ বৈদিক কর্মকাণ্ডের বিরোধী ছিলেন এবং মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবনে এর মূল্যহীনতা অনুভব করেন। গৌতমবুদ্ধের মতে মানুষের জীবন দুঃখময়। রোগ, শোক, জরা ইত্যাদি দুঃখ জীবনকে দুর্বিষহ করে। সুতরাং কিভাবে এই সব দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তারই সন্ধান করেন গৌতমবুদ্ধ, এবং নিজের জীবনে ও অভিজ্ঞতায় যে জ্ঞান অর্জন করেন, তাই সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। বুদ্ধের মতে এই দুঃখের কারণ হল অজ্ঞান বা অবিদ্যা এবং সেই অবিদ্যা থেকে উদ্ভূত আকাঙ্ক্ষা। অনিত্য ও ক্ষণস্থায়ী বস্তুর প্রতি আকাঙ্ক্ষাই মানুষকে নানা কাজে প্রবৃত্ত করে। ফলে, মানুষ দুঃখ ভোগ করে। কিন্তু দুঃখ ও দুঃখের কারণ অবিদ্যা, একথা সত্য হলেও এই দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। যেমন দুঃখ আছে তেমনই দুঃখ থেকে মুক্তিও আছে। আর এই মুক্তি লাভ করতে গেলে মানুষকে নিজের চেষ্টায় অভ্যাস ও সংযমের দ্বারা তা করতে হবে। বৌদ্ধধর্মকে ঠিক ধর্ম বলা যায় কি না, এ-নিয়ে মতভেদ আছে। কারণ, বুদ্ধ নিজে তাঁর উপদেশের মধ্যে ঈশ্বর ও জগৎস্রষ্টা কোন শক্তির কথা উল্লেখ করেন নি। তাঁর প্রবর্তিত মতের প্রধান কথা ছিল দুঃখমুক্তি, আর এই দুঃখমুক্তির যে উপায় তিনি নির্দেশ করেছেন তার মধ্যে ঈশ্বর বা দেবতাদের সাহায্য কিংবা দেবতাদের সঙ্গে জাগতিক বা আধ্যাত্মিক কোন সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপার নেই। তাঁর মতে মানুষ নিজের চেষ্টার দ্বারাই তার নিজের

সমস্ত দুঃখের অবসান ঘটাতে পারে। তাছাড়া জন্মান্তরে বিশ্বাস করলেও গৌতমবুদ্ধ অন্যান্য যে কোন স্থূল বস্তুর মত আত্মাকেও অনিত্য ও কয়েক রকমের উপাদানের সংঘাত বলে মনে করতেন। সুতরাং তাঁর মতে মুক্তি বা 'নির্বাণ' অর্থে দুঃখের অবসান বোঝালেও কোন নিত্য আত্মার মুক্ত অবস্থায় অবস্থিতি বোঝায় না। 'নির্বাণ' বলতে সব কিছুর অবসানরূপ একটি নঞর্থক শূন্য আদর্শ বোঝায় কি না এ সম্বন্ধে কোন দার্শনিক আলোচনার মধ্যে না গিয়েও একথা বলা যায় যে, অন্যান্য যে-কোন ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধ মতের কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য আছে, আর সেই কারণেই বৌদ্ধ মতকে ধর্মমত বলা যায় কি না, এ প্রশ্ন করা যেতে পারে। কিন্তু বুদ্ধের জীবিতকালে বৌদ্ধ মতের অবস্থা যা-ই থাক না কেন; পরবর্তী কালে অন্যান্য ধর্মের মতই বৌদ্ধ মত একটি ধর্মমতরূপেই পরিচিত ও প্রচারিত হয়। এই সময়ে বুদ্ধদেবকেই ঈশ্বর বা ভগবান তথাগত বলে মানা হয়; এবং তাঁকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ও পরম করুণাময় পুরুষ বলে পূজা করা হয়। তখন মানুষ তাঁর সঙ্গে অতি নিকট ও হৃদয়ের সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাইল। কারণ, সে বিশ্বাস করত তাঁরই বিশেষ করুণা লাভ করাই মানব জীবনের পরমার্থ। নির্বাণ সম্পর্কে ধারণারও পরিবর্তন ঘটল। মহাযানপন্থী বৌদ্ধদের মতে নির্বাণের অর্থ জগৎ থেকে মুক্তি নয়, জগতের মধ্যেই মুক্তি। তাছাড়া ব্যক্তিগত নির্বাণের চেয়ে সর্বজীবের মুক্তিই মানব জীবনের কাম্য বলে বিবেচিত হ'ল, মহাযান মতে। সুতরাং প্রাথমিক অবস্থায় বৌদ্ধ মতকে ঠিক ধর্ম বলে বর্ণনা করা না গেলেও পরবর্তী কালে এই মত একটি ধর্মমত বলেই প্রচারিত হয় এবং অন্যান্য ধর্মের বৈশিষ্ট্যও এতে দেখা দেয়। কারও কারও মতে প্রাথমিক বৌদ্ধ মতকে এক ধরণের জীবন-দর্শন ও নীতি বলা যায়। কারণ, তাঁদের মতে ঈশ্বরহীন ধর্ম বলে কিছু থাকতে পারে না। এবং কোন ক্রিয়াপদ্ধতি বা অনুষ্ঠান, তা সে যত উন্নত নৈতিক চেতনারই প্রকাশ হোক না কেন, তার মধ্যে যদি ঈশ্বর বা অতিপ্রাকৃতের ধারণা না থাকে তাহলে তাকে ধর্মপদবাচ্য বলা যায় না।

বৌদ্ধধর্মকে বিশ্বজনীন বলা যায় এই কারণে যে, এই ধর্ম কোনও বিশেষ জাতীয় আদর্শ বা উদ্দেশ্যকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি, গড়ে উঠেছিল মানবতার আদর্শ বা মানুষের দুঃখমুক্তির আদর্শকে কেন্দ্র করে। তাছাড়া এই আদর্শ অনুসরণে জাতি ও গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার স্বীকার করা হয়েছে বৌদ্ধধর্মে। জাতীয় ধর্মের সঙ্গে এর আর একটি পার্থক্য হল, এই ধর্মে আনুষ্ঠানিকতার তুলনায় ব্যক্তির নৈতিক চেতনা ও নীতিবোধকেই মূল্য দেওয়া হয়েছে বেশি। প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম আবার অন্যান্য

বিশ্বজনীন ধর্ম থেকে পৃথকও বটে। কারণ, গৌতমবুদ্ধ মানুষের ব্যক্তিগত চেষ্টাকেই তার মুক্তির একমাত্র উপায় বলেছেন। এমনকি তিনি নিজেকেও শিষ্যদের কাছে মুক্তির ব্যাপারে উপদেষ্টামাত্র বলে বর্ণনা করেছেন।

(2) **খ্রীষ্টধর্ম ঃ** খ্রীষ্টধর্মের উৎপত্তি যীশুখ্রীষ্টের জীবন ও বাণীকে ভিত্তি করে। যীশু নিজে ইহুদী ছিলেন বটে, কিন্তু ইহুদী বা হীব্রুধর্মের অনুষ্ঠান-সর্বস্বতা ও পুরোহিতদের প্রাধান্য তিনি পছন্দ করেন নি। তিনি প্রচার করলেন ক্ষমা, প্রেম ও প্রীতির ধর্ম। তাঁর ধর্মও এল নৈতিকতা ও মানবতাকে ভিত্তি করে। তাঁর মতে সমস্ত মানুষই এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরের সন্তান। সুতরাং সকলেই তাঁর কাছে সমান প্রিয়। মানুষে মানুষে কোনও ভেদ তিনি স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে মানুষে মানুষে প্রকৃত সম্পর্ক হ'ল ভ্রাতৃত্বের ও প্রীতির। তাই যীশু সকলকে উপদেশ দিলেন, 'তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাস'। বুদ্ধের মত তিনি ঈশ্বর সম্পর্কে মৌন ছিলেন না; বরং ঈশ্বরকেই জগতের একমাত্র কর্তা বলে স্বীকার করেছেন, এবং মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের প্রীতির সম্পর্কই স্বীকার করেছেন। বিশেষ উন্নত ধরণের নৈতিক ও সামাজিক চেতনাই খ্রীষ্টধর্মের ভিত্তি। মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের উপরই যীশু বিশেষ ভাবে জোর দিয়েছেন। সুতরাং জগৎ ও সমাজকে তিনি অসার বা মিথ্যা বলে মানেন নি। এই জায়গায়ই বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে খ্রীষ্টধর্মের প্রধান পার্থক্য। তাছাড়া বুদ্ধ চেয়েছিলেন মানুষকে দুঃখ থেকে মুক্তির পথ দেখাতে; আর যীশু চেয়েছিলেন মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার করতে। খ্রীষ্টধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল মানুষকে পাপাচরণ থেকে বিরত করে পুণ্য জীবনে নিযুক্ত করা। সুতরাং পাপ ও পুণ্যের ধারণা এবং সামাজিক নীতিবোধই এই ধর্মের মূল ভিত্তি।

খ্রীষ্টধর্ম কোন বিশেষ রাষ্ট্র বা গোষ্ঠীজীবনের সঙ্গে যুক্ত নয়। সমস্ত মানুষের সমান অধিকার ও সৌভ্রাতৃত্বের আদর্শে গড়ে ওঠার ফলে এই ধর্ম কোন জাতীয় গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ না হয়ে বিশ্বজনীন ধর্ম হয়ে উঠেছে, এবং দেশ ও জাতির সীমা অতিক্রম করে সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। এর বিশ্বজনীনতার আর একটি নিদর্শন হ'ল এর প্রচারধর্মিতা। কোন কোন জাতীয় ধর্ম বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসার লাভ করেছে রাষ্ট্রীয় প্রভাব বিস্তারের ফলে। বিজেতা জাতি বা রাষ্ট্রের ধর্ম বিজিত জাতি গ্রহণ করেছে, বা বিজেতার ধর্মের মধ্যে বিজিতের ধর্ম ক্রমশ লীন হয়েছে। কিন্তু বিশ্বজনীন ধর্মের প্রচার হয়েছে সেই ধর্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত ব্যক্তিদের উৎসাহে ও চেষ্টায়। কখনও বা হয়ত কোন বিশেষ রাষ্ট্রনায়ক এই ধর্মের দ্বারা

প্রভাবিত হয়েছেন ও ধর্ম-প্রচারের ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে যে তা ঘটেছে এমন নয়। তাছাড়া ক্ষেত্রবিশেষে রাষ্ট্রীয় সাহায্য পেলেও তা পেয়েছে জাতীয় ধর্ম হিসেবে নয়, তার স্বকীয় গুণের জন্য। আর এই গুণের জন্যই অন্য সকলের মত রাজা বা রাষ্ট্র-নায়কদেরও এই ধর্ম আকর্ষণ করেছে। বিশ্বজনীন ধর্মের প্রচারের আর একটি কারণ হ'ল এই ধর্মের প্রবর্তকদের ব্যক্তিগত চরিত্র। তাঁদের নৈতিক চরিত্রের ও ব্যবহারের নানা গুণ স্বাভাবিক ভাবেই সর্বসাধারণকে তাঁদের দিকে আকৃষ্ট করেছে। এই সব ক'টি বৈশিষ্ট্যই খ্রীষ্ট ধর্মের মধ্যে বর্তমান। ফলে, খ্রীষ্ট ধর্ম হয়েছে বিশ্বজনীন ও সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য।

(3) **ইসলাম ধর্ম:** বিশ্বজনীন ধর্মগুলির মধ্যে উৎপত্তির দিক থেকে সর্বকনিষ্ঠ হলেও প্রচারের দ্রুততার দিক থেকে অন্য সব ধর্মকে অতিক্রম করেছে ইসলাম ধর্ম। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন মহম্মদ। তিনি খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে আরব দেশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইসলাম ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল, 'আল্লাহ্' বা ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠত্ব ও সর্বশক্তিমত্তা। খ্রীষ্টধর্মের ঈশ্বর সর্বশক্তিমান হলেও মানুষের ব্যক্তিগত চেষ্টা ও সৎ আচরণের দ্বারাই তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব। বৌদ্ধধর্মেও মানুষের নৈতিক আচ-রণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। একমাত্র মানুষের নিজের চেষ্টায়ই মানুষ 'নির্বাণ' লাভ করতে পারে। কিন্তু ইসলামধর্মে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ইচ্ছা ও কর্তৃত্বের কাছে নতি স্বীকারই প্রধান কথা। মহম্মদ আল্লার দূত ছিলেন। তিনি আল্লার কাছে যে বাণী লাভ করেছিলেন তাই সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। তাঁর উপদেশ ও বাণী লিখিত আছে কোরাণে। সুতরাং ঈশ্বরের বাণী কোরাণেই বিধৃত আছে। মহম্মদ-প্রচারিত ও কোরাণে লিখিত সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের বাণীই ইসলাম ধর্মের ভিত্তি। অতএব ইসলামধর্মকে প্রধানত গ্রন্থ-ধর্ম বলা যেতে পারে; আর কোরাণই হ'ল সেই গ্রন্থ। ইসলামধর্মে মানুষের ব্যক্তিগত নৈতিক চেতনার তুলনায় ঈশ্বরের আদেশ ও বাণীকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বরের আদেশ অলঙ্ঘনীয় ও সর্বদা পালনীয়, এবং এই বাণী প্রচারের জন্য প্রয়োজন হলে অস্ত্রেরও সাহায্য নেওয়া চলে। মহম্মদ নিজেই ধর্ম প্রচারের জন্য যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। এই দিক থেকেও বৌদ্ধ বা খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে ইসলাম ধর্মের মৌলিক ও নীতিগত পার্থক্য আছে। অবশ্য ঐতি-হাসিক বিচারে ইসলাম ধর্মের পরিবেশ অপর দু'টি ধর্মের পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। মহম্মদ আরব দেশে যাদের মধ্যে তাঁর ধর্ম প্রচার করেন তারা তখনও আদিম গোষ্ঠীধর্মের স্তরেই আবদ্ধ ছিল। তাদের ধর্মে নানা

দেব-দেবীর মূর্তি ও এদের সম্বন্ধে নানা রকমের সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস প্রচলিত ছিল। এই সব স্থানীয় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবদেবীর প্রভাব দূর করে মহম্মদ এক ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের মাহাত্ম্য প্রচার করেন। অন্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন আদিম ধর্মের প্রভাব থেকে মানুষকে মুক্ত করতে অনেক সময়ই হয়ত যুদ্ধ ছাড়া অন্য পথ ছিল না বলেই মহম্মদ মনে করতেন।

বিশ্বজনীন ধর্ম হিসেবে ইসলাম ধর্মেও একেশ্বরবাদই প্রচারিত হয়েছে। তাছাড়া, ঈশ্বরের স্বেচ্ছাচারিতা স্বীকৃত হলেও অন্যান্য বিশ্বজনীন ধর্মের মতই ইসলাম ধর্মেও সব মানুষের ঐক্য ও সাম্যের উপরই জোর দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য বিশ্বজনীন ধর্মের মতই ইসলাম ধর্ম জাতি ও গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকলের মধ্যেই প্রচারিত হয়েছে। সুতরাং প্রচারধর্মিতাও ইসলামধর্মের আর একটি বৈশিষ্ট্য। আর আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, অন্যান্য বিশ্বজনীন ধর্মের তুলনায় এই ধর্ম অনেক দ্রুত প্রসার লাভ করে।

(a) বিশ্বজনীন ধর্মের বৈশিষ্ট্য

যে তিনটি প্রচলিত বিশ্বজনীন ধর্মের সম্বন্ধে আলোচনা করা হ'ল তাদের উৎপত্তি, পরিবেশ ও আদর্শের দিক থেকে অনেক পার্থক্য আছে, এ কথা সত্য। কিন্তু বর্তমান আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বিশ্বজনীন ধর্মের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করতে পারি।

(1) প্রথমত, বিশ্বজনীন ধর্মমাত্রই একেশ্বরবাদী। বৌদ্ধধর্মের প্রাথমিক অবস্থায় এতে ঈশ্বরের উল্লেখ না থাকলেও পরবর্তী কালে বৌদ্ধধর্মের মধ্যে যে পরিবর্তন আসে তা'তে বুদ্ধকেই পুরুষশ্রেষ্ঠ, পরম করুণাময় ও ভগবান বলে কল্পনা করা হয়েছে। খ্রীষ্ট ও ইসলাম ধর্মে ঈশ্বর স্বীকার করা হয়েছে, এবং এই ঈশ্বর এক ও সমস্ত জগতের অধিকর্তা ও পালক। সমস্ত মানুষ, জীব-জন্তু তাঁরই সৃষ্টি, তাঁরই সন্তান। একেশ্বরবাদের প্রবণতা জাতীয় ধর্মগুলির মধ্যে দেখা গেলেও, জাতীয় ধর্মে সাধারণত বহু দেবতার পূজার প্রচলন দেখা যায়। অবশ্য সংখ্যায় বহু হলেও দেবতাদের মধ্যে প্রভাব ও প্রাধান্যের দিক থেকে পার্থক্য দেখা যায় জাতীয় ধর্মে। দেবতাদের উপর নরত্ব আরোপের ফলে দেবতাদেরও সমাজ বা রাজত্ব কল্পনা করা হয়েছে জাতীয় ধর্মে। কিন্তু বিশ্বজনীন ধর্মে ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব স্বীকৃত হলেও, তাঁর সমগোত্রীয় বা সমজাতীয় অন্য কারও অস্তিত্ব কল্পনা করা হয় নি। ফলে, সব দিক থেকেই ঈশ্বরের প্রাধান্য, শ্রেষ্ঠতা ও একত্ব স্বীকার করা হয়েছে বিশ্বজনীন ধর্মে।

(2) দ্বিতীয়ত, সমস্ত বিশ্বজনীন ধর্মই ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষদের জীবন ও অনুভূতিকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠেছে। এই জন্যই এই সব ব্যক্তির চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে বিশ্বজনীন ধর্মগুলিকে। এঁদের ব্যক্তিত্বই আকৃষ্ট করেছে সাধারণ মানুষকে। ফলে, জাতি ও দেশের সীমা অতিক্রম করে সর্বসাধারণের মধ্যে এই সব ধর্মের প্রচার ও প্রসার সম্ভব হয়েছে। বৌদ্ধ, খ্রীষ্ট ও ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক বুদ্ধ, যীশু ও মহম্মদের চরিত্র-মাধুর্যই তাঁদের অনুগামীদের তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট করেছে, মুগ্ধ করেছে। এই সব ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষদের ব্যক্তিগত অনুভূতিই বিশ্বজনীন ধর্মগুলির মূল কথা। এঁদের অনুভূতি বিশেষ দেশ বা জাতির ধর্মবিসকে অনুশ্বাসরণ করে বা আশ্রয় করে দেখা দেয় নি; বরং অনেক ক্ষেত্রেই এঁরা ছিলেন প্রচলিত বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের বিরোধী। কিন্তু এঁদের অনুভূতির মূল কথা ছিল মানবতা ও মানুষের সঙ্গে মানুষের সৌভ্রাতৃত্ব। সুতরাং মানবতা ও নীতিবোধই ছিল বিশ্বজনীন ধর্মগুলির প্রধান অবলম্বন। স্বজাতীয় ও বিজাতীয়র মধ্যে যে ভেদ জাতীয় ধর্মগুলির মধ্যে দেখা যায়, বিশ্বজনীন ধর্মগুলি তা থেকে মুক্ত। এই ধর্মগুলি প্রকৃতই বিশ্বজনের। সমস্ত মানুষকেই সমান মর্যাদা দেওয়া হয়েছে বিশ্বজনীন ধর্মগুলিতে। ধর্মের প্রবক্তাদের এই সাম্যবাদ বিশ্বজনীন ধর্মের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

(3) তৃতীয়ত, বিশ্বজনীন ধর্মের সব ক'টিই প্রচারধর্মী। জাতীয় ধর্মের প্রসার ঘটেছে বা প্রভাব বিস্তারিত হয়েছে রাজনৈতিক প্রাধান্যের মধ্য দিয়ে। বিজিত জাতি স্বাভাবিকভাবেই বিজেতা জাতির ধর্ম গ্রহণ করেছে; বা বিজিতের ধর্ম বিজেতার ধর্মের মধ্যে লুপ্ত হয়েছে। যেমন, প্রাচীন ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদের ধর্ম অস্তিত্ব হারিয়েছে আর্যদের জাতীয় ধর্মের মধ্যে। সুতরাং ধর্মীয় প্রভাব রাজনৈতিক প্রভাবকে ভিত্তি করেই বিস্তার লাভ করেছে। কিন্তু বিশ্বজনীন ধর্মের প্রসার বা প্রচার প্রধানত রাজনৈতিক শক্তিকে আশ্রয় করে ঘটেনি। অবশ্য উত্তরকালে রাজা বা রাষ্ট্রনায়কদের অনেকে এই সব ধর্ম গ্রহণ করার ফলে এদের প্রচারে সাহায্য হয়েছে, সন্দেহ নেই, কিন্তু বিশ্বজনীন ধর্মগুলির প্রচার সম্ভব হয়েছে প্রধানত এই সব ধর্মের প্রবক্তা ও প্রবর্তকদের ব্যক্তিগত চরিত্রের শক্তিতে ও চেষ্টায় এবং এঁদের ভক্ত ও শিষ্যদের ধর্মপ্রচারের উৎসাহে ও আগ্রহে। সুতরাং বিশ্বজনীন ধর্মগুলির বহুল প্রচার সম্ভব হয়েছে রাজনৈতিক শক্তিতে নয়, ভক্তদের ব্যক্তিগত প্রচারকামিতায় ও উদ্যোগে।

(4) শেষত, সমস্ত বিশ্বজনীন ধর্মই উন্নত নৈতিকতাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এই ধর্মগুলির প্রধান উপজীব্য হ'ল জনকল্যাণ ও বিশ্ব-

প্রেম। ইসলাম ধর্মে বিরোধী ও 'কাফের'দের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে সমর্থন করা হলেও, মহত্তর বিশ্বভ্রাতৃত্বের স্বার্থেই তা করা হয়েছে এবং এই ধর্ম-যুদ্ধে আত্মত্যাগকে বিশেষ মূল্য দেওয়া হয়েছে। বৌদ্ধ ও খ্রীষ্ট ধর্মের ত' মূল কথাই হল বিশ্বপ্রেম। তাছাড়া, বিশ্বজনীন ধর্মের প্রবক্তাদের জীবনী আলোচনা করলে দেখা যায়, এঁরা সকলেই প্রধানত মানুষের দুঃখ ও বেদনায় অভিভূত হয়েছিলেন ও তা' দূর করবার জন্যই সচেষ্ট ছিলেন। সুতরাং গভীর নৈতিক চেতনা ও মানবতাবোধই বিশ্বজনীন ধর্মের মূল উৎস; আর সেই কারণেই বিশ্বজনীন ধর্মে আনুষ্ঠানিকতার মূল্য কম।

উপরেব আলোচনায় বলা হয়েছে যে, বিশ্বজনীন ধর্মের প্রবক্তাদের ব্যক্তিগত অনুভূতি, মানবতাবোধ ইত্যাদি থেকেই বিশ্বজনীন ধর্মের উৎপত্তি। কিন্তু এই সব প্রবক্তাদের আবির্ভাব আকস্মিক ব্যাপার নয়। বিশেষ যুগের বিশেষ পরিবেশ ও পরিস্থিতিতেই এঁদের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে। সুতরাং এই সব দৈবপুরুষ ছিলেন তাঁদের নিজেদের যুগেরই সৃষ্টি। বিভিন্ন যুগে ধর্মের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, ধর্মে বিশ্বজনীনতা এসেছে একাধিকবার; কিন্তু আবার নানা কারণে ধর্ম হয়ে উঠেছে আচার-নিষ্ঠ অনুষ্ঠানসর্বস্ব। বিশ্বজনীন ধর্মের উদ্ভব ঘটে প্রধানত খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম থেকে ষষ্ঠ শতকের মধ্যে এবং এর পরে আবার খ্রীষ্টের জন্মের পরে এবং খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে মহম্মদের জন্মের পরে। যুগের চেতনা ও যুগের অনুভূতিই বিশ্বজনীন ধর্মের প্রবক্তাদের বাণী ও ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং তাঁরা নতুন ধর্মের সৃষ্টি করেন নি, যুগের চেতনাকেই রূপ দিয়েছেন তাঁদের ধর্মে। কিন্তু এইসব দেবপুরুষরা পুরো-হিতদের মধ্যে থেকে আসেন নি। কারণ, যাঁরা বিশেষ ধরণের অনুষ্ঠান ও পূজাপ্রথার সঙ্গে জড়িত তাঁদের পক্ষে সেই আনুষ্ঠানিকতার দোষ-ত্রুটি অনুভব করা সম্ভব নয়। সুতরাং দেখা যায় যে, দৈবপুরুষরা এসেছেন সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে, এবং এঁরা সকলেই ছিলেন একা এবং সত্যদ্রষ্টা ও যথার্থবক্তা।

খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতকে ইস্রায়েলে দৈবপুরুষরা মানব-ধর্ম বা জনকল্যাণের ধর্ম প্রচার করেন। ইসায়া (Isaiah) ইত্যাদি দৈবপুরুষরা, জেহবা (Jehovah)র সম্বন্ধে যে স্থূল ধারণা জনমনে ছিল, তা উন্নীত্র করেন। তাঁরা জেহবাকে ন্যায় ও পবিত্রতার দেবতা বলে প্রচার করলেন; এবং তাঁর ইচ্ছাকেই ন্যায় ও নীতি বলে স্বীকার করলেন। তাঁরা প্রাচীন ধর্মের অনুষ্ঠান-সর্বস্বতারও নিন্দা করেন। ইহুদীদের নির্বাসন (Exile)-কাল পর্যন্ত প্রাচীন হীব্রু-ধর্মের এই উন্নত অবস্থা "প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ" (Old Testament)-এ

বিধৃত আছে। কিন্তু ইহুদী-ধর্মের এই অবস্থা থেকে বিচ্যুতি ঘটে পরবর্তী যুগে। ইহুদীদের "প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে" ইহুদীদের মিশর ত্যাগের ইতিহাসের অংশে ধর্মের এই আনুষ্ঠানিকতার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এর কয়েকশ' বছর পরে যীশু যখন ধর্ম প্রচার করেন তখন তাঁর মতের মধ্যে প্রাচীন ইহুদী দৈবপুরুষদের যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। অবশ্য যীশু বিশেষভাবে ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা ও আচারনিষ্ঠতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। সুতরাং তাঁর উপর তাঁর যুগের প্রভাব দু'দিক থেকেই পড়েছিল। একদিকে তিনি ছিলেন তখনকার পুরোহিতপ্রধান আচারনিষ্ঠ ও অন্যায়ধর্মের বিরোধী; অন্যদিকে তিনি ছিলেন তাঁর পূর্বসূরীদের মানবিক ও নৈতিক আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত। সুতরাং বলা যায়, যীশু সম্পূর্ণ নতুন কোন ধর্মের সৃষ্টি করেন নি, বরং সে যুগের সর্বসাধারণের নৈতিক চেতনা ও আদর্শকে ব্যক্ত করেছিলেন, রূপ দিয়েছিলেন স্পষ্ট ভাষায়, নির্ভীক ভাবে। প্রাচীন পারসীক ধর্মেও একই ধরণের ঘটনা-প্রবাহ লক্ষ্য করা যায়। ইস্রায়েলের ইহুদী ধর্মের প্রবর্তন ও প্রচারের অনেক বছর আগে পারস্য দেশে 'জরথুষ্ট্র' (Zarathustra) যে ধর্ম প্রচার করেন তা অতি উন্নত ধরণের। কিন্তু তাঁর "জেন্দ-আবেস্তা" (Zend-Avesta) গ্রন্থকে ভিত্তি করে যে ধর্ম গড়ে ওঠে তার মধ্যে দেখা দেয় আচারনিষ্ঠতা ও অনুষ্ঠানসর্বস্বতা। প্রাচীনতার দিক থেকে পারসীক ধর্ম ভারতীয় আর্য-ধর্মের সমসাময়িক। জেন্দ-আবেস্তার রচনাকাল ও ঋগ্বেদের রচনাকাল প্রায় একই বলে অনুমান করা হয়। কিন্তু সারা পৃথিবীর মধ্যে এই পারসীক ধর্মের অস্তিত্ব আছে বর্তমান ভারতবর্ষের পশ্চিম অংশে বোম্বাই অঞ্চলে। এই পারসীকরা সংখ্যায় অন্যান্য সম্প্রদায়ের বা ধর্মমতের লোকেদের তুলনায় অতি অল্প।

বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসেও প্রায় একই ধরণের ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব যে সমস্ত আদর্শ প্রচার করেন, সেগুলি তৎকালীন জনসাধারণের অজ্ঞাত ছিল না। তিনি যে-যুগে জন্মেছিলেন সে-যুগে ভারতবর্ষে নানা সম্প্রদায় ও মতবাদের লোক ছিল। উপনিষদুক্ত ইন্দ্রিয়-ভোগের অনিত্যতা ও ত্যাগের আদর্শ যেমন সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তেমনই বেদের কর্মকাণ্ডের বিরোধিতাও সাধারণের মধ্যে দানা বেঁধে উঠেছিল। বুদ্ধদেব ছাড়াও পুরোহিতদের প্রাধান্য ও বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের পশুহত্যা ও নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে জনমত নানা সম্প্রদায়ের আদর্শ ও ক্রিয়াকলাপের মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছিল। বুদ্ধদেব এই যুগচেতনাকেই রূপ দিলেন স্পষ্ট ও সহজ ভাষায়। সুতরাং তাঁর মত ও আদর্শের মধ্যে তৎকালীন চেতনারই প্রতিফলন দেখা যায়। অবশ্য এ-কথা অনস্বীকার্য যে, তিনি

সেই যুগের বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন ধারণাগুলিকে একটি নির্দিষ্ট রূপ দিলেন। ফলে, গড়ে উঠল একটি বিশিষ্ট দার্শনিক মতবাদ। কিন্তু বুদ্ধের উপদেশ ও বাণীকে ভিত্তি করে যে ধর্ম গড়ে উঠল, তার মধ্যেও আবার পরবর্তী যুগে দেখা দিল আচারনিষ্ঠতা।

সমসাময়িক সমাজের ও যুগের প্রভাব বুদ্ধ ও যীশুর উপর যেভাবে পড়েছিল, মহম্মদের উপর ঠিক সেভাবে পড়েনি। মহম্মদের যুগে তাঁর জন্মভূমি আরব দেশে যেসব ধর্মমত প্রচলিত ছিল তিনি প্রধানত তাদের বিরোধিতাই করেন। সুতরাং এমন মনে হতে পারে যে, মহম্মদের উপর তাঁর যুগ ও পরিবেশের প্রভাব ছিল প্রধানত বিরোধাত্মক। কিন্তু সে-যুগের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, স্থানীয় ধর্মের কোন সহায়ক ও প্রত্যক্ষ প্রভাব না থাকলেও, অর্থাৎ তাঁর নিজস্ব আদর্শ ও চিন্তাধারায় স্থানীয় আরব ধর্মগুলির প্রত্যক্ষ প্রভাব না থাকলেও হীব্রু ও খ্রীষ্ট ধর্মের আদর্শের প্রচার তখন যথেষ্ট ছিল, আর এই দু'টি ধর্মের আদর্শের দ্বারা মহম্মদ প্রভাবিতও হয়েছিলেন। এই কারণেই এই ধর্মগুলির উচ্চ মানবিক আদর্শের অস্তিত্ব ইসলাম ধর্মেও লক্ষ্য করা যায়, সুতরাং বলা যায় যে, সমস্ত দৈবপুরুষই তাঁর যুগ ও পরিবেশের দ্বারা দু'ভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। তাঁদের যুগের আদর্শ কখন তাঁদের ধর্মমতের ও অনুভূতির সহায়ক হয়েছে, কখন বা হয়েছে বিরোধী। অবশ্য দৈবপুরুষদের ব্যক্তিগত অনুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টি যুগের আদর্শ ও চিন্তাধারাকে নতুন রূপ দিয়েছে। তাই বিশেষ যুগের বিশেষ প্রয়োজনে সৃষ্টি হয়েছে নতন নতুন ধর্মের। কিন্তু যুগের আদর্শ, চিন্তা ও প্রয়োজনের দ্বারা প্রভাবিত ও চিহ্নিত হলেও উন্নত ও বিশ্বজনীন ধর্মগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল, এদের মধ্যে কতকগুলি সার্বজনীন মানবিক ও উচ্চ নৈতিক আদর্শই প্রাধান্য পেয়েছে। ফলে, এগুলি আকৃষ্ট করেছে সর্বসাধারণকে এবং হয়েছে বিশ্বজনীন।

উপসংহারে বলা যায় যে, বিশ্বজনীন ধর্মগুলির উচ্চ নৈতিক আদর্শই তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য, সন্দেহ নেই। কিন্তু ধর্মের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, অন্য সব ক্ষেত্রের মত ধর্মের ক্ষেত্রেও ক্রম-বিবর্তনের অর্থ অবিচ্ছিন্ন ক্রমোন্নতি নয়। উচ্চ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত ধর্মগুলির মধ্যেও বারে বারে এসেছে আচারনিষ্ঠতা ও অনুষ্ঠানসর্বস্বতা। বাহ্য অনুষ্ঠানের কাছে উচ্চ মানবিক আদর্শ হয়ে পড়েছে গৌণ। আর এই আদর্শভ্রষ্টতা থেকে ধর্মকে উদ্ধার করতে প্রয়োজন হয়েছে আধ্যাত্মিক শক্তিতে অনুপ্রাণিত ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নির্ভীক পুরুষদের। প্রত্যেক বিশ্বজনীন ধর্মের ইতিহাসেই এই আদর্শচ্যুতি ও পুনরুজ্জীবনের ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়।

ধর্মের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে আর একটি ব্যাপারও লক্ষণীয়। ধর্ম-চেতনার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের রূপও পরিবর্তিত হয়েছে, সন্দেহ নেই; কিন্তু প্রাচীন ধর্মের সব কিছুই নতুন ধর্মের মধ্যে হারিয়ে যায় নি। তাই জাতীয় ধর্মের মধ্যে, এমন কি উন্নত বিশ্বজনীন ধর্মের মধ্যেও, আদিম গোষ্ঠীধর্মের আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কারের অবশিষ্টাংশ দেখতে পাওয়া যায়। তাই আধুনিক উন্নত ও বিশ্বজনীন ধর্মের মধ্যেও আদিম ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠানের বা 'টোটেম'-পদ্ধতির অস্তিত্ব আজও লক্ষ্য করা যায়।

নির্বাচিত পুস্তক তালিকা

1. George Galloway—Philosophy of Religion.
2. D. Miall Edwards—The Philosophy of Religion.
3. M. Hiriyanna—Outlines of Indian Philosophy.
4. Robertson Smith—Religion of the Semites.
5. Articles in the Encyclopoedia of Religion and Ethics

চতুর্থ অধ্যায়

ধর্মের মানসিক উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

ধর্মের প্রাথমিক রূপটি ঠিক কি ছিল, সে সম্বন্ধে আমরা বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক মতবাদ নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, স্বল্প তথ্যের ভিত্তিতে ধর্মের ঐতিহাসিক উৎপত্তি আবিষ্কার করা অসম্ভব। তাই ধর্মের যথার্থ উৎসের সন্ধান করতে হবে মানুষের মনে। মানুষের অন্তর্লোকের ঠিক কোন্ বস্তুটি তাকে ধর্ম-প্রবণ করেছে? তার মানসিকতার মধ্যে এমন কি আছে যার জন্য সেই কোন্ আদিম যুগে মানুষ ধর্মের মধ্যে তার আশ্রয় খুঁজেছিল, এবং যা' যুগ যুগ ধরে ধর্মের প্রতি মানুষের প্রবণতাকে অব্যাহত রেখেছে? কোন্ মনোবৃত্তির জন্যই বা মানুষের ধর্ম-জীবন স্থূল আদিম অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে উন্নত ও সংস্কৃত হয়েছে? একটি জিনিষ এখানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন; ধর্মের মানসিক উৎপত্তি ও বিকাশের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা টানা যায় না। ধর্মের একেবারে মূল ও প্রাথমিক অবস্থা ও উন্নত সুসংস্কৃত ধর্ম-চেতনার মধ্যে এক অদ্ভুত ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। ধর্মের ক্রমবিবর্তনের মধ্যে সমগ্র মানব-জাতির ধর্ম-চেতনার এক অদ্ভুত ঐক্য চোখে পড়ে। ধর্মীয় অভিজ্ঞতার বিচিত্র প্রকাশের মধ্যেও এক অপূর্ব ঐক্য আছে। অন্যান্য সামাজিক সংস্থার ক্ষেত্রে যেমন ঘটেছে, ধর্মের ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনই উন্নতি ও সংস্কৃতি ঘটেছে; কিন্তু এই সংস্কৃতি, এই বিবর্তন ঘটেছে এক নির্দিষ্ট ধারাবাহিকতা, এক ঐক্যের মধ্য দিয়ে। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, মনুষ্যপ্রকৃতির কোন্ বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে ধর্ম-চেতনা ও ধর্মবোধ জাগিয়ে তুলেছে? তার অন্তর্লোকের কোন্ জায়গা-টিকে ধর্মের উৎস বলা যায়? এই প্রশ্নের কয়েকটি উত্তর পাওয়া যায়। কিন্তু এই মতগুলি বহুল প্রচারিত ও জনপ্রিয় হলেও, বৈজ্ঞানিক বিচারে এগুলি গ্রহণের অযোগ্য। তবুও দার্শনিক আলোচনায় এদের উল্লেখ ও নির্দিষ্ট স্থান থাকা প্রয়োজন।

(a) মানুষের ধর্ম-চেতনাকে, তার ধর্ম-প্রবণতাকে অনেকে **ধর্মীয় সহজ-প্রবৃত্তি (religious instinct)** দিয়ে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন। এঁদের মতে, আত্মরক্ষণ বা জাতি-সংরক্ষণ প্রবৃত্তির মত মানুষের একটি ধর্মীয় প্রবৃত্তি আছে। এটি একটি মৌল সহজাত প্রবৃত্তি। তাই মানব-

সংস্কৃতির সকল স্তরেই ধর্মের ও ধর্মীয় আচরণের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। এই সহজ-প্রবৃত্তিই মানুষকে ধর্মপ্রবণ করে তোলে। ধর্মচেতনার উৎস সম্বন্ধে এই সহজ-প্রবৃত্তি-মতবাদ জার্মান্ দার্শনিক শ্লায়ারমেকার (Schleiermacher)-এর "ধর্মের সম্বন্ধে পর্যালোচনা" (Reden über die Religion)[1] গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই সাধারণের মধ্যে বিশেষ প্রচারিত ও জনপ্রিয়; কারণ, ধর্মের মানসিক ব্যাখ্যা হিসাবে এটি অতি সহজগ্রাহ্য। কিন্তু বিজ্ঞান ও দর্শনের ক্ষেত্রে যা'ই সরল ও সহজগ্রাহ্য তা'ই সব সময়ে গ্রহণীয় নয়। ধর্মীয় সহজ-প্রবৃত্তি-মতবাদ সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলা যায়। এই মতবাদের প্রধানত দু'টি দোষ।

প্রথমত, এই মতবাদ একটি জটিল ব্যাপারের অতি-সরল ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। মনোবিদ্যায় সহজ-প্রবৃত্তি (instinct) বলতে বিশেষ উদ্দেশ্য-নিয়ন্ত্রিত নির্দিষ্ট ব্যবহার-প্রবণতাকে বোঝানো হয়। এই ব্যবহার-প্রবণতা সরল, সহজাত, অশিক্ষিত (যা শেখা হয় নি) ও অনভ্যস্ত। এই সহজ-প্রবৃত্তির বলেই জীব কোন বিশেষ পরিবেশে নির্দিষ্টভাবে প্রতিক্রিয়া করে। আর সহজাত ও অশিক্ষিত হওয়ার জন্য ব্যক্তি নির্বিশেষে সকলের ক্ষেত্রেই এটি এক ও বৈচিত্র্যহীন। অন্য সব জীবের মত মানুষেরও নিশ্চয়ই কিছু সহজ-প্রবৃত্তি আছে; আর এইগুলিই হ'ল মানব-প্রকৃতির মৌল উপাদান। কিন্তু মানুষের ধর্মীয় আচরণ সরলও নয়, সহজাতও নয়। তার মধ্যে শিক্ষা ও অভ্যাসের যথাযোগ্য স্থান আছে। প্রকৃতপক্ষে, ধর্ম একটি অতি জটিল ব্যবহার-ধারা, যা'র মধ্যে আছে নানা চিন্তা, নানা অনুভূতি আর প্রক্ষোভ (emotion)। তাছাড়া, ধর্মের অভিব্যক্তি ও প্রকাশও বিচিত্র। ধর্মীয় চিন্তা, ধর্মীয় অনুভূতি ও আচার-অনুষ্ঠান সর্বত্র ও সর্বকালে এক নয়। বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিয়ত যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলেছে তার ফলে যুগে যুগে দেশে দেশে মানুষের ধর্ম-চেতনা অনেক বিবর্তিত হয়েছে, অনেক রূপ নিয়েছে। সুতরাং সরল, সহজাত ও বৈচিত্র্যহীন সহজ-প্রবৃত্তির প্রকাশ বলে' ধর্মের যে ব্যাখ্যা করা হয় তা' অতিসরলীকরণ দোষে দুষ্ট। ধর্মের মত একটি জটিল ব্যাপারকে 'সহজ-প্রবৃত্তি' বলে ব্যাখ্যা করার সময় 'সহজ-প্রবৃত্তি' শব্দটি অত্যন্ত সাধারণ ও লৌকিক অর্থে ব্যবহার করা হয়, বৈজ্ঞানিক পরিভাষার অর্থে নয়।

দ্বিতীয়ত, ধর্মীয় সহজ-প্রবৃত্তি-মতবাদ ধর্মের ব্যাখ্যায় 'পুনরুক্তি-দোষে' দুষ্ট হয়েছে। কোন এক বিশেষ ব্যবহারধারাকে ঐ জাতীয় ব্যবহারপ্রবণতা

---

1 Schleiermacher, Reden über die Religion (1799).

দিয়ে ব্যাখ্যা করলে একই বস্তুর পুনরাবৃত্তি করা হয় মাত্র। 'মানুষ বিশেষ এক পরিস্থিতিতে বিশেষভাবে ব্যবহার করে, কারণ তার ঐ বিশেষভাবে ব্যবহার করার প্রবণতা আছে,'—এ-কথা বলার অর্থ, 'মানুষ বিশেষভাবে ব্যবহার করে কারণ সে বিশেষভাবে ব্যবহার করে।' এই ধরণের ব্যাখ্যা আসলে কোন ব্যাখ্যাই নয়। ধর্মীয় সহজ-প্রবৃত্তি বা ধর্মীয় প্রবণতা দিয়ে মানুষের ধর্মীয় ব্যবহারকে ব্যাখ্যার মধ্যে এই পুনরুক্তি-দোষ ঘটেছে। অন্য সব প্রাণীর মত মানুষেরও সহজ-প্রবৃত্তি আছে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু মানুষের এক এক ধরণের ব্যবহারধারাকে ব্যাখ্যা করার জন্য এক এক ধরণের সহজ-প্রবৃত্তি কল্পনা করা নিষ্প্রয়োজন।

সুতরাং, একথা স্বীকার করতে বাধা নেই যে, ধর্মবোধ মানুষের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। সহজাত না হলেও ধর্মের বীজ মানব-মনের গভীরে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে উপ্ত। কিন্তু শুধু সেই কারণেই মানুষের ধর্ম-চেতনাকে ঠিক কোন সরল-মৌলবৃত্তির মধ্যে ফেলা যায় না। ধর্মকে বলা যায়, একাধিক মৌল প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের সমন্বয়ে সৃষ্ট নির্দিষ্ট আদর্শ-অভিমুখী নানা ব্যবহারের এক সংহতি। ধর্মের মধ্য দিয়ে মানব-প্রকৃতির এক আদি ও মৌল আকাঙ্ক্ষা অভিব্যক্ত হয়েছে; কিন্তু তাই বলে ধর্মকে সহজ-প্রবৃত্তি বলে ব্যাখ্যা করার অর্থ এক জটিল মানসিকতাকে অতিসরল রূপ দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করা।

(b) অনেকের মতে মানুষের মনে এক বিশেষ **'ধর্মীয় শক্তি'** বা বৃত্তি (religious faculty) বর্তমান থাকার জন্যই সে ধর্ম-প্রবণ। এঁরা মানব-মনের বিভিন্ন বিভাগের অস্তিত্ব কল্পনা করেন; এঁদের মতে মনের এক একটি বিভাগ এক এক ধরণের কাজ করে ও এক এক ধরণের প্রবণতাকে রূপ দেয়। ধর্মীয় সহজ-প্রবৃত্তি-মতবাদের মত ধর্মীয় শক্তি-মতবাদও জটিল ব্যাপারকে অতিসরলীকরণের চেষ্টা করেছে। তাছাড়া মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে 'বৃত্তিবাদ' (faculty psychology) আজ একটি পরিত্যক্ত মতবাদ। বৃত্তিবাদীরা মানুষের মনের সম্বন্ধে যে বিভাগীয় (departmental) দৃষ্টি গ্রহণ করেন তা মনের একতা ও সংহতিকেই অস্বীকার করে। মানুষের মনে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ নেই। মানুষের অন্যান্য চেতনা যে মানসিক উপাদানে গঠিত, তার ধর্ম-চেতনাও সেই উপাদানেই গঠিত। মানুষের সামাজিক বা অন্য চেতনার মধ্যে যেমন চিন্তা, প্রক্ষোভ ও ইচ্ছা আছে, তার ধর্ম-চেতনায়ও তেমনই চিন্তা, প্রক্ষোভ ও ইচ্ছার অস্তিত্ব দেখা যায়। সাধারণ মনোবিদ্যা যে-সব মানসিক বৃত্তিগুলি নিয়ে আলোচনা করে, ধর্মীয় মনোবিদ্যাও সেই

একই মানসিক বৃত্তিগুলি নিয়ে আলোচনা করে। মানব-মনের এমন কোন একটি নির্দিষ্ট বিভাগ নেই যাকে 'ধর্মীয়' বলে চিহ্নিত করা যায়, এবং বলা যায় যে, কেবলমাত্র এই বিভাগটিই মানুষের ধর্মজীবনে সক্রিয় হ'য়ে ওঠে এবং একমাত্র ধর্মজীবনেই এটি সক্রিয় হয়।

(c) আবার অনেকে ধর্মের মানসিক উৎপত্তির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মানব-মনের কোন একটি বিশেষ প্রক্ষোভ, প্রধানত, ভীতির উল্লেখ করেছেন। এঁদের মতে রহস্যময় প্রকৃতির সম্বন্ধে মানুষের ভীতিই ধর্মের উৎস। প্রাচীন গ্রীসদেশে এপিকিউরীয় (Epicurean) দার্শনিকরা ও আধুনিক ইউরোপে হিউম (Hume) ভয়কেই ধর্মের উৎস বলে মত প্রকাশ করেছেন। অবশ্য হিউম-এর মতে দেবতাদের সদিচ্ছার 'আশা'-ও মানুষের ধর্ম-চেতনার মধ্যে কাজ করে ও ভয়কে কিছুটা স্তিমিত করে। সমসাময়িক মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যেও কেউ কেউ এই মত পোষণ করেন। আদিম মানুষের মনে আছে প্রকৃতির রহস্যময় শক্তি সম্বন্ধে ভীতি। তাই সে তার চারদিকের ভয়ঙ্কর ও দুর্দম শক্তিগুলিকে নানা ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে স্বপক্ষে আনবার চেষ্টা করে। বর্বর মানুষ সৎ ও সহানুভূতিশীল শক্তিগুলির সম্বন্ধে সচেতন হলেও, তাদের করুণা পাবার চেয়েও অনেক বেশি সচেষ্ট হয় দুষ্ট শক্তিগুলিকে দূর করবার জন্য। সে বিশ্বাস করে যে, দুষ্ট শক্তি না থাকলেই মহৎ শক্তিগুলি তাদের কাজ সহজে করতে পারবে। সুতরাং ভয়ই হ'ল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রধান উৎস।

মানুষের ধর্ম-জীবনে ভয়ের সক্রিয় ভূমিকা থাকলেও, কেবল ভয়ই ধর্মের একমাত্র কারণ নয়। আমরা আগেই দেখেছি যে, কেবল ভয় নয়, প্রকৃতির রহস্যময় শক্তির সম্বন্ধে ভক্তিমিশ্রিত ভীতিই (awe) ধর্ম-জীবনের একটি মৌল প্রক্ষোভ (emotion)। সুতরাং ধর্মীয় আচরণের মূলে ভয়ের সঙ্গে থাকে বিস্ময়, গুণমুগ্ধতা, শ্রদ্ধা ও অনেক ক্ষেত্রে ভালবাসাও। তাছাড়া, উন্নত ধর্ম-চেতনাকে ভয় দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। সেখানে বরং বিস্ময়, গুণমুগ্ধতা, কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধারই প্রাধান্য। কিন্তু আদিম বর্বর মানুষের মনেও আছে আশা, আছে আকাঙ্ক্ষা, আছে আদর্শ, যা' সে অর্জন করার চেষ্টা করে তার অধ্যাত্মজীবনে। ম্যাক্‌ডুগাল (McDougall) সহজ-প্রবৃত্তি (instinct) ও প্রক্ষোভের (emotion) যে শ্রেণী বিভাগ করেছেন, তা'তে তিনি দেখিয়েছেন যে, ভয়-জাতীয় প্রক্ষোভের সঙ্গে থাকে পলায়ন-জাতীয় কোন প্রবৃত্তি। কিন্তু ধর্ম-চেতনা মানুষকে ধর্মীয় বস্তু থেকে দূরে সরিয়ে দেয় না, বরং তার কছে নিয়ে আসে। আসলে মানুষের ধর্ম-চেতনায় দুটি বিপরীত প্রক্ষোভের অদ্ভূত সমন্বয় দেখা যায়। একদিকে মানুষ যেমন

তার দেবতাকে ভয় করে বলে' তাঁর সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখে, অপরদিকে তেমনই সে তার দেবতার দিকে আকৃষ্ট হয় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায়, কৃতজ্ঞতায়, ভালবাসায়। আদিম বর্বরের ধর্ম-চেতনায় যদি বা ভয়েরই প্রাধান্য থাকে, তাহলে তার কারণ, মানুষের নানা প্রক্ষোভের মধ্যে ভীতিই প্রথম সংহত হয়েছে মানুষের মনে। কেননা, আদিম মানুষের জীবন-যুদ্ধে তাকে প্রতি-পদে বহু সত্য ও কাল্পনিক বিপদের সম্মুখীন হ'তে হয়েছে বারে বারে; শত্রুরূপী বাহ্য প্রকৃতির মধ্যে ভয়ের অভিব্যক্তি প্রাধান্য পেলেও, মৌলিকতার দিক দিয়ে ভালবাসা কৃতজ্ঞতাবোধ ইত্যাদি প্রক্ষোভ ভয়ের তুলনায় কিছু কম নয়। ধর্মের উৎপত্তি যে দেবতাদের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তাবোধের মধ্যে, তাঁদের সম্বন্ধে শত্রুতাবোধ বা ভীতির মধ্যে নয়--একথা রবার্টসন্ স্মিথ্-ও স্বীকার করেছেন।[1] অবশ্য তিনি 'টোটেম'-প্রথাকেই প্রাথমিক ও আদি ধর্ম বলে কল্পনা করেছেন; এবং দেখিয়েছেন আদিম বর্বর মানুষ 'টোটেম'-দেবতার সঙ্গে তার 'আত্মীয়তা'য় বিশ্বাস করত। রবার্টসন্ স্মিথের সব কথা স্বীকার করা না গেলেও, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ভয়ই ধর্মের একমাত্র উৎস নয়।

উপরের আলোচনা থেকে এই কথাই স্পষ্ট হয় যে, মানুষের মনে এমন কোন মৌল বৃত্তি নেই, যাকে ধর্মীয় বলে চিহ্নিত করা যায়। ধর্ম মানুষের কোন সহজ-প্রবৃত্তিও নয়, বা কোন এক বিশেষ ধরণের প্রক্ষোভ বা আবেগও নয়। অর্থাৎ, মানুষের মনের বৃত্তিগুলিকে বিশ্লেষণ করলে ধর্মের যথার্থ উৎস খুঁজে পাওয়া যায় না। ধর্মীয় ও অ-ধর্মীয় মানসিকতার মধ্যে কোন মৌল-বৃত্তিগত ভেদ নেই, ভেদ আছে তাদের সংগঠনের মধ্যে, আছে প্রেরণার মধ্যে। সর্বজনশ্রদ্ধেয় সাধুর মনে যে-সব মৌল বৃত্তি আছে, একজন ইন্দ্রিয়লিপ্সু ঘৃণ্য প্রকৃতির মানুষের মধ্যেও তা আছে। এদের মধ্যে পার্থক্য এদের মানসিক উপাদানে নয়, এদের প্রেরণায়, এদের আদর্শে --যে আদর্শ এদের মানসিকতাকে সংগঠিত করে, রূপ দেয়।

মানুষের মনকে দু'টি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে--একটি হ'ল বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গী, আর অপরটি হ'ল আদর্শের বা প্রেরণার দৃষ্টিভঙ্গী। মানুষের মনকে বিশ্লেষণ করে' অনেক তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়, সন্দেহ নেই; কিন্তু কেবল বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে মনকে বোঝার চেষ্টা করার অর্থ মনকে স্থির অপরিণামী বলে কল্পনা করা। কিন্তু মন অপরিণামী নয়, নিয়তই তার বিবর্তন ঘটে চলেছে। আর সামগ্রিকভাবে এই পরিণামের, এই

1 W. R. Smith, The Religion of the Semites, পৃষ্ঠা, 55.

বিবর্তনেব তাৎপর্য বুঝতে গেলে, তা' বুঝতে হবে আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে। ধর্ম যখন মানুষের সমগ্র জীবনকে অনুপ্রাণিত কবে, প্রভাবিত করে, তখন মানব-মনে ধর্মের প্রকৃত উৎস খুঁজতে হবে ধর্মীয় আদর্শের ও প্রেরণার মধ্যে। কিসের প্রেরণায় মানুষ ধর্মীয় আচরণ করে? কিসের আকাঙ্ক্ষায় মানুষ ধর্ম-প্রবণ হয়? মানুষের ধর্ম-জীবন, ধর্মীয় ব্যবহার এক বিশেষভাবে নিয়-ন্ত্রিত ও সংহত ব্যবহার। কিন্তু কি সেই আদর্শ, বা কি সেই মূল্যবোধ, যা মানুষের নানা চিন্তা, আবেগ, অনুভূতি ও ইচ্ছাকে ধর্মের মধ্যে সার্থকতা দেয়? ধর্মের এই উদ্দেশ্যবাদী (teleological) ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে একটি জিনিষ আমাদের স্মরণ রাখা দরকার--উদ্দেশ্য (end) ও উপায় (means), আদর্শ ও পথকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা যায় না। উদ্দেশ্যের আলোচনায় তাই স্বাবাবিকভাবেই উপায়েব কথাও এসে পড়ে। আর শুধু প্রসঙ্গত এসে পড়াই নয়, মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের পথে এক কালে যা ছিল নির্দিষ্ট কোন আদর্শ অনুসরণের উপায়, তাই পরে স্থান নেয় আদর্শের, আবার প্রাথমিক দশায় যা ছিল প্রধান, যা ছিল আদর্শ তাই হয়ে যায় গৌণ, অপ্রধান, মহত্তর কোন আদর্শ লাভের পথে একটি পরোক্ষ ও উপজাত (by-product) অর্থমাত্র।

ধর্মের ঐতিহাসিক উৎপত্তির আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, আদিম মানুষের কাছে ধর্ম ছিল প্রধানত গভীর অনুভূতির ব্যাপার। অতীন্দ্রিয় রহস্যময় ও অতিপ্রাকৃতের সম্বন্ধে আদিম বর্বর মানুষের ধারণা স্পষ্ট ছিল না, কিন্তু অনুভূতি ও আবেগ ছিল গভীর। কিন্তু কেন মানুষ সেই অতি-প্রাকৃতের ব্যাপারে ধর্মীয় আচরণে প্রবৃত্ত হ'ল? কেনই বা সে এই সব রহস্যময় শক্তির সঙ্গে তার বন্ধুত্ব, বা আত্মীয়তা গড়ে তুলতে চাইল? মানুষ নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেছিল রহস্যময় 'মানা'র মধ্যে এমন শক্তির উৎস আছে, যা' জীবনযুদ্ধে তার সহায়ক হবে। সুতরাং অন্য যে-কোন প্রাণীর মতই মানুষের মৌল আবেগ হ'ল 'জীবন-প্রয়াস' (will-to-live)। এই জীবন-প্রয়াস মানুষকে শুধু ধ্বংসের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করারই প্রবৃত্তি দেয় না, জীবনের নানা সুখ ও আনন্দ উপভোগেরও প্রেরণা দেয়। তাই প্রাকৃত বা অতিপ্রাকৃত যে-কোন শক্তিই তাকে অতিরিক্ত শক্তি দিতে পারে বলে সে বিশ্বাস করেছে, তাকেই পূজা করেছে বা তুষ্ট করে স্বপক্ষে আনবার চেষ্টা করেছে। সুতরাং বলা যায় যে, ধর্মের মূল উৎস মানুষের জৈব প্রয়োজনের মধ্যে। এই জৈব প্রবৃত্তিই ধর্মের ক্রম-বিকাশের সর্ব স্তরে প্রেরণা রূপে কাজ করে। সমস্ত বাধা, বিপত্তি ও প্রতিকূলতার মধ্যে এই জীবন-প্রয়াসই ব্যক্তি ও জাতির ক্ষেত্রে জীবনের

ধারাকে অব্যাহত রাখে; এর প্রেরণায়ই জীব তার জীবন-যুদ্ধে এগিয়ে চলে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এই জীবন-প্রযাস শুধু জীবনকে বিস্তৃত, দীর্ঘায়িত করারই প্রয়াস নয়, জীবনকে উন্নত করার, পূর্ণতর করারও প্রয়াস।

যে জীবন-প্রয়াসের কথা উল্লেখ করা হ'ল তা' মূলত জৈবিক। এই প্রয়াসকে বিশেষভাবে ধর্মীয় প্রয়াস বা প্রেরণা বলা যায় না। কেননা, এই জীবন-প্রয়াস মানুষ ও ইতর-প্রাণী উভয়ের মধ্যেই বর্তমান। কিন্তু ইতর-প্রাণীর ত' ধর্ম নেই। তাহলে কি স্বীকার করতে হবে যে, অন্যান্য জৈব প্রয়োজনের মত ধর্মও মানুষের পক্ষে একটি জৈব প্রয়োজন ছাড়া আর কিছুই নয়?

এর উত্তরে প্রথমত বলা যায় যে, মনোবিদ্যা, বিশেষত উদ্দেশ্য-বাদী (teleological) মনোবিদ্যার সঙ্গে জীব-বিদ্যার কোন বিরোধ নেই। মনোজগতের অন্যান্য অনেক কিছুর মত ধর্মেরও মূল উৎস জৈব আবেগের মধ্যে। অবশ্য এর দ্বারা প্রমাণ হয় না যে, ধর্ম-জীবনের সম্পূর্ণ জৈব ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। কেননা, মূলে যা থাকে, ফলে তার চেয়ে বেশি কিছু থাকে। তাই ধর্মের স্বরূপ জানতে গেলে একমাত্র মূলের মধ্যে তার অনুসন্ধান করলে চলবে না, করতে হবে তার কৃতির মধ্যে, তার পরিপূর্ণ প্রকাশের মধ্যে। সেইখানেই হয় ধর্মের যথার্থ মূল্যায়ন। তবু ধর্মকে যদি মানুষের মূল জৈব আবেগের সঙ্গে যুক্ত করে দেখানো যায়, তাহলে প্রমাণ হয় যে, ধর্ম মানুষের পক্ষে অস্বাভাবিক, কৃত্রিম ব্যাপার নয়, মানুষের মৌল জৈব প্রকৃতির মধ্যেই তার বীজ আছে।

দ্বিতীয়ত, ধর্মের মধ্যে মানুষের চির-অতৃপ্ত জীবন-তৃষ্ণা এমন ধরণের তৃপ্তি পায়, যা আর অন্য কোন অভিজ্ঞতার মধ্যে পায় না। ধর্ম মানুষকে তার জৈব অস্তিত্বের যুদ্ধের স্তর থেকে উন্নত করে' তাকে মহত্তর জীবনের আস্বাদ দেয়; সত্য, শিব ও সুন্দরের আদর্শের মধ্যে জীবনের পূর্ণতর উপলব্ধিতে সাহায্য করে। অবশ্য একথা বললে ভুল হবে যে, একমাত্র ধর্মের মধ্যেই এইসব মানবিক আদর্শের সাধনা সম্ভব। ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক না রেখেও মানুষ সত্য, শিব ও সুন্দরের সাধনা করতে পারে। কিন্তু ধর্ম-জীবনে এই তিন পরম আদর্শের এক অপূর্ব মিলন ঘটে। ধর্ম-জীবনেই এই তিন আদর্শের মধ্য দিয়ে মানুষের আত্মোপলব্ধি ঘটে। আদিম ধর্মের মধ্যে অবশ্য এই সব উন্নত ও পরম আদর্শের কথা বা আত্মোপলব্ধির কথা অপ্রকট ও প্রচ্ছন্ন থাকে। আদিম বর্বর মানুষ দেবতার সাহায্য বা দেবতার বন্ধুত্ব কামনা করে তার শিকারে সফল হওয়ার জন্য, তার শত্রু-নাশ করার আশায়। কিন্তু মানুষের চেতনা ও অনুভূতি যত পরিণত হয়,

ততই ধর্ম আর মানুষের কাছে কেবল জীবন ধারণের বা জীবনের পরিধি দীর্ঘায়িত করার উপায়মাত্র হয়ে থাকে না, ধর্ম হয়ে ওঠে উন্নত আধ্যাত্মিক জীবনের সাধক।

তৃতীয়ত, জীবনযুদ্ধের সহায়ক অন্য যে-কোন উপায়ের সঙ্গে ধর্মের পার্থক্য হ'ল, ধর্ম-জীবনে মানুষ যাদের সাহায্য কামনা করে বা যাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়, সেগুলি নৈর্ব্যক্তিক জড়-শক্তি নয়, সচেতন মানসিক শক্তি। এই সব শক্তি মানবীয় না হলেও, মানুষের সম্পর্কে সহানুভূতিশীল বলেই মানুষ তাদের বিশ্বাস করে। আদিম অবস্থায় মানুষের ধর্মচেতনায় ব্যক্তিক ও নৈর্ব্যক্তিকের মধ্যে ভেদ স্পষ্ট ছিল না; তাই আদিম মানুষ ধর্ম ও ইন্দ্রজালের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য করত না। কিন্তু উন্নত ধরণের ধর্মে এই জাতীয় আত্মিক সত্তার অস্তিত্ব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। এ সম্বন্ধে লিউবা (Leuba) বলেন, "The will-to-live comes to expression as religion when an appeal is made to a class of powers which may be roughly characterised as psychic, superhuman, and usually, but not necessarily, personal." (জীবন-প্রয়াস তখনই ধর্মের রূপ নেয়, যখন এমন এক জাতীয় শক্তির কাছে আবেদন করা হয়, যাদের সাধারণভাবে মানসিক, অতিমানবীয়, ও আবশ্যিকভাবে না হলেও, সচরাচর ব্যক্তিক শক্তি বলে বর্ণনা করা যায়)।[1] লিউবা আরও বলেছেন, "It is not the needs which are distinctive of religion, but the method whereby they are gratified."—(ধর্মের বৈশিষ্ট্য প্রয়োজনের মধ্যে নয়, যে উপায়ে প্রয়োজনগুলি সাধন করা হয় তার মধ্যে)।[2] অবশ্য এখানে আপত্তি উঠতে পারে যে, ধর্মকে এখানে উদ্দেশ্য সাধনের উপায় বলে দেখা হয়েছে। মানুষের জীবনে ধর্মের কোন স্বকীয় মূল্য স্বীকার করা হয় নি। কিন্তু বিবর্তনের পথে এক কালে যা ছিল বিশেষ উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন সাধনের উপায়, তা'ই ধীরে ধীরে আদর্শের রূপ নেয়। তাই 'সত্য' ও 'সুন্দর' তাদের প্রয়োজনের বন্ধন কাটিয়ে আজ মানুষের চেতনায় স্বকীয় দীপ্তিতে ভাস্বর। মানুষ সত্যের অনুসন্ধান করে সত্যের জন্যই, 'সুন্দরের আরাধনা' করে তার আপন মহিমায় মুগ্ধ হয়ে'। মানুষের ধর্ম-চেতনার বিবর্তনেও ঠিক একই ঘটনা ঘটেছে। যে দেবতাদের বা যে ঈশ্বরকে মানুষ একদিন পূজা করেছে

1 J. H. Leuba, A Psychological Study of Religion (1912), পৃষ্ঠা 7.
2 ঐ, পৃষ্ঠা 8.

জীবনযুদ্ধে সাহায্য লাভের কামনায়, ধর্মের উন্নত অবস্থায় সেই দেবতাদের বা ঈশ্বরকে সে আরাধনা করেছে পরম পদার্থরূপে, জীবনের শেষ আশ্রয়-রূপে। উচ্চতর ধর্মে ঈশ্বর মানুষের কাছে আর স্বার্থসিদ্ধির উপায়মাত্র নয়, পরম শান্তি ও মুক্তিস্বরূপ। আর ঈশ্বরকে এই পরমাদর্শরূপে কল্পনা করেই ধর্ম-জীবনে ও অধ্যাত্মজীবনে মানুষ পূর্ণতা লাভ করে।

উপরের আলোচনা থেকে এই কথাই স্পষ্ট হয় যে, ধর্মের মত এক জটিল ব্যাপারের সহজ ও সরল ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। মানুষের কোন একটি বিশেষ মনোবৃত্তিকে ধর্মের উৎস বলে চিহ্নিত করা যায় না। উদ্দেশ্যবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মকে দেখলে বলতে হয়, এর মূলে রয়েছে মানুষের জীবন-প্রয়াস। কিন্তু এখানে আরও একটি ব্যাপার স্পষ্ট হওয়া দরকার। আমরা আমাদের আলোচনায় মানুষকে এতক্ষণ দেখেছি ব্যক্তি হিসেবে, অন্য সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্নরূপে। কিন্তু মানুষ একা নয়; সমাজের সঙ্গে তার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। মানুষকে আমরা সর্বত্রই কোন না কোন গোষ্ঠীর অন্তর্ভূত দেখি। সমাজ ছাড়া ব্যক্তির ধারণা চিন্তার বিমূর্তনমাত্র। অবশ্য ব্যক্তি ছাড়া সমাজের কল্পনাও অলীক, বিমূর্ত। সুতরাং যে পূর্ণতর জীবনের আকাঙ্ক্ষা ধর্ম-জীবনে প্রতিফলিত হয় তা' ব্যক্তিগত নয়, তা' গোষ্ঠীনিরপেক্ষ আত্মোপলব্ধি নয়; তা' হ'ল পূর্ণতর মানব-জীবনের উপলব্ধি। ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ-জীবন দুই নিয়েই এই মহান জীবন। আসলে ব্যক্তি-জীবন ও গোষ্ঠী-জীবনের মধ্যে যে বিরোধ তা কাল্পনিক। গোষ্ঠী-জীবনের মধ্য দিয়েই আসে ব্যক্তি-জীবনের পূর্ণতা, আত্ম-ত্যাগের মধ্য দিয়েই আসে যথার্থ আত্মোপলব্ধি। মানুষ যতই তার ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন দেয়, জীবনকে সে ততই মহত্তর ও পূর্ণতররূপে উপলব্ধি করে। আর ধর্মই মানুষকে ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধে উঠতে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে। আমরা পূর্বেই দেখেছি, ধর্ম একেবারে প্রাথমিক অবস্থা থেকেই সামাজিক ব্যাপার, আর এইখানেই ধর্মের সঙ্গে ইন্দ্রজালের পার্থক্য। ইন্দ্রজাল সমাজের কল্যাণের চেয়ে ব্যক্তির স্বার্থকেই প্রাধান্য দেয়; আর ধর্ম সমাজের বা সমগ্র গোষ্ঠীর কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করে। একথা সত্য যে, মানুষের সংস্কৃতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির মুক্তি ও ব্যক্তির কল্যাণের ধারণা ক্রমশ স্পষ্ট হ'তে লাগল; ধর্মের মধ্যেও ব্যক্তির মুক্তির আদর্শ প্রাধান্য পেল, কিন্তু সামাজিক প্রভাব থেকে ধর্ম কখনই সম্পূর্ণ মুক্ত হয়নি। সামাজিক পরিবেশ যে কেবল ধর্মীয় আবেগকে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করেছে তাই নয়, একমাত্র সমাজের মধ্যেই জীবনের পরম আদর্শগুলিকে দৃঢ় ও স্থায়ী রূপ দেওয়া সম্ভব।

অবশ্য দুর্খ্যা (Durkheim) বা অন্যান্য ফরাসী সমাজবিজ্ঞানীদের মত বলা যায় না যে, ধর্মের মাধ্যমে সমাজই ব্যক্তির উপর তার প্রভাব বিস্তার করে। কেননা, দৈব পুরুষ (prophets) ও সমাজ-সংস্কারকদের ব্যক্তিগত অনুভূতি ও উপলব্ধিও সমাজ-জীবনকে প্রভাবিত করে, পরিচালিত করে, এবং ধর্মের সংস্কৃতি ও ধর্মের উন্নতির ক্ষেত্রে দৈব পুরুষদের অবদান অনস্বীকার্য। এঁরাই বারে বারে ধর্মকে আনুষ্ঠানিকতা ও রক্ষণশীলতা থেকে মুক্ত করেছেন। এই সব মহাপুরুষদের নতুন সত্যের উপলব্ধি, তাঁদের উদ্দীপনা ও উদ্যোগ ধর্মকে মুমূর্ষু অবস্থা থেকে মুক্ত করে তার মধ্যে নতুন প্রাণসঞ্চার করেছে। তবুও স্বীকার করতেই হবে যে, এইসব সমাজ-সংস্কারক মহাপুরুষ, সমাজের এই সব কর্ণধার সমাজেরই সৃষ্টি। তাছাড়া, তাঁদের উপলব্ধ সত্যগুলিকে তাঁরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্যেই আবদ্ধ রাখতে চা'ন নি, এই সব সত্য সর্বসাধারণের স্বার্থে, সমাজের কল্যাণের স্বার্থে প্রচার করেছেন। এর জন্য তাঁরা বহু সামাজিক বাধা ও বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের দুর্দমনীয় আত্মবিশ্বাস, তাঁদের আত্মত্যাগ সমাজের সমস্ত রক্ষণশীল শক্তিকে পরাজিত করে নতুন সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। জনকল্যাণের জন্য তাঁদের এই সাধনা, সমাজের মঙ্গলের জন্য এই আত্মাহুতি উত্তরকালের মানুষকে সত্যের জন্য আত্মত্যাগের প্রেরণা দিয়েছে। সুতরাং উপসংহারে বলা যায় যে, ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল; এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক এই দু'রকম ধর্মেরই মূল উৎস হ'ল জীবনকে পূর্ণতররূপে উপলব্ধি করবার আকাঙ্ক্ষা।

নির্বাচিত পুস্তক তালিকা

1. D. Miall Edwards—The Philosophy of Religion.
2. J. H. Leuba—A Psychological Study of Religion.

পঞ্চম অধ্যায়

ধর্ম-চেতনা

পূর্বের অধ্যায়ে ধর্মের মানসিক উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু ধর্ম-তত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য ধর্ম-চেতনার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

1: ধর্মের লক্ষণ—

যুক্তিশাস্ত্রে কোন পদের লক্ষণ-বাক্য (Definition) গঠনের যে সব নিয়ম দেওয়া হয় তাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রেখে ধর্মের কোন লক্ষণ বাক্য গঠন করা সহজ নয়। যে সব বিশ্বাস, মতবাদ, আচরণবিধি প্রভৃতির সমষ্টিকে সাধারণত ধর্ম (Religion) বলে মনে করা হয়, পৃথিবীর নানা স্থানে তাদের এত বৈচিত্র্য দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে কোন্‌টিকে ধর্মের সারাংশ বলে বিবেচনা করা উচিত আর কোন্‌গুলিকে ধর্মের অপ্রয়োজনীয় অংশ বলে ত্যাগ করা সঙ্গত, তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। যেগুলি সাম্প্রদায়িক ধর্ম বলে পরিচিত, যথা, হিন্দুধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম, ঐসলামিক ধর্ম ইত্যাদি—সেগুলির মধ্যে নানা বিষয়ে প্রভেদ ত আছেই, তাছাড়া কোন কোন বিষয়ে বিরোধিতাও আছে। সুতরাং, কোন ধর্ম-বিশ্বাস বা ধর্মাচরণের কোনটি ধর্মের প্রকৃত অঙ্গ সে বিষয়ে গুরুতর মতভেদ অনিবার্য। কিন্তু এসব ধর্মের অন্ততঃ কিছুপরিমাণে যুক্তিসঙ্গত লক্ষণ নির্ণয় করবার চেষ্টা করা যেতে পারে।

ধর্মের লক্ষণ বিবৃতি-মূলক (Descriptive) অথবা আদর্শ-মূলক (Normative) হতে পারে। লোকসমাজে প্রচলিত যে সব বিশ্বাস, আচরণ, প্রথা প্রভৃতিকে ধর্ম-চেতনার অঙ্গ অথবা প্রকাশ অথবা এই চেতনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট বলে মনে করা হয়, তাদের সকলের মধ্যে সাধারণ উপাদান কি আছে তা আবিষ্কার করবার চেষ্টা করে যদি ধর্মের লক্ষণ নির্ণয় করা হয় তাহলে সেটি বিবৃতি-মূলক লক্ষণ হবে। আর, যদি আমরা বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে এমন একটি মান বা আদর্শ স্থির করি যার সাহায্যে প্রচলিত ধর্ম-মতগুলির মূল্যায়ন করা যায় এবং সেই মত বা আদর্শের ভিত্তিতে ধর্মের লক্ষণ নির্ণয় করি তাহলে সেটি হবে আদর্শমূলক লক্ষণ। মানষের কতকগুলি ক্রিয়াকে আমরা সাধারণত ধর্ম-চেতনা বা ধর্ম-বিশ্বাসের বাহ্য প্রকাশ বা ধর্মাচরণের অঙ্গ বলে মনে করি। বিভিন্ন প্রকারের পূজা বা

উপাসনা-পদ্ধতি, মন্ত্র বা স্তোত্রপাঠ, নৃত্যগীত, বাদ্য প্রভৃতি এই সকল ক্রিয়ার অন্তর্গত। আবার, অন্তর্নিরীক্ষণের (Introspection) ফলে আমরা আমাদের মনে এমন কতকগুলি বিশ্বাস, কল্পনা, চিন্তা, ভাবাবেগ প্রভৃতির পরিচয় পাই যেগুলিকে আমরা ধর্ম-চেতনা বা ধর্মীয় মনোভাবের অঙ্গ বলে মনে করি। এই সব ধর্ম-বিশ্বাস, ধর্মীয় ধারণা, ধর্মীয় মনোভাব ও বিভিন্ন ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে কোনগুলিকে ধর্মের মৌলিক ও সর্ব-সাধারণ উপাদান বলে গণ্য করা হবে তা নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। ধর্মীয় মতবাদ ও ধর্মাচরণের বৈচিত্র্যের কথা আগেই বলা হয়েছে। আবার, মানব-সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় মতবাদ, ধর্মাচরণের আকার প্রভৃতিতেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। আদিম যুগে ধর্ম যে আকারে প্রচলিত ছিল বর্তমানকালে তার সে আকার নেই। তা ছাড়া প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাস ও ধর্মাচরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এমন অনেক বিশ্বাস ও ক্রিয়াকলাপ আছে যেগুলিকে বুদ্ধিমান সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা কু-সংস্কার বা কু-অভ্যাস বলে চিহ্নিত করে থাকেন। সুতরাং সমস্ত ধর্মের মধ্যে সর্ব-সাধারণ মৌলিক উপাদান কি আছে তা নির্ণয় করার আগে ধর্মের কোন উপাদান মৌলিক এবং কোনটি নয়, কোন ধর্ম-বিশ্বাস অথবা ধর্মাচরণ ধর্মের প্রকৃত অঙ্গ এবং কোনটি নয় তা স্থির করতে হবে। প্রচলিত ধর্মগুলির তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও আলোচনা করে ধর্মের এমন কোন লক্ষণ নির্ণয় করা অতি দুরূহ যা অধুনা প্রচলিত সকল ধর্ম এবং মানুষের ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে যে সব ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছে তাদের সকলের প্রতিই প্রযোজ্য। সুতরাং আমরা সাধারণত যে সকল ধারণা, বিশ্বাস, কল্পনা, আবেগ, চিন্তা প্রভৃতিকে ধর্ম-চেতনার অঙ্গ বলে মনে করি এবং যে সব ক্রিয়াকে ধর্মাচরণ বলে গণ্য করি, সেগুলিকে পর্যবেক্ষণ করে আমাদের ধর্ম সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা গঠন করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে আদর্শ ধর্ম কি তা স্থির করতে হবে। অর্থাৎ, ধর্মের লক্ষণকে একই সময়ে বিবৃতি-মূলক এবং আদর্শ-মূলক হতে হবে।

'আদর্শ, পূর্ণাঙ্গ-ধর্ম কাকে বলব?'—এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আমাদের জীবনে ধর্ম কোন উদ্দেশ্যসাধন করে তা আলোচনা করতে হবে। কোনও না কোনও ইষ্টলাভ আমাদের প্রত্যেক সচেতন ক্রিয়ার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। যা আমাদের পক্ষে সর্বাঙ্গীণ শুভ বা মঙ্গল (Good), যার চেয়ে উৎকৃষ্টতর আর কিছুই হতে পারে না (নিঃশ্রেয়স—The Summum Bonum) তাকেই আমরা আমাদের চরম অভীষ্ট (The Supreme Object of Desire) বলে মনে করি। এই চরম অভীষ্টের আকার

সম্বন্ধে আমাদের সকলের খুব স্পষ্ট ধারণা না থাকতে পারে, কিন্তু এইরূপ একটা ধারণা যে আমাদের সকল কাজে প্রেরণা দিয়ে থাকে সেটা আমাদের স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু এই চরম অভীষ্ট লাভ করবার উপায় সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন ধারণা থাকতে পারে। কেউ জ্ঞান-চর্চা, কেউ নৈতিক আচরণ আর কেউ বা কাব্য, রস-সাহিত্য চারু-শিল্পের অনুশীলনকে চরম অভীষ্ট লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় বলে মনে করতে পারেন। আমাদের জীবনে ধর্ম, অর্থাৎ ধর্ম-ভাব, ধর্ম-চিন্তা, ধর্মাচরণ প্রভৃতি যে এত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে, তার মূল কারণ হচ্ছে এই যে, আমাদের অনেকেরই মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, ধর্মানুশীলনই আমাদের চরম অভীষ্ট লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। অন্য কোনও পন্থাই আমাদের অভীষ্ট লাভের পক্ষে সুনিশ্চিত নয়, এবং এইসব পন্থা অবলম্বন করে আমরা যে সব ইষ্ট লাভ করি, সেগুলি পূর্ণাঙ্গ নয় এবং আমাদের চরম তৃপ্তি দিতে পারে না। ধর্ম-ভাবের এক অপরিহার্য অঙ্গ হবে কোন এক বা একাধিক অতি-প্রাকৃত শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস, যার বা যাদের অনুগ্রহ লাভ করে আমরা আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করতে পারি। কেউ কেউ মনে করেন যে, আমাদের অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য অন্য কোনও শক্তির মুখাপেক্ষী হওয়ার প্রয়োজন নাই, আমরা নিজেদের বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতার সাহায্যেই আমাদের ঈপ্সিত ফল লাভ করতে পারি। কিন্তু যখনই আমরা চিন্তা করি যে, এই বিশাল বিশ্বে আমাদের স্থান কত নগণ্য এবং আমাদের বুদ্ধি ও শক্তি প্রয়োজনের তুলনায় কত ক্ষুদ্র, তখনই আমরা আমাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী কারও উপর নির্ভর করবার প্রয়োজন অনুভব করি। ভক্ত, ভাবুক, জ্ঞানী ও মহা-পুরুষদের বাণী শুনে আমাদের এই বিশ্বাস জন্মায় যে, এক অসীম, সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান মঙ্গলময়, চিন্ময় পুরুষ (ঈশ্বর)-ই আমাদের একমাত্র চরম নির্ভরযোগ্য আশ্রয় এবং এই পরমপুরুষের সঙ্গে আমাদের অন্তরের নিগূঢ় যোগ স্থাপন হলেই আমরা আমাদের চরম অভীষ্ট লাভ করতে পারি। আমাদের বিচার-বুদ্ধিও নানাভাবে আমাদের এই বিশ্বাসকে সমর্থন করে। এই বিশ্বাসের বিপক্ষে বহু আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে এবং হয়েছে, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিদের মতে এইসব আপত্তিকে যুক্তিদ্বারা খণ্ডন করা যেতে পারে। সুতরাং যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং ঈশ্বরের সঙ্গে যোগস্থাপন আমাদের চরম অভীষ্ট অর্থাৎ সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় হয় তাহলে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস, ঈশ্বরের উপর একান্ত নির্ভরতা ও তাঁর প্রতি আত্ম-সমর্পণের আকুল আগ্রহ—এগুলিকে ধর্ম-চেতনার মৌলিক উপাদান বা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে বিবেচনা করতে হবে, এবং প্রধানত ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসকে কেন্দ্র

করেই ধর্মের লক্ষণ-বাক্য রচনা করতে হবে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, এক অদ্বিতীয়, সর্বজ্ঞ, সর্ব-শক্তিমান পরম করুণাময়, সমস্ত শ্রেষ্ঠ সদ্গুণের আধার, বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও পালক পরমেশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস, সেই বিশ্বাস আমাদের মনে যে সব ভাবাবেগ উৎপন্ন করে এবং যে সকল শুভ-কর্মে আমাদের প্রেরণা দেয় এই সকলের সমষ্টিই ধর্ম। যে বিশ্বাস আমাদের মনে প্রবল ভাবাবেগ উদ্রেক করে এবং নানারকম ক্রিয়ার মাধ্যমে আত্ম-প্রকাশ করে সেই বিশ্বাসই ধর্মীয়বিশ্বাস বলে গণ্য হবার উপযুক্ত, আবার যে সব ভাবাবেগ ঈশ্বরে বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত নয় অথবা যেসব ক্রিয়ার মূল উৎস ঈশ্বরে বিশ্বাস নয়, সেগুলিকে ধর্মীয় আবেগ বা ধর্মাচরণ বলা সঙ্গত নয়। এই লক্ষণানুসারে যে সব মতবাদে ঈশ্বরের স্থান নেই—যথা, বৌদ্ধমত, জৈনমত, ওগুস্ত্ কোঁৎ (Auguste Comte)-এর মানব-ধর্ম (The Religion of Humanity)-এগুলিকে হয় ধর্ম বলা উচিত নয়, নতুবা অপূর্ণাঙ্গ ধর্ম বলা উচিত। বহু-দেববাদ সম্বন্ধেও বলা চলে যে, এটি ধর্ম বটে কিন্তু অপূর্ণাঙ্গ ধর্ম। এই দৃষ্টিতে শঙ্করের অদ্বৈতবাদকে বিশুদ্ধ জ্ঞান-সাধনা বলা যেতে পারে কিন্তু ধর্ম নয়। সুতরাং ধর্ম সম্বন্ধে দার্শনিক আলোচনা করতে হলে পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি ও অনুরাগ এবং নৈতিক সদাচরণ যে একেশ্বরবাদের অঙ্গ সেই একেশ্বরবাদের আলোচনা করব।

বিভিন্ন দার্শনিক ও ধর্মবেত্তা পণ্ডিত ধর্মের বিভিন্ন লক্ষণ দিয়েছেন। উপরে ধর্মের যে লক্ষণ দেওয়া হল তার সঙ্গে এই লক্ষণগুলির তুলনা করে এদের দোষগুণ বিচার করা প্রয়োজন। কিন্তু তার আগে ধর্ম-চেতনাকে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করা দরকার।

2. ধর্ম-চেতনার বিশ্লেষণ—

ধর্ম-চেতনা মানুষের সত্তার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এর অর্থ এই নয় যে, ইতিহাসের আদিম যুগেই প্রত্যেক মানুষের মনে পরমেশ্বর, অধ্যাত্মজীবন, নৈতিক আদর্শ প্রভৃতি সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ ধারণা ছিল। এর অর্থ এই যে, মানুষের মনে প্রথম থেকেই, অস্ফুটভাবে হলেও, নিজের সসীম সত্তার গণ্ডি পার হয়ে এক অসীম সত্তার সঙ্গে সংযুক্ত হবার আকাঙ্ক্ষার ক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায়। ধর্ম-চেতনার বিভিন্ন প্রকাশ ব্যাখ্যা করবার জন্য মানুষের মনের অন্যান্য চেতনা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক একটি স্বতন্ত্র বৃত্তি (Faculty) কল্পনা করা মনস্তত্ত্বের বিরোধী। ধর্ম-চেতনা একটি মিশ্র (Complex) চেতনা। আমাদের মনের প্রত্যেক অবস্থাতেই যেমন জ্ঞান, আবেগ এবং ক্রিয়াশীলতা

লক্ষ্য করা যায় ধর্ম-চেতনার বেলাতেও আমরা ঠিক তেমনই এই তিনটি প্রধান উপাদান লক্ষ্য করতে পারি। ধর্ম-চেতনায় যেমন উপাস্য শক্তি অথবা দেবতা সম্বন্ধে কতকগুলি ধারণা, বিশ্বাস বা মতবাদ থাকে, তেমনই আবার এই সব ধারণা, বিশ্বাস প্রভৃতি থেকে উদ্ভূত কতকগুলি ভাবাবেগ থাকে এবং এই সব ভাবাবেগ ধর্মপ্রাণ মানুষকে নানারকম কাজ করবার প্রেরণা দিয়ে থাকে। ধর্ম-চেতনার এই সব বিভিন্ন উপাদান সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

(a) জ্ঞান—

বিশ্বজগতের স্রষ্টা, এক অসীম, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান পুরুষের অস্তিত্বে বিশ্বাসকে ধর্ম-চেতনার মৌলিক উপাদান বলা যায়। যে সব মতবাদে ঈশ্বরের স্থান নেই সেগুলিকে ধর্ম বলা যায় না, অন্ততঃ সম্পূর্ণাঙ্গ ধর্ম বলা যায় না। ধর্মের যে সব আদিম রূপ আমাদের জানা আছে—যেমন, প্রাণ-বাদ (Animism), প্রতীকোপাসনা (Fetishism) প্রভৃতি—সেগুলিতেও মানুষের উপকার করতে সক্ষম এবং ইচ্ছুক কোন না কোন অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস গুরুত্বপূর্ণস্থান অধিকার করত। বহুদেববাদে ওই সব প্রাকৃতিক শক্তি, মানুষ যাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারে এমন কতকগুলি দেব-দেবীতে রূপান্তরিত হয়। জগৎ সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বহুদেববাদ একেশ্বরবাদে পরিণত হয়। কিন্তু পরমেশ্বর আছেন শুধু এই বিশ্বাসটুকু নিয়ে মানুষের জিজ্ঞাসু মন পরিতৃপ্ত হয় না। মানুষ যেমন জগৎকে জানতে চায় তেমনই আবার এই পরিদৃশ্যমান জগতের পিছনে যে অদৃশ্য শক্তি আছে তার প্রকৃতি, মানুষের সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ, এই সব সম্পর্কেও তার মনে নানা প্রশ্ন জাগে। মানুষের বুদ্ধি যতই বিকশিত হয় ততই সে এটা বুঝতে সক্ষম হয় যে, এই সব প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়ার ফলে কেবল যে তার কৌতূহল চরিতার্থ হয় এমন নয়, তার ধর্ম-সাধনার মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যও এর প্রয়োজন আছে। অর্থাৎ, মানুষ যখন নিজের দুর্বলতা ও অক্ষমতার জন্য হতাশাগ্রস্ত হয়ে কোন অতি-প্রাকৃত শক্তির উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয় তখন সেই এক বা একাধিক অতিপ্রাকৃত শক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে তার চেতনা থাকে, এবং যদিও প্রথমে এই চেতনা কতকগুলি অন্ধবিশ্বাস বা কল্পনার রূপ ধারণ করে, ক্রমে ক্রমে এই বিশ্বাসগুলির সত্যতা পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই সব বিশ্বাসের যদি কোন বাস্তব সত্যতা না থাকে তাহলে ধর্মজীবনের কোনও ভিত্তিই থাকে না। আমাদের চরম অভীষ্ট লাভ করবার জন্যই

যদি ধর্ম-সাধনার প্রয়োজন থাকে তাহলে জগতের চরম সত্তা বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের যথার্থ জ্ঞানই সেই সাধনার প্রকৃত ভিত্তি হবে। যে ব্যক্তির মনে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন কোন অতিপ্রাকৃত শক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতনতা নেই, প্রকৃতপক্ষে তার ধর্ম-চেতনাও নেই। যে ব্যক্তির ধর্মীয় বিশ্বাসগুলি বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে পরীক্ষিত হয় নি, তার ধর্ম-চেতনা অপূর্ণাঙ্গ কিংবা বিকৃত। ভ্রান্তধারণা বা কুসংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত আবেগসর্বস্বমতবাদ বা আচরণকে প্রকৃতপক্ষে ধর্ম বলা সঙ্গত নয়। ঈশ্বর, জগৎ ও আত্মা সম্বন্ধে কোন না কোন প্রকারের জ্ঞান ধর্ম-চেতনার অপরিহার্য অঙ্গ। প্রত্যেক সাম্প্রদায়িক ধর্মে কতকগুলি বিশ্বাসকে মৌলিক বিশ্বাস (Dogma) বলে স্বীকার করা হয় এবং এই সব বিশ্বাসের সমষ্টিকে ধর্মমতের সারাংশ (Creed) বলা হয়।

(b) ভাবাবেগ—

আমরা ঈশ্বরের প্রকৃতি এবং ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ সম্পর্কে যে সব বিশ্বাস পোষণ করি, সেগুলি আমাদের মনে যে সব ভাবাবেগ উৎপন্ন করে সেগুলিও ধর্ম-চেতনার অপরিহার্য উপাদান। যে ব্যক্তি পরমাত্মা, জীবাত্মা প্রভৃতি সম্বন্ধে বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে প্রগাঢ় আলোচনা করে কতকগুলি স্থির সিদ্ধান্তে পোঁছেছেন তাঁকে জ্ঞানী বা দার্শনিক বলা যেতে পারে, কিন্তু এই জ্ঞান যদি তাঁর মনে কোন ভাবাবেগ সৃষ্টি না করে তাহলে প্রকৃতপক্ষে তাঁকে ধার্মিক ব্যক্তি বলা যাবে না। কারণ, ধর্ম যদি আমাদের চরম অভীষ্ট লাভের উপায় হয় তাহলে আমাদের কতকগুলি ক্রিয়া করতে হবে। এইগুলিকেই ধর্ম-সাধন বা ধর্মাচরণ বলা হয়। ভাবাবেগের প্রেরণাতেই মানুষ কাজ করে। সুতরাং ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় বিশ্বাস বা জ্ঞান যদি আমাদের মনে আবেগসঞ্চার না করে তাহলে আমাদের আচরণকে ধর্মাচরণ বলা যাবে না। আবেগবর্জিত ধর্ম শুষ্ক, প্রাণহীন মতবাদমাত্র, প্রকৃত ধর্ম নয়। বাস্তব জগতে অবশ্য ঈশ্বর সম্বন্ধীয় চিন্তা যাঁর মনে বিন্দুমাত্র আবেগ সঞ্চার করে না, এরূপ ব্যক্তির দেখা পাওয়া যায় না।

ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করতে পারি, এবং ঈশ্বর-সম্বন্ধে চিন্তা করলে আমাদের মনে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণানুযায়ী বিভিন্ন আবেগ উৎপন্ন হতে পারে। আমরা যখন ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি ও অনন্ত জ্ঞানের কথা চিন্তা করি তখন আমাদের মনে জাগে ভয়মিশ্রিত সম্ভ্রম (Awe), যখন জগতে সর্বত্র তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতার পরিচয় পাই তখন আমাদের মনে জাগে শ্রদ্ধা, যখন চিন্তা করি যে, তিনি মঙ্গলময় এবং

আমাদের দুঃখে বিপদে সকল সময়েই আমাদের রক্ষা করেন এবং পাপ থেকে পরিত্রাণ করেন তখন আমরা তাঁর প্রতি এক পরম নির্ভরতার ভাব অনুভব করি এবং স্বস্তি ও শান্তিতে আমাদের মন পূর্ণ হয়ে ওঠে, যখন তাঁকে করুণাময় রূপে দেখি তখন তাঁর প্রতি প্রীতি ও ভালবাসায় আমাদের মন উদ্বেল হয়ে ওঠে, আর যখন তাঁকে জগতের সকল সৌন্দর্যের উৎস বলে চিন্তা করি তখন তাঁর প্রতি এক অদম্য আকর্ষণ অনুভব করি। ঈশ্বরের প্রকৃতি এবং আমাদের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধের কথা চিন্তা করলে আমাদের মনে যে সব আবেগের উদয় হয় সেগুলি যে কেবলমাত্র ঈশ্বরকেই লক্ষ্য করে তা নয়, যে সব বস্তু বা ব্যক্তির মাধ্যমে ঈশ্বর আত্ম-প্রকাশ করেন তারাও এই সব আবেগের বিষয় হয়ে থাকে। পূজা, উপাসনা, প্রার্থনা, মন্ত্রপাঠ, সঙ্গীত, নানারকম চারুশিল্প, সামাজিক অনুষ্ঠান, দীন দরিদ্রের সেবা প্রভৃতি ক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা সেই আবেগগুলিকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করি। এইসব আবেগ প্রবল হলে কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মোন্মত্ততাও সৃষ্টি করে। ধর্ম-চেতনা আমাদের মনে এইসব আবেগ সঞ্চার করে বলেই আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের উপর ধর্মের এত প্রভাব দেখা যায়।

(c) ক্রিয়াশীলতা—

জ্ঞান ও ভাবাবেগের মত ক্রিয়াশীলতাও ধর্ম-চেতনার একটি উপাদান। ধর্মীয় আবেগ যখন আমাদের মনে উত্তেজনা সৃষ্টি করে তখন সেই উত্তেজনা নানারকম কর্মের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। ঈশ্বরের ধ্যান এবং তাঁর প্রকৃতি সম্বন্ধে চিন্তার ফলে আমরা যে জীবনাদর্শের সন্ধান পাই সেই আদর্শ আমাদের জীবনে রূপায়িত করবার প্রেরণা পাই। এই চেষ্টাই নৈতিক প্রচেষ্টা। ঈশ্বর-চেতনার সঙ্গে নীতি-বোধের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। সৎ-কর্ম ও দুষ্কর্মের পার্থক্য-বোধ, নৈতিক দায়িত্ব-বোধ, কর্তব্য-জ্ঞান প্রভৃতি নৈতিক চেতনার উপাদান। যে ব্যক্তি ধার্মিক তিনি পবিত্র নৈতিক-জীবন যাপন করবেন এটাই স্বাভাবিক এবং যুক্তিসঙ্গত বলে আমরা বিশ্বাস করি। যে ধর্মমত জড়তা ও আলস্যের প্রশ্রয় দেয় আমরা সেই ধর্মমতের নিন্দা করে থাকি।

সুতরাং জ্ঞান, ভাবাবেগ ও ক্রিয়াশীলতা ধর্ম-চেতনার তিনটি বিশিষ্ট উপাদান। এদের যে কোনও একটির অভাবে ধর্ম-চেতনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, এবং বস্তুত এই তিনটি উপাদানের মধ্যে কোন একটিকে বাদ দিয়ে অপর দুটি উপাদান থাকতে পারে না। কিন্তু কেউ কেউ এদের মধ্যে

কোনটি প্রধান বা সর্বপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, এই প্রশ্ন তুলেছেন। কারও মতে জ্ঞান, কারও মতে হৃদয়াবেগ, কারও মতে কর্মতৎপরতাই ধর্ম-চেতনার মৌলিক বা প্রধান উপাদান। বহু লেখক এই সম্বন্ধে নিজ নিজ ধারণা-নুযায়ী ধর্মের লক্ষণ-বাক্য (Definition of Religion) দিয়েছেন। এখানে এরূপ কতকগুলি লক্ষণ-বাক্য দেওয়া হল:—

"ধর্ম একপ্রকার লোক-প্রচলিত দর্শন-মাত্র। ইহা মূর্ত, চিত্রাকার উপমাব্যঞ্জক চিন্তার মাধ্যমে প্রকাশিত, জগতের চরম তত্ত্ব সম্বন্ধে কতকগুলি বিশ্বাসের সমষ্টি, আর দর্শন হল বিশুদ্ধ চিন্তার মাধ্যমে প্রকাশিত (জগতের চরমতত্ত্ব সম্বন্ধে) জ্ঞান"—"জীবাত্মা যখন নিজেকে পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন বলে জানে তখন তার নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে যে জ্ঞান তা-ই ধর্ম" (হেগেল)।

"আধ্যাত্মিক শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাসই ধর্ম" (ঈ, বি, টাইলর)।

"অনন্তের অনুভূতি বা জ্ঞানই ধর্ম" (ম্যাক্সমুলার)।

আমরা আগে ধর্মের প্রকৃতি সম্বন্ধে যেসব আলোচনা করেছি তা থেকে বোঝা যাবে যে, এই লক্ষণবাক্যগুলি ত্রুটিপূর্ণ। প্রথমত, মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে বলা যেতে পারে যে, আমাদের কোন অবস্থাতেই কেবলমাত্র বিশুদ্ধজ্ঞান আমাদের মনকে অধিকার করে থাকতে পারে না। জ্ঞানের সঙ্গে সুখদুঃখানুভূতি, ভাবাবেগ, কর্মপ্রবৃত্তি প্রভৃতি অবশ্যই থাকবে। দ্বিতীয়ত, মানুষের বাস্তব জীবনের উপর ধর্মের প্রবল প্রভাব লক্ষ্য করলেও উপরের লক্ষণবাক্যগুলিকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। ধর্ম-চেতনা, ধর্ম-বিশ্বাস প্রভৃতির প্রচণ্ড শক্তি যুগে যুগে মানুষের চিন্তা-ধারাকে নানাভাবে সক্রিয় করেছে, ইতিহাসের গতিপথকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। যুগে যুগে নানারকম ধর্মীয় সংস্থা, ধর্মীয় প্রথা, আচার-ব্যবহারের উদ্ভব হয়েছে। ধর্মীয় জ্ঞানের সঙ্গে ধর্মীয় আবেগের সংযোগ না থাকলে এসব সম্ভব হত না।

কেউ কেউ আবার ধর্মকে একপ্রকার ভাবাবেগ বলে বর্ণনা করেছেন। দার্শনিক শ্লায়ারমাকারের (Schliermacher) মতে জ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। তিনি বলেন, "ঈশ্বরের উপর একান্ত নির্ভরশীলতার অনুভূতি থেকে জাত যে ভাবাবেগ তা-ই ধর্ম।" একজন ইংরাজ লেখক সীলে (Seeley) বলেন "জগতের প্রতি অভ্যস্ত এবং স্থায়ী সম্ভ্রমের ভাবই ধর্ম।" যিনি জগতের বিচিত্র কারুকার্য ও সৌন্দর্য অনুভব করে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে থাকেন তিনিই ধার্মিক। এই লক্ষণ বাক্যগুলিতে ধর্ম-চেতনায় জ্ঞান বা বিচার-বুদ্ধিরূপ উপাদান অবহেলিত হয়েছে। কেউ কেউ আবার ধর্মকে এক বিশেষ ধরনের ক্রিয়া বলেছেন। তাঁদের মতে আমাদের ইচ্ছা-শক্তিকে সৎপথে চালিত করাই ধর্ম। কান্ট (Kant) বলেন

"আমাদের কর্তব্যগুলিকে ঈশ্বরের আদেশ বলে স্বীকার করে নেওয়াই ধর্ম।" অর্থাৎ, ধর্ম-সাধনায় ঈশ্বর-চিন্তা, ঈশ্বরের উপাসনা প্রভৃতির কোন স্থান নেই। যিনি তাঁর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্তব্যগুলিকে ভগবানের আদেশ বলে সম্পাদন করে যান তিনিই ধার্মিক। কিন্তু এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আমাদের কর্তব্যগুলি ঈশ্বরের আদেশ—এটা যদি আমরা স্বীকার করি, তাহলে ঈশ্বরের প্রকৃত অস্তিত্ব আছে কি না? থাকলে তাঁর স্বরূপ কি? —এই সব সমস্যা সম্বন্ধে উদাসীন থাকা কি আমাদের পক্ষে সম্ভবপর? বস্তুত, কতকগুলি কর্মকে ঈশ্বরের আদেশ বলে স্বীকার করে নিলে ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করবার চেষ্টা করা বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীবের পক্ষে অপরিহার্য।

আমাদের ধর্ম-চেতনাকে বিশ্লেষণ করলে এবং আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ধর্মের বিভিন্ন প্রকাশের তাৎপর্য বোঝবার চেষ্টা করলে আমাদের এই সিদ্ধান্তই করতে হয় যে, এই পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরালে এক অতীন্দ্রিয় অতিপ্রাকৃত সত্তার অনুভবই ধর্ম-চেতনার প্রধান উপাদান। কোন ভাবাবেগ ধর্মীয় ভাবাবেগ কিনা, কোন ক্রিয়া বা আচরণ ধর্মীয় ক্রিয়া বা আচরণ কিনা, তা নির্ণয় করতে হলে আমাদের দেখতে হবে যে, এই আবেগ এক অতীন্দ্রিয় সত্তার অনুভব এবং এই সত্তার সঙ্গে নিজের জীবনকে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করার আকাঙ্ক্ষা থেকে উদ্ভূত কিনা এবং এই ক্রিয়া বা আচরণের পিছনে এই ধরনের আবেগের প্রেরণা আছে কিনা। বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন জীবের মনে এই অতীন্দ্রিয় সত্তার স্বরূপ সম্বন্ধে যথাযথ পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান লাভ করার যে অনিবার্য প্রবণতা আছে, বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতিতে তারই প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। মানবাত্মার শক্তি সীমাবদ্ধ হলেও অনন্তের সাধনা তার স্বরূপেই নিহিত। এই সাধনার ফলেই আমাদের মনে পর-মাত্মার ধারণা জন্মায়। অনন্তের প্রতি মানব-মনের এই যে অনিবার্য প্রবণতা, অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকেরা একেই "ধর্ম-সাধনার অনিবার্যতা" (The Necessity of Religion) বলেছেন। আমাদের ধর্ম-সাধনার বিচিত্র রূপের কথা চিন্তা করলে জ্ঞানকেই ধর্ম-চেতনার প্রধান উপাদান বলে সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত।

নির্বাচিত পুস্তক তালিকা

1. John Caird—Philosophy of Religion
2. D. Miall Edwards—The Philosophy of Religion.

ষষ্ঠ অধ্যায়

ধর্ম ও সমাজ

মানুষ সামাজিক জীব। আদিম বর্বর যুগ থেকে আরম্ভ করে আধুনিক সভ্যতার যুগ পর্যন্ত সর্ব কালেই মানুষ কোন না কোন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেছে ও সমাজের মধ্যেই বড় হয়েছে। ঘটনাচক্রে সামাজিক পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ভাবে যে বড় হয়েছে, এমন মানব-শিশু জৈবিক বিচারে মানুষ বলে গণ্য হলেও, মানসিকতার দিক থেকে মানুষ-পদবাচ্য নয়। শারীরিক বৈশিষ্ট্য ছাড়া মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রায় সবটাই সমাজ থেকে প্রাপ্ত। তাই সমাজ ছাড়া মানুষ কল্পনা করা যায় না এবং ব্যক্তির কোন চিন্তা, অনুভূতি ও আচার-ব্যবহারই সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত থাকতে পারে না। এই সব চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছার সঙ্গে কোন না কোন ভাবে সমাজের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া ঘটে। মানুষের জীবনের অন্য যে-কোন দিক সম্বন্ধে যেমন একথা সত্য, তার ধর্ম-জীবন সম্বন্ধেও ঠিক তেমনই সত্য। মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্মীয় ব্যবহার তার সামাজিক ব্যবহারের মধ্যে প্রকাশ পায়, আবার তার সামাজিক পরিবেশ তার ধর্ম-বিশ্বাস ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে নানা ভাবে প্রভাবিত করে।

মানুষের ধর্ম-চেতনার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, অতীন্দ্রিয় ও অতিপ্রাকৃতের সম্বন্ধে মানুষের বিভিন্ন ভাবনা, অনুভূতি ও ক্রিয়ার সমন্বয় ঘটেছে এর মধ্যে। অতীন্দ্রিয় বা অতিপ্রাকৃত সম্বন্ধে ধর্মীয় আবেগ ও কল্পনা রূপ নেয় তার ক্রিয়া ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে। তাই বলা যায় যে, মানুষের ধর্ম-জীবনের দু'টি দিক—আন্তর ও বাহ্য। অতীন্দ্রিয় সম্পর্কে মানুষের চিন্তা, কল্পনা ও অনুভূতি নিয়ে গড়ে ওঠে ধর্মের আন্তর দিক, আর আচার-অনুষ্ঠান পূজা ও প্রার্থনা নিয়ে হয় ধর্মের বাহ্য দিক। ধর্মের এই বহিরঙ্গের সঙ্গেই প্রধানত সমাজের সম্বন্ধ। ধর্মীয় ক্রিয়া ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই ধর্ম সামাজিক মানুষের পরস্পরের সম্বন্ধকে প্রভাবিত ও নির্ধারিত করে।

1. ধর্ম ও নীতি

ধর্ম ও সমাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায় সামাজিক রীতি ও নীতির মধ্যে। অনেক সামাজিক রীতি বা অনুশাসনই ধর্মীয়

অনুশাসন বা ঈশ্বরের নির্দেশ বলে পালিত হয়। তাই অনেকেই ধর্ম ও নীতির মধ্যে কোন পার্থক্য করেন না। কিন্তু ধর্ম ও নীতির স্বরূপ বুঝতে গেলে এদের উভয়ের মৌল পার্থক্যও বোঝা দরকার।

ধর্ম ও নীতির মধ্যে মূল পার্থক্য হ'ল, অর্থ বা আদর্শগত। নীতির মূলে আছে সামাজিক কল্যাণের আদর্শ। সমাজে যা' নৈতিক ও সৎ বলে স্বীকৃত হয়, তার প্রধান উদ্দেশ্য সমাজের কল্যাণ; আবার যা' অসৎ তা' সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর ও অকল্যাণকর। কিন্তু ধর্মীয় অনুশাসন প্রবর্তিত কোন অতিসামাজিক ও অতিমানবীয় সত্তার ধারণার সঙ্গে যুক্ত। ধর্মীয় অনুশাসন কোন না কোন ভাবে মানুষের সঙ্গে অতিমানবীয় সত্তার সম্পর্ককেই নির্দেশ করে। ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল মানুষের সঙ্গে অতি-মানবীয় সত্তার সম্পর্কের উন্নতি। অপরপক্ষে, নীতির উদ্দেশ্য হ'ল, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের উন্নতি। সুতরাং নীতির ভিত্তি হ'ল মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ, আর ধর্মীয় অনুশাসনের ভিত্তি হ'ল মানুষের সঙ্গে অতিমানবীয় ও অতিপ্রাকৃতের সম্বন্ধ। অবশ্য ধর্মীয় অনুশাসন অনেক সময়ই মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধও নির্দেশ করে, ফলে হয়ে ওঠে সামাজিক অনুশাসন; কিন্তু বিচার করে দেখলে বোঝা যায় যে, এই সব অনুশাসন প্রধানত মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্বন্ধকেই নির্দেশ করে, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ যেন সেখানে গৌণ। কারণ, এই সব ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্যে ঈশ্বর বা অতিপ্রাকৃতের ইচ্ছাই প্রকাশ পায়, এবং এদের মূল্যও সেই হিসেবেই। এইখানেই ধর্মীয় অর্থে 'পাপ' ও নৈতিক অর্থে 'অন্যায়'-এর মধ্যে পার্থক্য। কিন্তু এই আদর্শগত পার্থক্য সত্ত্বেও ধর্ম ও নীতি, একে অপরের ভিত্তি হিসেবে থাকতে পারে। কোন কোন লেখকের মতে ধর্মের ভিত্তি ছাড়া সামাজিক নীতি টিকে থাকতে পারে না। বেঞ্জামিন্ কিড্ (Benjamin Kidd) তাঁর "সামাজিক বিবর্তন" (Social Evolution) গ্রন্থে এই মত প্রকাশ করেছেন।[1] আবার হার্বার্ট স্পেন্সর তাঁর "সমাজ-বিজ্ঞানের সারকথা" (Principles of Sociology) গ্রন্থে এর বিপরীত মত পোষণ করেন। তাঁর মতে ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুশাসন থেকে মুক্ত না হ'লে সামাজিক নীতিগুলি কখনই বিশুদ্ধ নীতি হয়ে উঠতে পারে না ও নিত্যপরিবর্তনশীল সমাজের প্রয়োজনও মেটাতে পারে না। টমাস হাক্সলী (Thomas Huxley)-ও এই ব্যাপারে স্পেন্সরকেই সমর্থন করেন তাঁর "বিবর্তন ও নীতি" (Evolution and Ethics) গ্রন্থে। কিন্তু একটি

1 B. Kidd, Social Evolution. (New ed. New York, 1920)

ব্যাপারে এঁরা সকলেই একমত যে, নৈতিক অনুমোদন হ'ল মানুষের বিবেক বা বিচারশক্তির অনুমোদন। সেখানে অতিমানবীয় কোন সত্তার সঙ্গে মানুষেব সম্বন্ধ স্থাপনই মূল কথা নয়। কিন্তু ধর্মীয় অনুশাসন যে সম্পর্কের নির্দেশ দেয় তা' অতিপ্রাকৃতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককেই প্রাধান্য দেয়। সুতরাং, ধর্মীয় অনুশাসন সামাজিক সম্পর্ক নির্দেশ করলেও আধ্যাত্মিক সম্পর্কের তুলনায় তা' গৌণ। ফলে, ধর্মীয় অনুশাসন অনেক ক্ষেত্রেই সামাজিক সম্বন্ধের ব্যাপারে উদাসীন ও সময়-বিশেষে পরিপন্থীও। অবশ্য ধর্মীয় অনুশাসনও কখন কখন সামাজিক চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়। অন্তত ধর্মের প্রাথমিক অবস্থায় অনেক সামাজিক প্রয়োজনই ঈশ্বরের ইচ্ছা ও দৈব আদেশ বলে প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ধর্মীয় অনুশাসন ও সামাজিক নীতির মধ্যে মৌল পার্থক্য অস্বীকার করা যায় না। যখন কোন নীতি দৈব ইচ্ছা বা আদেশ থেকে উৎসারিত বলে প্রচারিত হয়, বা তার মূলে দৈব শক্তির অনুমোদন থাকে, আর তা লঙ্ঘন করলে ধর্মের নামে শাস্তিবিধান করা হয়, তখনই তাকে বলা হয় ধর্মীয় অনুশাসন। অপরপক্ষে, যখন কোন নীতি এমন ক্রিয়া-পদ্ধতির নির্দেশ দেয় যে, মানুষের বিবেক ও সদসৎ বিচারের মধ্যেই তার ব্যাখ্যা মেলে, তখন সেই নির্দেশকেই বলা হয় নীতি বা নৈতিক অনুশাসন। অর্থাৎ, নৈতিক অনুশাসনের অনুমোদন বা সমর্থন আসে মানুষের বিবেক থেকে, আর সেইখানেই তার মূল্য।

ধর্ম ও নীতির মধ্যে জ্যেষ্ঠত্ব কার, সে-সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। ওগুস্ত্ কোঁৎ (Auguste Comte) প্রমুখ প্রত্যক্ষবাদীদের মতে ধর্মই নীতির উৎস। অতিপ্রাকৃত ও অতিমানবীয় সত্তায় বিশ্বাস না করলেও কোঁৎ সমাজ-জীবনে ধর্মের মূল্য অস্বীকার করেন নি। তাঁর মতে ধর্মের মাধ্যমেই মানুষের মধ্যে দয়া মায়া ক্ষমা ইত্যাদি উচ্চতর নৈতিক গুণের উন্মেষ হয়। অন্যপক্ষে, দুর্খ্যা ইত্যাদি সমাজবিজ্ঞানীদের মতে সামাজিক ও নৈতিক রীতিগুলির পবিত্রীকরণের ফলেই ধর্মের উৎপত্তি। দুর্খঁ্যা তাঁর "ধর্মজীবনের প্রাথমিক রূপ" (Elementary forms of Religious Life) গ্রন্থে বলেছেন যে, ধর্মীয় ধারণার উৎপত্তি হয় সামাজিক পরিবেশ থেকে, এবং ধর্মজীবন হ'ল সমগ্র গোষ্ঠীজীবনেরই সংহত প্রকাশ, কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিচারে ধর্ম ও নীতির কোনটিকেই জ্যেষ্ঠ বলা যায় না। বিভিন্ন সামাজিক ও নৈতিক চিন্তার প্রকাশ ঘটে ধর্মীয় আচার ও অনুশাসনের মধ্যে; আবার ধর্মও সামাজিক ও নৈতিক চেতনাকে প্রভাবিত করে। আদিম মানুষের কাছে যেমন ধর্ম ও ইন্দ্রজালের মধ্যে কোন ভেদ

ছিল না, তেমনই কোন ভেদ ছিল না ধর্ম ও নীতির মধ্যে। আর কেবল আদিম বর্বর মানুষই নয়, আধুনিক কালের অপেক্ষাকৃত অল্পশিক্ষিত লোকের কাছেও ধর্ম ও নীতির মধ্যে মৌল পার্থক্যের ধারণা স্পষ্ট নয়। প্রকৃতপক্ষে, সামাজিক বিবর্তনের ফলে ও চিন্তাশক্তির ক্রমবিকাশের ফলেই মানুষের পক্ষে ধর্ম ও নীতির মধ্যে পার্থক্য অনুভব করা সম্ভব হয়েছে।

2. ধর্ম ও সামাজিক সংহতি

আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, ধর্ম সমাজ-জীবনকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে। অতি প্রাচীনকাল থেকেই ধর্ম গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সংহতি রক্ষার ব্যাপারে বিশেষ ভাবে কাজ করে এসেছে। আদিম গোষ্ঠীগুলির মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বজায় থাকত প্রধানত ধর্মকে ভিত্তি করেই। এক গোষ্ঠীর লোকেরা অপর গোষ্ঠীর লোকেদের ভিন্ন দেবতার পূজক বলেই নিজেদের থেকে পৃথক্ বলে বুঝত। সুতরাং আদিম গোষ্ঠী-চেতনাও ছিল প্রধানত ধর্মভিত্তিক। এর পর যখন বিভিন্ন গোষ্ঠী একত্রিত হয়ে জাতীয় জীবনে সংহত হ'ল, তখনও সেই সংহতির মূলে ছিল ধর্মীয় ঐক্য ও সংহতি। বিজিত গোষ্ঠী বিজেতার ধর্ম ও দেবতাদের প্রাধান্য স্বীকার করে বিজেতার ধর্মই গ্রহণ করল। জাতীয় ধর্মের ক্ষেত্রেও জাতীয় সংহতি মূলত ধর্মকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। এক জাতির লোকেরা একই জাতীয় দেবতাদের পূজা করত। এই জাতীয় দেবতাদের পূজা তাদের জাতীয় চেতনাকে জাগ্রত রাখত।

আমরা দেখেছি যে, ধর্ম-চেতনাকে বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে বুদ্ধি, আবেগ ও ইচ্ছা, এই তিন মানসিক বৃত্তিরই অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং সামাজিক সংহতি রক্ষার ব্যাপারেও ধর্ম এই তিনটি বৃত্তির সাহায্যেই কাজ করে। বুদ্ধি ও ভাবনার দিক থেকে একই ধর্মাবলম্বী লোকেরা সকলেই ঈশ্বর বা অতিপ্রাকৃত শক্তি সম্বন্ধে নিজেদের একই ধরনের অভিজ্ঞতার অধিকারী বলে বিশ্বাস করে; এবং তারা বিশ্বাস করে যে, যারা অন্য ধর্মে বিশ্বাসী তারা এই সব অভিজ্ঞতা বা ধারণা লাভ করতে পারে না। একই ধর্মীয় গোষ্ঠীর লোকেরা তাদের নিজস্ব ধর্মীয় অভিজ্ঞতা ও ধারণাগুলিকে অপর ধর্মের তুলনায় অনেক বেশি মূল্য দেয়। ফলে, এই সব ধর্মবিশ্বাস ও ধারণাকে কেন্দ্র করে বিশেষ বিশেষ ধর্মে গড়ে ওঠে নানা কল্পনা, কাহিনী, উপকথা ও পুরাণ। তাছাড়া, একই দেবতা বা শক্তির পূজক ও সন্তান বলে তাদের পরস্পরের মধ্যে বিশেষ ধরনের ভ্রাতৃত্ববোধ ও ঐক্যবোধও জেগে ওঠে।

কিন্তু ধর্ম-জীবন কেবল কতকগুলি বিশ্বাস বা মতবাদেরই সমষ্টি নয়। বরং, আদিকাল থেকেই ধর্ম-জীবনে অনুভূতিরই প্রাধান্য। তাই এই সব উপকথা, পৌরাণিক কাহিনী ও কল্পনার সঙ্গে যুক্ত হয় গভীর আবেগ। বিশেষ বিশেষ ধর্মের এই সব পৌরাণিক কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্র ও ঘটনা সেই ধর্মে বিশ্বাসী সকলের মনেই গভীর আবেগ ও অনুভূতি জাগায়; আর এই অনুভূতি ও আবেগের সমতাকে ভিত্তি করেই একই ধর্মীয় গোষ্ঠার লোকেদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি দেখা দেয়।

কিন্তু সকলের চিন্তা বা কল্পনাশক্তি সমান নয়। তাই বুদ্ধির দ্বারা ধর্মের গভীর তত্ত্বগুলি অনুধাবন করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। ধর্মীয় আবেগ ও অনুভূতির ব্যাপারেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য দেখা যায়। সুতরাং সামাজিক সংহতি রক্ষার ব্যাপারে ধর্মীয় চিন্তা, বিশ্বাস বা অনুভূতির তুলনায় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও ক্রিয়া-কলাপ অনেক বেশি কার্যকর। আমরা দেখেছি যে, ধর্মের আন্তর রূপের তুলনায়, বাহ্য রূপই সমাজ-জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। আর ধর্মের অনুষ্ঠানগত দিকটিই হ'ল তার বাহ্য রূপ। একই ধরনের ক্রিয়া ও অনুষ্ঠান পালনের মধ্য দিয়ে একই ধর্মে বিশ্বাসী লোকেদের মধ্যে সংহতি ও ঐক্যবোধ জেগে ওঠে। এই ধর্মীয় ক্রিয়ানুষ্ঠান দু'রকমের হতে পারে। কতকগুলি অনুষ্ঠানপদ্ধতি পালন করা হয় ব্যক্তিগতভাবে, আর কতকগুলি পালন করা হয় দলগতভাবে। অনেক ধর্মীয় অনুষ্ঠান (পূজা, প্রার্থনা ইত্যাদি) ব্যক্তিগত ও পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পালিত হলেও সকলেই একই নিয়মে পূজা করছে বা প্রার্থনা করছে, এই বোধ থাকার ফলে একই ধর্মীয় গোষ্ঠীর সকলেই নিজেদের মধ্যে একতা ও সংহতি বোধ করে। আর যে-সব অনুষ্ঠান সমবেতভাবে পালিত হয় (যেমন, ধর্মীয় সঙ্গীত বা নৃত্যানুষ্ঠান ইত্যাদি) তাদের মাধ্যমেও এই গোষ্ঠী-চেতনায় সংহতি আসা স্বাভাবিক।

ক্রিয়া ও প্রার্থনা-পদ্ধতির ঐক্য ছাড়াও বিশেষ বিশেষ ধর্মে বিশেষ বিশেষ স্থান 'পবিত্র' বা 'পীঠ' বলে বিবেচিত হয়। এই সব স্থানের সঙ্গে সাধারণত বিশেষ দেবতা বা দৈব পুরুষের নাম বা কাহিনী যুক্ত থাকে। ফলে, এই সব স্থানে মন্দির, মসজিদ্ ইত্যাদি গড়ে ওঠে। ধর্ম-জীবনে ও সমাজ-জীবনে এই সব তীর্থক্ষেত্র ও ধর্ম-স্থানের মূল্য অনেক। ধর্ম-বিশ্বাসীরা নিয়মিত পূজা বা প্রার্থনা ছাড়াও এই সব 'পবিত্র' স্থানে সমবেত হয় বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ও উৎসবে। পারস্পরিক আদান-প্রদান ও সামাজিক সংহতি বৃদ্ধির ব্যাপারে এই সব উৎসব, অনুষ্ঠান ও তীর্থক্ষেত্রের অবদান বিশেষ-ভাবে লক্ষণীয়। একই স্থানে একই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করার ফলে

একই ধর্মীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভূত ব্যক্তিদের মধ্যে ঐক্যবোধ গড়ে ওঠে। আবার এই সব বিশেষ পবিত্রস্থান, মন্দির বা ভজনালয়কে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় নতুন আবেগ ও নতুন ক্রিয়াপদ্ধতি, প্রচলিত হয় নতুন নতুন কাহিনী ও গাথা। এইগুলিকে কেন্দ্র করে আবার নতুন জনসংহতি দেখা দেয়।

আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, অনেক সামাজিক রীতিনীতি ধর্মকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। ধর্মীয় ধারণা, বিশ্বাস ও আবেগের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে নৈতিক আদর্শগুলি স্থায়িত্ব লাভ করে। ধর্মীয় ধারণার সঙ্গে যুক্ত থাকে পরম পদার্থের ধারণা। ফলে, ধর্মীয় আদর্শগুলি পরম নিত্য ও অক্ষয় বলে বিবেচিত হয়; এবং ধর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে সমাজের নৈতিক আদর্শগুলিও পরম, নিত্য ও অপরিবর্তনীয় বলে স্বীকৃত হয়। কিন্তু ধর্মীয় আদর্শের সঙ্গে যুক্ত সামাজিক ও নৈতিক আদর্শগুলি পরমতা ও নিত্যত্ব লাভের ফলে এগুলি ক্রমশ সামাজিক রক্ষণশীলতার ভিত্তিরূপে যে কোনও পরিবর্তন ও অগ্রগতির পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়।

অনেক সময় ধর্মের অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াগত দিকের সমতা ও স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য গড়ে ওঠে বিশেষ সামাজিক সংস্থা। সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় এই ধরনের সামাজিক সংস্থার নাম হ'ল ধর্মীয় সংস্থা (Church)। এই ধর্মীয় সংস্থাগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে বিশেষ পুরোহিত সম্প্রদায়। এরাই ধর্মের আনুষ্ঠানিক দিকটির স্থায়িত্ব রক্ষার ব্যাপারে সাহায্য করে। সমাজ-জীবনকে এই সব ধর্মীয় সংস্থা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে। ধর্মীয় সংস্থাই ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানগুলিকে নির্দিষ্ট ও স্থায়ী রূপ দেয়। অতি-মানবীয় সত্তার সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে ধর্মীয় সংস্থার নির্দেশগুলি সাধারণত বিনা বিচারে ও শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয়। ফলে, নির্দিষ্ট ও স্থায়ী ধর্ম-বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়। ধর্মীয় সংস্থা সহজেই ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তিদের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে তাদের সমাজ-জীবনে সংহতি ও শৃঙখলা আনতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে। একই ক্রিয়ানুষ্ঠান, একই নীতি, একই ধর্মীয় নির্দেশ পালন করার ফলে গোষ্ঠীর অন্তর্ভূত সকলেই পরস্পরের সঙ্গে ও সমগ্র গোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে। তাছাড়া অতীন্দ্রিয় ও অতিজাগতিক সত্তার সঙ্গে সম্পর্ক থাকার ফলে অন্যান্য সামাজিক সংস্থার তুলনায় ধর্মীয় সংস্থার প্রতি সাধারণ লোকের আনুগত্য থাকে অনেক বেশি। এই কারণেই ধর্মীয় সংস্থার পক্ষে সর্বসাধারণকে সংহত করা ও নিয়ন্ত্রিত করা সহজে সম্ভব হয়।

সামাজিক সংহতি রক্ষা ও ঐক্যবোধ জাগ্রত করার ব্যাপারে সামাজিক ঐতিহ্যও বিশেষ ভাবে কাজ করে। একই ঐতিহ্যের অংশীদার হিসেবে যে কেবল একই যুগের মানুষে মানুষে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাই নয়, এক

যুগের সঙ্গে আর এক যুগের সম্বন্ধও স্থাপিত হয়। সুতরাং বলা যায়, ঐতিহ্য কেবলমাত্র আন্তর্ব্যক্তিক সংহতিই রক্ষা করে না, আন্তর্যুগীয় সামাজিক সংহতিও গড়ে তোলে। এই সামাজিক ঐতিহ্য গড়ে তোলার ব্যাপারে প্রাচীনকাল থেকেই ধর্ম বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছে। আদি যুগে ধর্মীয় আচার ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কতকগুলি সামাজিক বিধি গড়ে উঠত ও নৈতিক অনুশাসনের সৃষ্টি হ'ত এবং এই নির্দিষ্ট কর্মবিধি ও নীতিকে ভিত্তি করে গড়ে উঠত স্থায়ী মূল্যবোধ ও আদর্শ। ফলে সৃষ্টি হ'ত ঐতিহ্যের। এই ঐতিহ্যের বাহক হিসেবেও ধর্ম সামাজিক সংহতি রক্ষায় বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছে।

নানা ভাবে সামাজিক ঐক্য ও সংহতি রক্ষায় সাহায্য করলেও ধর্ম সমাজে বিভেদ সৃষ্টিকারী শক্তি হিসেবেও কাজ করে এবং নানা ভাবে সামাজিক প্রগতিকে বাধা দেয়। অনেক ক্ষেত্রেই ধর্মবিশ্বাস, ধর্মীয় অনুভূতি ও আচার-অনুষ্ঠানকে ভিত্তি করে সমাজে দেখা দেয় বিভেদ, পার্থক্য ও বিরোধ। যে বিশ্বাস, ধারণা, আবেগ ও ক্রিয়াপদ্ধতি একই ধর্মের অনুগামীদের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের সৃষ্টি করে, সেইগুলিই আবার বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসীদের মধ্যে বিদ্বেষ ও কলহের কারণ হয়। ধর্ম হ'ল সমাজের একটি রক্ষণশীল শক্তি। অবশ্য সামাজিক ঐতিহ্যের বাহক যে-কোন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শক্তিই রক্ষণশীল। কিন্তু রক্ষণশীলতার দিক থেকে ধর্মের বৈশিষ্ট্য হ'ল, ধর্ম অতিমানবীয় ও পরমসত্তার ধারণার সঙ্গে যুক্ত। পরমসত্তার সঙ্গে সম্বন্ধ থাকায় ধর্মীয় ধারণা, নীতি ও অনুশাসনগুলিও সাধারণত পরমতা ও নিত্যত্ব দাবী করে। ফলে, ধর্ম ও ধর্মীয় সংস্থার পক্ষে অন্য কোন নতুন আদর্শকে স্বীকার করে নেওয়া সম্ভব হয় না। যে-সব ধর্মের মধ্যে অন্ধতা বা 'গোঁড়ামি' বেশি, সেই সব ধর্ম অন্য ধর্মের সম্বন্ধে বিশেষভাবে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। ধর্মের ব্যাপারে পরমত-অসহিষ্ণুতার উদাহরণ পাওয়া যায় খ্রীষ্ট ও ইসলাম ধর্মের ইতিহাসে। এই দু'টি বিশ্বজনীন ধর্মই স্বমত প্রচারের উদ্দেশ্যে বল-প্রয়োগকে প্রশ্রয় দিয়েছে। যে-সমাজে একাধিক ধর্মমত প্রচলিত আছে বা যে সমাজে একই ধর্মের মধ্যে একাধিক উপশ্রেণী আছে, সেই সমাজে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা সামাজিক সংহতির পরিবর্তে আনে সামাজিক বিভেদ, বিদ্বেষ ও কলহ। আধুনিক ভারতবর্ষে ধর্মীয় রক্ষণশীলতা ও অসহিষ্ণুতার ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিবাদ ও বিরোধ কিভাবে সমাজ-জীবনকে বিপর্যস্ত করেছে ও সামাজিক সংহতি নষ্ট করেছে তা কারো অবিদিত নয়। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও ধর্ম ও ধর্মীয় ঐতিহ্য যে যুগ যুগ ধরে সামাজিক সংহতি রক্ষায়

কিভাবে সাহায্য করেছে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তও মেলে ভারতীয় হিন্দুধর্মে। ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত বহু পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ধর্মকে ভিত্তি করেই ভারতীয় হিন্দু সমাজের ঐক্য ও সংহতি আজও বজায় আছে।

উপসংহারে বলা যায় যে, সামাজিক সংস্থা হিসেবে ধর্মের শক্তি ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে। বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে ও সাধারণ মানুষের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক চেতনার উন্মেষের ফলে, মানুষের উপর ধর্মের প্রভাব অনেক কমে গেছে। বিভিন্ন সমাজের মধ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ফলেও মানুষের উপর ধর্মের প্রভাব আর তেমন কার্যকর নয়। তাছাড়া, সামাজিক বিবর্তনের ফলে ধর্ম ও ধর্মীয় সংস্থাগুলি পূর্বে যে সব সামাজিক কর্তব্য (শিক্ষা, সেবা ইত্যাদি) পালন করত সেগুলির দায়িত্ব এখন ক্রমশ অন্যান্য সংস্থা গ্রহণ করছে। এর ফলেও সাধারণ মানুষের উপর ধর্মের প্রভাব হ্রাস পাচ্ছে। সবশেষে, মানুষের মধ্যে বিশ্বজনীনতা ও মানবতার আদর্শ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট কোন ধর্মবিশ্বাসের মূল্যও হ্রাস পাচ্ছে। আজ শিক্ষিত মানুষ আর নিজেকে খ্রীষ্টান, হিন্দু বা মুসলমান বলে পরিচয় দিতে গর্ব বোধ করে না। ধর্মীয় গোষ্ঠিচেতনা ও ধর্মান্ধতা আজ নিম্ন মানের শিক্ষা ও সংস্কৃতিরই পরিচায়ক। এই কারণেও ধর্মীয় সংস্থার সামাজিক মূল্য ও প্রভাব কমে এসেছে। সামাজিক সংস্থা হিসেবে ধর্মীয় সংস্থাগুলির ক্রিয়া-কলাপ এখন প্রায়ই শিক্ষা, সেবা, রোগের শুশ্রূষা ইত্যাদি জনহিতকর কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সভ্য ও শিক্ষিত সমাজে ধর্ম প্রচার ও প্রসারের ব্যাপারে এই সব ধর্মীয় সংস্থা প্রায় নিষ্ক্রিয়। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রসার ও বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক পৃথিবীতে ধর্মের নব-মূল্যায়নের সূচনা হচ্ছে। বিশ্বের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা আজ দুটি প্রধান দলে বিভক্ত। একদল চাইছেন মানবজীবনে ধর্ম ও নীতির প্রয়োজনীয়তাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করতে। এঁরা বিশেষভাবে আধুনিক জড়বিজ্ঞান (পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ইত্যাদি) ও গণিতের দ্বারা প্রভাবিত। তাই এঁদের মতে সমাজে বিজ্ঞানের চর্চার প্রসার হওয়া প্রয়োজন, ও সব কিছুকেই জড়বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেই দেখতে হবে, বুঝতে হবে। এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই সমাজ-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। মানুষের নানা জটিল আবেগ ও অনুভূতির মূল্য এঁদের কাছে অনেক কম। এঁরা কয়েকটি প্রধান ও মৌল আবেগকেই স্বীকার করেন এবং সেগুলির ভিত্তিতেই সমাজ-জীবনকে গঠন করতে চা'ন। আরেক দল অবশ্য এতটা জড়বাদী ন'ন। তাঁরা জড়বিজ্ঞানকে অস্বীকার করেন না। কিন্তু মানব-জীবন ও সমাজ-জীবনকে সম্পূর্ণরূপে জড়বাদী

দৃষ্টিতে দেখবারও এঁরা পক্ষপাতী ন'ন। এঁরা মানুষের সমস্ত জটিল অনুভূতি ও আবেগকে বিশ্লেষণ করে কয়েকটি মৌল মানসিক বৃত্তিতে পর্যবসিত করতে রাজি ন'ন। তাই ধর্ম, নীতি, এগুলি এঁদের কাছে একেবারে মিথ্যা ও মূল্যহীন নয়। কিন্তু তাই বলে এঁরা ধর্মের বা নীতির বাহ্য আনুষ্ঠানিকতাকেও স্বীকার করেন না। এঁরা চা'ন ধর্ম ও নীতির আন্তর দিকটি বিশ্লেষণ করে তাদের স্বরূপটি উদ্‌ঘাটিত করতে ও তারই পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম ও নীতির যথার্থ মূল্যায়ন করতে; তাদের অন্ধ আনুষ্ঠানিকতা থেকে মুক্ত করে ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে তাদের উপযুক্ত স্থানটি নির্দেশ করতে। এঁরা মানব-জীবন থেকে ধর্ম ও নীতিকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে চা'ন না। মানব-জীবনে ধর্মীয় চিন্তা ও অনুভূতির মূল্য স্বীকার করে এঁরা চা'ন ধর্মকে বুদ্ধি ও বিচারের ভিত্তিতে সমাজ ও ব্যক্তি-জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে। যুগ যুগ ধরে বাহ্য আচারের বন্ধন কাটিয়ে উন্নত ধর্ম-চিন্তার মধ্যে মানুষ যে সামাজিক আদর্শের অনুসন্ধান করেছে, সাধনা করেছে, তাকে মিথ্যা বা কল্পনা বলার অর্থ মানুষের মনুষ্যত্বকেই অস্বীকার করা। জীবজগতে ধর্ম একান্তভাবেই মানবিক। সুতরাং মানব-জীবনে ধর্মকে অস্বীকার করলে, তার মনুষ্যত্বকে খণ্ডিত করা হয়। তাই ধর্মকে অস্বীকার করার অবাস্তব চেষ্টা বাদ দিয়ে আধুনিক বিজ্ঞান ও নিরপেক্ষ বিচার-বুদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মের নব-মূল্যায়ন বা যথার্থ মূল্যায়ন করতে হবে।

নির্বাচিত পুস্তক তালিকা

1. McIver and Page—Society, An Introductory Analysis.
2. Gorge Galloway—Philosophy of Religion.
3. D. Miall Edwards—The Philosophy of Religion.

সপ্তম অধ্যায়

ধর্ম-বিশ্বাসের বিভিন্ন ভিত্তি

(Grounds of Religious Belief)

1. ধর্ম-বিশ্বাসের সত্যতা

বহু লোকের মনে যে নানারকম ধর্ম-বিশ্বাস আছে এবং এই সব বিশ্বাসের প্রভাবে তারা নানারকম কাজ করে থাকে এবং তার ফলে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সুখ দুঃখ ভোগ করে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু আপাতত আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে এই সব বিশ্বাসের মধ্যে কোনটি সত্য এবং কোনটি মিথ্যা অথবা সেগুলি আদৌ সত্য কিনা, এই সব প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া সম্ভব কিনা সে বিষয়ে আলোচনা করা।

আমরা কখনও কখনও ভয় বা লোভের বশবর্তী হয়ে ঈশ্বর, পরলোক, আত্মার অমরত্ব প্রভৃতিতে বিশ্বাস করে থাকি। আবার, আমরা যে সমাজে বাস করি, অধিকাংশ সময়েই সেই সমাজে প্রচলিত প্রথা বা বিশ্বাস থেকেই আমাদের ধর্ম-বিশ্বাসগুলির জন্ম হয়। কিন্তু কোন কোন মনোভাব বা মানসবৃত্তি থেকে আমাদের ধর্ম-বিশ্বাসগুলির জন্ম হয়, কোন কোন প্রাকৃতিক বা সামাজিক পরিবেশ এই সব বিশ্বাসের পুষ্টির পক্ষে অনুকূল অথবা আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে এই সব বিশ্বাসের উপকারিতা কি?—এই সব প্রশ্ন ছাড়াও আর একটি প্রশ্ন আমাদের মনে উদয় হয়, যথা—এইসব বিশ্বাসের বস্তুগত সত্যতা আছে কিনা? বা এদের সত্যতা নির্ণয়ের জন্য কোন নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড (Criterion) আছে কিনা? ধর্মের তত্ত্ব সম্বন্ধে বিচারে এইটিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

2. প্রত্যাদেশ (Revelation)

আমাদের ধর্ম-বিশ্বাসগুলির সত্যতার প্রকৃত ভিত্তি কি? এবং সেই সত্যতা নির্ণয়ের উপযুক্ত ও নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড কি?—এ সম্বন্ধে নানারকম মত প্রচলিত আছে। ধর্ম-বিশ্বাসের সত্যতার যথার্থ ভিত্তি সম্বন্ধে একটি মত হ'ল এই যে, একমাত্র ভগবৎ-প্রত্যাদেশের (Revelation) উপর

যে ধর্ম-বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত, তা-ই সত্য। বিভিন্ন উৎস থেকে আমাদের ধর্ম-বিশ্বাসের জন্ম হ'তে পারে, কিন্তু কোন ধর্ম-বিশ্বাস যথার্থই সত্য তা নির্ণয় করবার একমাত্র অভ্রান্ত বা নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড হচ্ছে ভগবৎ-প্রত্যাদেশের সঙ্গে এই বিশ্বাসের সঙ্গতি। অর্থাৎ, যদি কোন ধর্ম-বিশ্বাসের পিছনে ভগবৎ-প্রত্যাদেশের সমর্থন থাকে তাহলে তা নিঃসংশয়ে সত্য, আর যদি এই সমর্থন না থাকে তাহলে তার স্বপক্ষে যতই বিচারবুদ্ধিসম্মত যুক্তি থাকুক না কেন, বা এটি যতই চিত্তাকর্ষক হোক না কেন, তা অসত্য এবং বর্জনীয়।

যাঁরা ভগবৎ-প্রত্যাদেশে বিশ্বাসী তাঁদের মতে স্বয়ং ঈশ্বর কখনও কখনও মানুষের মনে ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বগুলি সাক্ষাৎভাবে প্রকাশ করে থাকেন। ধর্মের এই তত্ত্বগুলি জানবার জন্য মানুষের পক্ষে স্বাধীনভাবে বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। এই প্রত্যাদিষ্ট সত্যগুলির প্রকৃতিই এমন যে, যে ব্যক্তি এরূপ প্রত্যাদেশ পেয়েছেন তিনি নিঃসংশয়ে এবং নিঃসঙ্কোচে এগুলিকে অভ্রান্ত বলে বুঝতে পারেন এবং তাঁর মনে অন্য কোনও উপায়ে যে সকল ধর্ম-বিশ্বাসের জন্ম হয়েছে সেগুলি থেকে এগুলিকে পৃথক করতে পারেন। প্রত্যাদেশ দুরকমের হতে পারে—ব্যক্তিগত (Personal revelation) এবং ঐতিহাসিক (Historical) বা সার্বজনীন (Universal revelation)। কোন ব্যক্তিবিশেষ তাঁর ব্যক্তিগত সাধনা ও চিত্ত-শুদ্ধির ফলে এমন এক অবস্থা বা স্তরে পৌঁছতে পারেন যখন তাঁর মন ভগবৎ-প্রকাশিত তত্ত্বকে গ্রহণ করার উপযুক্ত হয়ে ওঠে। সেই বিশেষ ব্যক্তির কাছে বিশেষ অবস্থায় ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন—এটি হল ব্যক্তিগত প্রত্যাদেশ। আবার, ঈশ্বর কখনও কখনও সমগ্র মানব-জাতিকে ধর্মের পথে পরিচালনা করবার জন্য সাক্ষাৎভাবে নিজেকে প্রকাশ করেন এবং অতীন্দ্রিয় জগৎ ও ঐশীসত্তা সম্বন্ধে মানুষের অজ্ঞানতা দূর করে তাকে প্রকৃত জ্ঞান দান করেন। ঈশ্বরের এই আত্ম-প্রকাশ (self-revelation) কোনও ব্যক্তি-বিশেষের অন্তরেই সীমিত নয়; এই আত্ম-প্রকাশ ঘটে সকলেরই জন্য। ঈশ্বর কখনও বা মনুষ্যদেহ ধারণ করে জগতে স্বয়ং অবতীর্ণ হন অথবা কোন প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষের মাধ্যমে তাঁর বাণী প্রচার করেন। ঈশ্বরের এই বাণী যে সব গ্রন্থের আকারে প্রচারিত হয়েছে সেইগুলি শাস্ত্র এবং শাস্ত্রে যে সব তত্ত্বকথা বা আচরণবিধি পাওয়া যায় সেগুলি নিশ্চয়ই অভ্রান্ত এবং নির্দোষ। এই সব ঈশ্বরীয় অবতার ও ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষদের জীবন ও আচরণ থেকে যে কোনও ব্যক্তি ধর্ম ও নীতি সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করতে পারে; এবং শাস্ত্রের উপদেশ

অনুসারে নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করতে পারে। ঈশ্বরকর্তৃক এই ধরনের আত্ম-প্রকাশ ঐতিহাসিক ঘটনা; অর্থাৎ, ঈশ্বর যে বিশেষ বিশেষ কালে এইভাবে মানব-জাতিকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য জগতে আত্ম-প্রকাশ করেছিলেন, ইতিহাস থেকেই আমরা সেকথা জানতে পারি। এই আত্ম-প্রকাশ ঘটেছিল সর্বসাধারণের জন্য, কোনও ব্যক্তি-বিশেষের জন্য নয়। ঈশ্বর যে সব মানুষের দেহ ধারণ করে জগতে আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁরা অবতাররূপে ভক্তদের পূজা পেয়েছেন এবং যে সব প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ ঈশ্বরের বাণী প্রচার করেছেন তাঁরা ধর্ম-প্রবর্তকরূপে শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র বলে সম্মানিত হয়েছেন। এইভাবে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ধর্ম-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে করেন যে, যে সব ধর্ম-বিশ্বাস তাঁদের ধর্মের অনুমোদন পায় কেবল সেইগুলিই সত্য।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহু ব্যক্তিই প্রত্যাদেশে বিশ্বাস করে আসছেন। তাঁদের মতে আমরা যে সব বিশ্বাসকে ধর্ম-বিশ্বাস বলে গণ্য করি, সেগুলির অধিকাংশই হ'ল ঈশ্বর, জীবাত্মা, পরলোক, জীবের বন্ধন, মুক্তি প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব সম্বন্ধে। সাধারণ মানুষের পক্ষে নিজের চেষ্টায়, প্রত্যক্ষজ্ঞান অথবা বিচারবুদ্ধির সাহায্যে এই সব তত্ত্বের জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। ঈশ্বরকে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারিনা, কারণ, তাঁর কোন জড়দেহ নেই। তাঁর অস্তিত্বকে অনুমানের সাহায্যে প্রমাণ করা যায় না, কারণ, এরূপ অনুমানের জন্য যে সব হেতুবাক্যের প্রয়োজন সেগুলিকে দৃশ্যমান জড়-জগৎ থেকেই সংগ্রহ করতে হবে, এবং সসীম জড়বস্তুর জ্ঞানকে ভিত্তি করে ঈশ্বরের অথবা কোনও অতীন্দ্রিয় সত্তার জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। যুক্তি-দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করা যায় না; কারণ, এক বুদ্ধিমান ব্যক্তির যুক্তি অপর একজন অধিক বুদ্ধিমান ব্যক্তি খণ্ডন করতে পারেন, তাঁর যুক্তিও অপর এক ব্যক্তি খণ্ডন করতে পারেন, এবং এই প্রক্রিয়ার কোনও শেষ দেখা যায় না। আবার, অনুভূতি ও ভাবাবেগ ব্যক্তিগত রুচি ও প্রবণতা-সাপেক্ষ। তাদের ভিত্তি করে যে ধর্ম-বিশ্বাস গড়ে ওঠে তার বাস্তব সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। সুতরাং ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আত্মপ্রকাশ বা প্রত্যাদেশ ভিন্ন ধর্মসম্বন্ধে কোন অভ্রান্ত সত্য লাভ করা একেবারেই অসম্ভব।

[খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করেন যে, যীশুখ্রীষ্ট ভগবানের অবতার। খ্রীষ্ট ভগবানের একমাত্র পুত্র এবং পিতা ও পুত্র অভিন্ন। বাইবেলই একমাত্র অভ্রান্ত এবং নির্ভরযোগ্য ধর্ম-শাস্ত্র। হিন্দুরা রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতিকে

ভগবানের অবতার বলে মনে করেন আর সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের মাধ্যমে প্রকাশিত বেদের অভ্রান্ততাতেও বিশ্বাস করেন। মুসলমানেরা বিশ্বাস করেন যে, মহম্মদ ঈশ্বর-প্রেরিত একমাত্র দূত (রসল) এবং প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত মহম্মদের মাধ্যমে প্রচারিত কোরাণ-ই একমাত্র অভ্রান্ত শাস্ত্র]।

3. মরমী অনুভূতি (Mystical experience) ও অতীন্দ্রিয়ানুভূতি (Intuition)

কেউ কেউ মনে করেন যে, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ, অনুমান বা যুক্তিতর্ক প্রভৃতি আমাদের ঈশ্বর বা কোন অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব সম্বন্ধে নির্ভুল জ্ঞান দিতে পারে না। ঈশ্বরকে আমরা সাধারণত নিরাকার চৈতন্যময় পুরুষ বলে কল্পনা করি। কোন জড়বস্তুতে যেসব প্রত্যক্ষগোচর গুণ, যেমন, বিস্তৃতি, রং, শব্দ, গন্ধ, কাঠিন্য, কোমলতা প্রভৃতি থাকে ঈশ্বরে সেইগুলি থাকতে পারে না। সুতরাং কোন দৈহিক ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই ঈশ্বরকে জানবার সম্ভাবনা নেই। আত্মা, পরলোক, পাপপুণ্যের ফল, বন্ধন, মুক্তি সম্বন্ধেও এই কথা সত্য। অনুমান, যুক্তি, তর্ক প্রভৃতিরও প্রাথমিক ভিত্তি হ'ল ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ। সুতরাং এদের সাহায্যেও ঈশ্বর প্রভৃতির জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। যিনি কোন উপায়ে ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ করেছেন তাঁর কাছ থেকে উপদেশ পেযে বা শিক্ষা লাভ করেও ঈশ্বর সম্বন্ধে নির্ভুল জ্ঞান পাওয়া অসম্ভব; কারণ, শিক্ষা বা উপদেশের প্রধান বাহন হ'ল ভাষা, এবং কোন অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব প্রকাশ বা ব্যাখ্যা করার পক্ষে মনুষ্যসমাজে প্রচলিত যে কোনও ভাষা সম্পূর্ণ অনুপযোগী। এইসব ভাষায় যে সকল শব্দ ব্যবহার করা হয়, তাদের অর্থ প্রকাশ করার ক্ষমতা সীমিত। সাধারণত আমরা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি গুণযুক্ত, দেশ ও কালে সীমাবদ্ধ বস্তুকেই শব্দ-দিয়ে প্রকাশ করে থাকি। প্রত্যেক ভাষাতেই আবার শব্দ-বিন্যাসের ভিন্ন ভিন্ন রীতি আছে। এই সকল শব্দ এবং তাদের বিন্যাসের রীতির সাহায্যে ঈশ্বর প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের বর্ণনা করলে সেই বর্ণনা নিশ্চয়ই বিকৃত বা অসম্পূর্ণ হবে। প্রত্যক্ষ এবং প্রত্যক্ষভিত্তিক অনুমান, যুক্তি প্রভৃতি কোন বস্তুর বাহ্য আকার সম্বন্ধেই জ্ঞান দিতে পারে, তার স্বরূপের কোনও পরিচয় দিতে পারে না। দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া, সম্বন্ধ প্রভৃতি ধারণা বা বৌদ্ধিক প্রকারের (Categories) সাহায্যে যখন আমরা চরম সত্তাকে (Ultimate Reality) জানবার চেষ্টা করি তখন তারা আমাদের বিষয়বস্তুর নিজস্ব রূপকে বিকৃত করে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে। আবার, সাধারণ জ্ঞানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই দুইয়ের পার্থক্যবোধ থাকে। আমার কাছে

আমার জ্ঞেয় বস্তু একটা বাহিরের বস্তু এবং আমার পক্ষে সেই বস্তুর অন্তরে প্রবেশ করা অসম্ভব। কিন্তু মানুষের পক্ষে এমন একটা মানসিক অবস্থা লাভ করা সম্ভব যখন বিষয়ী ও বিষয়ের প্রভেদ থাকে না, অথবা কোন বৌদ্ধিক প্রকারেরও প্রয়োজন থাকে না। মনের এই অবস্থাকে মরমী অনুভূতি (Mystic experience) বলা হয়। এই অনুভূতিতে ঈশ্বর বা চরম সত্তার এক রকম অপরোক্ষ (Direct) জ্ঞান হয়ে থাকে, যে জ্ঞানে বিষয়ী ও বিষয়ের কোনও ভেদ থাকে না, এক অদ্বিতীয় নির্মল সত্তার প্রকাশ ছাড়া আর কিছু থাকে না। এই অনুভূতিতে আমাদের সমস্ত সংশয় ও অনিশ্চয়তার সমাপ্তি ঘটে এবং আমরা চরম সত্তার সাক্ষাৎ পাই। বস্তুত এরূপ অনুভূতিকে জ্ঞান বলা যায় না ; কারণ, এতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের প্রভেদ নেই এবং এর সত্যতা পরীক্ষা করার কোনও মানদণ্ড (Criterion) নেই। এ এক মানসিক অবস্থা সেখানে সত্য-মিথ্যার কোন প্রশ্ন ওঠে না। যাঁর ভাগ্যে এরূপ অনুভূতি ঘটে তিনি লাভ করেন পরম তৃপ্তি, তাঁর জীবনে আসে চরম পরিপূর্ণতা।

মরমী অনুভূতি বলতে ঠিক কি বোঝা উচিত উপরে তার ব্যাখ্যা দেওয়া হ'ল। এরকম অনুভূতিতে যখন কোনও ভেদবুদ্ধি থাকে না তখন এর মাধ্যমে কোনও বিশেষ বস্তুর কোনও বিশেষ জ্ঞান হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু অনেক মরমীয়া ভাবুক ও সাধক মনে করেন যে, এই অনুভূতির মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ বস্তুর বা সম্বন্ধের জ্ঞান হওয়াও সম্ভব। তাঁরা দাবী করেন যে, সাধারণ মানুষের পক্ষে যে সকল সত্যের জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব তাঁরা কোন অলৌকিক শক্তির সাহায্যে সেই সকল সত্যের জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম। এই মতানুসারে মরমী অনুভূতি হচ্ছে অতীন্দ্রিয় অপরোক্ষ অনুভূতি (Non-sensuous, non-inferential apprehension or intuition)। সাধারণ লোকেরা যেখানে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের বা যুক্তির সাহায্যে কোন সত্য লাভ করার চেষ্টা করে অকৃতকার্য হয়, মরমী সাধক বা ভাবুক সেখানে অক্লেশে কোনও রকম বিচার-বুদ্ধি-ঘটিত মনন-ক্রিয়ার সাহায্য না নিয়েও সেই সত্যকে আয়ত্ত করতে পারেন। সাধারণ লোকেরা তাদের মনে ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সব বিশ্বাস পোষণ করে, সেগুলির অধিকাংশই অস্পষ্ট, শিথিল এবং অস্থির। এগুলির সত্যতা সম্বন্ধে তাদের মনে সর্বদাই সন্দেহ। কিন্তু অতীন্দ্রিয় অপরোক্ষ অনুভূতি যে সকল বিশ্বাসের মূল ভিত্তি সেগুলি সুস্পষ্ট, দৃঢ় এবং অবিচল। সেগুলির সত্যতা সম্বন্ধে ভাবুক বা সাধকের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। সে-গুলি প্রকৃতপক্ষে কখনও পরস্পর-বিরোধী হতে পারে না। এই ধরনের

অনুভূতি (Intuition)-কে যদি মরমী অনুভূতি বলা হয়, তাহলে এই অনুভূতি যে সকল ধর্ম-বিশ্বাসের মূল ভিত্তি কেবলমাত্র তারাই সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য হ'তে পারে।

মরমী অনুভূতি (Mystic experience) এবং অতীন্দ্রিয়ানুভূতি (Intuition)র মধ্যে এইভাবে পার্থক্য করা যেতে পারে (যদিও এই পার্থক্য সর্বক্ষেত্রে করা হয় না): মরমী ভাবুকেরা (Mystics) যে ধরনের অনুভূতির দাবী করেন তাতে ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতির কোনও সুস্পষ্ট বা সুনির্দিষ্ট জ্ঞান হওয়া সম্ভব বলে মনে হয় না। এ একরকম মানসিক অবস্থা যেখানে সমস্ত ভেদ-বুদ্ধির লোপ হয়। অতীন্দ্রিয়ানুভূতিতেও ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বা যুক্তিতর্কের সাহায্য না নিয়েও সাক্ষাৎভাবে সত্যের উপলব্ধি হ'তে পারে, কিন্তু এই অনুভূতিতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ভেদ লুপ্ত হয় না, জ্ঞানের একটা নির্দিষ্ট বিষয় থাকে এবং সেই বিষয় সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকে। কেবল ধর্ম-বিশ্বাস নয়, অন্য ধরনের বিশ্বাসের ভিত্তিও এই রকম অনুভূতি (Intuition) হ'তে পারে। "2+2=4"—এই বচনে "2+2" এবং "4"—এই দুইয়ের যে সম্বন্ধ তা আবশ্যিক, অর্থাৎ, সর্ব দেশ ও সর্ব কাল ও সকল প্রকার অবস্থা-নিরপেক্ষ। এই বিশ্বাস কোনও ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ অথবা যুক্তি-তর্কের উপর নির্ভর করে না। '2', '4' '+' '=' এই প্রতীকগুলির অর্থের সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে এমন যে কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তিই "2+2=4"—এই বচনের অভ্রান্ততা স্বীকার করবেন। আবার, আমার দৃষ্ট কোন জিনিষের সাদা রং অন্য একটি জিনিষের কালো রং থেকে ভিন্ন এই জ্ঞানকে ভিত্তি করে (অথচ কোনও অনুমানের নিয়ম অনুসরণ না করে) আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি যে, বিশ্বজগতের সর্বত্রই সাদা রং এবং কালো রং এর মধ্যে ভেদ থাকবে। এইভাবে ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক প্রভৃতি সম্বন্ধেও অতীন্দ্রিয়ানুভূতির সাহায্যে নির্ভুল জ্ঞান লাভ হ'তে পারে।

মরমী অনুভূতি এবং অতীন্দ্রিয়ানুভূতির এই ভেদরেখা যদিও সকলের কাছে খব স্পষ্ট নয় তবু ধর্ম-বিশ্বাসের ভিত্তি সম্বন্ধে যথাযথ আলোচনা করতে গেলে এই পার্থক্য করা প্রয়োজন।

4. শ্রদ্ধা (Faith)[1]

কেহ কেহ বলেন যে, একমাত্র শ্রদ্ধা (Faith)ই ধর্ম-বিশ্বাসের প্রকৃত

---

1 ইংরাজী 'Faith' শব্দটি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ধর্মীয় ব্যবহারে যুক্তি, তর্ক, অনুমান প্রভৃতির সাহায্য না নিয়ে কেবলমাত্র নিজের তৃপ্তি-

ভিত্তি হ'তে পারে। বিচার-বুদ্ধির উপর যে ধর্ম-বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত তার সত্যতা কখনও সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত হতে পারে না, আর সকলের পক্ষে মরমী অনুভূতি বা অতীন্দ্রিয়ানুভূতি লাভও সম্ভব নয়। সুতরাং ধর্ম-বিশ্বাসের যদি কোনও সুদৃঢ় ভিত্তি থাকে তাহলে সেটা হবে শ্রদ্ধা। ধর্ম-প্রাণ ব্যক্তি যদি নিষ্ঠার সঙ্গে কোন ধর্ম-বিশ্বাস পোষণ করেন তাহলে তাঁর সেই নিষ্ঠাই তাঁকে প্রকৃত সত্যের পথ দেখিয়ে দেবে।[1] এজন্য তাঁর পক্ষে কোনও কষ্টসাধ্য মনন-ক্রিয়ার প্রয়োজন নেই। কোন ধর্ম-বিশ্বাস প্রথমে যে আকারে তাঁর মনে উদয় হয় তার কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন হ'লে কিভাবে সেই পরিবর্তন করতে হবে তাঁর শ্রদ্ধাই সেটা বলে দেবে এবং বিরোধী যুক্তি-তর্ক তাঁকে বিচলিত করবে না। তাঁর অন্তরের প্রেরণাই তাঁকে ক্রমে ক্রমে পরিপূর্ণ সত্যের দিকে নিয়ে যাবে।

5. বিচার-বুদ্ধি (Reason)

মানুষ বিচার-বুদ্ধি-বিশিষ্ট প্রাণী (Rational animal)। এই বিচার-বুদ্ধিই মানুষকে অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথক করে রেখেছে। বিচার-বুদ্ধির অধিকারী বলেই মানুষ সত্য ও মিথ্যা, সাধারণ সত্য ও বিশেষ সত্য, সদ্বস্তু ও অবভাসের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে, সত্যতার মানদণ্ড নির্ণয় করবার প্রয়োজন অনুভব করে। দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে কোন বিষয় নিয়ে মতান্তর হলে একব্যক্তি অপরদের যুক্তিতর্কের মাধ্যমে নিজের মতে আনবার চেষ্টা করতে পারে। বিচার-বুদ্ধি আছে বলেই নানা বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়েছে, মানুষের পক্ষে সুশৃঙ্খল সমাজ-জীবন ও রাষ্ট্র-জীবন গঠন করা সম্ভব হয়েছে। এক কথায়, বিচার-বুদ্ধির অধিকারী বলেই মানুষ আত্ম-কেন্দ্রিক কল্পনা-জগতের গণ্ডী ছাড়িয়ে বাস্তব-জগৎ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানলাভ করবার এবং সেই জ্ঞানানুসারে আপন জীবন নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতার দাবী রাখে।

অনেক ধর্ম-প্রাণ ব্যক্তির মতে জাগতিক ব্যাপার সম্বন্ধে সত্যানুসন্ধানের ক্ষেত্রে এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে আমাদের নির্ভুল পথে চালনা করবার জন্য আমাদের বিচার-বুদ্ধির মুখ্য ভূমিকা থাকলেও আমাদের ধর্ম-জীবনে বিচার-বুদ্ধির ভূমিকা অতি গৌণ। আমাদের ধর্ম-চেতনা থেকে

লাভের জন্য, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে কোনও কিছু বিশ্বাস করার প্রবণতাকে Faith বলা যায়। 'শ্রদ্ধা' শব্দটি এই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

1 "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্"—গীতা ৪।৩৯

যে সব বিশ্বাসের সৃষ্টি হয় সেগুলির বাস্তব সত্যতা সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করবার ক্ষমতা বিচার-বুদ্ধির নেই; সুতরাং এই সব বিশ্বাসের সত্যতা নির্ণয়ের জন্য ভগবৎ-প্রত্যাদেশ, অতীন্দ্রিয়ানুভূতি প্রভৃতির উপর নির্ভর করতে হবে, এবং এইসব বিভিন্ন উপায়ে প্রাপ্ত বিশ্বাসগুলির সঙ্গে বিচার-বুদ্ধির বিরোধ উপস্থিত হলেও ঐগুলিকেই গ্রহণ করতে হবে।

6. ভগবৎ-প্রত্যাদেশবাদ, মরমী অনুভূতিবাদ প্রভৃতির সমালোচনা

আমরা পূর্বেই এইরকম কতকগুলি মতবাদের বিবরণ দিয়েছি। ধর্ম-জীবনে বিচার-বুদ্ধির স্থান কোথায় তা নির্ণয় করার জন্য এই সব মতবাদের সমালোচনা করা আবশ্যক।

প্রথমে প্রত্যাদেশবাদীদের কথাই ধরা যাক্। ভগবৎ-প্রত্যাদেশের মাধ্যমে ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল সত্য আমাদের নিকট প্রকাশিত হয় সেগুলির প্রত্যেকটিই অভ্রান্ত সত্য—প্রত্যাদেশবাদীদের এই দাবী যদি যথার্থই গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে এক প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির বাণীর সঙ্গে অপর এক প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির বাণীর কোনও বিরোধ থাকা উচিত নয়। যে সকল গ্রন্থে এই সব প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তিদের বাণী সংগ্রহ করা হয়েছিল তাদের পরস্পরের মধ্যেও কোনও বিরোধ থাকা উচিত নয়। কিন্তু বস্তুত বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের শাস্ত্রগুলির মধ্যে নানা বিষয়ে বিরোধ দেখা যায়। কোন ধর্মশাস্ত্র এক বিশেষ ঐতিহাসিক ব্যক্তিকে মানব-জাতির একমাত্র পরিত্রাতা বলে নির্দেশ করে, অপর এক ধর্মশাস্ত্র ঠিক ঐভাবেই অপর এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিকে জগতে ঈশ্বরের একমাত্র প্রতিনিধি ও মানবজাতির একমাত্র পরিত্রাতা বলে নির্দেশ করে। এক শাস্ত্রে পরলোক সম্বন্ধে এক কথা বলা হয়েছে, অপর এক শাস্ত্রে পরলোক সম্বন্ধে অন্য কথা বলা হয়েছে (যেমন খ্রীষ্টীয় ধর্ম-শাস্ত্রে জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত হয় না, কিন্তু হিন্দুদের শাস্ত্রে স্বীকৃত হয়)। কোন শাস্ত্রে উপাস্য দেবতার সম্মুখে পশুবলি দেওয়ার বিধান আছে, কোন শাস্ত্রে অহিংসাকে পরম ধর্ম বলা হয়েছে। বিভিন্ন শাস্ত্রের উক্তিগুলি যদি এইভাবে পরস্পরবিরোধী হয়, তাহলে তাদের প্রত্যেকটি অভ্রান্ত সত্য হতে পারে না; কোনটি সত্য কোনটি মিথ্যা হতে পারে অথবা সবগুলিই মিথ্যা হতে পারে। কিন্তু কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির সম্মুখে এরূপ পরস্পরবিরোধী উক্তি থাকলে তিনি বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করতে বাধ্য; কারণ, দুটি পরস্পর-বিরোধী উক্তি একই সময়ে একই অর্থে একই বস্তু সম্বন্ধে সত্য হতে পারে না—এটা বিচার-বুদ্ধির একটি মূল নিয়ম। কিন্তু

বিচারবুদ্ধির সাহায্যে দুটি পরস্পর বিরোধী উক্তির সত্যতা বিচার করার অর্থই হ'ল তাদের নিঃসর্ত অভ্রান্ততা অস্বীকার করা। এ অবস্থায় কোন বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিবা দাবী করতে পারেন যে, একমাত্র তাঁদের ধর্মশাস্ত্রই অভ্রান্ত, অন্য সম্প্রদায়গুলির ধর্মশাস্ত্র অসম্পূর্ণ বা ভ্রমপূর্ণ। কিন্তু প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা যদি অনুরূপ দাবী করেন (এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা করে থাকেন), তাহলে তাঁরা হয় বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করবেন, নতুবা ধর্ম-বিশ্বাসগুলির সত্যতার প্রশ্ন অমীমাংসিতই থেকে যাবে। সুতরাং ধর্ম-বিশ্বাসের সত্যতা নির্ণয়ের ব্যাপারে বিচার-বুদ্ধিকে অবহেলা করা চলে না। বিভিন্ন ধর্মপ্রবর্তকদের বাণী এবং বিভিন্ন ধর্ম-শাস্ত্রের উক্তিগুলির মধ্যে অনেকক্ষেত্রে বিরোধিতা ত আছেই, তার উপর এই সব বাণী ও উক্তিব সঙ্গে সুপ্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলিরও বিরোধ দেখা যায়। যেমন, বাইবেলে প্রাণী ও মনুষ্য-জাতির উৎপত্তিসম্বন্ধে যে বর্ণনা দেওয়া আছে, আধুনিক বিজ্ঞান তাকে ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করেছে। এসব বিষয়ে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তকে অবহেলা ক'রে শাস্ত্রীয় বর্ণনাকেই সত্য বলে গণ্য করার দাবী সম্পূর্ণ অচল; কারণ, এই দাবী মানতে হলে সমগ্র বিজ্ঞানকেই অস্বীকার করতে হয়। কিন্তু যদি কোন ধর্মশাস্ত্রের একাংশে কোন ভ্রম থাকে তাহলে অন্যান্য অংশের অভ্রান্ততা সম্বন্ধেও সন্দেহ হতে পারে। সুতরাং এক্ষেত্রেও ধর্ম-প্রবর্তকদের বাণী ও বিভিন্ন শাস্ত্রের উক্তিমাত্রই যে অভ্রান্ত সত্য এবং সত্যনির্ণয়ের ব্যাপারে ধর্ম-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিচার-বুদ্ধির কোনও ভূমিকা নেই, এই দাবী গ্রহণযোগ্য নয়।

এরকম পরিস্থিতিতে প্রত্যাদেশবাদীরা কয়েকটি পন্থা অবলম্বন করতে পারেন। কোন এক বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরা বলতে পারেন যে, তাঁদের নিজেদের ধর্মশাস্ত্রে ধর্ম-বিশ্বাসের বিষয়গুলি সম্বন্ধে যে সব উক্তি করা হয়েছে একমাত্র সেইগুলিই অভ্রান্ত সত্য, এবং অন্যান্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের শাস্ত্রগুলিতে যে সব উক্তি করা হয়েছে সেগুলির অধিকাংশই মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর; কারণ, তাঁদের আপন ধর্ম-মতগুলিকে যুক্তিদ্বারা সমর্থন করা যায়, কিন্তু অন্যান্য শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম-মতগুলিকে যুক্তিদ্বারা সমর্থন করা যায় না। কিন্তু যেহেতু যুক্তি দিয়ে কোন মত সমর্থন বা খণ্ডন করতে হ'লে বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগ আবশ্যক, সেইহেতু 'প্রত্যাদিষ্ট' বলে চিহ্নিত কোন উক্তি বা মতবাদকেই বিনা বিচারে অভ্রান্ত সত্য বলে গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং, ধর্ম-বিশ্বাসগুলি মহাপুরুষদের বাণী (আপ্তবাক্য) অথবা শাস্ত্রীয় উপদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও সেগুলির সত্যতানির্ণয়ের ব্যাপারে বিচার-বুদ্ধির ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। প্রত্যাদেশবাদী বা শাস্ত্র-

প্রমাণবাদীরা অনেক সময়ে বলেন যে, আমরা শাস্ত্র-বাক্যের প্রকৃত মর্ম বুঝতে পারিনা বলেই শাস্ত্র-বাক্যের সঙ্গে বিচার-বুদ্ধির বিরোধ আছে, অর্থাৎ, শাস্ত্র-বাক্য অযৌক্তিক, এরকম মনে করি। কিন্তু শাস্ত্র-বাক্যের প্রকৃত মর্ম বুঝলে আমাদের মত পরিবর্তন করতে বাধ্য হব। সেইজন্য শাস্ত্র-বাক্যের নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যার প্রয়োজন। সেইজন্যই ধর্ম-বিৎ পণ্ডিতেরা প্রত্যেক শাস্ত্রেরই ব্যাখ্যা-পুস্তক বা ভাষ্য রচনা করেছেন। কিন্তু এতেই সমস্যার সমাধান হয় না। কারণ, শাস্ত্র-বাক্যের প্রকৃত মর্ম বোঝাবার জন্য যেসব ভাষ্য রচনা করা হয়েছে তাদের মধ্যেই মতভেদ এবং বিরোধ দেখা যায়, এবং কোন ভাষ্য নির্ভুল এবং কোন ভাষ্য ভ্রান্তিপূর্ণ সেটা মীমাংসা করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অর্থাৎ, শাস্ত্রবাক্যগুলির সত্যতা পরীক্ষার জন্য বিচার-বুদ্ধির সাহায্য নেওয়া অপরিহার্য। "বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম-মতগুলির মধ্যে বিরোধিতা থাকায় শাস্ত্রগুলিকে অভ্রান্ত সত্যের আকর বলে স্বীকার করা যায় না, সুতরাং তাদের সত্যতা পরীক্ষার জন্য বিচার-বুদ্ধির সাহায্য নেওয়া আবশ্যক"—এই আপত্তি খণ্ডন করার জন্য কেহ কেহ বলেন যে, সব ধর্ম-মতই সত্য ("যত মত তত পথ")। প্রত্যেক ধর্ম-মতই যখন ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষদের বাণী ও উপদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত, তখন কোন ধর্ম-মত বা ধর্ম-বিশ্বাসই মিথ্যা হতে পারে না। প্রকৃত শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে যে কোন ধর্ম-মত অনুসারে চললেই আমাদের ইষ্ট-সিদ্ধি হতে পারে। এই মতবাদ আমাদের ধর্ম সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণতা বা ধর্মান্ধতা (fanaticism) পরিহার করতে শিক্ষা দেয়, একথা সত্য, কিন্তু বিশেষভাবে বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, এটি প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধিক আলস্যের পরিচায়ক। এই মতবাদ স্বীকার করে নিলে আমরা যে কোনও ভ্রান্ত বিশ্বাস, কুসংস্কার, বিজ্ঞানবিরোধী উক্তি, কাল্পনিক কাহিনী প্রভৃতিকে অভ্রান্ত সত্য বলে বিনা বিচারে মেনে নিতে বাধ্য হব। কারণ, যে কোনও ব্যক্তি নিজের ইচ্ছা ও পছন্দানুযায়ী যে কোনও মতবাদকে শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত বা কোনও প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষের নিকট হ'তে সাক্ষাৎভাবে প্রাপ্ত বলে দাবী করতে পারেন এবং জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করতে পারেন; এবং এই মতবাদকে বিচার-বুদ্ধি দিয়ে পরীক্ষার অধিকার আমাদের থাকবে না। কোন মত যথার্থই কোন শাস্ত্রবাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, কোন মতটি নয়, তা নির্ণয় করতে হলেও যুক্তিতর্কের অর্থাৎ বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগের প্রয়োজন। আর, বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের প্রয়োজন যদি একেবারেই অস্বীকার করা হয়, অর্থাৎ, যদি কোন প্রত্যাদেশবাদী বলেন যে, ধর্ম-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষদের বাণী অথবা শাস্ত্র-বাক্যের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠাই

সত্য-নির্ণয়ের একমাত্র মানদণ্ড, এবং কোন ধর্ম-বিশ্বাস যথার্থই সত্য কিনা তা স্থির করবার জন্য তাকে বিচার-বুদ্ধির কষ্টি পাথরে যাচাই করার কোনও প্রয়োজন নেই, তাহলে শেষ পর্যন্ত সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য লুপ্ত হয়ে যায়। আমি যদি যে কোনও মত বা বিশ্বাসকে প্রত্যাদিষ্ট সত্য বলে স্বীকার করেই সন্তোষ লাভ করতে পারি, তাহলে সত্যতা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ব্যাপারে পরিণত হয়, এবং কেবলমাত্র ধর্ম-সংক্রান্ত ব্যাপারে নয়, যে কোন ক্ষেত্রেই এই উক্তি প্রযোজ্য হবে। 'এই বাক্য অথবা মতবাদ সত্য' এর অর্থ যদি কেবলমাত্র এই হয় যে, এটি কোন ব্যক্তিবিশেষকে তৃপ্তি বা আনন্দ দিতে পারে, তাহলে "আমি এই মত বিশ্বাস করে তৃপ্তি বা আনন্দ পাই" এবং "এই মত সত্য" এই দুইটি বাক্যের মধ্যে 'অতএব' এই সংযোজক শব্দের ব্যবহারের কোনই অর্থ হয় না। 'এই মতটি সত্য' বললে 'এই মতটি কোন ব্যক্তি-বিশেষকে তৃপ্তি বা আনন্দ দেয়', এর অতিরিক্ত কিছু বোঝান উচিত, যথা, 'এই মতের অনুরূপ কোন বস্তু বা বস্তু-সমষ্টি বহির্জগতে আছে', অথবা 'এই মত ও অন্যান্য মতের মধ্যে সঙ্গতি আছে,' 'এই মত গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে হিতকর' ইত্যাদি। 'কোন বাক্য বা মত সত্য' এইটুকু বলাই যথেষ্ট নয়, সত্যতাকে যাচাই করার জন্য একটি মানদণ্ডের প্রয়োজন এবং এই মানদণ্ড এমন হওয়া উচিত যা সকলেই প্রয়োগ করতে পারে। কিন্তু কোন মানদণ্ড প্রয়োগ করে কোন বাক্য বা মতের সত্যতা নির্ণয় করতে গেলে বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগের প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক গবেষণায়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার আলোচনায়, প্রতিদিনকার জীবনযাত্রার ব্যাপারেও এই কথা মেনে নিতে হবে। সুতরাং, ধর্ম-বিশ্বাসের সত্যতার একমাত্র ভিত্তি ভগবৎ-প্রত্যাদেশ, এই মত গ্রহণযোগ্য নয়।

আমরা পূর্বেই ঐতিহাসিক সার্বজনীন প্রত্যাদেশ আর ব্যক্তিগত প্রত্যাদেশের মধ্যে পার্থক্য করেছি। উপরে সার্বজনীন প্রত্যাদেশবাদের সমালোচনা করা হ'ল। এখন ব্যক্তিগত প্রত্যাদেশবাদের সমালোচনা করা যেতে পারে। সার্বজনীন প্রত্যাদেশবাদীদের মতে ঈশ্বর সমগ্র মানব জাতির উপকারের জন্য কোন একবিশেষ সময়ে কোন এক বিশেষ ব্যক্তির মাধ্যমে মাত্র একবারই অতীন্দ্রিয় বা বুদ্ধ্যতীত তত্ত্বগুলি প্রকাশ করেছিলেন। যে ব্যক্তির মাধ্যমে এই তত্ত্বগুলি প্রকাশিত হয়েছিল তিনি একজন অনন্য-সাধারণ মহাপুরুষ। ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকার জন্যই ঈশ্বর নিজের কাজের জন্য তাঁকে প্রতিনিধি মনোনীত করেছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগত প্রত্যাদেশবাদীদের মতে ঈশ্বর যে কোনও ব্যক্তির কাছেই আত্ম-প্রকাশ করতে পারেন এবং নিগূঢ় তত্ত্বগুলির জ্ঞান দিতে পারেন। কোন

ব্যক্তির কাছে ঈশ্বর আত্ম-প্রকাশ করবেন কিনা তা নির্ভর করে সেই ব্যক্তির বুদ্ধি, নৈতিক চরিত্র ও অধ্যাত্ম-সাধনার উপর। বুদ্ধিমান, নির্মলচরিত্র, ভাবুক বা সাধক কখনও কখনও উপলব্ধি করেন যে, তিনি এমন কতকগুলি সত্যের সন্ধান পেয়েছেন যেগুলি তাঁর নিজের চেষ্টায় অর্জিত হয় নি; পরন্তু, স্বয়ং ঈশ্বর এগুলি সাক্ষাৎভাবে তাঁর কাছে প্রকাশ করেছেন। সত্যের সন্ধানে রত দুর্বল মানুষের স্বাধীন প্রচেষ্টা হয়ত সফল নাও হতে পারে, কিন্তু যিনি ভগবৎ-কৃপা লাভ করেছেন তিনি যে নিশ্চয়ই প্রকৃত জ্ঞান লাভ করবেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এইভাবে তিনি যে জ্ঞান লাভ করেন তা বিচার-বুদ্ধির আয়ত্তে নয়, কোনও যুক্তি-তর্ক প্রয়োগ করে তা পাওয়া যায় না।

এই মতের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, যদি স্বীকার করেও নেওয়া যায় যে, ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট হয়ে কোন অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের জ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর, তাহলেও তাঁর কোন বিশ্বাসগুলি ঈশ্বর-প্রত্যাদেশের ফল আর কোনগুলি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, ইচ্ছা, সংস্কার, সামাজিক পরিবেশ ইত্যাদির ফল তা স্থির করা কঠিন। আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞান ও অনুমানে যেমন ভ্রম থাকতে পারে ঠিক তেমনই নিশ্চয়তার অনুভূতিতেও ভ্রম থাকতে পারে। অর্থাৎ, যে ধর্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে আমার নিশ্চিত অনুভূতি এই যে, এটি ঈশ্বরের নিকট থেকে সাক্ষাৎভাবে প্রাপ্ত, সেটি প্রকৃতপক্ষে এক বা একাধিক নির্জ্ঞান অনুমানের সিদ্ধান্ত, ভাবানুষঙ্গের (Association of ideas) ফল ইত্যাদি হ'তে পারে। শেষোক্ত শ্রেণীর বিশ্বাসগুলি নিশ্চয়ই বিচার-বুদ্ধির বিষয়-বস্তু হতে পারে এবং এগুলিকে প্রথমশ্রেণীর বিশ্বাসগুলি থেকে পৃথক্ করবার জন্যও বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করার প্রয়োজন হ'তে পারে। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বিশ্বাসগুলির মধ্যে যদি এতই সাদৃশ্য থাকে যে, তাদের পরস্পর থেকে পৃথক্ করা অতীব কঠিন, তাহলে তাদের মধ্যে কতকগুলিকে বিচার-বুদ্ধি দ্বারা পরীক্ষা করা যেতে পারে না আর কতকগুলিকে করা যায়, এরকম মত সমর্থন করার অযোগ্য। প্রত্যাদেশবাদীরা বলেন যে, 'আমাদের সসীম ও অ-পূর্ণ বিচারবুদ্ধির সাহায্যে চরম সত্যের (Absolute truth) জ্ঞান হয় না'। কিন্তু তাঁরা নিজেরাই প্রকারান্তরে সকল তত্ত্ব সম্বন্ধেই যুক্তিতর্কের প্রামাণিকতা ও উপযোগিতা স্বীকার করে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, যখন তাঁরা বলেন যে, "এক বুদ্ধিমান ব্যক্তির যুক্তি অপর এক অধিকতর বুদ্ধিমান ব্যক্তি খণ্ডন করতে পারেন, অতএব যুক্তির দ্বারা কোনও সত্য নির্ণয় করা যায় না," অথবা যখন তাঁরা বলেন যে, "আমাদের, অর্থাৎ, সসীম জীবদের বুদ্ধিবৃত্তির গঠনই এইরকম যে, এর সাহায্যে অসীম, সর্বনিরপেক্ষ সত্তার জ্ঞান হ'তে

পারে না", তখন তাঁরা নিজেরাই যুক্তির (অর্থাৎ বিচার-বুদ্ধির) সাহায্য নিয়েই যুক্তির অসারতা বা অপ্রামাণিকতা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন। কেউ যখন বলেন যে, ঈশ্বরের প্রকৃতিই এইরূপ যে, আমরা যে কোনও বিশেষণে তাঁকে বিশেষিত করিনা কেন, সেই প্রকৃতিকে যথাযথভাবে ব্যক্ত করতে পারি না, তখন তিনি ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের কিছু জ্ঞান হ'তে পারে এইটাই প্রকারান্তরে স্বীকার করছেন। কোন বস্তুর প্রকৃতি যদি সম্পূর্ণভাবেই আমাদের বিচার-বুদ্ধির অতীত হয়, তাহলে সেটি যে আমাদের বিচার-বুদ্ধির অতীত তা' জানাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রত্যাদেশ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে আমাদের ঈশ্বর-তত্ত্বের জ্ঞান হওয়া অসম্ভব এই মত গ্রহণ করা যায় না। যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, ঈশ্বর কোন এক বিশেষ প্রণালীর সাহায্যে তাঁর ভক্তের কাছে কতকগুলি অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের জ্ঞান প্রকাশ করেন, তাহলে সেই ব্যক্তির পক্ষে এই জ্ঞানকে আয়ত্ত করার ক্ষমতা আছে এটা স্বীকার করতে হ'বে। কোনও প্রস্তর-খণ্ডের কাছে ঈশ্বরের আত্ম-প্রকাশ করা অসম্ভব। বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীবের কাছেই যদি ঈশ্বর আত্ম-প্রকাশ করেন, তাহ'লে ঈশ্বরের নিকট প্রাপ্ত অতীন্দ্রিয় তত্ত্বগুলি যে আমাদের বুদ্ধির অগম্য, একথা বলা সম্পর্ণ অযৌক্তিক হবে। আবার, বিভিন্ন ব্যক্তিরা যখন তাঁদের প্রত্যাদেশলব্ধ সত্যগুলিকে ভাষার মাধ্যমে সকলের কাছে প্রচার করবার চেষ্টা করেন, তখন এই তথা-কথিত অভ্রান্ত সত্যগুলির মধ্যেও বিরোধ দেখা যায় এবং তখন তাদের মধ্যে কোনটি প্রকৃত সত্য এবং কোনটি নয়, তা নির্ণয় করতে গেলে বিচার-বুদ্ধির সাহায্য নেওয়া অপরিহার্য। সুতরাং যাকে সাধারণত প্রত্যাদেশ বলা হয়, সেটি যে বিচার-বুদ্ধির আলোচনা-পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া এবং এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের কাছে যে সকল সত্য প্রকাশিত হয় সেগুলি বিচার-বুদ্ধির আয়ত্তে নয়, এরূপ মনে করা ভুল।

7. প্রত্যাদেশ ও বিচারবুদ্ধির মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য নেই

প্রত্যাদেশকে প্রচলিত অর্থে নিলে মনে হতে পারে যে, প্রত্যাদেশ আর বিচার-বুদ্ধির (Revelation and Reason) মধ্যে অবশ্যই বিরোধ থাকবে। জাগতিক কোন বস্তু বা ঘটনা সম্বন্ধে কোন উক্তি বা মতকে সত্য বলে গ্রহণ করার আগে তাকে বিচার করে দেখার চেষ্টা করা বুদ্ধির স্বভাব। যে সব উক্তি বা মতের পিছনে যুক্তি, তর্ক, অনুমানের সমর্থন নেই, সেগুলিকে বুদ্ধি সত্য বলে স্বীকার করে না। কিন্তু প্রত্যা-

দেশবাদীদের মতে এমন কতকগুলি নিগূঢ় সত্য আছে যেগুলি এক বিশেষ উপায়ে প্রাপ্ত বলেই সেগুলির পিছনে কোন যুক্তি না থাকা সত্বেও সে-গুলিকে স্বীকার করে নিতে হ'বে। ভগবৎ-প্রত্যাদেশের যে নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা (Authority) আছে সেই ক্ষমতার বলেই যে কোনও প্রত্যাদিষ্ট বাণীর অভ্রান্ত সত্যতা আমাদের স্বীকার করে নিতে হ'বে। প্রত্যাদেশ ভাবুক বা ভক্তকে যে সব অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের সন্ধান দেয় সেগুলি বুদ্ধ্যতীত, অর্থাৎ সেগুলি বিচার-বুদ্ধির বিষয়-বস্তু হ'তে পারে না, এবং সেই হেতু বিচার-বুদ্ধির পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট বাণীর কোনও বিরূপ সমালোচনা গ্রহণীয় নয়।

- A. সুতরাং মনে হতে পারে যে, প্রত্যাদেশ ও বিচার-বুদ্ধির মধ্যে একটা বিরোধিতা আছে। য়ূরোপে মধ্যযুগে কোন কোন ধর্ম-বেত্তা মনে করতেন যে, এটা আত্যন্তিক বিরোধিতা (Absolute opposition); অর্থাৎ, প্রত্যা-দেশ যা বলে বিচার-বুদ্ধি তা অস্বীকার করে, আর বিচার-বুদ্ধি যা বলে প্রত্যাদেশ তা অস্বীকার করে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এমন কথাও বলেছেন যে, কোনও প্রত্যাদিষ্ট বাণী যতই অযৌক্তিক হ'বে ততই সত্য হবে, আর এটি যতই অসম্ভব হবে ততই বিশ্বাসযোগ্য হ'বে।[1] যেমন, "ভগবান্ এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন"—বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে এই উক্তিকে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক[2] বলে মনে হলেও প্রত্যাদিষ্ট বাণী বলেই একে সত্য বলে স্বীকার করতে হবে। "মানবাত্মার ধ্বংস নেই"—এই প্রত্যাদিষ্ট বাণীটি বিচার বুদ্ধির দৃষ্টিতে অসম্ভব[3] বলেই একে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করতে হ'বে।

(i) প্রত্যাদেশ এবং বিচার-বুদ্ধির প্রভেদকে যদি এইভাবে আত্যন্তিক বিরোধের রূপ দেওয়া হয়, তাহলে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, বুদ্ধি-গ্রাহ্য জগতে সত্য ও মিথ্যার অর্থ ও মানদণ্ড বুদ্ধ্যতীত জগতে সত্য ও মিথ্যার অর্থ ও মানদণ্ড থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্। প্রথমোক্ত জগতের কোন ব্যাপার সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে হ'লে বিচার-বুদ্ধির উপর নির্ভর করতে হ'বে, আর দ্বিতীয়োক্ত জগতের কোন ব্যাপার সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানলাভ

1 "The more it (i.e., the revealed message) is absurd, the more it is true". "The more it is impossible, the more it is believable."

2 কারণ, যাঁর কোন দেহ নেই তিনি কোন জড়দ্রব্যই নির্মাণ বা সৃষ্টি করতে পারেন না।

3 কারণ, দেহের মধ্যে আছে অথচ দেহের অংশ নয় এরকম কোনও বস্তু থাকতে পারে না। সুতরাং আমরা যাকে আত্মা বলি সেটা দেহেরই একটা অংশ এবং দেহের ধ্বংসের সঙ্গে এরও ধ্বংস অনিবার্য।

করতে হ'লে ভগবৎ প্রত্যাদেশের উপর নির্ভর করা ভিন্ন উপায় নেই। কিন্তু বুদ্ধিগ্রাহ্য জগৎ এবং বুদ্ধ্যতীত জগতের মধ্যে এইভাবে পার্থক্য করা অসম্ভব। যেগুলিকে বুদ্ধ্যতীত তত্ত্ব বলে মনে করা হয়, সেগুলির সঙ্গে বুদ্ধিগ্রাহ্য বহু ব্যাপারেরই এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে যে, এদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে চিন্তা করা অথবা এদের মধ্যে কোন সুস্পষ্ট সীমারেখা নির্দেশ করা অসম্ভব। যেমন, মানবাত্মার অমরত্ব হয়ত অতীন্দ্রিয় বা বুদ্ধ্যতীত তত্ত্ব, কিন্তু যেহেতু মানবাত্মার সঙ্গে জড়দেহের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, সেহেতু আত্মার স্বভাব বুঝতে গেলে আত্মার সঙ্গে দেহের সম্বন্ধের কথাও বিচার করতে হ'বে। কিন্তু আত্মা ও দেহের সম্বন্ধকে বিশুদ্ধ অতীন্দ্রিয় বা বুদ্ধ্যতীত ব্যাপার বলা যায় না। সুতরাং, বিচার-বুদ্ধিকে সম্পূর্ণ বর্জন করে, এ ব্যাপারের আলোচনা করা অসম্ভব।

(ii) সত্য ও মিথ্যার প্রভেদ সকল ক্ষেত্রেই একরূপ হওয়া উচিত, এবং সত্যতার মানদণ্ডও সকলের প্রতিই সমানভাবে প্রযোজ্য হওয়া উচিত। যদি মনে করা যায় যে, বুদ্ধিগ্রাহ্য জগতে সত্যতার মৌলিক অর্থ ও মানদণ্ড একরূপ আর অতীন্দ্রিয় বুদ্ধ্যতীত জগতের ক্ষেত্রে অন্যরূপ, তাহলে সত্যতার মানদণ্ডের সংখ্যা দুই না হয়ে আরও অধিক হওয়াও সম্ভব। কিন্তু এটা স্বীকার করলে প্রত্যেক ব্যক্তিই কোন এক বিশেষ সমস্যার আলোচনায় তার নিজের রুচি ও ইচ্ছামত সত্য ও মিথ্যার প্রভেদ করবার দাবী করতে পারে এবং তার ফলে প্রকৃতপক্ষে সত্য ও মিথ্যার প্রভেদ লুপ্ত হয়ে যেতে পারে।

(iii) প্রত্যাদেশবাদীরা যখন বলেন যে, বুদ্ধ্যতীত তত্ত্বের জগৎ এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য জগৎ সম্পূর্ণ পৃথক্, এবং সেই হেতু বুদ্ধিগ্রাহ্য জগতে সত্যতার যে মানদণ্ডের ব্যবহার হয়, বুদ্ধ্যতীত জগতে তার ব্যবহার হ'তে পারে না, তখন তাঁরা প্রকারান্তরে বিচার-বুদ্ধির প্রাধান্যই স্বীকার করেন;[1] কারণ, তাঁরা তাঁদের বক্তব্যকে যুক্তি দিয়ে সমর্থন করতে উৎসুক।

B. কেউ কেউ বলেন যে, প্রত্যাদেশ ও বিচারবুদ্ধির মধ্যে আত্যন্তিক-বিরোধ না থাকলেও প্রত্যাদেশের স্থান বিচার-বুদ্ধির অনেক ঊর্ধে। (The content of a revelation, though not contrary to reason, may be above reason.—Caird—An Introduction to Philosophy of Raligion—p. 66)। এই মতটির দুটি অর্থ করা যেতে পারে।

1 "The authority which appeals to reason in proof of its rights commits itself, so to speak, to be essentially rational. Ibid. p, 64.

(a) প্রথম অর্থ এই যে, অতীন্দ্রিয় তত্ত্বগুলি মানুষের সসীম বিচার-বুদ্ধির উর্ধে, আর (b) দ্বিতীয় অর্থ এই যে, এগুলি বিচার-বুদ্ধিমাত্রেরই (জীবেরই হউক অথবা ঈশ্বরেরই হউক) অগম্য। প্রথমত, এটা মনে করা যেতে পারে যে, মানুষের বিচার-বুদ্ধির বাইরে এমন সব নিগূঢ় তত্ত্ব আছে, যাদের জ্ঞান কেবলমাত্র প্রত্যাদেশের মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব। মানুষের বিচার-বুদ্ধি সসীম বলেই সে স্বাধীন চেষ্টায় এই তত্ত্বগুলির তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে না, কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় কোন ব্যক্তির মনে এই তত্ত্বগুলি উদ্ভাসিত হ'লে সে এদের তাৎপর্য বুঝতে পারে এবং অনুভব করে যে, প্রত্যাদিষ্ট জ্ঞান এবং বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে পাওয়া সিদ্ধান্তের মধ্যে বাস্তবিক কোনও বিরোধ নেই। ঈশ্বর অনন্তজ্ঞানের অধিকারী বলেই যাবতীয় সত্য তাঁর কাছে প্রাঞ্জল। এমন কোনও রহস্য বা সমস্যা নেই যার সমাধান তাঁর অজ্ঞাত। দুর্বল, অল্পবুদ্ধি মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের সাহায্য ব্যতীত এই সব গূঢ় সমস্যা সমাধান করা অসম্ভব।

(i) এই মতানুসারে দুটি বিচার-বুদ্ধির (অর্থাৎ ঈশ্বরেব এবং মানুষের) অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে। এই দুই বিচার-বুদ্ধির মধ্যে গুণগত পার্থক্য নেই, কেবল পরিমাণগত পার্থক্য আছে, অর্থাৎ, এমন অনেক তত্ত্ব আছে যেগুলিকে এদের মধ্যে একটিই আয়ত্ত করতে পারে, অপরটি পারে না। কেবলমাত্র নিজের চেষ্টায় এই তত্ত্বগুলি আবিষ্কার করা অথবা তাদের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করা সসীম জীবের পক্ষে অসম্ভব। এইসব তত্ত্ব সম্বন্ধে যে সব বাণী আমরা সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বরের নিকট পাই, সেগুলিকে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করাই আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির একমাত্র উপায়। কিন্তু এই মতের বিরুদ্ধে সহজেই এই আপত্তি করা যেতে পারে যে, এই দুটি বিচার-বুদ্ধির মধ্যে কোনও সুনির্দিষ্ট সীমারেখা টানা অসম্ভব। কোন তত্ত্বগুলি মানুষের সসীম বিচার-বুদ্ধি আয়ত্ত করতে সক্ষম এবং কোনগুলি নয়, তা নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কোন ব্যক্তি যদি কোন বিশেষ সময়ে কোন তত্ত্বের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করতে না পারে, অথবা, কোন একটি উক্তিকে যুক্তি দ্বারা সমর্থন বা খণ্ডন করতে অক্ষম হয়, তাহলেই ঐ তত্ত্ব বা উক্তিকে তার বিচার-বুদ্ধির উর্ধে বলে স্থির করা উচিত নয়, কারণ, কালক্রমে তার বুদ্ধির বিকাশ ঘটলে ঐ তত্ত্বটি আয়ত্ত করা অথবা ঐ উক্তির সত্যতা নির্ণয় করা তার পক্ষে সম্ভব হ'তে পারে। কোন নিরক্ষর ব্যক্তি যতদিন নিরক্ষর থাকে, ততদিন কোন বই পড়ে মানে বোঝা তার পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু সে যে চিরকালই নিরক্ষর থাকবে এটা আমরা নিশ্চয় করে বলতে পারি না। কোন বুদ্ধিমান জীবের জ্ঞানলাভের ক্ষমতাকে

সীমাবদ্ধ করা যায় না। সুতরাং কোন অতীন্দ্রিয় তত্ত্বসম্বন্ধে ঈশ্বরের নিকট প্রাপ্ত বাণী মানুষের বুদ্ধির অগম্য, এবং সেইজন্য তার সত্যতা বা অসত্যতা বিচারের ক্ষমতা মানুষের নেই, এই মত স্বীকার করে নেওয়া যায় না।

(ii) যে তত্ত্ব একান্তই আমাদের বিচার-বুদ্ধির অগম্য, তাকে প্রকৃতপক্ষে বিচার-বুদ্ধিমাত্রেরই বিরোধী বলতে হবে; কারণ, ঈশ্বরেরই হোক অথবা মানুষেরই হোক বিচার-বুদ্ধির মৌলিক প্রকৃতি একই হবে। সুতরাং যা মূলত বিচারবুদ্ধির বিরোধী তাকে আমাদের বিচার-বুদ্ধি গ্রহণ করতে পারে না।

(iii) যে তত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে মানুষের বিচার-বুদ্ধির আয়ত্তের বাইরে, তা ঈশ্বরের বাণীর মাধ্যমে মানুষের কাছে উপস্থিত হ'লেও তার বিন্দুমাত্র জ্ঞান-বৃদ্ধির সহায়ক হবে না। কোন জড়বস্তুকে হাজার বৎসর শাস্ত্রবাণী বা মহাপুরুষদের উপদেশ শোনালেও তার কিছুমাত্র উপকার হবার সম্ভাবনা নেই।

(iv) যেসব প্রত্যাদিষ্ট সত্যকে সম্পূর্ণ নতুন বলে মনে করা হয়, সেগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে অনেকগুলিই চিন্তাশীল ব্যক্তিরা নিজেদের বিচার-বুদ্ধির সাহায্যেই আবিষ্কার করেছেন এবং প্রচার করেছেন। সুতরাং, সেগুলিকে আমাদের সাধারণবুদ্ধির অগম্য বলে মনে করার পক্ষে কোন যুক্তি নেই।

(b) যদি বলা যায় যে, বুদ্ধ্যতীত জগতের তত্ত্বগুলি বিচারবুদ্ধি-মাত্রেরই (ঈশ্বরের অথবা জীবের) ঊর্ধে, তার অর্থ হবে এই যে, এগুলি একান্তভাবেই বুদ্ধির অগম্য। কিন্তু তাহলে এই তত্ত্বগুলি মানুষের মনে সঞ্চারিত করা ঈশ্বরের পক্ষেও অসম্ভব, এবং ঈশ্বরের নিকট পাওয়া প্রত্যাদেশের সাহায্যে আধ্যাত্মিক উন্নতি করাও মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

সুতরাং, ঈশ্বরবাদীদের মধ্যে যাঁরা বুদ্ধিবাদী তাঁরা মনে করেন যে, প্রকৃতপক্ষে ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ এবং বিচার-বুদ্ধির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। মহাপুরুষেরা যখন ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁদের বাণী প্রচার করেন, তখন সাধারণত সেগুলিকে যুক্তি দিয়ে সমর্থন করেন না; সুতরাং সাধারণ লোকের নিকট সেগুলি অসাধারণ তাৎপর্যযুক্ত এবং বিচারবুদ্ধির অগম্য বলেই মনে হয়। কিন্তু কালক্রমে আবার সেইগুলিকে যুক্তি দিয়ে সমর্থন অথবা খণ্ডন করা সম্ভব বলে বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি স্বীকার করে থাকেন। যে মত বা বিশ্বাসকে আদৌ বিচার-বুদ্ধিদ্বারা সমর্থন করা যায়না, কেবলমাত্র প্রত্যাদিষ্ট বলেই সেগুলিকে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য, এরূপ মনে করা উচিত নয়।

তাঁরা আরও বলেন যে, ঈশ্বর বা পরমাত্মাতেই বিচার-বুদ্ধির পূর্ণরূপ প্রতিষ্ঠিত, আর সসীম জীবের বুদ্ধি ঐশ বুদ্ধিরই সীমিত প্রকাশ। সুতরাং মানুষ বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে যা কিছুজ্ঞান লাভ করে, তার অন্তিম উৎস ঈশ্বরের বিচার-বুদ্ধি।

সুতরাং, এক হিসাবে বলা যায় যে, ঈশ্বরই প্রতি মুহূর্তে আমাদের ধীশক্তিকে সত্যের দিকে চালনা করছেন, অথবা, আমরা প্রতিমুহূর্তেই তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাদেশ লাভ করছি। মানুষ যখন তার বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে কোন সত্য আবিষ্কার করবার চেষ্টা করে, অথবা কোন মতবাদকে খণ্ডন অথবা সমর্থন করে, তখন প্রকৃতপক্ষে তার আবেদন বিশ্বজনীন বিচারবুদ্ধির কাছে, তার সীমিত ব্যক্তিত্বের গণ্ডীর মধ্যে যে বুদ্ধি সক্রিয়, তার কাছে নয়। সুতরাং যখন কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি অনুভূতি বা ভাবাবেগের বিরুদ্ধে বিচার-বুদ্ধির দাবী সমর্থন করেন, তখন তাঁর মনোভাবকে দাম্ভিকতার অপবাদ দেওয়া অসঙ্গত। তিনি যে মানদণ্ডের সাহায্যে সত্যতা বা অসত্যতার বিচার করতে উৎসুক সেটা তাঁর ব্যক্তিগত রুচি, ইচ্ছা বা সুবিধার উপর নির্ভর করে নয়, এই মানদণ্ড চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই অকুণ্ঠ সমর্থনের দাবী রাখে। সুতরাং একমাত্র প্রত্যাদিষ্ট ঐশ্বরিক বাণীই সকল ধর্ম-বিশ্বাসের সুদৃঢ় ভিত্তি, এইমত সমর্থন করা যায় না।

৪. মরমী অনুভূতি, অতীন্দ্রিয়ানুভূতি, শ্রদ্ধা ও বিচার-বুদ্ধি

প্রত্যাদেশ ও বিচারবুদ্ধির সম্পর্ক সম্বন্ধে যা বলা হ'ল, মরমী উপলব্ধি, অতীন্দ্রিয়ানুভূতি বা শ্রদ্ধা ও বিচারবুদ্ধির সম্পর্ক সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে। মরমীয়া ভাবুক বা ভক্ত এক বৃহত্তর সত্তার মধ্যে আপন সত্তাকে নিমজ্জিত করে আনন্দ বা মানসিক শান্তিলাভ করতে পারেন, কিন্তু তিনি যদি তাঁর উপলব্ধিকে সত্যের আকার দিতে চান, অথবা, জগৎ সম্বন্ধে এই উপলব্ধির মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানকে বুদ্ধিগম্য ধারণার সাহায্যে প্রকাশ করতে চান, তাহলে তাঁর এই জ্ঞানকে অবশ্যই বিচারবুদ্ধির কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখার প্রয়োজন হ'বে। যে অনুভবে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের, বিশেষ্য ও বিশেষণের বস্তু ও সম্বন্ধের পার্থক্য থাকে না, বা যে জ্ঞানকে কতকগুলি অবধারণের সুসংহত সমষ্টিরূপে ব্যক্ত করা যায় না, তাকে জ্ঞান বলা অসঙ্গত। ভাবুক বা সাধক সম্বন্ধে আমরা মাত্র এই কথাই বলতে পারি যে, তাঁর মনে কোন সংশয় বা অশান্তি নেই,

তিনি আত্ম-তৃপ্ত বা আত্ম-সমাহিত। কিন্তু তিনি জগৎসম্বন্ধে নির্ভুল সত্য লাভ করেছেন, একথা স্বীকার করতে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই সম্মত হবেন না। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি যদি অতীন্দ্রিয়ানুভূতির সাহায্যে কোন অভ্রান্ত সত্য আবিষ্কার করেছেন বলে দাবী করেন, তাহলে আমরা সেই দাবী স্বীকার করে নিতে পারি না। তাঁর আবিষ্কৃত সত্যের সঙ্গে অন্যান্য সত্যের সঙ্গতি আছে কিনা, এটা বিচার করে দেখা প্রয়োজন। অন্যান্য সত্যের দ্বারা তাঁর আবিষ্কৃত সত্য সমর্থিত হচ্ছে, এই যুক্তিবলেই আমরা একে স্বীকার করব, কোন বিশেষ উপায়ে এই সত্য আবিষ্কৃত হয়েছে, তার ভিত্তিতে নয়। সেই রকম কোন ব্যক্তি বিনা বিচারে শ্রদ্ধার সঙ্গে কোন মত গ্রহণ করেছেন বলেই যে সেই মতকে অভ্রান্ত সত্য বলে মেনে নিতে হ'বে এমন নয়; সেই মত যুক্তিযুক্ত কিনা, অর্থাৎ, বিচার-বুদ্ধির মানদণ্ডের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারে কিনা সেটাই আমাদের প্রধান বিবেচ্য হ'বে।

বিচার-বুদ্ধির সাহায্য ছাড়া জগৎসম্বন্ধে কোন যথার্থ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়—একথা বলার অর্থ এই নয় যে, কেবলমাত্র বিশুদ্ধ বিচার-বুদ্ধি থেকেই আমাদের সকল জ্ঞান উৎপন্ন হয়। কোন বিষয় সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে হ'লে বিচার-বুদ্ধির যেমন প্রয়োজন, সাক্ষাৎ অনুভবেরও তেমনই প্রয়োজন। জড়-জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে হ'লে যেমন বস্তুগুলির সঙ্গে আমাদের ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শ হওয়া প্রয়োজন, তেমনই আবার ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শ থেকে উৎপন্ন সংবেদনগুলিকে একত্র গ্রথিত করে একটি সুসংহত আকার দেওয়ার জন্য বিচার-বুদ্ধিরও প্রয়োজন। ইন্দ্রিয়-সংবেদনগুলি আমাদের জড়জগৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞানের উপাদান যোগায়। কিন্তু বিচার-বন্ধির ক্রিয়ার ফলেই সেগুলি জ্ঞানের আকার লাভ করে। জগতে এমন অনেক বস্তু থাকতে পারে যেগুলির সঙ্গে আমাদের ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শ সম্ভবপর না হলেও সেগুলিকে আমরা অন্য কোন উপায়ে অনুভব করতে পারি—একথা স্বীকার করে নিয়েও আমরা বলতে পারি যে, অতীন্দ্রিয় জগৎ সম্বন্ধে সেই সকল বিচিত্র অনুভব যতক্ষণ পর্যন্ত না পরস্পরের সঙ্গে সুশৃঙ্খলভাবে গ্রথিত হয়ে একটি সুসংহত আকারের রূপ নিচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই সব অনুভবকে অভ্রান্ত সত্যের উৎস বলে মনে করা সঙ্গত হবে না।

প্রত্যেক ধর্ম-সম্প্রদায়েই এমন অনেক সাধক, ভাবক ও ভক্ত জন্মগ্রহণ করেছেন, যাঁদের নির্মল চরিত্র ও মানবপ্রেম আমাদের চিরকাল অনুপ্রাণিত করে, এবং যাঁরা জগতের চরমসত্তা সম্বন্ধে মরমী উপলব্ধি

বা অতীন্দ্রিয়ানুভূতির দাবী রাখেন। তাঁদের এই দাবী আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। এই সব বিচিত্র উপলব্ধি বা অনুভূতি বিচ্ছিন্নভাবে আমাদের জগৎ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান দিতে না পারলেও আমাদের ধর্ম-জীবনের পক্ষে এদের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। আমরা আগেই দেখেছি যে, মানুষের জীবনে তার বুদ্ধি-বৃত্তি, ভাবাবেগ এবং ইচ্ছা-শক্তি এই তিনেরই অংশ আছে এবং মানব-প্রকৃতির এই সব উপাদানের যথোচিত সহযোগিতা ছাড়া আদর্শ ধর্ম-জীবন গড়ে উঠতে পারে না। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা তাঁদের বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে ধর্মীয় বিশ্বাসগুলির সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলেও ধর্ম তাঁদের কাছে কেবলমাত্র কতকগুলি বুদ্ধি-গ্রাহ্য তত্ত্ব-কথার সমষ্টি হয়েই থাকতে পারে। মরমী ভাবুক, সাধক ও ভক্তের সংস্পর্শে এলেই তাঁদের ধর্ম-জীবনে আন্তরিকতা ও উদ্দীপনা আসা সম্ভব। যে ধর্মবিশ্বাস বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয় না, তা অন্ধ কুসংস্কার ও নিছক ভাবালুতায় পরিণত হতে পারে, আবার ভাবাবেগ-বর্জিত ধর্ম-জীবন কেবলমাত্র কতকগুলি প্রচলিত মতের মৌখিক অনুবর্তিতা এবং গতানুগতিক আচার-পালনে নিঃশেষিত হয়ে যেতে পারে। যে ব্যক্তি মাঝে মাঝে নিজের অন্তরে এবং বহির্জগতের সর্বত্র বিশ্বাত্মার উপস্থিতি সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেন, অথবা যাঁরা এইভাবে বিশ্বাত্মার উপস্থিতি উপলব্ধি করেছেন, তাঁদের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভ করেন, তিনি অন্তত কিছুক্ষণের জন্যও জগতের সকল মালিন্য কুশ্রীতা ও দৈন্যের কলুষ থেকে নিজেকে মক্ত রাখতে পারেন, এবং তাঁর এই সাময়িক উপলব্ধি তাঁকে সর্বক্ষণের জন্য প্রেরণা জোগাতে পারে, এবং সকল শুভ-কর্মে উৎসাহ দিতে পারে। আমাদের ধর্মবিশ্বাসের গভীরতা ও আন্তরিকতা সম্পাদনের জন্য অনুভূতি অপরিহার্য। মরমী ভাবুক সাধক ও ভক্তদের উপলব্ধি ও সাধনা সমস্ত ধর্মেরই অমূল্য সম্পদ।

নির্বাচিত পুস্তক তালিকা

1. J. Caird—An Introduction to the Philosophy of Religion.
2. G. Galloway—The Philosophy of Religion.

অষ্টম অধ্যায়

ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের সমর্থনে যুক্তিসমূহ

(Arguments for the existence of God)

1. ভূমিকা

প্রচলিত প্রধান ধর্মমতগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কোনও না কোনও আকারে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস তাদের অধিকাংশের একটি অঙ্গ। সাধারণত, ঈশ্বর সম্বন্ধে ধর্ম-বিশ্বাসী ব্যক্তিদের ধারণা এই যে, তিনি নিরাকার, চৈতন্য-ময় পরম পুরুষ। ঈশ্বরকে আমাদের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন জড়দ্রব্যের মত প্রত্যক্ষ করা যায় না বটে, কিন্তু বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী বহু চিন্তাশীল ব্যক্তির, এমন কি অনেক দার্শনিকেরও অভিমত এই যে, ঈশ্বরের অস্তিত্বের সমর্থনে বুদ্ধিগ্রাহ্য যুক্তি দেওয়া সম্ভব। ঈশ্বরের অস্তিত্বে আমাদের এই বিশ্বাসকে বিচারবুদ্ধির সাহায্যে পরীক্ষা করলে হয়ত দেখা যাবে যে, এই বিশ্বাসকে অনেকাংশেই পরিবর্তন ও সংশোধন করা প্রয়োজন ; কিন্তু মূলত এই বিশ্বাসকে সত্য বলেই গ্রহণ করতে হবে। এই বিশ্বাসকে বিচারবুদ্ধিসম্মত যুক্তির সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারা যায় কিনা, সেটা নির্ণয় করার চেষ্টা দার্শনিকের কাজ। এই যুক্তিগুলিকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করার পক্ষে বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন কালে দার্শনিকেরা সাধারণত যে সব যুক্তি দিয়েছেন তাদের মধ্যে চারটি যুক্তি প্রধান, যথা, (a) তাত্ত্বিক যুক্তি অথবা লক্ষণ-ভিত্তিক যুক্তি বা অনুমান (The Ontological Argument), (b) কার্য-কারণ-সম্বন্ধ-ভিত্তিক যুক্তি বা অনুমান (The Causal or Cosmological Argument), (c) উদ্দেশ্য-কারণতাভিত্তিক যুক্তি বা অনুমান (The Teleological Argument) এবং (d) নৈতিকচৈতন্যমূলক যুক্তি বা অনুমান (The Moral Argumet)। এখন আমরা এই যুক্তিগুলিকে বিশ্লেষণ করব এবং তাদের বৈধতা সম্বন্ধে আলোচনা করব।

2. লক্ষণ-ভিত্তিক যুক্তি (The Ontological Argument)

পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বের সমর্থনে Ontological Argument (লক্ষণ-ভিত্তিক যুক্তি বা তাত্ত্বিক যুক্তি) বলে একটি যুক্তি প্রচলিত

আছে। এই যুক্তির সমর্থকেরা মনে করেন যে, আমাদের মনে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে ধারণা আছে কেবলমাত্র তাকে বিশ্লেষণ করে এবং সেই বিশ্লেষণকে ভিত্তি করে ঈশ্বর যে বাস্তবিকই আছেন, আমাদের কল্পনামাত্র ন'ন, তার নির্ভুল প্রমাণ পাওয়া যাবে। এজন্য বহির্জগৎ সম্বন্ধে আমাদের যে অভিজ্ঞতা আছে তার সাহায্য নেওয়া মোটেই আবশ্যক হ'বে না। কোন সাধারণ সসীম বস্তু সম্বন্ধে আমরা এ কথা বলতে পারি না যে, যেহেতু এই বস্তুর ধারণা আমাদের মনে আছে, সেই হেতু এর অনুরূপ বস্তু অবশ্যই বহির্জগতে থাকবে। দ্বি-মুণ্ড মানুষ কল্পনা করতে পারি বলেই যে ঐরূপ মানুষ নিশ্চয়ই জগতে থাকবে এটা আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারিনা। কিন্তু ঈশ্বরের ধারণা অন্যান্য সমস্ত ধারণা থেকে একেবারে পৃথক। এটি একটি অনন্ত, সর্ব-নিরপেক্ষ, সর্বশ্রেষ্ঠ গুণরাজিমণ্ডিত, সর্বাংশে পূর্ণ চৈতন্যময় পুরুষের ধারণা। এই ধারণার প্রকৃতি এমন যে, এটি থেকে এরূপ পুরুষের (অর্থাৎ ঈশ্বরের) যথার্থ অস্তিত্ব অনিবার্যরূপে নিঃসৃত হয়ে থাকে। অর্থাৎ, যদি আমরা স্বীকার করি যে, এই পরম পুরুষের ধারণা আমাদের মনে আছে, তাহলে আমাদের এটাও অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে, এই পরম পুরুষের বাস্তব অস্তিত্ব আছে। এরূপ পুরুষের ধারণা আমাদের মনে আছে অথচ তাঁর বাস্তব অস্তিত্ব নেই, তিনি কেবলমাত্র আমাদের কল্পনার সৃষ্টি, এটা হ'তে পারে না।

দার্শনিক মহলে এই যুক্তির বিভিন্ন রূপ দেখতে পাওয়া যায়। য়ুরোপে মধ্যযুগের এক দার্শনিক Anselm (১০৩৩-১১০৯ খ্রীঃ) যুক্তিটিকে এইভাবে ব্যক্ত করেছিলেন—"ঈশ্বর এমন একটি বস্তু যার চেয়ে মহত্তর কিছু কল্পনা করা যায় না। যার অস্তিত্ব কেবলমাত্র আমাদের কল্পনায় আছে তদপেক্ষা যা আমাদের কল্পনাতেও আছে আবার বহির্জগতেও আছে তা-ই মহত্তর। সুতরাং, যদি মনে করা যায় যে, ঈশ্বর কেবলমাত্র আমাদের কল্পনাতেই আছেন, তাহলে যে বস্তু আমাদের কল্পনাতে আছে আবার বহির্জগতেও আছে সে বস্তু ঈশ্বর অপেক্ষাও মহত্তর হবে। কিন্তু যেহেতু ঈশ্বরের ধারণা সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহত্তম বস্তুর ধারণা, সেহেতু এটা অবশ্য স্বীকার্য যে, ঈশ্বর কেবলমাত্র আমাদের কল্পনাতেই নেই, তাঁর যথার্থ অস্তিত্ব আছে এবং তাঁর অস্তিত্ব আবশ্যিক (God necessarily exists)। কোন সসীম বস্তু থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে, কিন্তু 'ঈশ্বর নাই' এরূপ হ'তে পারে না।" Gaumilo নামে Anselm-এর সমসাময়িক এক দার্শনিক এই যুক্তির সমালোচনা করে বলেছিলেন যে, কাল্পনিক সত্তা থেকে যথার্থ সত্তা প্রমাণ করা যায় না। আমরা সর্বোত্তম দ্বীপের (অর্থাৎ

যে দ্বীপ অপেক্ষা অন্য কোনও দ্বীপ উৎকৃষ্ট হ'তে পারে না) কল্পনা করতে পারি, কিন্তু তা থেকে এটা প্রমাণিত হ'বে না যে, এরকম দ্বীপ বাস্তব জগতে নিশ্চয়ই আছে (কারণ, কল্পিত কোন দ্বীপ দ্বীপ-হিসেবে সর্বোৎকৃষ্ট হ'লেও এর মধ্যে এমন কোনও দোষ বা ত্রুটী থাকতে পারে যেজন্য বাস্তব জগতে এরকম দ্বীপের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বহু বাধা থাকতে পারে) । এই আপত্তির উত্তরে Anselm বলেন যে, যে বস্তু সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ বা সর্বোত্তম কেবলমাত্র সেই বস্তু সম্বন্ধেই তাঁর যুক্তি প্রযোজ্য । কেবলমাত্র এরূপ বস্তু সম্বন্ধেই বলা যেতে পারে যে, এর যথার্থ অস্তিত্ব অনস্বীকার্য, কিন্তু কোনও সসীম বস্তু সম্বন্ধে এই যুক্তি প্রযোজ্য নয় । কোন সসীম বস্তু তার নিজ শ্রেণীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হ'তে পারে, কিন্তু সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ নয় । সুতরাং আমাদের মনে এরূপ বস্তুর ধারণা থাকলেই যে তার যথার্থ অস্তিত্ব স্বীকার করতে হ'বে এমন নয় ।

প্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিক দেকার্তে (১৫৯৬-১৬৫০ খ্রীঃ) এই যক্তিকে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করেছেন । "আমাদের মনে ঈশ্বরের , অর্থাৎ, সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ পরমপুরুষের ধারণা আছে । আমরা যেমন সুস্পষ্টভাবে ও নিঃসংশয়ে বুঝতে পারি যে, কোন জ্যামিতিক ক্ষেত্রের লক্ষণ থেকে তার কতকগুলি গুণ অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়, ঠিক তেমনই এই পরম-পুরুষের যথার্থ ও চিরন্তন সত্তা যে তাঁর স্বরূপ থেকে অনিবার্যরূপে নিঃসৃত হয়, এটাও আমরা স্পষ্টভাবে এবং নিঃসংশয়ে বুঝতে পারি ।" দেকার্তে বলেন—"আমি যখন এই বিষয়টি নিবিষ্ট মনে চিন্তা করি তখন এটা স্পষ্টভাবেই বুঝতে পারি যে, যেমন উপত্যকার লক্ষণের সঙ্গে পর্বতের লক্ষণ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, এবং 'ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান', ত্রিভুজের এই বৈশিষ্ট্য ত্রিভুজের লক্ষণের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, ঠিক সেইরকম ঈশ্বরের যথার্থ অস্তিত্ব তাঁর স্বরূপের (Essence) একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । যেমন, পর্বত ব্যতীত উপত্যকার ধারণা করা অসম্ভব এবং ত্রিভুজের তিন-কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান—ত্রিভুজের এই বৈশিষ্ট্য বাদ দিয়ে ত্রিভুজের স্বরূপ কল্পনা করা অসম্ভব, ঠিক তেমনই ঈশ্বরের, অর্থাৎ, সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ কোন পুরুষের যথার্থ অস্তিত্ব তাঁর স্বরূপের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, এবং কোন বিশেষ সদ্‌গুণ অথবা অস্তিত্ব-বিহীন ঈশ্বরের, অর্থাৎ সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ পুরুষের কল্পনা করা একান্তই অসম্ভব"[1] । ঈশ্বর যাবতীয় শ্রেষ্ঠ গুণের আধার, এই বলে যদি ঈশ্বরের স্বরূপ নির্দেশ করি, তাহলে তাঁর বাস্তব অস্তিত্ব যে কোনও একটি সদ্‌গুণের মত তাঁর স্বরূপ থেকে নিঃসৃত

1 Meditations.

হবে। ঈশ্বর যাবতীয় শ্রেষ্ঠ গুণের আধার, অথচ এই একটি সদ্‌গুণ, 'বাস্তব অস্তিত্ব', তাঁতে নাই—এরকম কল্পনা স্ববিরোধ-দুষ্ট এবং যুক্তি-শাস্ত্রের বিচারে এরূপ কল্পনাকে কোনও মতেই সমর্থন করা যায় না। সুতরাং পরিদৃশ্যমান জড়জগতের অস্তিত্ব অথবা তার কোনও বৈশিষ্ট্য থেকে অনুমান করে নয়, পরন্তু ঈশ্বরের স্বরূপ (Essence)-এর ধারণা থেকেই তাঁর বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

লাইব্‌নিজ (Leibniz) (১৬৪৬-১৭১৬ খ্রীঃ) দেকার্তে এই যুক্তির যে বিবৃতি দিয়েছেন তার অনুমোদন করেন, কিন্তু এই যুক্তিকে দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে তার সঙ্গে আরও কিছু যোগ করা আবশ্যক বলে মনে করেন। তাঁর মতে ঈশ্বর যথার্থই আছেন এটা প্রমাণ করবার আগে আমাদের দেখাতে হবে যে, ঈশ্বরের ধারণার মধ্যে কোনও বিরোধ নেই। কতকগুলি ধারণা আছে যাদের এক অংশের সঙ্গে অপর অংশের বিরোধ আছে, যেমন, বৃহত্তম সংখ্যা, ক্ষিপ্রতম গতি ইত্যাদি। সংখ্যা মাত্রই একটি একক অথবা কতকগুলি এককের সমষ্টি, কোন সংখ্যা যতই বৃহৎ হোক না কেন তার সঙ্গে ১ যোগ করা যায়, গতি যতই ক্ষিপ্র হোক না কেন তার বেগ (কল্পনায়) আরও বাড়ান যেতে পারে। সুতরাং 'ক্ষিপ্রতম গতি' ইত্যাদি ধারণার মধ্যে বিরোধ আছে, এবং যে সব ধারণার মধ্যে বিবোধ আছে তাদের অনুরূপ বস্তু জগতে পাওয়া যাবেনা।[1] ঈশ্বরকে যেসব গুণের অধিকারী বলে মনে করা হয়, তাদের মধ্যে সঙ্গতি থাকলে তবেই বুঝতে হবে যে, ঈশ্বরের ধারণা স্ব-বিরোধ-মুক্ত এবং তখনই 'ঈশ্বর সত্যই আছেন'—এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হ'বে। অন্তহীনতা, স্বয়ং-সম্পূর্ণতা, অনন্য-নির্ভরতা প্রভৃতি গুণ ঈশ্বর-ধারণার অবিচ্ছেদ্য উপাদান। এই সকল গুণ যাঁতে আছে তাঁর বাস্তব সত্তাকে অন্য কোনও বস্তু বা শক্তি বাধা দিতে পারে না; কারণ, তার বাইরে কোন বস্তু বা শক্তি নেই। লাইব্‌নিজ বলেন, "একমাত্র ঈশ্বরেরই এই অধিকার (Prerogative) আছে যে, তাঁর সম্ভাব্যতা আছে বলেই (অর্থাৎ তিনি অন্তর্বিরোধমুক্ত বলেই) তাঁর আবশ্যিক সত্তা (Necessary existence) আছে। যে বস্তুর কোনও সীমা নেই, কোনও অভাব নেই, কোনও স্ব-নিরোধ নেই, তার সম্ভাব্য সত্তাকে বাধা দিতে পারে এমন কিছুই নেই।[2] কোনও প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের উপর নির্ভর না করেও আমরা

---

1 কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মতে আলোকের গতি ক্ষিপ্রতম।

2 চারকোণবিশিষ্ট ত্রিভুজের অস্তিত্ব অসম্ভব। দশমুণ্ডবিশিষ্ট মানুষের অস্তিত্ব সম্ভব, কিন্তু এর সত্তা অন্য বস্তুদ্বারা বাধিত হয় বলে বাস্তব নয়।

বলতে পারি যে, ঈশ্বরের সম্ভাব্যতা আছে, অতএব তাঁর বাস্তব সত্তাও নিশ্চয়ই থাকবে।"[1] সুতরাং, বহির্জগতের প্রকৃতি সম্বন্ধে কোনরকম আলোচনা না করেই, কেবলমাত্র ঈশ্বর-ধারণাকে বিশ্লেষণ করেই আমরা স্থিরসিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, 'ঈশ্বর আছেন'—এই হ'ল লক্ষণ-ভিত্তিক যুক্তির তাৎপর্য।

3. লক্ষণ-ভিত্তিক যুক্তির সমালোচনা

প্রথম দৃষ্টিতে এই যুক্তিকে অত্যন্ত প্রবল ও চিত্তাকর্ষক বলে মনে হলেও অনেক দার্শনিক এই যুক্তিটির প্রতিকূল সমালোচনা করেছেন। এই যুক্তির বিরুদ্ধে প্রধানত দুটি আপত্তি তোলা যেতে পারে, যথা—(i) কোনও বস্তুর ধারণামাত্র থেকে তার প্রকৃত অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না, (ii) কোন অসীম, অনন্ত, সর্ব-নিরপেক্ষ বস্তুর ধারণা থেকে তার প্রকৃত অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়, এটা স্বীকার করে নিলেও যে বস্তুর প্রকৃত অস্তিত্ব প্রমাণিত হ'ল, সে বস্তু যে সত্যই আমাদের ধর্মবিশ্বাসানুযায়ী ঈশ্বর হ'বেন তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। এই দুটি আপত্তির পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

(i) প্রথম আপত্তি এই যে, কোন বস্তুর ধারণা ও তার অস্তিত্বের মধ্যে প্রভেদ অনেক। ধারণা একটি মানসিক ব্যাপার। একে আমরা আমাদের রুচি ও প্রয়োজনমত গঠন করতে পারি। আমরা কালো রংএর রূপা অথবা দশমুণ্ডবিশিষ্ট মানুষ কল্পনা করতে পারি। কিন্তু যে বস্তুর প্রকৃত অস্তিত্ব আছে তাকে কেবলমাত্র ইচ্ছার সাহায্যে বিকৃত অথবা নিয়ন্ত্রিত করতে পারি না। কোন বস্তু সত্যই আছে কিনা জানতে হ'লে জড়বস্তুর বেলায় সংবেদন, আর মানসক্রিয়া বা অবস্থার বেলায় অন্তর্নিরীক্ষণের প্রয়োজন। দার্শনিক কাণ্ট ঠিকই বলেছেন যে, আমার মনে 100 স্বর্ণমুদ্রার ধারণা আছে বলেই যে আমার পকেটে তা' থাকবে এরকম সিদ্ধান্ত করা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। কাণ্টের এই আপত্তির বিরুদ্ধে অবশ্য বলা যেতে পারে যে, কোন সসীম, অসম্পূর্ণ বস্তু সম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রযোজ্য হলেও অসীম, স্বয়ং-সম্পূর্ণ, সকল শ্রেষ্ঠগুণের আধার ঈশ্বর সম্বন্ধে এটা প্রযোজ্য নয়। দেকার্তে নিজেই বলেছেন যে, তাঁর যুক্তি কেবলমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু সম্বন্ধে প্রযোজ্য, কোনও সসীম, ত্রুটীবিশিষ্ট বস্তু সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু এ যুক্তিদ্বারাও কাণ্টের মূল আপত্তি খণ্ডিত হয়না ;

---

1 Monadology, 45

কারণ, কাণ্ট বলেন যে, অস্তিত্ব কোন বস্তুর একটি অতিরিক্ত গুণ নয়। কোন বস্তুর অস্তিত্ব নেই বললে তার একটি অনুভবযোগ্য গুণের অভাব আছে এরূপ বুঝায় না। যে বস্তুর অস্তিত্ব আছে তার এক বা একাধিক গুণ আছে এটা জানা থাকলে তার অপর একটি বিশেষগুণ অবশ্যই থাকবে, আমরা এরকম সিদ্ধান্ত করতে পারি। কোনও ত্রিভুজের লক্ষণ থেকে তার তিনটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান হ'বে, এই সিদ্ধান্ত করতে পারি, কিন্তু ত্রিভুজের প্রকৃত অস্তিত্ব না থাকলে তার এই গুণটিরও অস্তিত্ব থাকবে না, এটা কাল্পনিক গুণমাত্র হ'বে। অস্তিত্বকে একটি অতিরিক্ত গুণ কল্পনা করে ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠতা বা সর্বোত্তমতা (Perfection) থেকে তাঁর প্রকৃত অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত করতে হ'লে ঈশ্বরের যে প্রকৃত অস্তিত্ব (Real existence) আছে, তা প্রথমেই স্বীকার করে নিতে হয়, এবং এটা স্বীকার করে নিলে এই যুক্তির আর কোন উপকারিতা থাকে না ; কারণ, যা প্রমাণ করা আবশ্যক, তা পূর্বেই স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে। সুতরাং, কার্তেসীয় যুক্তিটি এইরূপ দাঁড়ায়, "কোন সর্বশ্রেষ্ঠ বা সর্বোত্তম (All-perfect) বস্তু কল্পনা করতে হ'লে তাঁকে অবশ্যই অস্তিত্ববান বলে কল্পনা করতে হ'বে।" কিন্তু আমরা যদি এরূপ বস্তুর কল্পনা না করি, অর্থাৎ, চিন্তাই না করি, তা হ'লে তার প্রকৃত অস্তিত্ব আছে এটা কল্পনা করাও অনাবশ্যক হ'বে। ঈশ্বরের ধারণামাত্র থেকে তাঁব প্রকৃত অস্তিত্ব প্রমাণ করবাও চেষ্টা সফল হ'তে পারেনা।

এই ধরনের প্রতিকূল সমালোচনার আক্রমণ থেকে তাত্ত্বিক যুক্তিকে রক্ষা করবার জন্য কেউ কেউ বলেন যে, এই যুক্তির প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে হ'লে একে এইভাবে প্রকাশ করতে হ'বে—"ঈশ্বর অথবা সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তুর ধারণা একটি অপরিহার্য ধারণা (Necessary idea)। অর্থাৎ, আমাদের মনে এই ধারণার অস্তিত্ব আমাদের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না। অন্যান্য ধারণার সঙ্গে এই ধারণার সম্বন্ধের কথা চিন্তা করলে আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারি যে, আমরা একে আমাদের মনে স্থান দিতে বাধ্য, এবং স্বীকার করতে হ'বে যে, যেহেতু অস্তিত্ব পূর্ণতা বা শ্রেষ্ঠত্বের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, সেইহেতু ঈশ্বরের ধারণা থেকেই 'ঈশ্বর আছেন' এই সিদ্ধান্ত নিঃসৃত হ'বে। আমাদের মনে ঈশ্বর-ধারণার উপস্থিতি অনিবার্য, এটি স্বীকার করব অথচ তাঁর অস্তিত্বের ধারণাকে অনিবার্য বলে স্বীকার করবনা, এটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, ঈশ্বর-ধারণা অপরিহার্য হ'লে তাঁর অস্তিত্বও অবশ্যই স্বীকার করতে হ'বে।

কিন্তু তাত্ত্বিক যুক্তিকে এইভাবে ব্যক্ত করলে এর মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ

হয়ে যায়। জগৎ সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর নির্ভর না করেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করাই এই যুক্তির মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু ঈশ্বরের ধারণা অপরিহার্য, এটা প্রমাণ করতে হ'লে অন্যান্য বস্তুর জ্ঞানের সঙ্গে ঈশ্বরের ধারণাকে যুক্ত করা আবশ্যক। অর্থাৎ, জগৎকে কার্যরূপে বিবেচনা করলে তার এক উপযুক্ত কারণ স্বীকার করা প্রয়োজন; জগতের নিয়ম, শৃঙ্খলা ইত্যাদির ব্যাখ্যা করতে হ'লে একজন বুদ্ধিমান, সর্বজ্ঞ নিয়ন্তা স্বীকার করতে হ'বে, ইত্যাদি যুক্তির অবতারণা করা আবশ্যক। কিন্তু তা করলে তাত্ত্বিক যুক্তির কোনও বৈশিষ্ট্য থাকেনা, ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্বপক্ষে অন্যান্য যুক্তির পর্যায়েই এসে পড়ে, এবং তখন এর বৈধতার বিচার অন্যভাবে করা আবশ্যক বলে বোঝা যায়। অর্থাৎ, ঈশ্বরের ধারণা সত্যই অপরিহার্য কিনা, সেই প্রশ্ন এসে পড়ে।

(ii) এবার তাত্ত্বিক যুক্তির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। দ্বিতীয় আপত্তিটি হচ্ছে এই: স্বয়ং-সম্পূর্ণ, সর্বোত্তম বস্তুর অস্তিত্ব অবশ্যই থাকবে, এই যুক্তিটিকে নির্দোষ এবং গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকার করলেও এতে ঈশ্বরবাদীর প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না; কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত না এটা প্রমাণিত হচ্ছে যে, ঈশ্বরই সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু, ততক্ষণ পর্যন্ত এই যুক্তিদ্বারা আমাদের ধর্মীয় চৈতন্য যে ঈশ্বরকে নির্দেশ করে তাঁর অস্তিত্ব সিদ্ধ হ'বে না। কেউ হয়ত বলবেন যে, অসংখ্য অচেতন, গতিশীল পরমাণুর সমষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু, কেউ হয়ত বলবেন যে, সর্ব-নিরপেক্ষ সমগ্র সত্তা (The Absolute or the Whole)-ই সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু, কেউ হয়ত বলবেন যে, নির্গুণ, নির্বিকার, নির্বিশেষ শুদ্ধচৈতন্য-স্বরূপ পরব্রহ্মই সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু, আবার কেহ হয়ত বলবেন যে, সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয় (The Unknown and Unknowable)। এদের মধ্যে যে কোনটির অস্তিত্বের সপক্ষে তাত্ত্বিক যুক্তিটি প্রয়োগ করা যেতে পারে। অর্থাৎ, শ্রেষ্ঠত্বের প্রকৃত মানদণ্ড (Criterion) কি, এই সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে এবং প্রশ্নের মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত "আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের, অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষের ধারণা আছে", কেবলমাত্র এই একটি হেতুবাক্য থেকে "ধর্ম-বিশ্বাসের অনুমোদিত ঈশ্বর আছেন, এই সিদ্ধান্ত নিঃসৃত হ'তে পারে না।

4. লক্ষণ-ভিত্তিক যুক্তির হেগেলীয় ব্যাখ্যা

হেগেল (Hegel) প্রভৃতি অধ্যাত্মবাদীদের অভিমত এই যে, সাধারণতঃ লক্ষণভিত্তিক যুক্তিটিকে যে আকারে প্রকাশ করা হয়, সেই আকারে এটি

গ্রহণীয় না হলেও এর একটি গূঢ় অর্থ আছে, এবং একে সেই অর্থে নিলে আমরা বলতে পারি যে, এটি একটি চরম সত্যকে প্রকাশ করছে। এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হ'বে যে, যে সব বিশেষ বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের বিষয় সেগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে চিন্তা করলে মনে হয় যে, তাদের অস্তিত্ব থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে ; এবং আমাদের মনে এরকম কোন একটি বস্তুর ধারণা উপস্থিত থাকলে যে বহির্জগতে নিশ্চয়ই থাকবে, এরকম সিদ্ধান্ত করা যায় না। কিন্তু যার মধ্যে সব কিছুই অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে, এমন এক অনন্ত চৈতন্যের ধারণা সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর। এরূপ একটি ধারণার বাস্তব সত্তা আমাদের চিন্তার পক্ষে এতই অপরিহার্য যে, একে অস্বীকার করলে আমাদের সমস্ত চিন্তাই অসংলগ্ন হয়ে পড়ে এবং সমগ্র জগতের অস্তিত্বই সন্দেহের বিষয় হয়ে যায়। অর্থাৎ, আমরা যা কিছু চিন্তা করি, বা যার সম্বন্ধেই আমাদের কোনও জ্ঞান আছে, তা অনিবার্যভাবে নির্ভর করে এমন একটি চৈতন্যের উপর, যা না থাকলে কোন চিন্তা বা জ্ঞানই সম্ভব হ'ত না। আমাদের প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের বিষয়গুলির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে বেশ বোঝা যায় যে, তাদের অস্তিত্ব চিন্তা বা জ্ঞানের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, কোন বৃত্তের পরিধি যেমন তার কেন্দ্রের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, ঠিক তেমনই যে কোনও বস্তু চেতন বিষয়ীর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কোনও স্বয়ং-সৎ বস্তুর, অর্থাৎ যা কোনও ভাবেই কোন জ্ঞানের বিষয় নয়, এমন বস্তুর ধারণা স্ব-বিরোধী ; কারণ, এমন কোনও ধারণাকে মনে স্থান দিতে গেলেই সেই তথাকথিত স্বয়ং-সৎ বস্তুকে অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে এবং চিন্তার সঙ্গে সংযুক্ত করতে হয়। আমাদের পক্ষে যা কিছু আছে তাদের সকলেরই অস্তিত্বের ভিত্তি হিসাবে জ্ঞান বা চিন্তাকে স্বীকার করতেই হ'বে। কিন্তু যে জ্ঞান বা চিন্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে আমরা কোন বস্তুই কল্পনা করতে পারি না, সেটি কোন সসীম ব্যক্তিবিশেষের চিন্তা বা জ্ঞান নয়। "সকল বস্তুর অস্তিত্বই চিন্তা বা জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে"—যে 'আমি' এই বিষয়টি চিন্তা করে সেই 'আমি'ই আবার নিজেকে বাদ দিয়েও চিন্তা করতে পারে। "এমন এক সময় ছিল যখন আমি ছিলাম না, আবার এমন এক সময় নিশ্চয়ই আসবে যখন আমি থাকব না"—এরকম চিন্তাও সম্ভব।[1]

---

1 "The individnal mind which thinks of the necessary priority of thought can also think the non-necessity of *its own* thought. There was a time when we were not ; and the world and all that is therein we can conceive to be as real though we and myriads such as we, no longer existed to perceive and know it." —J. Caird. Philosophy of Religion p. 148.

এই থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, যে চিন্তা বা জ্ঞানের সঙ্গে সমস্ত বস্তুর ধারণাই জড়িত সেটি কোনও সসীম চিন্তা বা জ্ঞান নয়, সেটি একটি বিশ্বজনীন অতিমানব-চৈতন্য যার সঙ্গে সসীম 'আমি' ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং যার জন্য আমার চিন্তন-প্রক্রিয়া সম্ভব। J. Caird বলেন "সমস্ত জ্ঞানের যা অপেক্ষিত, সমস্ত বস্তু যার উপর নির্ভরশীল সেটি কোনও ব্যক্তিবিশেষের নিজেকে ব্যক্তিহিসাবে চিন্তন নয়, কিন্তু এমন একটি চিন্তা বা আত্ম-চেতনা যা সকল ব্যক্তি-চেতনা ও তাদের বিষয়গুলির ঐক্যস্বরূপ অথচ তাদের সকলকে অতিক্রম করে।"[1]

সুতরাং, ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য লক্ষণ-ভিত্তিক যুক্তির প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, আধ্যাত্মিক জীব হিসাবে আমাদের সচেতন জীবন এক বিশ্বজনীন আত্ম-চেতনার উপর নির্ভরশীল। এই সর্ব-ব্যাপী সর্বানুস্যূত চেতনা কারও ব্যক্তিগত ধারণা বা চিন্তা নয়, কিন্তু এর আবশ্যিক সত্তার প্রমাণ এর মধ্যেই নিহিত। এই বিশ্বজনীন চৈতন্যই ঈশ্বর। হেগেলীয় দার্শনিকদের মতে লক্ষণ-ভিত্তিক যুক্তিটির এইভাবে ব্যাখ্যা করলে এর মধ্যে ধর্ম-চেতনার সবচাইতে সুনিশ্চিত ভিত্তি পাওয়া যাবে। ঈশ্বর কেবলমাত্র সকল সসীম বস্তু থেকে ভিন্ন, পরিদৃশ্যমান জগতের সঙ্গে সকল সম্পর্করহিত, বিশ্বাতীত এক অদ্বিতীয় অসীম সত্তা, অথবা তিনি এক সর্বশক্তিমান পুরুষ, এবং এক বাধাবন্ধহীন প্রবৃত্তিই (Arbitrary will) তাঁর এবং জগতের মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র—এইভাবে ঈশ্বরকে চিন্তা না করে, যদি ঈশ্বর এক সর্বব্যাপী, আত্ম-সচেতন বিশ্বাত্মা এবং তিনি সসীম জীবরূপে নিজেকে প্রকটিত করেন —এইভাবে তাঁর স্বরূপ চিন্তা করি, কেবলমাত্র তাহলেই আমরা ধর্ম-চেতনা ও ধর্ম-বিশ্বাসের যথার্থ তাৎপর্য বুঝতে সক্ষম হ'ব।

3. জগৎ-ভিত্তিক যুক্তি (The Cosmological Argument)[2]

পরিদৃশ্যমান জগৎ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানকে ভিত্তি করে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করবার উদ্দেশ্যে যে যুক্তি প্রয়োগ করা হয়, তাকে জগৎ-ভিত্তিক যুক্তি বা অনুমান (The Cosmological argument) বলা যেতে পারে।

1 "The real pre-supposition of all knowledge or the thought which is the prius of all things, is not the individual's consciousness of himself as individual, but a thought or self-consciousness which is beyond all individual selves, which is the unity of all individual selves and their objects, of all thinkers and all objects of thought."—Philosphy of Religion, p. 149

2 Cosmos=জগৎ। Cosmology=জগৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞান।

(জগতের প্রকৃতি আলোচনা করলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এই জগৎ স্বয়ং-নির্ভর বা স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয়। এর সত্তা অবশ্যই এক অসীম, অনন্ত, পূর্ণ-সত্তার উপর নির্ভর করে। সেই এক অদ্বিতীয় পূর্ণসত্তাই ঈশ্বর।) এই যুক্তি নানা আকারে উপস্থাপিত করা যেতে পারে। এই যুক্তির একটি বিশেষ আকার হ'ল কার্য-কারণ-সম্বন্ধ-ভিত্তিক অনুমান অথবা কার্যত্বলিঙ্গক অনুমান[1] (The Causal Argument)। আমরা প্রথমে জগৎ-ভিত্তিক অনুমানের এই আকার সম্বন্ধেই আলোচনা করব।

যুক্তিটিকে সংক্ষেপে এইভাবে প্রকাশ করা যায়:—(যে জগৎ আমরা দেখছি, সেটি একটি কার্য (Effect)। কার্যমাত্রেরই একটি উপযুক্ত কারণ অবশ্যই থাকবে, সুতরাং জগতেরও একটি উপযুক্ত কারণ অবশ্যই আছে। কেবলমাত্র এক সচেতন, সর্বজ্ঞ, সর্ব-শক্তিমান পুরুষ, অর্থাৎ ঈশ্বর-ই সেই উপযক্ত কারণ হ'তে পারেন। সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করতে হ'বে।) এই যুক্তির বিশদ ব্যাখ্যা সাধারণত এইভাবে করা হয়ে থাকে—যে বস্তু বা ঘটনার উৎপত্তি আর বিনাশ আছে তাকেই কার্য বলা হয়। কোন বস্তু বা ঘটনা যদি প্রথমে না থাকে এবং পরে এক বিশেষ সময়ে দেখা দেয়, তাহলে বুঝতে হ'বে যে, তার সত্তা অন্য কিছুর উপর নির্ভরশীল। অন্য কিছুর উপর নির্ভরশীল না হ'লে এটি চিরকালই থাকত। অর্থাৎ, এর সত্তা আবশ্যিক (Necessary) বা স্বতন্ত্র (Self-dependent) নয়, পরনির্ভরশীল বা পরতন্ত্র (Contingent)। যা থেকে কোন বস্তু বা ঘটনা উৎপন্ন হয়, বা যা'র উপর সেটি নির্ভরশীল তাই হচ্ছে এর কারণ। জগতের যত বস্তু বা ঘটনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে তাদের প্রত্যেকেরই কারণ আছে, সুতরাং সেইসব বস্তু ও ঘটনার সমষ্টি যে জগৎ সেই সমগ্র জগতেরও অবশ্যই কারণ থাকবে। বর্তমান মুহূর্তে যে জগৎ, অর্থাৎ, বস্তু ও ঘটনা-সমষ্টি, আছে তার পূর্ব-মুহূর্তের জগৎ, অর্থাৎ সমগ্র বস্তু ও ঘটনা-সমষ্টিই তার কারণ। কিন্তু সেই কারণও স্বতন্ত্র বা স্বয়ং-সিদ্ধ নয়, তারও অনুরূপ কারণ নিশ্চয়ই আছে, এবং সেই কারণেরও কারণ আছে। এইভাবে বর্তমান কালের জগৎকে ব্যাখ্যা করতে হ'লে আমরা অতীতকালে প্রসারিত এক কার্য-কারণ শৃঙ্খলের কল্পনা করতে বাধ্য হই। এই কার্য-কারণ শৃঙ্খল কবে, কোথায়, কিভাবে আরম্ভ হয়েছে তা নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। কোন বস্তু বা ঘটনাকে ব্যাখ্যা করবার জন্য যদি আমরা কোন কারণ নির্দেশ করি, কিন্তু সেই কারণকে ব্যাখ্যা করবার জন্য যদি অপর এক কারণের সন্ধান করতে হয় তাহলে মনে করতে হ'বে যে,

1 ডাঃ সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শন, পৃষ্ঠা ১০০।

প্রথম বস্তু বা ঘটনার সম্পূর্ণ বা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করা হ'ল না। যে বস্তু বা ঘটনাকে ব্যাখ্যা করবার জন্য কোন কারণের প্রয়োজন হয়, তা অন্য বস্তু বা ঘটনাকে ব্যাখ্যা করবে কি করে? যদি কারণ বলতে কেবল-মাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু বা ঘটনা (Phenomenal cause) বুঝি, তাহলে এই সমস্যা অবশ্যই উঠবে, কিন্তু যদি আমরা সেই কার্য-কারণ শৃঙ্খলের আদিতে এমন একটি কারণ স্বীকার করি যার অন্য কোনও কারণ নেই, তাহলেই বর্তমান কালের জগতের একটা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। এই আদি কারণ (First cause, *causa sui*) অন্য কোনও কারণের অপেক্ষা রাখে না। এটি স্বতন্ত্র এবং স্বয়ং-সিদ্ধ। এই আদি কারণই ঈশ্বর। "জগতের আদি-কারণ যে মাত্র একটি হ'বে তার প্রমাণ কি?" —এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে যে, জগতের আদি-কারণের সংখ্যা যদি অনেক হয়, তাহলে তাদের প্রত্যেকটিই সসীম হ'বে, কিন্তু কোনও সীমাবদ্ধ বস্তুই স্ব-তন্ত্র বা স্বয়ং-সিদ্ধ হ'তে পারে না। তা ছাড়া, এই জগতের প্রত্যেক অংশের সঙ্গে অন্যান্য সমস্ত অংশের এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, এবং যে কোনও একটি বস্তুর প্রকৃতি ও ক্রিয়া অন্যান্য অসংখ্য বস্তুর প্রকৃতি ও ক্রিয়ার উপর এমনভাবে নির্ভর করে যে, অনেক স্বতন্ত্র কারণের ক্রিয়ার ফলে এই জগতের উৎপত্তি সম্ভবপর নয়। সুতরাং জগতের আদি-কারণ এক, অদ্বিতীয়—এই সিদ্ধান্তই যুক্তিসঙ্গত।

এখানে লক্ষণীয় এই যে, জগতের আদি-কারণ যে করুণাময়, প্রেমময়, ন্যায়বান, চৈতন্যময় পুরুষ, কেবলমাত্র কার্য-কারণবিধির উপর নির্ভর করে তা প্রমাণ করা যাবে না। সেজন্য অন্য যুক্তির সাহায্য নিতে হ'বে। এই বিশাল জগতের আদি-কারণরূপে এক অতীন্দ্রিয়, এক অসীম অনন্ত সত্তা অবশ্যস্বীকার্য—এই যুক্তি কেবলমাত্র এইটুকুই প্রমাণ করতে পারে। আদি-কারণের অন্যান্য গুণ প্রমাণ করবার জন্য অন্য যুক্তি আবশ্যক।

ভারতীয় দর্শনেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করবার জন্য কার্য-কারণ-সম্বন্ধভিত্তিক যুক্তি বা কার্যত্ব-লিঙ্গক অনুমানের প্রয়োগ দেখা যায়। 'এই জগৎ কোথা থেকে এল?' 'এর সৃষ্টি-কর্তা কে?' এই ধরনের প্রশ্ন যে অতি প্রাচীনকালেও ভারতের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মনে উদয় হ'ত, ভারতের প্রাচীনতম সাহিত্যেও তার বহু চিহ্ন দেখা যায়। এই জগতের যে একজন সর্বজ্ঞ ও সর্ব-শক্তিমান সৃষ্টিকর্তা ও বিধাতা আছেন, এই বিশ্বাসের প্রচলন যে ভারতে খুব প্রাচীন যুগেও ছিল, তার বহু প্রমাণ আছে। আস্তিক দার্শনিক-দের মধ্যে অনেকেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে শ্রুতি বা বেদকেই একমাত্র প্রমাণ বলে গ্রহণ করলেও অনেকে যুক্তির সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ

করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কার্যত্ব-লিঙ্গক অনুমান এই সকল যুক্তির মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। ন্যায়-দর্শনে কার্য-কারণ সম্বন্ধকে ভিত্তি করে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য যে যুক্তি দেওয়া হয়েছে, তা এই রকম—আমরা চন্দ্র, সূর্য, পর্বত, সাগর প্রভৃতি যে সকল বস্তু দেখি, তারা সকলেই কার্য। কার্য-মাত্রেরই কোন চেতন কর্তা থাকবে যেমন, ঘট। সুতরাং এই সকল বস্তুরও চেতন কর্তা আছে। এই সব বস্তুকে কার্য বলে স্বীকার করতে হ'বে ; কারণ, প্রথমত, এদের প্রত্যেকটি বহু অংশের সমষ্টি, এবং দ্বিতীয়ত, এরা মধ্যম-পরিমাণ ; অর্থাৎ, এরা নিরবয়ব পরমাণুও নয় আবার কাল বা আকাশের মত অতি মহৎও নয়। যে অংশগুলির সংযোগে কোন জড়-বস্তু গঠিত হয়, সেই অংশগুলি নিজে নিজেই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হ'তে পারে না। সুতরাং তাদের যুক্ত করবার জন্য কোন চেতন কারণের (কর্তার) প্রয়োজন। কোন বস্তুর আয়তনকে সীমিত করবার জন্যও চেতন কারণের প্রয়োজন। আমরা জগতে যে শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য লক্ষ্য করি, জগতের কোন চেতন কারণ না থাকলে তা সম্ভব হ'ত না। যে কর্তা পরমাণুগুলিকে একত্র করে বিভিন্ন বস্তু গঠন করেন তাঁর পক্ষে পরমাণুগুলির প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষজ্ঞান, চন্দ্রসূর্যাদি বিভিন্ন বস্তু উৎপন্ন করার ইচ্ছা এবং সেই ইচ্ছানুসারে কাজ করার চেষ্টা থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ, জগতের স্রষ্টিকর্তা এক, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান হ'বেন। এই স্রষ্টিকর্তাই ঈশ্বর। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য কার্য-কারণ-সম্বন্ধভিত্তিক যুক্তি (কার্যত্বলিঙ্গক অনুমান)কে সমর্থন করার জন্য অন্য যুক্তিও প্রয়োগ করা হয়েছে।

কার্যত্ব-লিঙ্গক অনুমানকে এইভাবে ব্যক্ত করলে এর বিরুদ্ধে কতকগুলি কঠিন আপত্তি উঠতে পারে :—

(i) প্রথমত, অনাদি কার্য-কারণশৃঙ্খলের কল্পনা আমরা করতে পারিনা, সুতরাং, কার্য-কারণ শৃঙ্খল কোনও একটা বিশেষ কারণ পর্যন্ত এসে নিশ্চয়ই শেষ হয়ে যাবে—এরকম সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক। অনাদি কার্য-কারণ শৃঙ্খলের চিন্তায় কোনও অন্তর্বিরোধ নেই। কোন একটা কার্যের কারণ আছে, আবার সেই কারণের কারণ, দ্বিতীয় কারণের অপর একটি কারণ, তৃতীয় কারণেরও অপর একটি কারণ আছে—এইভাবে ক্রমাগত চিন্তা করতে গেলে হয়ত আমাদের ক্লান্তি আসতে পারে, অথবা, আমরা বিরক্তিবোধ করতে পারি। কিন্তু সেইজন্য যে বাস্তব-জগতে কার্য-কারণ-শৃঙ্খল একটা বিশেষ স্থানে শেষ হয়ে যা'বে, এরকম সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক হ'বে।

অনাদি কার্য-কারণ-শৃঙ্খলের চিন্তার মধ্যে কোনও স্ব-বিরোধ ত

নেইই, পরন্তু সসীম কার্য-কারণ-শৃঙ্খলের চিন্তা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অনুমোদন পেতে পারে না। যদি মনে করা যায় যে, কোনও এক বিশেষ সময়ে তখনকার জগতের সৃষ্টি হয়েছিল, তাহ'লে বলতে হ'বে যে, এমন এক সময় ছিল যখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু বা ঘটনা কিছুই ছিল না। কিন্তু বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য কার্য (Phenomenal effect) মাত্রেরই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য কারণ (Phenomenal cause) থাক ব। এরূপ কারণ না থাকলেই কোন বস্তু বা ঘটনাকে অ-কারণ বলা হ'বে। কোনও বিশেষ সময়ে কিছুই ছিল না, এবং তারপর কতকগুলি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু বা ঘটনার উৎপত্তি হ'ল—একথা বললে বৈজ্ঞানিক কার্য-কারণ নিয়মের বিরোধিতা করা হয়। অর্থাৎ, যে নিয়মকে ভিত্তি করে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করবার চেষ্টা করা হয়েছে, সেই নিয়মকেই অস্বীকার করা হয়। বস্তুত, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য কার্য-কারণ-পরম্পরাকে অনুসরণ করে কোনও অতীন্দ্রিয় জগদতিরিক্ত কারণে পৌঁছান যায় না। J. Caird বলেন, "কোনও সসীম, পর-নির্ভর কার্য থেকে আমরা কেবলমাত্র অপর একটি সসীম, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পরনির্ভর কারণ, অথবা, বড়জোর, সেইরূপ কার্য-কারণের একটি অন্তহীন শৃঙ্খল অনুমান কয়তে পারি, কিন্তু যেহেতু আমাদের মন এই ধরনের মিথ্যা অনন্তত্বে সন্তুষ্ট হ'তে পারেনা, সেই হেতু যদি আমরা এই অন্তহীন পশ্চাদপসরণের কোনও এক বিশেষস্থানে একটা ছেদ টানবার চেষ্টা করি, এবং সেই স্থানে এমন একটি কারণের উপস্থিতি কল্পনা করি যা নিজে কার্য নয়, যা নিজেই নিজের কারণ, কিংবা যা অসীম এবং সর্ব-নিরপেক্ষ, তাহ'লে সেই সিদ্ধান্ত একান্তই নিয়ম-বহির্ভূত (Arbitrary) হ'বে।"[1]

(ii) দ্বিতীয়ত, কার্য-কারণ নিয়ম (প্রত্যেক বস্তু বা ঘটনার একটি কারণ অবশ্যই থাকবে) জগতের অন্তর্গত সসীম বস্তু বা ঘটনা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, সমগ্র জগৎ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। (এখানে 'সমগ্র জগৎ' বলতে বর্তমান কালের জগৎ এবং অতীতে যা কিছু বস্তু বা ঘটনা ছিল এবং ভবিষ্যতে থাকবে সেই সবের সমষ্টি বোঝাবে)। যে নিয়ম বিশেষ বিশেষ বস্তু বা ঘটনা সম্বন্ধে সত্য, সেটি যে সমস্ত বস্তু ও ঘটনার সমষ্টি (অর্থাৎ সমগ্র

---

1 "All that from a finite or contingent effect you can infer is a finite or contingent cause or, at least, an endless series of such causes. But if, because the mind cannot rest in this false infinity, you try to stop the indefinite regress and assert at any point of it a cause which is not an effect, which is its own cause, or which is unconditioned and infinite, the conclusion in this case is purely arbitrary." J. Caird—Philosophy of Religion. p. 129.

জগৎ) সম্বন্ধেও সত্য হ'বে, এমন নাও হ'তে পারে। এরকম সিদ্ধান্ত করলে যে হেত্বাভাসের (Fallacy) উৎপত্তি হয়, তা'কে পাশ্চাত্য তর্কশাস্ত্রে Fallacy of Composition বলা হয়। প্রত্যেক বস্তু বা ঘটনার কারণ আছে, সুতরাং সমগ্র বস্তু ও ঘটনাসমষ্টির (সমগ্র জগতের) একটি কারণ থাকবে, এই অনুমান অসিদ্ধ। জাগতিক ঘটনাগুলির অথবা সমগ্র জগতের ব্যাখ্যা করার জন্য জগদতিরিক্ত কোন শক্তির কল্পনা করা অনাবশ্যক।

এই ধরনের আপত্তির উত্তরে কোন কোন দার্শনিক বলেন যে, যে কার্য-কারণ সম্বন্ধকে ভিত্তি করে আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করি, তার মধ্যে কালিক পৌর্বাপর্যের (Temporal succession) কোনও স্থান নেই। সাধারণত আমরা মনে করি যে, 'খ'-রূপ কার্যের অব্যবহিত পূর্বগামী কোন বস্তু বা ঘটনাই তার কারণ হ'তে পারে। কিন্তু কারণের এই অর্থ করলে ঈশ্বর অথবা কোনও চৈতন্যময় সত্তাকেই জগতের কারণ বলা চলে না। ঈশ্বর বা ঈশ্বরের কোন চিন্তা বা চেষ্টার সঙ্গে কোন জাগতিক ঘটনা বা অবস্থার কালিক সম্বন্ধ হ'তে পারে না। সুতরাং, জগৎ-কারণ হিসাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুমান করলেও ঈশ্বরকে কার্য-কারণ শৃঙ্খলের একটি অংশ হিসাবে বিবেচনা করা অসঙ্গত।

(iii) তৃতীয়ত, ঈশ্বর যদি কোনও এক বিশেষ মুহূর্তে এই জগৎ অথবা যে সব মৌলিক উপাদান থেকে এই জগতের উদ্ভব হ'তে পারে, সেগুলিকে সৃষ্টি করে থাকেন, তা হ'লে স্বভাবতই এই প্রশ্ন উঠবে যে, একটা বিশেষ মুহূর্তে স্রষ্টার মনে জগৎ-সৃষ্টির ইচ্ছা কেন হ'ল ? অনাদিকাল নিষ্ক্রিয় থাকার পর হঠাৎ তাঁর মনে এ রকম ইচ্ছা হ'ল কেন ? কালঘটিত এইসব কঠিন প্রশ্নের মীমাংসা করার জন্য কোন কোন দার্শনিক[1] বলেন যে, ঈশ্বরের সৃষ্টি কালে ঘটেনি। ঈশ্বর সমগ্র জগৎ এবং কাল একই সঙ্গে সৃষ্টি করেছেন। জগৎ সৃষ্টির আগে কিছুই ছিল না, এমন কি, ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কহীন কালও ছিল না। সুতরাং 'বহুদিন অপেক্ষা করার পর ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করলেন কেন ?' —এই প্রশ্নই উঠতে পারে না।

এইভাবে আপত্তিটির উত্তর দিলে কিন্তু মূল যুক্তিটির আকার সম্পূর্ণভাবে বদলাতে হ'বে। কার্য-কারণ সম্বন্ধের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যাকে ভিত্তি করে যুক্তি প্রয়োগ করলে আমরা কোনও কালাতীত বা কাল-বহির্ভূত ক্রিয়া (সৃষ্টি-ক্রিয়া) অনুমান করতে পারি না। বিজ্ঞান-সম্মত কার্য-কারণ নিয়মের সাহায্যে আমরা জগতের কোনও আদি-কারণের অস্তিত্ব অনুমান করতে পারি না।

---

1 মধ্যযুগের দার্শনিক St. Augustine এই মতের সমর্থক।

(iv) চতুর্থত, আমরা যখন কিছু উৎপাদন করি তখন কতকগুলি নিয়মের বশীভূত হয়ে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করতে হয়। কিন্তু ঈশ্বরের ক্ষেত্রে সে ধরনের কোন নিয়ম বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা আমরা কল্পনা করতে পারি না। বিশেষত আমাদের ইচ্ছা-শক্তি যখন কোন জড়বস্তুর উপর কাজ করে, তখন জড়দেহের সাহায্যের দরকার হয়। কিন্তু ঈশ্বরের ক্ষেত্রে আমরা এমন কোনও জড়দেহের (শরীরের) সন্ধান পাই না যার সাহায্যে বা মাধ্যমে ঈশ্বর জগৎ-সৃষ্টি করতে পারেন।[1]

কার্যত্ব-লিঙ্গক অনুমানের বিরুদ্ধে এই সব আপত্তির সমাধান করতে গিয়ে ঈশ্বরবাদীরা বলেন যে, পরিদৃশ্যমান জগতে কার্য ও কারণের মধ্যে আমরা যে ধরনের সম্বন্ধ দেখি, জগৎ ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ ঠিক এরূপ নয়। প্রথমত, ঈশ্বর ও জগতের মধ্যে কালিক পৌর্বাপর্য সম্বন্ধ থাকতে পারে না। কারণ, জগৎ বলতে যদি যা কিছু আছে, ভবিষ্যতে হ'বে এবং অতীতে ছিল, এই সবের সমষ্টি বুঝি তাহ'লে তার আগে কিছু থাকতে পারে না। দ্বিতীয়ত, এ সম্বন্ধ দৈশিক সম্বন্ধও হ'তে পারে না। কারণ, ঈশ্বরের বাহিরে কোনও কিছু থাকতে পারে না। আমরা কোন বস্তু নির্মাণ করলে সেটা আমাদের শরীরের বাইরে কোন স্থানে থাকে। কিন্তু ঈশ্বর যা সৃষ্টি করেন তা তাঁর বাহিরে থাকতে পারে না। সুতরাং, পরিদৃশ্যমান জগতের অস্তিত্ব থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্বের অনুমান যুক্তি-সিদ্ধ করতে হ'লে জগৎ ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ অন্যভাবে কল্পনা করতে হ'বে। কোন কোন দার্শনিক বলেন যে, ঈশ্বর জগতের অন্তর্বর্তী কারণ (Immanent cause)। প্রাণ-শক্তি যেমন জীব-দেহের ভেতরে থেকেই বৃদ্ধি এবং বিকাশের কারণ হয়, ঠিক তেমনই ঈশ্বর জগতের ভেতরে থেকেই যাবতীয় বস্তু এবং ঘটনার নিয়ামক হ'ন। ঈশ্বর ও জগতের মধ্যে পৌর্বাপর্য সম্বন্ধ নেই, অথচ জগৎ কার্য এবং ঈশ্বর তার কারণ। এ স্থলে 'কারণ' বলতে 'আশ্রয়' বা 'ভিত্তি' (ground) বুঝতে হ'বে। বিখ্যাত দার্শনিক স্পিনোজা (Spinoza) বলেন যে, "একটি ত্রিভুজের অন্তর্গত তিনটি কোণের সমষ্টি তিন সমকোণের সমান"—এই সত্য যেমন ত্রিভুজের স্বরূপেই নিহিত থাকে, এবং এই স্বরূপ থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হ'য়ে থাকে, ঠিক সেই রকম এই জগতের সত্তাও ঈশ্বরের স্বরূপ থেকে অনিবার্য-

---

1 কেউ কেউ বলেন যে, আমাদের ইচ্ছাশক্তি আমাদের মস্তিষ্কের ভিতরের বস্তুতে সাক্ষাৎ-ভাবে পরিবর্তন ঘটাতে পারে। ঠিক তেমনই ঈশ্বরের ইচ্ছা-শক্তিও সাক্ষাৎভাবে জগতের উপর ক্রিয়া করতে পারে। কিন্তু এ মতের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, জীবদেহের সঙ্গে সংযুক্ত মস্তিষ্কের অনুরূপ পদার্থ দেহের বাইরে পাওয়া যায় না।

ভাবে নিঃসৃত হয়। ঈশ্বর সুদূর অতীতে কোনও এক বিশেষ মুহূর্তে জগৎ সৃষ্টি করলেন এ কল্পনা অযৌক্তিক। জগৎ অনাদি, চিরকালই আছে, অথচ ঈশ্বর প্রতি মুহূর্তে একে সৃষ্টি করছেন, অর্থাৎ, প্রতিমুহূর্তেই জগৎ ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল। অতএব এক হিসাবে যেমন এটা সত্য যে, জগৎ অনাদি, অপর এক হিসাবে তেমনই এটাও সত্য যে, সৃষ্টি ক্রিয়া অনাদি। এই মতের সমালোচনায় বলা যেতে পারে যে, বিজ্ঞানসম্মত কার্য-কারণ নিয়মের ভিত্তিতে ঈশ্বরকে জগতের অন্তর্বর্তী কারণ বলে প্রমাণ করা যায় না।

এতক্ষণ পর্যন্ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য যে কার্যত্ব-লিঙ্গক অনুমান প্রয়োগ করা হয়, তার সম্বন্ধে আলোচনা করা হ'ল। এখন কার্য-কারণ নিয়মের সাহায্য না নিয়েও কেবলমাত্র জগতের অস্তিত্ব থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুমান করা যায় কিনা তা আলোচনা করা হ'বে।

যুক্তিটি এইরকম:—জগতের প্রকৃতি অনুধাবন করে দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, জগৎ স্বয়ং-সম্পূর্ণ বা স্বয়ং-নির্ভর নয়; এর দোষ-ত্রুটী, অসঙ্গতির অন্ত নেই, এর অন্তর্গত যা কিছু সবই ক্ষণ-ভঙ্গুর, চিরচঞ্চল। এই জগতের চরম আশ্রয় বা আধার হিসাবে এক অসীম, স্বয়ং-নির্ভর, স্বয়ং-সম্পূর্ণ, সকল রকম সঙ্গতিপূর্ণ সত্তার প্রয়োজন। এই পূর্ণসত্তাই ঈশ্বর।[1] জগতের অপূর্ণতা এবং পরনির্ভরতাবোধই এই যুক্তির (The argument *a contingentia mundi*) ভিত্তি।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করবার জন্য ব্যবহৃত তাত্ত্বিক যুক্তি সম্বন্ধে যা বলা হয়েছিল, জগৎভিত্তিক যুক্তি সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যায়। যে চরম সত্তার অস্তিত্ব প্রমাণ করা এই যুক্তির উদ্দেশ্য, তিনি যে ঈশ্বর, অর্থাৎ, ধর্ম-বিশ্বাসীর উপাসনার উপযুক্ত পাত্র—প্রেমময়, ন্যায়বান, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান পরমকারুণিক পুরুষ—হ'বেন তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছবার জন্য যুক্তি আবশ্যক।

Caird বলেন যে, ন্যায়-সম্মত যুক্তি হিসাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য জগৎ-ভিত্তিক যুক্তি সাধারণত যেভাবে বিবৃত করা হয়, তা অসিদ্ধ হ'লেও আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনে এর এক বিশেষ তাৎপর্য আছে।

1 "It is because the finite facts in their dispersedness and mutability seem to be unable to stand alone, to have no thing stable or permanently satisfactory about them and to be riddled with discord and contradiction, that the mind seeks to pass beyond them, as fragmentary appearances to a reality which it conceives as an abiding and harmonious whole" :—Pringle-Pattison—The Idea of God. p. 251

মানুষের মন যে সসীম, ক্ষণস্থায়ী বস্তুর চিন্তায় শান্তিলাভ করতে পারেনা, অসীম, শাশ্বত, স্বয়ং-সিদ্ধ সত্তার জন্য মানুষ সর্বদাই উন্মুখ, তার মনের এই প্রবণতাই এই যুক্তিতে প্রতিফলিত হয়েছে।

4. মার্টিনো (Martineau)র কার্যত্ব-লিঙ্গক যুক্তি

প্রসিদ্ধ ধর্ম-বেত্তা ও দার্শনিক মার্টিনো তাঁর "A Study of Religion" নামক পুস্তকে ঈশ্বরই যে জগৎ-কারণ এটা প্রমাণ করার জন্য যে যুক্তি প্রয়োগ করেছেন, এই প্রসঙ্গে সেটিও আলোচনা করা যেতে পারে। তাঁর এই যুক্তি উপরে যে সব যুক্তিসম্বন্ধে আলোচনা করা হ'ল, সেগুলি থেকে অনেকটা পৃথক্। হিউম (Hume) কার্য-কারণ সম্পর্কের ব্যাখ্যা যেভাবে করেছেন তাকে বিশ্লেষণ করে মার্টিনো দেখিয়েছেন যে, কারণ ও কার্যের সম্বন্ধ মূলত কালগত (Temporal) নয়। অর্থাৎ, কারণ কেবলমাত্র কোন কার্যের নিয়ত পূর্ববর্তী বস্তু বা ঘটনা নয়। এই দুইয়ের মধ্যে একটা যোগসূত্র বা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ (Necessary connection) আছে। কোন বিশেষ কারণের যখন আবির্ভাব হয়, তখন তার অব্যবহিত পরেই নিয়মিত-ভাবে যে বস্তু বা ঘটনার আবির্ভাব হয়, সেইটা তার কার্য—কার্য-কারণ সম্পর্ক সম্বন্ধে মাত্র এইটুকু বল্লেই যথেষ্ট হ'বে না। কারণ কার্যকে ঘটায় বা ঘটতে বাধ্য করে, অর্থাৎ, কারণ-কার্য সম্বন্ধ কোন একটি শক্তির প্রকাশ এটা মানতেই হ'বে।[1] আমরা যখন সক্রিয়ভাবে আমাদের দেহে বা বহির্জগতে কোন পরিবর্তন ঘটাই, কেবলমাত্র তখনই আমরা কারণ-কার্য-সম্বন্ধের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারি। আমরা যখনই কোন ভারী দ্রব্যকে উপরে ওঠাবার চেষ্টা করি, বা প্রবল ঝড়ের বিরুদ্ধে একটি দরজা বন্ধ করবার চেষ্টা করি, তখনই আমরা আমাদের নিজেদের শক্তির সক্রিয়তা অনুভব করি, এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা বিরোধীশক্তির সক্রিয়তাও অনুভব করি। কারণ-কার্যসম্পর্কে হিউম যে বলেছেন, এরকম সম্পর্কের (অর্থাৎ কালিক পৌর্বপর্য ছাড়া অন্য কোনও যোগসূত্রের) আমাদের কোনও সাক্ষাৎ অনুভব হয় না, এটা কোনও মতেই সমর্থনযোগ্য নয়। আমরা বহুবার একটি বস্তু বা ঘটনার

1 "Their relation (i.e. the relation of un-varying antecedent phenomena) to what follows is that, not of prophecy but of production; it is their *effect* and they are its 'efficients'; they not only give notice of it: but do it, not only do it, but necessitate it." —Martineau—A Study of Religion Vol I. p. 146.

আবির্ভাবের পর নিয়মিতভাবে অপর একটি বস্তু বা ঘটনার আবির্ভাব লক্ষ্য করবার পর কারণ-কার্য-সম্পর্কের ধারণা (Idea) আমাদের মনে আবির্ভূত হয়, এ যুক্তিও ভ্রান্ত। আমরা সক্রিয় হ'লে একটিমাত্র ঘটনা থেকেই কারণ-শক্তি কি, সেটা অনুভব করতে পারি, এবং 'শক্তি' (Power)র ধারণা (Idea)র অনুরূপ কোনও অনুভব (Impression) আমাদের নেই, এই মতবাদও ভ্রান্তিমূলক। আমরা সক্রিয় হ'লে পদে পদে যে বিরোধী শক্তিগুলির সম্মুখীন হই, সেগুলির উৎস কি বিভিন্ন না একই—এটাই হ'ল বিবেচ্য, এখানেই যুক্তির প্রয়োজন। জগতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যেসব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে এবং কি ভাবে এক ধরনের শক্তি অন্য ধরনের শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, এই সমস্ত বিচার করলে আমাদের এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে, জগতে যাবতীয় শক্তির মূল উৎস একটিই। এই শক্তি নিশ্চয়ই চেতন-শক্তি হ'বে; কারণ, আমাদের অনুভবের মাধ্যমে আমরা কেবলমাত্র চেতন-শক্তিরই সাক্ষাৎ পরিচয় পেয়ে থাকি। যে শক্তি এই জগতের প্রত্যেক পরমাণুর প্রত্যেক গতি চালিত করছে, তা নিশ্চয়ই অসীম এবং সর্বব্যাপী হ'বে। এইটিই হ'ল ঐশী শক্তি এবং যাবতীয় শক্তিই এই শক্তির রূপান্তর। সুতরাং, কার্য-কারণ-সম্পর্কের ঠিকমত বিশ্লেষণ করলে জগতে যা কিছু ঘটছে একমাত্র ঈশ্বরই তার আদি-কারণ, এই সিদ্ধান্তে আসতে আমরা বাধ্য হই।

মার্টিনোর এই যুক্তির সমালোচনায় বলা যেতে পারে যে, জড়জগতে যে সকল ক্রিয়া দেখা যায়, সেগুলি মূলত একই শক্তির প্রকাশ, বা এই শক্তিই আদি-কারণ, এটা স্বীকার করে নিলেও এই শক্তি যে চেতন সেটা প্রমাণিত হয়না। আমরা যেমন সক্রিয়ভাবে বহির্জগতে পরিবর্তন ঘটাই, ঠিক তেমনি বহির্জগতের এই শক্তিও আমাদের শরীরে বা মনে পরিবর্তন ঘটায়, এটা হয়ত সত্য হ'তে পারে; কিন্তু মাত্র এইটুকু সাদৃশ্যকে ভিত্তি করে এই দুই শক্তির মধ্যে আরও মৌলিক সাদৃশ্য অনুমান করা সঙ্গত হ'বে না। এরকম সিদ্ধান্ত করতে হ'লে বুদ্ধিমান জীবের কর্ম আর তথাকথিত জড়শক্তির ক্রিয়ার ফলে জগতে যা কিছু ঘটে, তাদের মধ্যে কতটা সাদৃশ্য এবং কি ধরনের সাদৃশ্য আছে সেটা বিশেষভাবে বিচার করে দেখতে হ'বে। যাঁরা এইভাবে বিচার করার চেষ্টা করেছেন তাঁরা কার্যত্ব-লিঙ্গক অনুমানের সহায়ক-রূপে অপর একটি অনুমান উদ্ভাবন করেছেন। এই অনুমানটিকে উদ্দেশ্য-কারণতাবাদভিত্তিক যুক্তি (The Teleological Argument) বলা হয়। চেতন বুদ্ধিমান জীবের কর্ম এবং তথাকথিত জড়শক্তির বিভিন্ন ক্রিয়া, এই দুইয়ের মধ্যে এক মৌলিক সাদৃশ্য আছে, এবং সেই মৌলিক সাদৃশ্যের ভিত্তিতে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, এই জড়শক্তিও চৈতন্য ও

বুদ্ধিমত্তা—এই দুই গুণবিশিষ্ট, এই যুক্তিতে এইটাই দেখাবার চেষ্টা করা হয়ে থাকে।

5. উদ্দেশ্যকারণতাবাদ-ভিত্তিক যুক্তি (The Teleological Argument)

যখন একটি বিশেষ ঘটনা বা কতকগুলি বিশেষ ঘটনা একত্র ঘটবার অব্যবহিত পরেই আমরা নিয়মিতভাবে অপর একটি ঘটনাকে ঘটতে দেখি, এবং এর অস্তিত্বকে প্রথমোক্ত ঘটনা বা ঘটনাসমষ্টির উপর নির্ভরশীল বলে মনে করি, সাধারণত তখনই আমরা পূর্ববর্তী ঘটনা বা ঘটনাসমষ্টিকে কারণ এবং দ্বিতীয় ঘটনাকে ঐ কারণের কার্য বলে চিহ্নিত করি। কোন কার্যকে ব্যাখ্যা করতে গেলে তার এক বা একাধিক কারণের উল্লেখ করা আবশ্যক। কিন্তু বহু স্থলে আমরা দেখি যে, কোন বস্তু বা ঘটনাকে পুরাপুরি ব্যাখ্যা করতে গেলে কেবলমাত্র তার নিয়ত-পূর্ববর্তী ঘটনা বা ঘটনাসমষ্টির উল্লেখ করাই যথেষ্ট নয়, সেটা কি উদ্দেশ্যে ঘটছে তারও উল্লেখ করা আবশ্যক। যে সামগ্রী বা উপাদান দিয়ে কোন বস্তু গঠিত হয়, তাকেও কারণ হিসেবে গ্রহণ করলে উপাদান-কারণ (Material cause) আর নিমিত্ত-কারণ (Efficient cause) ছাড়াও যে উদ্দেশ্য লক্ষ্য করে কোন বস্তুর আবির্ভাব হচ্ছে বা ঘটনা ঘটছে, তাকেও একটা কারণ বলে গণ্য করা যেতে পারে। অনেক স্থলেই আমরা কোন বস্তু বা ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তার উদ্দেশ্য-কারণের উল্লেখ করে থাকি। কোন জীব, বিশেষত বুদ্ধিমান জীব, যখন কোন বস্তু নির্মাণ করে, বা বহির্জগতে কোন ঘটনা ঘটায়, তখনই তার একটা উদ্দেশ্য-কারণ আছে, এটা আমরা চিন্তা করতে বাধ্য হই। পাখী যখন বাসা তৈরী করে, বা মানুষ যখন কোন যন্ত্র তৈরী করে, তখন তাদের কাজের পিছনে একটা উদ্দেশ্য থাকে, এবং ঐ উদ্দেশ্য ঐ কাজের আকার এবং প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করে। অন্য কারণ ছাড়াও উদ্দেশ্যকারণ যেখানে কাজ করে সেখানে কার্যের একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। আমাদের অনেক কাজই উদ্দেশ্যমূলক। অধিকাংশ স্থলেই কোন না কোন অভাব মোচন করে আপনার বা অপরের তৃপ্তিসাধন করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। যেখানে আমরা নিজেদের বা অপরের ক্লেশের কারণ হই, সেখানেও অধিকাংশ স্থলেই কোন না কোন রকম সুখ-সাধনই আমাদের চরম উদ্দেশ্য। যখনই আমরা কোন ঈপ্সিত ফললাভের জন্য চেষ্টা করি তখনই সেই ফললাভের উপযোগী সামগ্রীও সংগ্রহ করি। সুতরাং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কাজের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রধানত দুটি, যথা—(১)

কোন একটি কার্যের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী সামগ্রী বা উপকরণের একত্র সমাবেশ এবং (২) এই সমাবেশের ফলে কোনও না কোনও জীবের সুখ উৎপাদন।) অর্থাৎ, ঈপ্সিত ফললাভের জন্য বিশেষ উপযোগিতাই এই সব সামগ্রীসমাবেশের বৈশিষ্ট্য। এসব ক্ষেত্রে কোন কার্য (Effect) কেবলমাত্র এক বা একাধিক কারণসমাবেশের অবশ্যম্ভাবী ফল নয়, কিন্তু এটা কোন জীবের প্রয়োজন মেটায়, তাকে বিপদ থেকে রক্ষা করে, অথবা তার সুখের হেতু হয়, এবং সেইজন্য এই ধরনের কার্যকে উদ্দেশ্য-কারণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে হ'বে। আমাদের বুদ্ধি আছে, এইজন্যই আমরা কোনও না কোনও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সামগ্রী বা উপকরণের সমাবেশ ঘটাই। এরকম সমাবেশ স্বতঃই ঘটে না। (কোনও উদ্দেশ্যসাধনের জন্য একাধিক বস্তু বা ঘটনার সমাবেশ হ'ল—এই ব্যাপার কোন না কোন ধরনের বুদ্ধি-ক্রিয়ার পরিচয় দেয়। সুতরাং জড়জগতের যে অংশে কোন বুদ্ধিমান জীবের ক্রিয়ার সাক্ষাৎ পরিচয় নেই, সেখানেও যদি উদ্দেশ্য-সাধক বস্তু বা ঘটনাসমাবেশ দেখা যায়, তাহ'লে সেখানেও কোন বুদ্ধিযুক্ত মনের ক্রিয়ার ফলে এরকম সমাবেশ সম্ভবপর হয়েছে, এটা অনুমান করা নিশ্চয়ই অযৌক্তিক হ'বে না। কোন নূতন আবিষ্কৃত দ্বীপের সমুদ্রকূলে যদি একটি ঘড়িকে পড়ে থাকতে দেখা যায়, তা'হলে আমরা নিশ্চয়ই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, সেই দ্বীপে মানুষের বাস আছে, বা ছিল, অথবা, কোন ব্যক্তি ঐ বস্তুটিকে ঐ স্থানে ত্যাগ করে গিয়েছে। ঘড়িটির বিভিন্ন অংশ আকস্মিকভাবে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে মানুষের পক্ষে পরম উপকারী এমন একটি যন্ত্র নির্মাণ করবে এটা অবিশ্বাস্য। সুতরাং, যেখানেই কতকগুলি সামগ্রী বা উপকরণকে একত্র হয়ে জীবের পক্ষে সুখকর কিছু উৎপাদন করতে দেখা যাবে, সেখানেই কোন কর্ম-দক্ষ বুদ্ধির ক্রিয়া অনুমান করতে পারা যাবে। সমগ্র জগতের বিশালতা, জটিলতা এবং সুশৃঙ্খল ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখলে আমরা নিঃসন্দেহে অনুমান করতে পারি যে, সমগ্র জগতের পিছনে একমাত্র একটি মন কাজ করছে, এবং সেই মনের জ্ঞান ও বুদ্ধি অপরিসীম। সেই অসীম জ্ঞান ও বুদ্ধিবিশিষ্ট মনই ঈশ্বর। এই হ'ল ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য উদ্দেশ্যকারণতাভিত্তিক যুক্তি (The Teleological Argument)।

এই যুক্তিটির মূল বক্তব্যকে এইভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে: জড় জগতের বহুস্থলেই আমরা কতকগুলি বস্তুকে একত্র মিলিত হয়ে একটা নতুন বস্তু উৎপাদন করতে দেখতে পাই। এইসব স্থলে ঐ নতুন বস্তুকে উৎপাদন করার জন্য যে সব উপাদান বা উপকরণের প্রয়োজন, অর্থাৎ,

যেগুলির ঐ বস্তু উৎপাদনের উপযোগিতা আছে, কেবলমাত্র সেগুলিকেই মিলিত হ'তে দেখা যায়, এবং বিশেষ লক্ষণীয় এই যে, এই রকম সমাবেশ ঘটে বহুবার। ঐ সব বস্তু বা উপাদানের নিজেদের মধ্যে এমন কোনও যোগসূত্র নেই যার ফলে এগুলি অসংখ্যবার পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হ'তে পারে। এক ঝুড়ি টাইপ (Types) ভূমিতে ছড়িয়ে দিলে তাদের যে সব সমাবেশ ঘটে, সেগুলি দিয়ে কোনও গল্প, গান বা কবিতা রচিত হয় না। এই রকম কিছু রচনা করবার ইচ্ছা কোন ব্যক্তির মনে পূর্ব হ'তে থাকলে তবেই টাইপগুলির অর্থপূর্ণ সমাবেশ ঘটতে পারে। অর্থাৎ, যদি অর্থপূর্ণ বাক্য রচনা করা কোন ব্যক্তির ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য থাকে, তবেই ওই সব সমাবেশের সুসঙ্গত ব্যাখ্যা হয়।

এই যুক্তির তিনটি অংশ। প্রথমাংশে বলা হচ্ছে যে, যদি কতকগুলি পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র উপাদান বা উপকরণের একটি ঈপ্সিত ফল (End or goal) উৎপাদন করার এক বিশেষ উপযোগিতা (Adaptation of means to an end) থাকে, এবং তারা বহুবার একত্র মিলিত হয়ে ঐ ঈপ্সিত ফল উৎপাদন করে, তাহ'লে ঐ ফলের ধারণা (Idea of the end)কে ঐ উপাদান বা উপকরণগুলির পরস্পর মিলিত হওয়ার কারণ বলে সিদ্ধান্ত করা উচিত। দ্বিতীয়াংশে বলা হচ্ছে যে, যেহেতু কোন ফলপ্রাপ্তি বা লক্ষ্যসাধনের ধারণা জড়বস্তুতে অথবা অচেতন শক্তিতে থাকতে পারে না, সেইহেতু এইরকম ধারণার আধার হিসাবে চৈতন্য ও বুদ্ধিবিশিষ্ট মনের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হ'বে ; এবং তৃতীয়াশে বলা হচ্ছে যে, জগতের যাবতীয় বস্তু ও ঘটনার মধ্যে যে সব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এবং সর্বব্যাপী মিথস্ক্রিয়া (Universal interaction) দেখতে পাওয়া যায়, তা থেকে সমগ্র জগতের পিছনে একটি মাত্র অসীম, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান মনের ক্রিয়া রয়েছে, এই সিদ্ধান্ত করাই যুক্তিযুক্ত হ'বে।

উদ্দেশ্যকারণতাবাদের সমর্থকরা মনে করেন যে, জগতের সর্বত্রই তাঁদের মতবাদের অনুকূলে বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। যেমন—প্রাণীদের পক্ষে দৃষ্টিশক্তির প্রয়োজন আছে এবং কতকগুলি উপাদানের একত্র সমাবেশের ফলে অসংখ্য প্রাণীর দেহেই দৃষ্টিশক্তিবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়ের (চক্ষুর) আবির্ভাব ঘটে। দৃষ্টিশক্তি উৎপাদনের জন্য যে যে উপাদানের যেরকম বিন্যাসের প্রয়োজন, ঠিক সেই উপাদানগুলিই অসংখ্যবার একত্র মিলিত হয়ে থাকে। প্রাণীদের দেহের গঠন পর্যবেক্ষণ করলে আমাদের এই সিদ্ধান্ত করতে হ'বে যে, বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীদের পরিবেশের দিকে লক্ষ্য রেখেই তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির সৃষ্টি হয়েছে। যে সব প্রাণী অধিকাংশ সময়ে

স্থলের উপরে এবং স্থলের সঙ্গে সংযোগ রেখে বাস করবে, তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন এই কাজের উপযোগী ; যেসব প্রাণী জলচর, তাদের দেহের গঠন অন্যরূপ ; যারা আকাশে উড়বে তাদের দেহের গঠন আবার অন্যরূপ। মানুষজাতির বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার সম্মুখের দুটি পা হাতের আকার ধারণ করেছে, এবং এর ফলে মাটিতে হাঁটার কাজে শরীরকে সাহায্য করার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে তাকে অন্যরকম কাজ করতে সাহায্য করছে। প্রাণীদের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের এক একটি বিশেষ ক্রিয়া (Function) আছে, এবং এই বিশেষ ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রত্যেক প্রাণীই তার জীবন ধারণের উপযোগী বস্তু সংগ্রহ করে থাকে এবং জীবনের ক্ষতিকারক বস্তু বা ঘটনাকে পরিহার করতে পারে। একটি বিশেষ ধরনের বীজ থেকে একটি বিশেষ পরিবেশে একটি বিশেষ শ্রেণীর গাছ জন্মায়, এবং সেই বিশেষ শ্রেণীর গাছ থেকেই সেই গাছ উৎপাদন করার উপযোগী বীজ জন্মায়। পৃথিবীর আবর্তন, ঋতু-পরিবর্তন প্রভৃতির বৈচিত্র্য যে সব নিয়মানুযায়ী হয়ে থাকে, সে সবই যেন উদ্দেশ্যমূলক। সুতরাং, জগতের প্রত্যেক জায়গায় কোনও না কোনও উদ্দেশ্য বস্তু ও ঘটনাগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করছে, এটা স্বীকার করলে তবেই জগতের ক্রমবিকাশের একটা সুসঙ্গত, সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

প্রত্যেক বস্তু বা ঘটনা কোনও না কোনও উদ্দেশ্যদ্বারা চালিত হচ্ছে, এটা স্বীকার করে জগতের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, সেই ব্যাখ্যা জড়বাদ-সম্মত যান্ত্রিক ব্যাখ্যা (Mechanical interpretation)র বিরোধী। যান্ত্রিক ব্যাখ্যায় বলা হয় যে, এই জগৎ অসংখ্য পরমাণুর সমাবেশের ফলে গঠিত হয়েছে। এই পরমাণুগুলি অচেতন হলেও চিরকালই সক্রিয়। তারা কোনও চেতন সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি নয়, বা কোনও বুদ্ধিমান পুরুষদ্বারা চালিত নয়। অনাদিকাল থেকেই তারা কতকগুলি নিয়মের অধীন, এবং এইসব নিয়মের বশে তারা পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, অথবা, পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। প্রাণীদের সচেতন ক্রিয়ার ফলে যেসব কার্য হয়, সেগুলি ছাড়া অন্যান্য সব কার্যই বস্তু বা ঘটনাসমূহের আকস্মিক সমাবেশের (Accidental combination) ফল। অর্থাৎ, তাদের পিছনে কোনও উদ্দেশ্যই সক্রিয় নয়। কতকগুলি কারণ-সামগ্রী একত্র হ'লে যে কার্য উৎপন্ন হয়, তা হ'ল সেই কারণ-সামগ্রী সমাবেশের অনিবার্য ফল। প্রাকৃতিক ঘটনাগুলির ফলে কোন জীবের সুখ বা দুঃখ উৎপন্ন হ'তে পারে, কিন্তু সেই সুখ বা দুঃখ ঘটানোই যে কারণগুলির উদ্দেশ্য এরূপ কল্পনার কোন স্থান নেই। প্রবল বন্যায় যখন গ্রাম ও সহর বিধ্বস্ত হয়, তখন এই ধ্বংসকায যে বন্যার উদ্দেশ্য, বা যখন সমুদ্র থেকে

উত্থিত বাষ্পরাশি মেঘের আকার ধারণ করে এবং বৃষ্টিতে পরিণত হয়ে ভূমিকে সিক্ত করে, তখন মানুষের কৃষি-কার্যের সহায়তা করাই তার উদ্দেশ্য, এরূপ মনে করারও কোন হেতু নেই।

সুতরাং, জাগতিক ঘটনাগুলির উদ্দেশ্য-কারণতাভিত্তিক, ইষ্ট-হেতুক বা উপযোগিতাত্মক ব্যাখ্যা আর যান্ত্রিক কার্য-কারণভিত্তিক ব্যাখ্যা পরস্পর-বিরোধী বলেই মনে হয়। প্রথম ব্যাখ্যাটিকে স্বীকার করে নিলেই অসীম বুদ্ধির অধিকারী, পরম কুশলী স্রষ্টিকর্তার অস্তিত্ব অনুমান করা সম্ভব, কিন্তু দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি এরকম স্রষ্টিকর্তার অস্তিত্বের অনুকুল নয়।

6. উদ্দেশ্য-কারণতা-ভিত্তিক যুক্তির সমালোচনা

উপরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের সহায়ক যে যুক্তির ব্যাখ্যা করা হ'ল আমাদের সহজ-বুদ্ধির পক্ষে এটা খুবই হৃদয়-গ্রাহী হলেও একে বহু আপত্তির সম্মুখীন হ'তে হয়। এইসব আপত্তির সমাধান না হ'লে এই যুক্তিকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা যায় না। এইরকম কতকগুলি আপত্তি নীচে দেওয়া হ'ল—

(i) প্রথম আপত্তিটিকে এইভাবে প্রকাশ করা যায়—

যুক্তিটি মূলত একটি সাদৃশ্য-মূলক যুক্তি (Analogical argument)। বুদ্ধিমান জীব অর্থাৎ মানুষ যে সকল বস্তু নির্মাণ করে সেগুলি, এবং যেগুলি প্রাকৃতিক জগতে নানারকম বস্তু ও ঘটনার ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয়, তাদের মধ্যে একটি বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। যথা, এই দুই শ্রেণীর বস্তুর বেলাতেই আমরা দেখি যে, কতকগুলি কারণের সমাবেশের ফলে যে বস্তু নির্মিত হচ্ছে, সেটি কোন না কোন ইষ্ট বা মঙ্গলজনক বস্তু, এবং ঐ কারণগুলি ঐ ইষ্ট বা মঙ্গলজনক বস্তু উৎপাদনের উপযোগী। মানুষের নির্মিত বস্তুগুলির ক্ষেত্রে যেমন কারণ-সামগ্রীগুলির ইষ্ট-সাধনের উপযোগিতা আছে, তেমনই প্রাকৃতিক জগতের বস্তুগুলির ক্ষেত্রেও তাদের কারণ-সামগ্রীগুলির ইষ্ট-সাধনের উপযোগিতা আছে। মনুষ্য-নির্মিত বস্তুগুলির ক্ষেত্রে কিন্তু তাদের নির্মাণ-ক্রিয়ার পিছনে কোন না কোন উদ্দেশ্য বর্তমান (এটা আমাদের সাক্ষাৎ অনুভবের বিষয়)। সুতরাং আমরা অনুমান করতে পারি যে, প্রাকৃতিক জগতেও প্রত্যেক বস্তুর নির্মাণ-ক্রিয়ার পিছনে কোন না কোন উদ্দেশ্য থাকবে। মানুষের তৈরী বস্তু সম্বন্ধে যেমন কোন সচেতন উদ্দেশ্যকে একটি অপরিহার্য কারণ (Necessary cause) বলে মনে করি, তেমনই প্রাকৃতিক জগতেও প্রত্যেক বস্তুর পিছনে

কোন উদ্দেশ্যের ক্রিয়া আছে, এটা স্বীকার করতে হ'বে। কিন্তু এখানে লক্ষণীয় এই যে, মনুষ্য-নির্মিত বস্তু এবং প্রাকৃতিক জগতে নির্মিত বস্তুর মধ্যে বহু স্থলেই এরূপ সাদৃশ্য থাকে না। অসংখ্য ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, কতকগুলি কারণের সমাবেশে যে বস্তু রচিত হ'ল তার কোন উপকারিতাই নেই, বরং অনেকস্থলেই সেগুলি মানুষ এবং অন্য প্রাণীদের দুঃখকষ্টের কারণ। বিশাল মরুভূমি, সুমেরু ও কুমেরুর বিস্তীর্ণ বরফ-রাশি, মহাসাগরের তলদেশে অবস্থিত নানারকম জলজ উদ্ভিদ প্রভৃতি কারও কোনও ইষ্ট বা মঙ্গল করে বলে আমাদের জানা নেই। জীবদেহের এমন অনেক অংশ আছে যেগুলির দেহের পক্ষে কোনও উপকারিতা নেই, অথচ সেগুলি নানারূপ রোগসৃষ্টি করতে পারে।[1] বহু অনিষ্টকারী কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ ইত্যাদি আছে যেগুলি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এই যে, সেগুলি জগতে না থাকলেই ভাল হ'ত। যেসব জিনিষ কোনও জীবের কোনও উপকারে আসে না, বরং নানারকমে ক্ষতি করে, তাদের উদ্দেশ্যহীনতার (Dysteleology) দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে। আবার যে সব স্থলে মানুষের তৈরী কোন বস্তুর সঙ্গে প্রাকৃতিক কোন বস্তুর সাদৃশ্য আছে বলে মনে করা হয়, প্রকৃতপক্ষে সে সব স্থলে অনেক বৈসাদৃশ্যও থাকে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি যখন কোন উপকারী বস্তু উৎপাদন করার ইচ্ছা করে, তখন সে যতদূর সম্ভব অল্প সময়ে, অল্প পরিশ্রমে এবং অল্প সামগ্রীর সাহায্যে সেটি করা যায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখে; কিন্তু প্রাকৃতিক জগতে এরকম চেষ্টার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। মাছ বা মাকড়সার একটি ডিম থেকে অসংখ্য মাছ বা অসংখ্য মাকড়সা জন্মায়, কিন্তু জন্মাবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাদের অধিকাংশের মৃত্যু হয়। একটি গাছে যত ফল হয় এবং অনেক ফলে যত বীজ হয়, সেগুলি থেকে অসংখ্য গাছ হ'তে পারে, কিন্তু অধিকাংশ বীজই নষ্ট হয়ে যায়। জীবের প্রাণ-ধারণের জন্য এত অধিক সংখ্যক ও এত বিভিন্ন রকমের খাদ্যসামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা কি, তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। আবার, বৈজ্ঞানিকেরা দেখিয়েছেন যে, পৃথিবীতে কোন বিশেষ প্রাণীজাতির আবির্ভাব হ'তে, অথবা, প্রাণীদেহের কোন অঙ্গের বর্তমান অবস্থায় পৌঁছতে লক্ষ লক্ষ বৎসর কেটে যায়। মানুষের পক্ষে একটা বাড়ী নির্মাণ করতে কয়েক মাস বা কয়েক বৎসর সময় লাগে, প্রাকৃতিক জগতে কোন বস্তুর নির্মাণের জন্য এত সময়ের অপচয় কেন? বুদ্ধিমান জীবের নির্মাণকার্যের পদ্ধতি আর প্রাকৃতিক

1 মানুষের দেহে Appendix নামে যে অংশটি আছে, তার নিজের কোন উপকারিতা নেই, অথচ তা Appendicitis নামে ভীষণ রোগের কারণ হ'তে পারে।

জগতে নির্মাণ-কার্যের পদ্ধতি, দুইয়ের মধ্যে এই বৈসাদৃশ্য থাকার দরুণ দুটিকে একইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। জগতে এমন বহু দৃষ্টান্ত আছে যেগুলি ঈশ্বরবাদীদের যুক্তির সমর্থন করে না, বরং বিরোধিতা করে।

(ii) দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য উপরে যে যুক্তি দেওয়া হয়েছে তা চক্রক-দোষে দুষ্ট। অর্থাৎ, এই যুক্তিতে যে সিদ্ধান্ত করতে চাওয়া হয়েছে, হেতুবাক্যে সেটির সত্যতা আগেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। যদি কতকগুলি বস্তু একত্র মিলিত হয়, তার ফলে কোনও না কোনও কার্য অবশ্যই উৎপন্ন হ'বে, এবং ঐ বস্তুগুলি নিশ্চয়ই ঐ কার্যের উপযোগী সামগ্রী বা কারণ হ'বে। কিন্তু মনুষ্যরূপী কতকগুলি বুদ্ধিমান জীব উৎপাদন এবং তাদের সকল রকম সুখ ও উন্নতি বিধান করাই জগতের উদ্দেশ্য, এটা পূর্বে স্বীকার করে নিলে তবেই এই ধরনের উপযোগিতার কোন বিশেষত্ব আছে বলা যেতে পারে। দুই বা ততোধিক বস্তুর সমাবেশের ফলে একই সময়ে বিভিন্ন কার্য এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কার্য উৎপন্ন হ'তে পারে (অন্ততঃ উৎপন্ন হয় বলে মনে হ'তে পারে)। যেমন, কোনও রোগীর দেহে অস্ত্রোপচারের ফলে রোগীর যন্ত্রণা হ'তে পারে এবং রোগীর প্রাণরক্ষাও হ'তে পারে। একটি গাছ দিনে মানুষদের ছায়া দিতে পারে আবার রাত্রিতে পাখীদের আশ্রয় দিতে পারে, ফলফুল ইত্যাদি দিতে পারে। এদের মধ্যে কোনটিকে উদ্দেশ্য বলে মনে করা উচিত, তার কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম আছে বলে মনে হয় না। কোনও নির্জন স্থানে একটি ঘড়ি দেখে আমরা সেখানে মানুষের অস্তিত্ব অনুমান করতে পারি, কারণ আমরা পূর্ব হ'তেই জানি যে, সময়ের সঠিক হিসাব রাখা মানুষের পক্ষে প্রয়োজন। কিন্তু এই প্রয়োজন সম্বন্ধে জ্ঞান পূর্ব থেকেই না থাকলে ঘড়ি যে একটি উদ্দেশ্য সিদ্ধি. করে, সেটা প্রমাণ করা যেত না। ঠিক তেমনই ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন ও পালন করেছেন, সেটা পূর্বেই জানা না থাকলে কেবলমাত্র কতকগুলি বস্তু কি ভাবে একত্র মিলিত হচ্ছে, তা দেখে সেগুলির যে বিশেষ উদ্দেশ্য আছে সেটা প্রমাণ করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ, ঈশ্বর আছেন এটা স্বীকার করে নিয়েই জগৎসৃষ্টি যে উদ্দেশ্যমূলক সেটা প্রমাণ করবার চেষ্টা করা হচ্ছে। সুতরাং এই যুক্তিতে চক্রক-দোষ আছে।

(iii) বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, জগতের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যে সকল তথ্য ও নিয়ম আবিষ্কৃত হয়েছে, তাদের সাহায্যে জাগতিক বস্তুগুলির আকার, প্রকৃতি এবং বিভিন্ন সমাবেশ এমনভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব যে, কোনও উদ্দেশ্যের উল্লেখ করা প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। জগতের যে এক অবস্থা থেকে

অপর এক অবস্থায় ক্রমাগত পরিণতি হচ্ছে, তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। অসংখ্য জড়-পরমাণু এবং কতকগুলি মৌলিক নিয়মের জ্ঞানকে ভিত্তি করে বৈজ্ঞানিকেরা জগৎপ্রক্রিয়ার প্রত্যেক ব্যাপারের বর্ণনা দিয়ে থাকেন। এই বর্ণনা থেকে আমরা বুঝতে পারি কি ভাবে যে বস্তু এক-সময়ে অতি সরল ছিল এবং যার অংশগুলি অস্পষ্ট ছিল, সেটি তার অন্তর্নিহিত শক্তি ও পরিবেশের প্রভাবে, এবং এই দুইয়ের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলে ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হয়ে কোনও এক সময়ে এক বিশেষরূপ ধারণ করে। যে সৌরজগতে সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহ-উপগ্রহেরা প্রত্যেকে নির্দিষ্ট গতিপথে ঘরছে, সেই সৌরজগৎ কি ভাবে কোনও নির্দিষ্ট আকারবিহীন নীহারিকাপুঞ্জ থেকে ক্রমে ক্রমে তার বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেচে, যে পৃথিবী এক সময়ে জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডমাত্র ছিল, সেটা কি করে ক্রমে ক্রমে জীবন্ত প্রাণীর বাসের পক্ষে উপযোগী হয়েছে, প্রাণীদের মধ্যে বিভিন্ন জাতির উদ্ভব কি করে হ'ল, প্রাণীদের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি কি ভাবে তাদের বর্তমান আকার ধারণ করল—এ সমস্তরই সন্তোষজনক ব্যাখ্যা বৈজ্ঞানিকদের বর্ণনা থেকে পাওয়া যায়। এইসব বর্ণনায় কোনও বুদ্ধিমান পুরুষের হস্তক্ষেপের স্থান নেই। মানুষের কোন ইন্দ্রিয়ের এখন যে গঠন দেখতে পাওয়া যায়, তার সেই গঠন লক্ষ্য করলে অবশ্য মনে হ'বে যেন, কোন এক নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য-সাধনের উপযোগী করেই এটিকে তৈরী করা হয়েছে, কিন্তু এর ক্রমবিকাশের বহু বৎসরের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, এটি আদিম অবস্থায় মোটেই ঐ উদ্দেশ্য-সাধনের উপযোগী ছিল না, অথবা, খুব অল্পই উপযোগী ছিল; কিন্তু ক্রমে ক্রমে নানারকম প্রাকৃতিক শক্তির ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলে ঐ উদ্দেশ্য-সাধনের উপযোগী হ'তে পেরেছে। কোনও সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান পুরুষের পক্ষে একটি যন্ত্র তৈরী করবার জন্য লক্ষ লক্ষ বছর প্রয়োজন হ'বে কেন, আর এই সময়ের মধ্যে অসংখ্য ত্রুটী পূর্ণ যন্ত্র ধ্বংস করে ফেলার প্রয়োজন হ'বে কেন, তার কোনও সদুত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না। সুতরাং, যদি বাস্তব তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক মতবাদের সাহায্যে সমস্ত জাগতিক বস্তুর গঠন, প্রকৃতি, ক্রিয়া, সমাবেশ প্রভৃতির সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া যায়, তা'হলে উদ্দেশ্য-কারণতাবাদকে ভিত্তি করে এসবের কোন কাল্পনিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

(iv) Kant এই উদ্দেশ্য-কারণতামূলক যুক্তির বিরুদ্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ আপত্তি তুলেছেন। তিনি নিম্নলিখিত নিয়মকে একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলে মনে করেন—"যে কারণ জগতের ভিতরে এক বা একাধিক জাগতিক নিয়মের নিয়ন্ত্রণাধীনে ক্রিয়া করে, সেই কারণই জগৎসৃষ্টি করতে

পারে না।"—জাগতিক বহু ঘটনার কারণরূপেই অনেক সময়ে মানব-বুদ্ধির উল্লেখ করতে হয়। কিন্তু মানব-বুদ্ধি জাগতিক নিয়মগুলির অনুগত না হয়ে ক্রিয়া করতে পারে না, সুতরাং মানব-বুদ্ধি বা তদনুরূপ কোনও শক্তি জগৎ সৃষ্টি করতে পারে না (কারণ এইরকম সৃষ্টি করার সময়ে কোনও জাগতিক নিয়মের সাহায্য পাওয়া ঐ শক্তির পক্ষে সম্ভব নয়)।

(v) কোন কোন দার্শনিক এই যুক্তির বিরুদ্ধে আপত্তি তুলেছেন যে, এই জগতের একজন নির্মাতা (Builder) আছেন, এই যুক্তি বড় জোর এইটুকু প্রমাণ করতে পারে, কিন্তু একজন সর্বজ্ঞ, অনন্তশক্তিবিশিষ্ট সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারে না। এই যুক্তির পূর্ব-স্বীকার্য হ'ল এই যে, ঈশ্বর হ'তে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র এমন একটি উপাদান আছে, যার সুন্দর, সুসমঞ্জস বা প্রাণীদের পক্ষে উপকারী বস্তু উৎপন্ন করার কোনও ক্ষমতা নেই। ঈশ্বর এই উপাদানের আনুকূল্য ছাড়া কিছুই নির্মাণ করতে পারেন না, এবং সেইজন্য এই উপাদানকে আয়ত্তে আনার জন্য তাঁকে অনেক কৌশল অবলম্বন করতে হয়। সুতরাং, এই যুক্তি সিদ্ধ হ'লেও এর সাহায্যে জগতের আকার এবং উপাদান, এই দুইই যিনি সৃষ্টি করেছেন এমন কোন বুদ্ধিমান পুরুষের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না।

এইসব আপত্তি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার স্থান এখানে নেই। তবে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলা যায়।

(i) ঈশ্বরবাদীদের পক্ষ থেকে বলা যেতে পারে যে, উদ্দেশ্যকারণতা-বাদ-ভিত্তিক অনুমান ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করবার জন্য বহু যুক্তির মধ্যে একটিমাত্র, কিন্তু এটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয়। অর্থাৎ, আমরা কেবলমাত্র এই যুক্তির সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ সন্তোষজনকভাবে প্রমাণ করতে অথবা ঈশ্বর সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে পারি না। কেবলমাত্র একজন বুদ্ধিমান পুরুষকেই এই জগতের বিধাতা বা পালনকর্তা বলে স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত, এইটা প্রমাণ করাই এই অনুমানের উদ্দেশ্য, সুতরাং, এর এই সীমিত উদ্দেশ্য মনে রেখেই এর বিচার করতে হ'বে।

(ii) বৈজ্ঞানিক ক্রম-বিকাশবাদের ভিত্তিতে যে আপত্তি করা হয়েছে সে সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে, এই মতবাদ স্বীকার করে নিলেও জগতে উদ্দেশ্যমূলক নানা রকম ব্যবস্থার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে 'ক্রম-বিকাশবাদ' (Theory of Evolution)কে জাগতিক প্রক্রিয়া (The Cosmic process)র সম্পূর্ণ সন্তোষজনক ব্যাখ্যা বলে মনে হ'লেও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে একে সম্পূর্ণ সন্তোষজনক বলা যায় না। বিজ্ঞান জগতে বহু সার্বিক নিয়মের অস্তিত্ব স্বীকার করলেও, বিভিন্ন

বস্তু ও ঘটনাকে, উদ্দেশ্য এবং উপায়কে, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানকে পরস্পর হ'তে বিচ্ছিন্ন করে দেখে, কিন্তু দর্শনের দৃষ্টি সামগ্রিক দৃষ্টি। সমস্ত বস্তু ও ঘটনা, উদ্দেশ্য ও উপায়, ভবিষ্যৎ, বর্তমান ও অতীত—এদের মধ্যে যে মৌলিক ঐক্য আছে. সেই ঐক্যের আলোকে সব কিছুর প্রকৃতি বোঝবার চেষ্টা করাই দার্শনিকের কাজ। যদি জগতের মৌলিক উপাদান পরমাণুগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার ফলে কালক্রমে জৈব দেহ, প্রাণ, চৈতন্য, বিচারবুদ্ধি প্রভৃতির আবির্ভাব হয়ে থাকে, তাহ'লে এটাই বুঝতে হ'বে যে, এগুলি উৎপন্ন করার উপযোগিতা পূর্ব হ'তেই পরমাণুগুলির অন্তর্নিহিত ছিল। এগুলির আবির্ভাব আকস্মিক নয়। এগুলি যাতে উৎপন্ন হ'তে পারে তার প্রস্তুতি-পর্ব যেন সৃষ্টির আদি থেকেই চলে আসছিল। যে সব বিশেষ আকারের মধ্য দিয়ে একটি বস্তু, যেমন, পৃথিবী বা একটি প্রাণীজাতি বা কোন ইন্দ্রিয় বর্তমান আকার লাভ করেছে, সেই আকারগুলিকে উদ্দেশ্য-সাধনের বিভিন্ন উপায় বলে মনে করলে সেগুলিরও নিজস্ব মূল্য আছে স্বীকার করতে হ'বে। অর্থাৎ, দার্শনিক-দৃষ্টি এই কথাই বলে যে, বিভিন্ন বস্তু বিচ্ছিন্নভাবে কোন কোন উদ্দেশ্যসাধন করে, সেটা বিচার না করে ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জগতের মিলিত সত্তা যে সমগ্র জগৎ সেই জগতের ঐক্য, সঙ্গতি, সামঞ্জস্য ও সুষমার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হ'বে। এই সামাগ্রিক সামঞ্জস্য ও সুষমার মাধ্যমেই বুদ্ধিদীপ্ত চৈতন্যের প্রকাশ।

(iii) এখানে বিশেষভাবে মনে রাখতে হ'বে যে, প্রাকৃতিক ক্রিয়াগুলি যদি উদ্দেশ্যদ্বারা চালিত হয়, তাহ'লেও মানুষের উদ্দেশ্যসাধনের পদ্ধতি আর প্রকৃতির উদ্দেশ্য-সাধনের পদ্ধতি, এই দুইয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকতে পারে। মানুষের শক্তি ও ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি সীমাবদ্ধ। আমাদের দৃষ্টি সাধারণত অদূর ভবিষ্যৎকে অতিক্রম করতে পারে না। যে সব অসংখ্য বস্তু কোন বিশেষ উদ্দেশ্য-সাধনের উপযোগী তাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক বস্তুকেই আমরা আয়ত্ত করতে পারি। সুতরাং একই ক্রিয়ার কত বিভিন্ন ফল হ'তে পারে, বা সুদূর ভবিষ্যতে কি কি ফল হওয়া সম্ভব, সাধারণত সেগুলি আমাদের দৃষ্টিগোচরে থাকে না। আমরা আমাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন-কেই গুরুত্ব দিয়ে থাকি এবং সেই সব প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য যেসব পদ্ধতি বা উপকরণ ব্যবহার করি, সেগুলি ছাড়াও যে প্রয়োজন-সিদ্ধির অন্য পদ্ধতি, অন্য উপকরণ থাকতে পারে, সেটা আমরা চিন্তা করি না। আমাদের ক্রিয়া-পদ্ধতি ও প্রাকৃতিক ক্রিয়া-পদ্ধতির মধ্যে কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ্য করে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, প্রাকৃতিক ক্রিয়াও আমাদের ক্রিয়ার মত উদ্দেশ্যাভিমুখী (Teleological)। কিন্তু প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের

জ্ঞান যতই ব্যাপকতর ও গভীরতর হ'তে থাকে ততই প্রকৃতির উদ্দেশ্য-সাধনের প্রকৃত রূপটি আমাদের কাছে ক্রমশ অনেকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তখন হয়ত আমরা একথা বলব না যে, মানুষকে রৌদ্রে ছায়া দেবার উদ্দেশ্যেই ভগবান গাছ সৃষ্টি করেছেন, অথবা, সমুদ্রে নাবিকদের সুবিধার জন্যই ধ্রুবতারা সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু একথাও বলব যে, জগতে প্রতি মুহূর্তে যে সব অসংখ্য ঘটনা যেভাবে ঘটছে, সেগুলি ঠিক সেইভাবে ঘটতে গেলে অসংখ্য বস্তুর মধ্যে যে ধরনের সাহচর্য বা একাত্মতা থাকা প্রয়োজন, তা অসংখ্য অচেতন, স্ব-তন্ত্র, অন্য-নিরপেক্ষ পরমাণুতে থাকতে পারে না। এই পৃথিবীতে কোন জড়বস্তুতে কোনও একটি ক্রিয়া ঘটলে সেই ক্রিয়ার উপযোগী একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়া কোটি কোটি মাইল দূরবর্তী স্থানে নিয়মিতভাবে বারবার ঘটতে থাকে। এই ব্যাপারকে নিছক আকস্মিকতা (Accidental coincidence)র উদাহরণ বলে সিদ্ধান্ত করা কোনও বুদ্ধিমান জীবের পক্ষে অসম্ভব।

7. অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যকারণতাবাদ

আধুনিক ঈশ্বরবাদী দার্শনিকদের মধ্যে অনেকে উদ্দেশ্য-কারণতামূলক যুক্তিকে ত্রুটীপূর্ণ বলে সমালোচনা করলেও তাঁরা বলেন যে, জগতের কারণটি যে উদ্দেশ্য সাধন করে, সেটা কোন বাহ্য উদ্দেশ্য (External purpose) নয়, অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য, এটা স্বীকার করলে এই যুক্তির ত্রুটিগুলি অনেকাংশে দূর করা যায়। উদ্দেশ্যকারণতাভিত্তিক অনুমান সাধারণত যে আকারে প্রয়োগ করা হয় তাতে এটা ধরে নেওয়া হয় যে, যে বস্তু কোন উদ্দেশ্য সাধন করছে সেই বস্তুর মধ্যে উদ্দেশ্যটি নেই, কিন্তু বাহিরে আছে। (যেমন কোন মানুষ ফুলের গন্ধ উপভোগ করবে, এইটাই হ'ল তার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্য সাধন করাতেই তার সার্থকতা।) এই যুক্তি এটাই প্রমাণ করবার চেষ্টা করে যে, যে বস্তু বা উপাদান স্বতঃই কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করতে অক্ষম, বাহিরের কোন শক্তি তার উপর ক্রিয়া না করলে সেই বিশেষ উদ্দেশ্য সাধিত হ'ত না, এবং সেই শক্তি কোন বুদ্ধিমান পুরুষের ক্রিয়া হওয়া আবশ্যক। এরূপ ভাবে চিন্তা করলে উদ্দেশ্যমূলক যুক্তির বিরুদ্ধে যে সব আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে সেগুলি খণ্ডন করা দুরূহ হয়ে পড়ে। কিন্তু এরূপ চিন্তা না করে, যদি প্রত্যেক বস্তুর প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য তার নিজের মধ্যেই আছে, এরূপ মনে করা হয়, তাহ'লে এই আপত্তিগুলির অধিকাংশকেই আর প্রবল বলে মনে হ'বে না। প্রত্যেক বস্তুর নিজস্ব উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন

হচ্ছে তার পূর্ণস্বরূপে বিকশিত হওয়া, জগতে তার যে নির্দিষ্ট স্থান সেই স্থান পূর্ণ করা ; এবং যদি সে তার অন্তর্নিহিত শক্তিবলেই সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে, তাহ'লে বাহিরের কোন শক্তির তার উপর ক্রিয়া করার কোন প্রয়োজন থাকে না। সমগ্র জগৎ সম্বন্ধে এই ধারণা প্রয়োগ করলে আমরা বলব যে, জগতে যে সামঞ্জস্য, সংহতি, সুষমা আমরা অনুভব করি, তা তার অন্তর্নিহিত শক্তির ক্রিয়ার ফল। কিন্তু সেই শক্তি কোনও অচেতন অন্ধ শক্তি নয়, বুদ্ধিদীপ্ত চৈতন্য। এই চৈতন্য ঐশীসত্তা। সুতরাং, বিশেষ বিশেষ বস্তুর বিশেষ বিশেষ বাহ্য উদ্দেশ্য-সাধনের দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করে নয়, জগতের সামগ্রিকরূপকে ভিত্তি করে ঈশ্বরের অস্তিত্বে আমাদের বিশ্বাসকে সমর্থন করতে পারি।[1]

৪. নৈতিক যুক্তি (The Moral Argument)

উদ্দেশ্য-কারণতামূলক যুক্তি জাগতিক বস্তু ও ঘটনাগুলিতে উদ্দেশ্য-সাধনের উপযোগিতার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এক পরম বুদ্ধিমান, কুশলী নির্মাণ-কর্তার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চায়। কিন্তু এই যুক্তিবলে এক সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, বুদ্ধিমান, কুশলী বিধাতার অস্তিত্ব প্রমাণিত হ'লেও তিনি যে সকল কল্যাণগুণের আধার এবং সকল শুভকর্মে আমাদের প্রেরণা-দায়ক, এটা প্রমাণ করবার জন্য অন্য এক যুক্তির আবশ্যকতা আছে বলে সাধারণত মনে করা হয়। এই যুক্তিই নৈতিক যুক্তি। কার্যত্ব-লিঙ্গক অনুমান এবং

---

1 অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের ক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেক দার্শনিক জীবন্ত প্রাণিদেহের উল্লেখ করেছেন। একটি অচেতন বস্তু তার বাইরে অবস্থিত কোন বুদ্ধিমান পুরুষের ইচ্ছা-শক্তির প্রয়োগের ফলে কি ভাবে বদলায়, আর একটি জীবন্ত প্রাণিদেহ কি ভাবে তার অন্তর্নিহিত শক্তির ফলে ক্রমে ক্রমে নানা আকার ধারণ করে, এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করে J Caird বলেন, "The thought or design which is at work in the growth and development of organised structures is not a mere mechanical power or cunning action from without.....Here, on the contrary, the idea or formative power goes with the matter and constitutes the very indwelling presence of the thing." (Introduction to the Philosophy of Religion, p. 137)

উদ্দেশ্যকারণতামূলক যুক্তির প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে Pringle-Pattison বলেন, "A teleological view of the universe means the belief that reality is a significant whole. When teleology in this sense is opposed to a purely mechanical theory, it means substantially the assertion of an intelligible whole as against the idea of reality as a mere aggregate or collection of independent facts"—The Idea of God, p. 330.

উদ্দেশ্য-কারণতামূলক অনুমান জড়জগতে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ আবিষ্কার করবার চেষ্টা করে, কিন্তু নৈতিক যুক্তি মানুষের মনে যে নৈতিক চেতনা ও নৈতিক আদর্শ আছে সেগুলিকে ভিত্তি করে এক অন্তর্যামী পরম-মঙ্গলময় পুরুষের অস্তিত্ব প্রমাণ করবার চেষ্টা করে। যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান তিনিই আমাদের সকল শুভ-কর্মে প্রেরণা দিয়ে থাকেন এবং পাপের পথ থেকে নিবৃত্ত করেন। বিভিন্ন দার্শনিকের চিন্তায় এই যুক্তিটি বিভিন্ন আকার ধারণ করেছে।

(i) মার্টিনো (Martineau)

মার্টিনো বলেন যে, যখন আমরা কোন কর্মকে সৎকর্ম বলে জানি, অর্থাৎ, যখন কোন সৎ প্রবৃত্তি আমাদের কোন বিশেষ কর্ম করতে চালিত করছে, এরকম অনুভব করি, তখন সঙ্গে সঙ্গে এটি করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব, এটাও অনুভব করি। সৎ কর্ম ও অসৎ কর্মের পার্থক্য আমাদের ব্যক্তিগত অভিরুচির উপর নির্ভর করে না, এটিকে একটি বাস্তব তথ্য বলেই মেনে নিতে হ'বে। 'এটি করা উচিত,' 'এটি করা উচিত নয়'— এই ধরনের নিয়মগুলিকে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছানুসারে রদবদল করতে পারি না। এগুলি সকলের পক্ষেই অবশ্য পালনীয় এবং কোন বাইরের শক্তি আমাদের এগুলি পালন করতে বাধ্য করে। জড়বাদী দার্শনিকদের মতে, এই বাহিরের শক্তি বহু মানুষের নিন্দা বা প্রশংসার সমবেত শক্তিমাত্র। সমাজের আদিম অবস্থায় সকল মানুষই সুখান্বেষী ও স্বার্থপর ছিল। নিজের স্বার্থ ও অপরের স্বার্থের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হ'লে প্রত্যেক ব্যক্তিই অপরের ক্ষতি করেও নিজের স্বার্থ রক্ষা করবার চেষ্টা করত। কিন্তু কোন ব্যক্তি এরূপ করলে বা করতে উদ্যত হ'লে সকলে তার নিন্দা করত এবং শাস্তির ভয় দেখিয়ে তাকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করত। অপর পক্ষে, যখন কোন ব্যক্তি অন্য লোকদের উপকার করবার জন্য নিজের স্বার্থ-ত্যাগ করত, তখন সকলে তার প্রশংসা করত এবং ঐ ধরনের কাজ করবার জন্য তাকে উৎসাহ দিত। এইভাবে ক্রমাগত কোন কাজের জন্য নিন্দা এবং কোন কাজের জন্য প্রশংসা শোনবার ফলে অসৎ কর্ম এবং সৎ কর্মের পার্থক্য প্রত্যেক ব্যক্তির মনে বদ্ধমূল হয়ে যায় এবং পুরুষানুক্রমে সঞ্চারিত হয়ে থাকে। অসৎ কর্ম করবার বিরুদ্ধে আমরা যে মানসিক বাধা অনুভব করি, সেটা উৎপন্ন হয় অপর লোকদের নিন্দার ভয় থেকে এবং সৎকর্ম করার জন্য যে আত্ম-প্রসাদ অনুভব করি, সেটা

উৎপন্ন হয় অপর লোকদের প্রশংসার প্রত্যাশা থেকে। সুতরাং বিবেক (conscience)-কে ঈশ্বরের বাণী বলে বর্ণনা করা কল্পনা-বিলাসমাত্র। মার্টিনো এই মতের সমালোচনা করে বলেছেন যে, এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথম যুগে প্রত্যেক লোক মূলত স্বার্থপর ছিল এবং প্রত্যেক কর্মে সুখলাভই তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, একথা সত্য নয়। আমাদের প্রবৃত্তি-গুলি মুখ্যত কতকগুলি বস্তু আয়ত্ত করতে চায় এবং সেই বস্তুগুলি লাভ করলে আমরা সুখ অনুভব করি। প্রবল প্রবৃত্তি বা রিপুর তাড়নায় যখন আমরা কাজ করি তখন সুখলাভ করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে, একথা বলা যায় না। বস্তুর এমন কতকগুলি স্বকীয় গুণ আছে যারা আমাদের আকর্ষণ করে থাকে এবং সেগুলি কি উপায়ে লাভ করা যায়, এই চিন্তাই আমাদের মনে প্রবল থাকে। তাছাড়া আমাদের কতকগুলি প্রবৃত্তি স্বভাবত আত্মাভিমুখী, কতকগুলি স্বভাবত পরাভিমুখী। মানুষের মনের এই গঠন আধুনিক কালে যেমন, অতি প্রাচীনকালেও প্রধানত তেমনই ছিল বলেই মনে হয়। মানব-সমাজের প্রাগৈতিহাসিক যুগের অবস্থা সম্বন্ধে গবেষণা করে এমন কোনও তথ্য পাওয়া যায় নি যা উপরোক্ত মতের বিরোধী। ইতর প্রাণীদের মধ্যেও অপত্যস্নেহ, যৌথপ্রবৃত্তি প্রভৃতির দেখা পাওয়া যায়। সুতরাং যে মতে বলা হয় যে, অতি প্রাচীন-কালে মানুষ নিছক স্বার্থপর ছিল, অথবা, তার নৈতিক চেতনার সম্পূর্ণ অভাব ছিল, এবং কালক্রমে তার মনে নৈতিক চেতনার উদয় হয়েছে এবং সে পরের উপকারের জন্য কখনও কখনও স্বার্থত্যাগ করা আবশ্যক, এটা বুঝতে শিখেছে, সেই মত যুক্তিযুক্ত নয়। আর যদি এটা স্বীকার করেও নেওয়া যায় যে, যৌথজীবন ব্যক্তি-জীবনকে প্রভাবিত করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির রুচি, পছন্দ, ভাবধারা, দৃষ্টিভঙ্গী প্রভৃতিতে পরিবর্তন নিয়ে আসে, তাহলেও "আমি এই কাজ করতে বাধ্য হচ্ছি" এবং "আমার এই কাজ করা উচিত"—এই দুই অনুভবের মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য আছে তার কোন সুসঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।[1]

সৎকর্ম করবার জন্য আমাদের নৈতিক দায়িত্ব আছে, কিন্তু এই দায়িত্ব বলবৎ করে কে? এই দায়িত্ব-জ্ঞানের উৎস যদি সামাজিক নিন্দা বা প্রশংসা না হয়, তা'হলে নিশ্চয়ই সকল সদ্‌গুণের আধার সর্বশ্রেষ্ঠ কোন পুরুষ এই দায়িত্ব বলবৎ করেন—এই সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত হ'বে। আমরা

---

1 "I can understand how society, taking the individual in hand, can create a Must for him, but not how it can create an Ought."

J. Martineau.-Study of Religion. Vol. II p. 7.

যদি যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী হই, তা'হলে অসৎ কর্ম করবার পর সমাজের ভ্রূকুটীকে আমরা অবহেলা করতে পারি, কিন্তু অনুতাপের হাত থেকে অব্যাহতি পাই না। এই পরমপুরুষ যিনি সকল শ্রেষ্ঠ গুণের আধার তিনিই ঈশ্বর। ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করলে আমাদের ঔচিত্য বোধ বা নৈতিক দায়িত্ব-বোধের কোন সুসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া অসম্ভব।

(ii) কাণ্ট (Kant)

কাণ্ট বলেন যে, আমাদের বিশুদ্ধ জ্ঞানভিত্তিক বিচার-বুদ্ধির গতি পরিদৃশ্যমান জগতেই সীমাবদ্ধ, বিশুদ্ধ তত্ত্ব-জগৎ তার আয়ত্তের বাইরে। সুতরাং ঈশ্বর যথার্থই আছেন কি না, বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে তার কোনও মীমাংসা হ'তে পারে না। কিন্তু আমরা যখন আমাদের নৈতিক জীবন নিয়ে আলোচনা করি, তখন আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে একটি অবশ্য-স্বীকার্য সত্য (postulate) বলে স্বীকার করতে বাধ্য হই। যদিও আমাদের নৈতিক চেতনা বলে যে, কোনও সুখ বা সুবিধালাভের আশায় নয়, বিশুদ্ধ কর্তব্যবোধের খাতিরেই আমাদের সব কর্তব্য করা উচিত তাহ'লেও যদি কোন কর্তব্যপরায়ণ ধার্মিক ব্যক্তি বস্তুত সুখ লাভ না করেন, তাহ'লে এই নৈতিক চেতনাই পীড়িত হয়। আমাদের ব্যবহারিক বুদ্ধি (Practical Reason) দাবী করে যে, ধার্মিক ব্যক্তির সুখী হওয়া উচিত। কিন্তু সুখভোগ ধর্মাচরণের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়, এবং বহু ক্ষেত্রেই ধার্মিক ব্যক্তিদের দুঃখভোগ করতে এবং অধার্মিক ব্যক্তিদের সুখভোগ করতে দেখা যায়। কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গেই যদি মানবাত্মার বিনাশ না হয়, অর্থাৎ, যদি আত্মা অমর হয়, তাহ'লে মরণোত্তর জীবনে ধার্মিক ব্যক্তিদের ভাগ্য সম্বন্ধে এই অসঙ্গতি দূর হ'বার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং আমরা এমন এক মঙ্গলময় সর্বশক্তিমান পুরুষের অস্তিত্ব কল্পনা করতে বাধ্য হই যিনি কোনও না কোনও সময়ে ধার্মিকদের সুখী করবেন এবং অধার্মিকদের শাস্তি দেবেন। এই সর্বশক্তিমান পুরুষই ঈশ্বর। এই কল্পনা বাস্তব-জগতের অনুগামী কি না, সে প্রশ্ন চূড়ান্তভাবে সমাধান করবার ক্ষমতা আমাদের বিচার-বুদ্ধির নেই, কিন্তু একে স্বীকার না করলে আমাদের নৈতিক জীবনে একটা দারুণ অসঙ্গতি থেকে যাবে, এটাই আমাদের বিশ্বাস। সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব আমরা ন্যায়ানুমোদিত যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে না পারলেও, ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস আমাদের নৈতিক জীবনের পক্ষে অপরিহার্য, একথা বলা যেতে পারে।

(iii) হেগেলপন্থী অধ্যাত্মবাদ

হেগেলের অনুবর্তী অধ্যাত্মবাদীরা কিন্তু মার্টিনো এবং কাণ্ট, এই দুজনের যুক্তির সমালোচনা করে বলেছেন যে, তাঁদের যুক্তির সাহায্যে আমরা ঈশ্বরের যে ধারণায় পৌঁছাই সে ধারণা ত্রুটীপূর্ণ। মার্টিনো যে ঈশ্বরের কথা বলেছেন, সেই ঈশ্বরের সঙ্গে মানবাত্মাদের সম্বন্ধ বাহ্য সম্বন্ধ। একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি তাঁর অধীনস্থ ব্যক্তিদের উপর যেভাবে দায়িত্ব ন্যস্ত করে থাকেন এবং তারা সেই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে না পারলে তাদের তিরস্কার করেন বা শাস্তি দেন, ঈশ্বরও যেন তেমনই বাইরে থেকে মানবদের কতকগুলি নিয়ম পালন করতে বাধ্য করেন। কিন্তু এভাবে চিন্তা করলে ঈশ্বর ও মানবাত্মার সম্বন্ধের যথার্থ প্রকৃতি প্রকাশ করা যায় না। ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ। ঈশ্বর মানুষের অন্তরাত্মা। মানুষের মনে যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ আছে, তারই মাধ্যমে ঈশ্বর আপনাকে প্রকাশ করে থাকেন। সুতরাং এই আদর্শ যখন আমাদের কাজে প্রেরণা দেয় তখন সেই প্রেরণা দায়িত্ব-বোধের আকার নিতে পারে, কিন্তু সেই দায়িত্ব কোন বহিঃশক্তির প্রতি নয়, সেটি আমাদেরই স্বরূপকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করার, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব। ঈশ্বর ও মানবাত্মার এই যে দ্বৈতাদ্বৈত সম্বন্ধ, এটি মার্টিনোর যুক্তিতে পরিস্ফুট হয় নি। কাণ্ট সম্বন্ধেও বলা চলে যে, তিনি ঈশ্বরকে কেবলমাত্র মানুষের পুণ্য-কর্মের ফলদাতারূপেই কল্পনা করেছেন। তিনি তাঁর যুক্তিতে যেভাবে ঈশ্বর-প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন তাতে মনে হয় যেন মানুষের নৈতিক জীবনের সঙ্গে ঈশ্বরের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নেই। মানুষ যে আদর্শের প্রেরণায় কাজ করে, সেই আদর্শের চরম রূপ একমাত্র ঈশ্বরেই সুপ্রতিষ্ঠিত এবং ঈশ্বরই আমাদের অন্তরাত্মারূপে সকল শুভকর্মে প্রেরণা দিয়ে থাকেন, কাণ্ট এমন কথা বলেন নি। সুখলাভ ধর্ম জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি নয়, কেবলমাত্র ঈশ্বরের ইচ্ছার ফলেই ধার্মিক ব্যক্তিরা সুখলাভ করেন, একথার অর্থ এই যে, মানুষের পুণ্য ও পাপ অনুসারে সুখ দুঃখ বিতরণ করাই ঈশ্বরের কাজ। কিন্তু ঈশ্বরসম্বন্ধে এই ধারণা খুব উচ্চ স্তরের নয়।

হেগেলীয় অধ্যাত্মবাদীদের মতে নৈতিক যুক্তিটিকে এইভাবে বিবৃত করা যেতে পারে :—

মানুষকে দুই বিভিন্ন জগতের অধিবাসী বলা যেতে পারে। দেহের অধিকারীরূপে মানুষ জড়জগতের অধিবাসী এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভের জন্য কাজ করে। কিন্তু আত্মসচেতন, বিচার-বুদ্ধি-

বিশিষ্ট জীবরূপে মানুষ অন্য এক জগতেরও অধিবাসী। মানুষ সাধারণত দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভের জন্য চেষ্টা করলেও এই ধরনের সুখ তাকে তৃপ্ত করতে পারে না। তার লক্ষ্য থাকে উচ্চতর ইষ্টার্থের দিকে। এই উচ্চতর জীবনের আকাঙ্ক্ষা মানুষের স্বরূপের পরিচয় দেয়। আমাদের বিচার-বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে এক চরম মঙ্গলের আদর্শ গড়ে ওঠে এবং আমরা ঐ আদর্শকে আমাদের জীবনে পূর্ণভাবে রূপায়িত করবার প্রেরণা অনুভব করি। এই প্রেরণাই নৈতিক দায়িত্ব-বোধ। এই দায়িত্ব-পালন করতে অক্ষম হ'লেই আমরা মানসিক অশান্তি ভোগ করি। এই আদর্শ আমাদের মনে গড়ে উঠলেও একে নিছক কাল্পনিক বলে মনে করা উচিত নয়। কোনও কর্ম করা উচিত কি অনুচিত, যখন আমাদের মনে এই প্রশ্ন উঠে তখন আমরা জ্ঞাতসারেই হোক বা অজ্ঞাত-সারেই হোক এই আদর্শকে মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহার করে থাকি। আমরা বাস্তবক্ষেত্রে অনেক সময়ে নৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে বিভিন্নভাবে চিন্তা করে থাকি এবং কোন কার্য করা উচিত বা অনুচিত এ সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে প্রায়ই মতভেদ হয়ে থাকে। কিন্তু এই সব প্রভেদ ও মতবিরোধ সত্ত্বেও আমরা বিশ্বাস করি যে, একটি সর্বজনগ্রাহ্য নৈতিক আদর্শ অবশ্যই আছে এবং সেই আদর্শের নির্দেশ অবশ্যপালনীয়। আমাদের অজ্ঞতার জন্যই আমরা এই আদর্শের পূর্ণ রূপটি উপলব্ধি করতে পারি না। কিন্তু আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর পূর্ণ রূপটি আমাদের কাছে ক্রমশ প্রকাশিত হ'তে থাকে। এই আদর্শের যদি কোন বাস্তব সত্তা না থাকত তাহ'লে আমাদের প্রেরণা দেবার এই শক্তি তার থাকত না। বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলি জড়জগতে আছে এবং জড়বস্তুগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু নৈতিক আদর্শ জড়গতে থাকতে পারে না। এই আদর্শ চিরকাল যাতে পূর্ণভাবে রূপায়িত হয়ে আছে, এমন একটি অনন্ত চেতন-সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার না করলে, এই আদর্শসম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা, সেটি সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়ে পড়ে। এই অনন্ত চেতন-সত্তাই ঈশ্বর। সুতরাং, একদিক থেকে যেমন বলা যায় যে, মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের মাধ্যমে ঈশ্বর ক্রমাগত আপনাকে প্রকাশ করে থাকেন, ঠিক সেইরকম অপর একদিক থেকে বলা যায় যে, তার মধ্যে যে অনন্ত সম্ভাবনা আছে মানুষ তাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে চায়। মানুষের এই স্ব-রূপই ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ। দ্বৈতাদ্বৈতবাদীদের মতে এই হ'ল নৈতিক যুক্তির প্রকৃত তাৎপর্য।

9. উপসংহার

ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করবার জন্য চিন্তাশীল ব্যক্তিরা সাধারণত যে সব যুক্তি বা অনুমান ব্যবহার করে থাকেন তাদের মধ্যে যেগুলি প্রধান উপরে সেগুলিকে ব্যাখ্যা করা হ'ল। এগুলিকে আলোচনা করে আমরা দেখলাম যে, এদের মধ্যে কোনটিই দোষ বা ত্রুটী থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়, অর্থাৎ, এগুলির চূড়ান্ত প্রামাণ্য স্বীকার করা যায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও, এগুলিব যথার্থ তাৎপর্য বিচার করে দেখলে এদের যে প্রভূত মূল্য আছে, সেটা স্বীকার করতে হ'বে। এই যুক্তি বা অনুমানগুলি সম্বন্ধে জে, কেয়ার্ড বলেন[1] যে, এগুলিকে প্রচলিতে অর্থে (ঈশ্বরের অস্তিত্বের) প্রমাণ বলে গ্রহণ করলে এদেব বিরুদ্ধে সাধারণত যে সব আপত্তি উত্থাপিত হয়, সেগুলিকে ন্যায়সঙ্গত বলেই মনে করা যেতে পারে। কিন্তু আমাদের নির্জ্ঞান মনে আমাদের ধর্ম-চেতনার অন্তর্নিহিত যুক্তি কি ভাবে ক্রিয়া করে, অথবা, আমরা বস্তুত কি ভাবে চিন্তা করে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হই এবং তাঁতে আমাদের নিজেদের প্রকৃতির মধ্যে যা কিছু শ্রেষ্ঠ, তার পরিপূর্ণ বিকাশ দেখতে পাই, এই যুক্তিগুলিকে সেই প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ হিসাবে বিবেচনা করলে এদের প্রভূত মূল্য আছে স্বীকার করতে হ'বে।

(কিন্তু সত্যান্বেষী প্রশ্ন করবেন—ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণ করতে পারে, এমন কোন সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রমা-বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি আছে কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে যে, যে ন্যায়ানুমানে (Syllogistic Inferencc) দুটি হেতুবাক্য থেকে একটি সিদ্ধান্ত অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়, সেরূপ কোনও অনুমানের সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু যদি ঈশ্বরের ধারণা বাদ দিলে আমাদের সমগ্র বিশ্ব-চেতনাকে একটা সুসংহত রূপ দে'ওয়া অসম্ভব হ'য়ে পড়ে, তা'হলে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস যে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষেই অপরিহার্য।) এই প্রসঙ্গে অবশ্য সন্দেহবাদীরা বলবেন যে, আমাদের বিশ্ব-চেতনার একটি সুসংহত রূপ যে নিশ্চয়ই থাকবে এটা স্বীকার করার প্রয়োজন কি? তার উত্তরে আমরা বলতে পারি

1 "Considered as proofs in the ordinary sense of the word, they are open to the objections which have been frequently urged against them; but viewed as an analysis of the unconscious or implicit logic of religion, as tracing the steps of the process by which the human spirit rises to the knowledge of God, and finds therein the fulfilment of its own highest nature, these proofs possess great value."—Introduction to the Philosophy of Religion.—p. 125.

যে, আমাদের বিশ্ব-চেতনার একটি সুসংহত সামগ্রিক রূপ আছে, সেটা অবশ্য-স্বীকার্য বলে স্বীকার করে না নিলে আমরা সত্য ও মিথ্যা, যথার্থ-জ্ঞান ও ভ্রম, উচিত ও অনুচিত এই সব পার্থক্যের কথা চিন্তা করতেই পারি না, অর্থাৎ, কি জ্ঞানের ক্ষেত্রে, কি ব্যবহারিক জীবনের সমস্যা সমাধানে, আমাদের চিন্তা এক পদও অগ্রসর হ'তে পারে না। সুতরাং কোন না কোন আকারে ঈশ্বরের ধারণা ছাড়া যদি আমাদের বিশ্ব-চেতনা একটা সামগ্রিক সুসংহত-রূপ ধারণ করতে না পারে, তাহ'লে এই ধারণা যে বস্তুত সত্য, এটা স্বীকার করতে হ'বে। ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্বপক্ষে এইটিই হ'ল সর্বাপেক্ষা প্রবল যুক্তি।

আমাদের বিশ্বচেতনাকে মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে, যথা, বহির্বিষয়ক চেতনা এবং আত্ম-চেতনা। আমরা আগেই দেখেছি যে, কার্যতালিঙ্গক অনুমান (The Cosmological Argument) এবং উদ্দেশ্য-কারণতামূলক অনুমান (The Teleological Argument)—এই দুটি আমাদের বহির্বিষয়ক জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, আর লক্ষণ-ভিত্তিক অনুমান (The Ontological Argument) ও নৈতিক অনুমান (The Moral Argument) মূলত আত্ম-জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা আরও দেখেছি যে, এই অনুমানগুলি সম্পূর্ণ নির্দোষ বা সর্বাংশে যুক্তিশাস্ত্রসম্মত নয়। কিন্তু ঈশ্বর-বাদীদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন যে, এগুলির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে এদের পুনর্গঠিত করা সম্ভব।

উদ্দেশ্যকারণতামূলক অনুমান এই কথা বলে যে, জগতে যত কিছু ঘটনা ঘটে সেগুলিকে স্পষ্টতই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মনে হয়, অর্থাৎ প্রত্যেক কারণ-সমাবেশ থেকে যে কার্য উৎপন্ন হয়, তাকে কাম্য বা অভীষ্ট বলে মনে হয়, সুতরাং কারণ সমাবেশমাত্রই কোনও না কোনও চেতন-পুরুষের অভীষ্ট-সিদ্ধির সহায়ক। সুতরাং জগতের সমস্ত ঘটনারই মূলে কোন বুদ্ধিমান চেতন-পুরুষের ক্রিয়া আছে। এই বুদ্ধিমান চেতন-পুরুষই ঈশ্বর। কিন্তু প্রত্যেক কারণ-সমাবেশই কোন অভীষ্ট সিদ্ধি করে কিনা, সে বিষয়ে গুরুতর সন্দেহ আছে। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তিতে যদি এই অনুমানটি রচিত হয়ে থাকে, তাহ'লে এর হেতুবাক্যকে একটি সন্দিগ্ধ হেতুবাক্য বলতে হ'বে। সুতরাং সমস্ত জাগতিক ঘটনাগুলির এমন একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যার সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকতে পারে না[1]। জড়-জগতের যাবতীয় ঘটনাই যে বহু সংখ্যক নিয়মানুসারে

1 "A proof of God must start not from the fact of purposive action in things which is doubtful, but from bare action which is not"—Lotze. Philosophy of Religion. p. 27.

ঘটে—এইটি হ'ল সেই বৈশিষ্ট্য। সমস্ত ঘটনাই যে নিয়ন্ত্রিত, এই সার্বিক নিয়মটি প্রত্যক্ষভিত্তিক হ'লেও এটিকে কোনও আরোহানুমানের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করা হয়নি। এই নিয়মটি সকল আরোহানুমানেরই অপেক্ষিত। আমাদের বিচার-বুদ্ধির মৌলিক গঠনই এমন যে, কোন বস্তু বা ঘটনা সম্বন্ধে চিন্তা করতে গেলেই তাকে বহু বস্তু বা ঘটনার সঙ্গে সম্বন্ধ-যুক্ত করে চিন্তা করতে হ'বে। এভাবে চিন্তা করলেই তাকে বহু নিয়মের অধীন বলে স্বীকার করতে হ'বে। আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞান যতই বিস্তার লাভ করে ততই এই নিয়মের সমর্থক তথ্য আমরা অজস্র পরিমাণে পেয়ে থাকি। সমগ্র জগৎকে অসংখ্য বস্তুর সমষ্টি বলে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু এই সকল বস্তু অসংখ্য নিয়মের মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। কোন নিয়ম একটা স্বতন্ত্র বস্তু বা শক্তি নয়। "বস্তুসমূহ নিয়মের অধীন"—এই বাক্যের প্রকৃত অর্থ এই যে, যখনই কোনও একটি বস্তুতে একটি বিশেষ ক্রিয়া ঘটে, তখনই এই বস্তুর সঙ্গে যে সব বস্তুর কতকগুলি বিশেষ দৈশিক ও কালিক সম্বন্ধ আছে, সেগুলিতে এক বিশেষ ধরনের ক্রিয়া ঘটে। যে সকল বস্তুর মধ্যে দেশগত ও কালগত প্রচুর ব্যবধান আছে তাদের সম্বন্ধেও এই কথা সত্য। কোটী কোটী মাইল দূরের নক্ষত্রে কোন বিস্ফোরণ ঘটলে আমাদের এই পৃথিবীতে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, একটি গাছের বীজ আজ বপন করলে তাই থেকে বহুকাল পালাক্রমে গাছ, ফল এবং বীজ জন্মাতে থাকে। এক স্থানে কোন একটি ঘটনা ঘটলে তার কার্য-শৃঙ্খল কত সুদূরপ্রসারী, সে কথা গভীরভাবে চিন্তা করলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, জগতের মৌলিক উপাদান (পরমাণু, অথবা তড়িৎ-কণা অথবা অন্য কিছু)-গুলি যদি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বা স্বয়ং-নির্ভর হ'ত তাহ'লে এই ব্যাপার কি ভাবে সম্ভবপর, তার কোনও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা পাওয়া যেত না। যদি কোন বিস্তীর্ণ মাঠে এক লক্ষ দৃষ্টিহীন লোক সমবেত হয়, তাহ'লে তাদের মধ্যে কোন বিশেষ ব্যক্তি তার নিজের ইচ্ছামত এক বিশেষ মুহূর্তে তার ডান হাতটি ওঠালে অপর এক বিশেষ ব্যক্তি ঠিক সেই মুহূর্তে অথবা পরবর্তী মুহূর্তে নিজের ইচ্ছায় তার ডান হাত উঠাবে, এর সম্ভাব্যতা অতি অল্পই। সারা-দিনের মধ্যে কোনও এক অনির্দিষ্ট মুহূর্তে এদের মধ্যে কোনও এক ব্যক্তি ডান হাত ওঠালে ঠিক সেই মুহূর্তে অথবা এক বিশেষ ক্রমানুসারে একের পর অপর এক ব্যক্তি তার ডান হাত ওঠাবে, এরকম ঘটবার সম্ভাব্যতা নিশ্চয়ই আরও অল্প এবং দিনের পর দিন ঐ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তির সম্ভাব্যতা শূন্যের কাছাকাছি, অর্থাৎ নেই। যার নির্দেশ এই লক্ষ লোকের বোধগম্য হয়, এমন কোনও এক ব্যক্তি তাদের চালনা

না করলে এরূপ ঘটা অসম্ভব। ঠিক সেইরূপ, কোনও একটি ঐক্য-সম্পাদক শক্তিদ্বারা চালিত না হ'লে কোটী কোটী বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র, স্বয়ং-নির্ভর পরমাণু অথবা তড়িৎ-কণা অথবা ঈথার-তরঙ্গে একই মুহূর্তে অনুরূপ ক্রিয়া অথবা বিভিন্ন মুহূর্তে এক বিশেষ ক্রমানুসারে একই রূপ ক্রিয়া অথবা পরস্পরের পরিপূরক ক্রিয়া ঘটতে পারে না, অর্থাৎ কোনও নিয়মানুযায়ী ঘটনাবলী ঘটতে পারে না। কোন এক স্থানে বৈদ্যুতিক বাতী জ্বলবার সঙ্গে সঙ্গে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বহু স্থানের একই মুহূর্তে আলোকিত হয়ে যাওয়া প্রথম শ্রেণীর ঘটনার উদাহরণ। একটি বীজ মাটিতে বপন করার পর মুহূর্ত থেকে এর ভিতর যে সব ক্রিয়া ঘটে এবং যারা পরিণতি লাভ করে এক প্রকাণ্ড ফলফুলযুক্ত গাছে, সেগুলি হ'ল দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘটনাশৃঙ্খলের উদাহরণ। এই ধরনের ঘটনাগুলির একটা সুসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া আবশ্যক। এরূপ ঘটনা-সমাবেশ বা ঘটনা-শৃঙ্খল স্বভাবতই ঘটে বা আকস্মিক বা নিয়ম-জন্য, এ ধরনের ব্যাখ্যা প্রকৃত পক্ষে কোন ব্যাখ্যাই নয়, কারণ, আমরা স্বভাব, আকস্মিকতা অথবা নিয়মকে এই সকল ঘটনার অতিরিক্ত কোন দ্রব্য হিসাবে নির্দেশ করতে পারি না। কোন ঘটনা বা ঘটনা-সমাবেশ স্বভাবত ঘটে বা অকস্মাৎ ঘটে বা নিয়মের জন্য ঘটে, এরূপ বলা আর "এরূপ ঘটনা ঘটে" এটা বলার একই অর্থ। স্বভাব, আকস্মিকতা বা নিয়ম অনুভব-যোগ্য কোন প্রকৃত বস্তু নয়, এক বা একাধিক ঘটনা একটি বিশেষভাবে ঘটে, এইটি প্রকাশ করবার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত সূত্র (Formula) মাত্র। লৌহপিণ্ড কেন জলে ডুবে যায়—এই ব্যাপারের ব্যাখ্যাস্বরূপ যদি বলা যায় যে, লৌহপিণ্ডের স্বভাবই জলে ডুবে যাওয়া, অথবা "সকল লৌহপিণ্ড জলে ডুবে যায়"—এটাই হ'ল সার্বিক নিয়ম, তাহলে একটি বিশেষ ধরনের ঘটনা-সমাবেশ অসংখ্য স্থানে ঘটে, মাত্র এইটুকুই বলা হয় আর কিছুই নয়। এই আপত্তির উত্তরে স্বভাববাদী, আকস্মিকতাবাদী বা নিয়মবাদীরা বলতে পারেন যে, কতকগুলি ঘটনা এক বিশেষভাবে ঘটে, এইটুকু জানাই আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা বা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য যথেষ্ট, এর অতিরিক্ত কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। এস্থলে ঈশ্বরবাদীরা বলবেন যে, আমরা এটা নিশ্চিতভাবে জানি যে, যেখানে বহুসংখ্যক বস্তুর অন্তরালে তাদের ঐক্য-সম্পাদক কোনও শক্তির ক্রিয়া নেই, সেখানে নিয়মিত ঘটনা-সমাবেশ বা ঘটনা-শৃঙ্খলের উপস্থিতি অসম্ভব। সুতরাং যদি কোন ক্ষেত্রে আমরা অসংখ্য বস্তু বা ঘটনাকে নিয়ম-শৃঙ্খলে আবদ্ধ দেখতে পাই তাহলে আমাদের বিচার-বুদ্ধি নিশ্চয়ই এই ব্যাপারের একটা সুসঙ্গত ব্যাখ্যার দাবী করবে। যদি কোন বিস্তীর্ণ মাঠে বিনা পরিকল্পনায় অনির্দিষ্ট সংখ্যক টাইপ বার বার ছড়িয়ে দেওয়া যায়

তাহ'লে অনন্তকাল ধরে এরূপ করতে থাকলেও তাদের দিয়ে কোন কাব্য-গ্রন্থ রচিত হ'বে না, বা প্রথমবারে তাদের যে সমাবেশ দেখা গিয়েছিল দ্বিতীয়বার আর সেই সমাবেশ দেখা যাবে না।[1] সেই ব্যাখ্যা আমরা পাই আমাদের বিশ্ব-চেতনার দ্বিতীয়াংশে, অর্থাৎ, আমাদের আত্ম-চেতনায়। আমরা যখন আমাদের অন্তরে দৃষ্টিপাত করি, তখন আমরা বহু বস্তুকে একত্র গ্রথিত করতে পারে অথবা তাদের নিয়ন্ত্রিত করতে পারে, এমন একটি ঐক্য সম্পাদক শক্তির সাক্ষাৎ পাই। সেই শক্তি আমাদের আত্ম-চেতনার শক্তি। এই আত্ম-চেতনা একটি অনুভবগম্য প্রকৃত সদ্বস্তু। আমবা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে সব সংবেদন পাই, সেগুলিকে যদি আমাদের আত্ম-চেতনা পরস্পরেব সঙ্গে সংযুক্ত না করত, তাহ'লে আমাদের জ্ঞান কখনই একটা সুসংহত আকার ধারণ করতে পারত না। ঠিক তেমনই পরিদৃশ্যমান জগতের পিছনে যদি এরূপ একটি বুদ্ধিদীপ্ত চৈতন্য না থাকত তাহ'লে এখানে কোনও নিয়ম-শৃঙ্খলা, অর্থাৎ, দেশ ও কালে সুবিন্যস্ত, সুনিয়ন্ত্রিত বস্তু বা ঘটনা-সমাবেশ অথবা বস্তু বা ঘটনা-শৃঙ্খলের সন্ধান পাওয়া যেত না[2]। জ্ঞান-জগতে আমাদের যে আত্ম-চেতনা আমাদের জ্ঞানেব ঐক্য সম্পাদন করে, তার অনুরূপ কোন শক্তি জড়জগতের পিছনে না থাকলে নিয়ম-শৃঙ্খলা-বিশিষ্ট জগতের অস্তিত্ব থাকত না। জগতে যেখানে যা কিছু ঘটছে সে সমস্তই এক অদ্বিতীয় চেতন-সত্তার নিয়ন্ত্রণাধীন বলেই অসংখ্য বস্তু ও ঘটনার মধ্যে সংযোগসূত্র দেখা যায়—এইটিই হ'ল জাগতিক নিয়ম-শৃঙ্খলার একমাত্র সন্তোষজনক ব্যাখ্যা।

জড়জগতের পিছনে যে এক অখণ্ড চৈতন্য-সত্তার পরিচয় পাই, সেটি যে কেবলমাত্র আমাদের জ্ঞানজগতের ঐক্য সম্পাদক শক্তির সদৃশ তাই নয়, এই দুটি মূলত অভিন্ন। যে চৈতন্য আমাদের আত্ম-চেতনায় কেন্দ্রীভূত তাকে সীমাবদ্ধ বলে মনে হ'লেও প্রকৃতপক্ষে এটি একটি অনন্ত-চৈতন্যের অংশ। আমরা যে আমাদের জ্ঞানেব সীমা সম্বন্ধে সচেতন এবং আমাদের জ্ঞানের সীমানাকে আরও বিস্তৃত করতে চাই, আমাদের জ্ঞান-পিপাসার যে কখনও পরিতৃপ্তি হয় না—এ সমস্তই এই ইঙ্গিত বহন করে যে, আমাদের সত্তা এক অনন্ত সত্তার প্রকাশ। এই অনন্ত সত্তা কিন্তু কেবলমাত্র বিষয়ীগত সত্তা (Subjective being) নয়, এটি বিষয়গত সত্তা (Objective being) ও বটে। আমাদের জ্ঞানের স্ফুরণের সঙ্গে

1 যদি এ সম্বন্ধে কারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে তিনি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

2 "Out of Mind alone can order come."—Anaxagoras.

সঙ্গেই আমাদের এই বোধ জন্মায় যে, বহির্জগতের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ আছে। আমাদের জ্ঞান যতই বিকশিত হ'তে থাকে, যখনই আমরা কোন ভ্রম সংশোধন করি, কোন মত প্রতিষ্ঠা অথবা খণ্ডন করবার জন্য যুক্তি তর্ক প্রয়োগ করি, তখনই আমরা সকল বিষয়ীর পক্ষে সাধারণ একটি জগৎ যে প্রতিপদে আমাদের চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, এটি উপলব্ধি করি। বিষয়ীর সঙ্গে সম্বন্ধরহিত কোনও বস্তুকে যেমন আমরা চিন্তা করতে পারি না, তেমনই মূলত বস্তুনিষ্ঠ নয়, এমন কোন চিন্তাও আমরা কল্পনা করতে পারি না। আমাদের জ্ঞানরাজ্য ও বহির্জগতের এই অন্যোন্যনির্ভরতার দিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, জ্ঞান-রাজ্য ও বহির্জগৎ অভিন্ন এবং আমাদের জ্ঞানে যে অসীম সত্তার প্রকাশ, বহির্জগৎও সেই একই সত্তার প্রকাশ। পরম চেতন-সত্তা যে কেবলমাত্র আমাদের জ্ঞানের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেন তাই নয়, আমাদের পূর্ণতার আদর্শের মাধ্যমেও আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি একাধারে সর্বজ্ঞ, সর্ব-শক্তিমান ও মঙ্গলময়। জীবাত্মা পরমাত্মারই সসীম প্রতিকৃতি। ঈশ্বরকে জগৎ থেকে ভিন্ন কোন আদিম কারণ, অথবা জগতের কুশলী, নির্মাতা অথবা আমাদের বিচারক এবং পাপ-পুণ্যের ফলদাতারূপে কল্পনা না করে, ঈশ্বর জীব ও জগৎ যে একই সত্তার বিভিন্ন প্রকাশ এবং এক অদ্বিতীয় চেতন-সত্তাই জীব ও জগতের মাধ্যমে পুরুষোত্তমরূপে স্ব-প্রতিষ্ঠ হ'ন, এইভাবে চিন্তা করলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহেরই অবকাশ থাকে না।

10. ধর্ম-চেতনার বাস্তবতা

সুতরাং, যে চৈতন্যময় পরম পুরুষ একদিকে জড়-জগৎকে ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করেন এবং অপরদিকে আমাদের অধ্যাত্ম চেতনার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেন, এবং যাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাস আমাদের ধর্ম-চেতনার একটি প্রধান অঙ্গ, তিনি অলীক বা কাল্পনিক বস্তু হ'তে পারেন না। ঈশ্বরের ধারণা পরিহার করলে আমাদের জ্ঞান-জগৎ সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং আমাদের নৈতিক ও সামাজিক জীবনের ভিত্তি বিধ্বস্ত হয়ে যায়। যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী (Logical Positivists)-দের আপত্তি যে, যেহেতু ঈশ্বর ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের বিষয় ন'ন, সেহেতু ঈশ্বর সম্বন্ধীয় সমস্ত বাক্যই অর্থহীন প্রলাপবাক্যমাত্র, মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়; কারণ, ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষই যে আমাদের জ্ঞানের একমাত্র উৎস এই মত গ্রহণ

করা যায় না। অনুরূপভাবে যদি আমরা বলি যে, যেহেতু বাতাস দেখতে পাওয়া যায় না, সেইহেতু বাতাস সম্বন্ধে সমস্ত বাক্যই অর্থহীন প্রলাপমাত্র, তাহ'লে সেটা হাস্যকর যুক্তি হ'বে। যাঁরা ধর্ম-বিশ্বাসের মনস্তাত্ত্বিক অথবা নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেন, তাঁদের মতের সমালোচনা করে আমরা বলব যে, মানুষের মনে কোনও একটা বিশেষ মত বা বিশ্বাসের উৎপত্তি কি ভাবে হ'ল তার উপর ঐ মত বা বিশ্বাসের সত্যাসত্যতা নির্ভর করে না। সমগ্র জগৎ সম্বন্ধে আমাদের যা কিছু জ্ঞান আছে সেই সমস্তকে সুসংহতভাবে গ্রথিত করবার চেষ্টা করলে যদি কোন মত বা বিশ্বাসকে অপরিহার্য বলে মনে হয়, যদি সেটি মিথ্যা হ'লে আমাদের সমগ্র জ্ঞান-জগৎ বিশৃঙ্খল ও বিধ্বস্ত হয়ে যায়, তাহ'লে তার বস্তুগত সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস এই ধরনের বিশ্বাসগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং আমাদের ধর্ম-চেতনা যে কেবলমাত্র কল্পনা-বিলাস নয়, এর একটা বাস্তব ভিত্তি আছে, সেটা স্বীকার করতে কোনও বাধা নেই।

নির্বাচিত পুস্তক-তালিকা

1. J. Martineau.—A study of Religion Vols I & II, Book II, Chs I & II.
2. J. Caird—An Introdution to the Philosophy of Religion.
3. H. Lotze—Philosophy of Religion Ch. I. Sections VI. & VII.
4. Galloway—Philosophy of Religion.
5. A. S. Pringle-Pattison—The Idea of God. Lecture. XII.

নবম অধ্যায়

ঈশ্বর ও পরব্রহ্ম

(God and the Absolute)

1. পরব্রহ্ম (The Absolute)

যে সব দার্শনিক এক অনন্ত, অদ্বিতীয় অখণ্ড চৈতন্য-সত্তাকে সমগ্র-জগতের মূল ও আধার বলে স্বীকার করেন, তাঁরা সাধারণত একে পরব্রহ্ম (The Absolue)[1] বলে থাকেন। পরব্রহ্ম অসীম, অনন্ত, সর্ব-নিরপেক্ষ, স্বয়ম্ভূ, স্বনির্ভর, স্বয়ং-প্রতিষ্ঠ ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ। জগতে যা কিছু আছে সে সকলের সত্তাই পরব্রহ্মের অন্তর্গত। তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে পরব্রহ্মই সব কিছু (The Whole), তাঁর বাইরে কিছুই নেই বা থাকতে পারে না। "এই পরিদৃশ্যমান জগতের স্বরূপ কি?"—এই প্রশ্নের উত্তর যখন আমরা বিশুদ্ধ বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে দেবার চেষ্টা করি, তখন আমরা এই সিদ্ধান্তেই আসি যে, সমগ্র জগৎ ব্যেপে এবং সমগ্র জগতের মূলে যে পরব্রহ্ম আছেন জগৎ তাঁরই প্রকাশমাত্র, এর নিজের কোনও সত্তা নেই।

2. ঈশ্বর (God)

জগতের মূল সত্তাকে আবার ঈশ্বর বা ভগবানও বলা হয়। ঈশ্বর জগতের স্রষ্টিকর্তা, চালক ও পালনকর্তা। তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। তাঁর জ্ঞানের বা শক্তির সীমা নেই। ঈশ্বরের প্রকৃতি ও অস্তিত্ব দার্শনিক আলোচনার বিষয় হ'লেও প্রধানত ধর্ম-চেতনা ও ধর্মীয় প্রেরণা থেকেই ঈশ্বরের ধারণার উৎপত্তি। দুঃখ ও বিপদের দিনে মানুষ যখন নিজেকে একান্ত অসহায় বলে মনে করে, অথবা, পাপকার্য করার অনুশোচনায় যখন তার মন পীড়িত হয়, তখন সে এক অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তির আশ্রয় নিতে

---

1 ইংরাজী Absolute শব্দের অর্থ সর্ব-নিরপেক্ষ। যার প্রকৃতি বা অস্তিত্ব অন্য কোনও বস্তুর বা কোনও সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে না সেই Absolute. এরকম বস্তু কেবলমাত্র একটিই হ'তে পারে। দ্বিতীয় কোনও বস্তু থাকলেই তার সঙ্গে প্রথম বস্তুর কোনও না কোনও সম্বন্ধ থাকবে এবং আপেক্ষিক (Reiatlve) হ'য়ে যাবে।

চায়, এক পরম পবিত্র পুরুষের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে সকল রকম ক্ষুদ্রতা, নীচতা ও মালিন্য থেকে মুক্তি পেতে চায়। এই পরম পবিত্র, সকল সদ্‌গুণের আধার, সর্ব-শক্তিমান পুরুষই ঈশ্বর।

3. ঈশ্বরের প্রকৃতি ও গুণাবলী

জগতের যাবতীয় বস্তু ও ঘটনা অনেক পরস্পর-নিরপেক্ষ, অদৃশ্য শক্তিদ্বারা চালিত হয় এবং প্রত্যেক মানুষের পক্ষে তার নিজের নিরাপত্তা, উন্নতি এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এই সব শক্তির মনোমত কাজ করে তাদের সন্তুষ্ট রাখা প্রয়োজন, এরকম একটা বিশ্বাস পুরাকালে অনেকের মধ্যেই প্রচলিত ছিল এবং এখনও কোন কোন স্থলে আছে। এই সকল অদৃশ্য শক্তিকে একেকটি দেব বা দেবীরূপে কল্পনা করা হয় এবং এই সকল দেবদেবীর (এমন কি অপদেবতাদেরও) উপাসনা করা, স্তব-স্তুতি দিয়ে তাঁদের মনোরঞ্জন করা ধর্মের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ বলে মনে করা হয়। এই বিশ্বাসকে বহু-দেববাদ বলা হয়। আধুনিক সভ্য ও শিক্ষিত সমাজে বহু-দেববাদ প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। আধুনিককালে বহু শিক্ষিত হিন্দুকেও অবশ্য আনুষ্ঠানিকভাবে বহু দেব-দেবীর পূজা করতে দেখা যায়, কিন্তু প্রাচীন বৈদিক ঋষিদের মত তাঁরাও বিশ্বাস করেন যে, এই সকল বিভিন্ন দেব-দেবী একই শক্তির বিভিন্ন প্রকাশমাত্র, অথবা, একই ঈশ্বরের বিভিন্ন নাম মাত্র। বস্তুত আজকাল যাঁরা জগতের স্রষ্টিকর্তা ও চালক হিসেবে কোন অতিপ্রাকৃত চৈতন্য-সত্তায় বিশ্বাস করেন, তাঁরা প্রায় সকলেই একেশ্বরবাদী। সুতরাং ঈশ্বরের প্রকৃতি ও গুণাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করতে হ'লে আমরা প্রধানত একেশ্বরবাদীদের মতবাদই লক্ষ্য করব।

ঈশ্বরের প্রকৃতি ও গুণাবলীকে তত্ত্বজ্ঞান ও ধর্ম, এই দুইয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা যেতে পারে। "এই পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরালে যে চরমসত্তা তার স্বরূপ কি?"—এই প্রশ্নের উত্তরে যখন বলা হয় যে, ঈশ্বরই সেই চরমসত্তা, তখন প্রশ্ন ওঠে 'ঈশ্বর' বলতে আমাদের কি বোঝা উচিত? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হ'লে তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ঈশ্বরের প্রকৃতি বিচার করা প্রয়োজন। দার্শনিক বিচারের ফলে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, ঈশ্বর চরমসত্তা বা পরমতত্ত্ব। তিনি এক, অদ্বিতীয়, চৈতন্যময়, স্ব-প্রকাশ, সদ্বস্তু। তিনি অসীম, অনন্ত, দেশকালের অতীত। তাঁর অস্তিত্ব কোন বিশেষ স্থানে সীমাবদ্ধ নয়। তিনি পূর্বে কোন সময়ে ছিলেন না, বা ভবিষ্যতে কোন এক সময়ে থাকবেন না, এমনও নয়। ঈশ্বর যেহেতু

কালাতীত, সেইহেতু তিনি অপরিণামী (Changeless)। তিনি জগতের আদি-কারণ, বিধাতা। তিনি স্ব-নির্ভর, স্বয়ং-প্রতিষ্ঠ ও সর্ব-নিরপেক্ষ। তাঁর কোনও কারণ নেই। তিনি সর্ব-শক্তিমান। এই বিশাল জগৎকে সৃষ্টি করবার এবং পালন করবার উপযুক্ত ক্ষমতা তাঁর আছে। তাঁর শক্তিতে বাধা দিতে পারে, এমন ক্ষমতা কোনও বস্তু বা জীবেরই নেই। তিনি সর্বজ্ঞ। এই জগতে যেখানে যা কিছু ঘটে সমস্তই তাঁর জানা। তাঁর জ্ঞানে কোনও ত্রুটী বা ভ্রমের সম্ভাবনামাত্র নেই, বর্তমান, ভূত ও ভবিষ্যতের ভেদ নেই। দেশ ও কালে বিধৃত, অনন্ত বৈচিত্র্যময়, সুসংহত, সুশৃঙ্খল জগৎ ঈশ্বরের জ্ঞান ও শক্তির প্রকাশ। ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করলে এই জগতের কোন সুসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া অসম্ভব। দার্শনিক একেশ্বর-বাদের মূল বক্তব্য হ'ল মোটামুটি এইরকম।

ভাবুক, ধর্ম-প্রাণ ব্যক্তির দৃষ্টিতে ঈশ্বর আমাদের সহায়ক ও ত্রাণকর্তা। তিনি বিপদে আমাদের রক্ষা করেন, পাপের শোচনীয় পরিণতি থেকে উদ্ধার করেন। তিনি সকল সত্যের, সকল জ্ঞানের আধার। তিনি মঙ্গলময়, করুণাময়, প্রেমময় ও ন্যায়বান। ঈশ্বর ও আমাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ, সেটা হ'ল দুই আত্ম-সচেতন ব্যক্তির মধ্যে সম্বন্ধ। এই জন্যই আমরা ঈশ্বরকে পিতা, মাতা, সুহৃৎ, প্রিয়তম প্রভৃতি বলে সম্বোধন করতে পারি, তাঁকে আমাদের শ্রদ্ধা, ভক্তি নিবেদন করতে পারি, দুঃখ, দুর্দশা বেদনার কথা জানাতে পারি, "আমাদের সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি দাও, আমাদের পাপমুক্ত করে উদ্ধার কর" বলে প্রার্থনা করতে পারি। ঈশ্বর ভক্তের প্রার্থনায় সাড়া দেন, ও তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। সুতরাং ঈশ্বর ও মানুষের সম্পর্ক উপাস্য-উপাসকের সম্পর্ক। মরমী সাধকের (Mystic) দৃষ্টিতে ঈশ্বর আমাদের অন্তর্যামী, অন্তরাত্মা, আমাদের সকল আদর্শের আশ্রয়, সকল চিন্তায় ও সকল কাজে প্রেরণাদাতা। ঈশ্বর পরম সুন্দর। জগতের যে যে স্থানে শ্রী, সৌন্দর্য আছে, সে সমস্তই ঈশ্বরের প্রকাশ। তিনি সকল কল্যাণগুণের আধার, কুশ্রীতা, নীচতা, মালিন্য, অশুচিতা প্রভৃতি সকল রকম দোষমুক্ত, পরম পবিত্র, নিত্যশুদ্ধ, অ-পাপবিদ্ধ। তাঁর সংস্পর্শে আমাদের সব মলিনতা, অশুচিতা দূর হয়ে যায়। তিনি আমাদের নৈতিক জীবনের নিয়ন্ত্রণকর্তা। আমাদের অন্তরের বিবেকের বাণী ঈশ্বরেরই বাণী বা আদেশ। যে সব নৈতিক নিয়ম আমাদের সমাজ-ব্যবস্থাকে রক্ষা করে ঈশ্বরের প্রকৃতিতেই সেই সব নিয়মের ভিত্তি। আমরা যে সব কর্ম করি ঈশ্বরই সেই সব কর্মের ফলদাতা। তিনি ন্যায়বান। তিনি পাপীকে তার পাপানুযায়ী শাস্তি দেন আর যে সুকর্ম করে তাকে সুখী করেন। তাঁর রাজ্যে পুণ্যের জয়

এবং পাপের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। আবার, পাপী যদি নিজের পাপকর্মের জন্য অনুতাপ করে, তিনি তাকে ক্ষমা করেন এবং পাপ থেকে মুক্ত করেন। তিনি পক্ষপাতহীন, কোনও বিশেষ ব্যক্তির প্রতি তাঁর অনুরাগ অথবা বিরাগ নেই। ঈশ্বর করুণাময়, জীবের প্রতি তাঁর দয়া অসীম, অপার। জগতের ক্ষুদ্রতম বা নিকৃষ্টতম প্রাণীও তাঁর করুণা থেকে বঞ্চিত নয়। তিনি পরম প্রেমময় ও আনন্দময়। তিনি প্রত্যেক জীবকে তাঁর আনন্দের অংশ দিতে উৎসুক এবং সেজন্য তিনি সকল জীবকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন। কোন কোন ভক্তের উপলব্ধিতে তাঁর মধুর রূপ ছাড়া একটা রুদ্ররূপও প্রকাশ পায়। তিনি "ভয়ং ভয়ানাং ভীষণং ভীষণানাম্"। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঝড়, জলপ্লাবন, মহামারী প্রভৃতির মাধ্যমে তাঁর এই রুদ্ররূপের প্রকাশ। প্রকৃত ভক্ত এই সকলের মধ্যেই ঈশ্বরের মঙ্গলহস্ত দেখতে পান।

"The Idea of the Holy" গ্রন্থের লেখক R. Otto বলেন যে, আমাদের ধর্মীয় মনোভাবকে বিশ্লেষণ করলে এমন একটি উপাদান পাওয়া যায় যার একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে এবং যাকে অন্য কোনও মনোভাবের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না। Otto একে "Feeling of the Numinous" বলেছেন। এইটি হ'ল ধর্ম-ভাবের মৌল উপাদান। আমরা ঈশ্বরের, অর্থাৎ আমাদের উপাস্য দেবতার প্রতি সত্য, মঙ্গলময়, করুণাময় ইত্যাদি নানা বিশেষণ প্রয়োগ করি। এই বিশেষণগুলি আমাদের বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং ভাষায় প্রকাশ করবার উপযুক্ত। কিন্তু এই বিশেষণগুলি ছাড়াও ঈশ্বরের আর একটি বিশেষণ আছে যার কেবল উপলব্ধিমাত্র হ'তে পারে কিন্তু যাকে ভাষায় উপযুক্তভাবে প্রকাশ করা যায় না। 'Numinous' শব্দটি ঈশ্বরের এই বিশেষণের একটি ইঙ্গিতমাত্র দেয়, কিন্তু এটি যে ঠিক কি তা ব্যক্ত করে না। 'Holy' (পরম পবিত্র) এবং 'Mysterious' (রহস্যময়)—এই দুইটি শব্দও 'Numinous' এর প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু এরাও ঐ শব্দটির অর্থকে যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারে না। যে ব্যক্তি অনুভব করে যে, সে এমন একটি বস্তু বা শক্তির সম্মুখে উপস্থিত যা অন্য সমস্ত বস্তু থেকে সম্পূর্ণ পৃথক (wholly other), যার উপস্থিতিতে সে নিজেকে নিতান্ত দুর্বল বলে মনে করে, অথচ যার উপর নিজেকে একান্ত নির্ভরশীল (Creature feeling) বলে মনে হয়, সেই হ'ল Numinous, পরম পবিত্র ও রহস্যময়।

ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞানী দার্শনিকের ধারণা আর ভাবুক ভক্তের ধারণা—এই দুইয়ের মধ্যে কোন অবশ্যম্ভাবী বিরোধ নেই। যিনি দার্শনিক তিনি

ভক্তও হ'তে পারেন, আর যিনি ভক্ত তিনি দার্শনিকও হ'তে পারেন। তত্ত্ব-দৃষ্টিতে ঈশ্বরকে যে সব গুণের অধিকারী বলে বর্ণনা করা হয়, আর ভাবুক ভক্তের অনুভূতিতে ঈশ্বরের যে সব গুণ প্রকাশিত হয়, সেগুলি পরস্পরের বিরোধী নয়, বরং পরিপূরক। ঈশ্বরকে কেবলমাত্র চরমসত্তা বা পরিদৃশ্যমান জগতের আদি-কারণ বলে বর্ণনা করলে হয়ত আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তি চরিতার্থ হয়, কিন্তু আমাদের জীবনের উপর এই ধারণার কোন প্রভাব থাকে না। অপর পক্ষে, ঈশ্বরকে যদি কেবলমাত্র কোন সসীম, অল্পজ্ঞ, সীমিত শক্তিবিশিষ্ট পুরুষ বলে কল্পনা করা হয়, তাহ'লে তাঁকে আমাদের পরিত্রাতা মনে করা বা তাঁর প্রসাদ লাভ করে আমাদের জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করা অসম্ভব বলে মনে হ'বে। যিনি প্রেমময়, করুণাময়, মঙ্গলময়, তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান, পরমপুরুষ—এই বিশ্বাসই ঈশ্বরবাদী ধর্মের (Theism) মূল ভিত্তি।

4. ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব (Divine Personality)

ভাবুক, ধর্ম-প্রাণ ব্যক্তিমাত্রই ঈশ্বরকে অশেষ সদ্‌গুণের অধিকারী ব্যক্তি (Person) বলে বিশ্বাস করেন। তিনি এমন এক ব্যক্তি যাঁর সঙ্গে আমাদের উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ থাকতে পারে এবং যিনি আমাদের ব্যাকুল আহ্বানে সাড়া দিতে পারেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব থাকতে পারে কি না, এ সম্বন্ধে দার্শনিক প্রশ্ন উঠতে পারে। ব্যক্তির লক্ষণ কি? সাধারণত: (i) আত্ম-চেতনা (self-consciousness), (ii) আত্ম-নিয়ন্ত্রণ (self-determination) এবং (iii) ভাবাবেগ (Feeling or Emotion)—এই কয়টিকে ব্যক্তিত্বের প্রধান উপাদান বলে মনে করা হয়। মানুষের এই সব বৈশিষ্ট্য আছে বলেই মানুষের ব্যক্তিত্ব আছে এবং জড়বস্তু বা ইতর প্রাণীদের এইগুলি নাই বলেই তাদের ব্যক্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। ঈশ্বর আত্ম-সচেতন পুরুষ, তাঁর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আছে, তিনি নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় উপায় ব্যবহার করতে পারেন, এবং জীবের প্রতি তাঁর দয়া বা ভালবাসা আছে, এই সব স্বীকার করলে তবেই আমরা তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারি, এবং ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ থাকার উপর আমাদের ধর্ম-জীবনের সার্থকতা নির্ভর করে।

(i) প্রথমত, আমি আমাকে 'আমি' (অহম্) রূপে জানি বলেই অন্য সব বস্তু (অনাত্মা) থেকে আমাকে পৃথক বলে অনুভব করতে পারি। আবার

'ইহাই আমি' এই জ্ঞান হ'তে হ'লে 'উহা আমি নয়' এরূপ জ্ঞান হওয়াও একান্তই আবশ্যক। অর্থাৎ, এই অহং-বোধ আমার 'আমিত্বের' কেন্দ্র হ'লেও অনাত্মা-বোধের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। আমি যখনই নিজেকে জানি তখনই অনাত্মা বা বহির্জগৎ থেকে পৃথক করে, এমন কি এর বিরোধীরূপেই নিজেকে জানি। এই বহির্জগতের জ্ঞান যদি না থাকত তাহ'লে আত্মজ্ঞান বা অহং-বোধও থাকত না এবং ব্যক্তিত্ব (Personality) বলেও কিছু থাকত না। আমাদের জ্ঞানের একদিকে আছে বিষয় (বহির্জগৎ), ইহা বহু বস্তুর সমষ্টি এবং নিত্য পরিবর্তনশীল, এবং অপরদিকে আছে বিষয়ী (subject), ইহা এক, অখণ্ড এবং অ-পরিণামী। আমার মনে নানা রকম সংবেদন, সুখদুঃখানুভূতি, চিন্তা, ধারণা, সঙ্কল্প প্রভৃতি একটির পর একটি উদয় হচ্ছে, কিন্তু এদের সব থেকে পৃথক্, অথচ এদের সব কিছুকে একত্র গ্রথিত করে, এমন একটি ঐক্য-বোধও সর্বদাই এদের সঙ্গে আছে। এই অহং-বোধ-রূপী ঐক্য-বোধই ব্যক্তিত্বের মূল উপাদান, অথচ এই অহং-বোধই অনাত্মা বা বহির্জগতের জ্ঞানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট।

(ii) দ্বিতীয়ত, যাকে আমরা ব্যক্তি বলি, তার আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকবে। কোন ব্যক্তি সচেতনভাবে যে সব কাজ করে সেগুলির অধিকাংশই উদ্দেশ্যমূলক; এবং এই উদ্দেশ্যগুলিকে সিদ্ধ করবার জন্য তার ধারণা, চিন্তা, প্রকৃতি প্রভৃতিকে একটির পর একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে চালিত করতে হ'বে। কোন ক্রিয়ার উৎস আমি নিজে (স্বয়ং) এবং এই ক্রিয়াকে কোন না কোন লক্ষ্যের দিকে চালিত করার ক্ষমতা আমার আছে—এই বোধ আমার ব্যক্তিত্বের একটি অঙ্গ বা উপাদান। যে বস্তু বা প্রাণীর ক্রিয়া কেবলমাত্র অন্য বস্তুর ক্রিয়াদ্বারা নিয়ন্ত্রিত তার ব্যক্তিত্ব নেই।

(iii) তৃতীয়ত, সুখদুঃখানুভব, ভাবাবেগ (Feelings and Emotions) প্রভৃতিও ব্যক্তিত্বের উপাদান। যে জীবের সুখদুঃখবোধ বা ভাবাবেগ নেই তাকে ব্যক্তি বলা যায় না। কোন ব্যক্তির বিশেষত্ব প্রকাশিত হয় বহির্জগতের উপর তার মানসিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে। সব জীবের প্রতিক্রিয়াই যদি ঠিক এক ধরনের হ'ত তাহ'লে তাদের কোনও বৈশিষ্ট্য থাকত না। একই বস্তুর উপর আমাদের মানসিক প্রতিক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন রকম। একই বস্তু আমাদের কোন একজনকে প্রফুল্ল করে, অপর একজনকে পীড়া দেয়। একই অবস্থায় কেউ উৎসাহবোধ করে, অপর একজন নিরুৎসাহ হয়। এইসব সুখদুঃখানুভূতি, ভাবাবেগ প্রভৃতির ভিতর দিয়ে আমাদের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ হয়।

5. ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আপত্তি

এখন প্রশ্ন হ'তে পারে যে, উপরে ব্যক্তিত্বের যে সব লক্ষণ দেওয়া হ'ল, সেগুলিকে মানদণ্ড (Criterion) হিসেবে ব্যবহার করলে ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলা যায় কি না। বহু দার্শনিকের মতে ঈশ্বরে ব্যক্তিত্ব আরোপ মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। ঈশ্বর যদি অসীম, অনন্ত, স্বয়ং-সম্পূর্ণ হ'ন, তাহ'লে তাঁর আত্ম-চেতনা, আত্ম-নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি গুণ বা ক্ষমতা থাকতে পারে না।

প্রথমত, ঈশ্বরে আত্ম-চেতনা বা অহং-বোধ থাকতে পারে না। আত্ম-চেতনা ব্যক্তিত্বের অপরিহার্য উপাদান হ'লে ব্যক্তিকে সীমাবদ্ধ হ'তেই হ'বে, কারণ, তার অস্তিত্ব অপর কোন বস্তুর উপর নির্ভর করবে এবং অপর বস্তু তার অস্তিত্বকে সীমিত করবে। ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব থাকলে সসীম ব্যক্তি সম্বন্ধে যা প্রযোজ্য তাঁর সম্বন্ধেও তাই প্রযোজ্য হ'বে। অর্থাৎ, ঈশ্বরের পক্ষে ঈশ্বর থেকে ভিন্ন বহির্জগতের সঙ্গে নিজের পার্থক্য অনুভব করা প্রয়োজন। সুতরাং এই সর্তটি পূরণের জন্য জগতে ঈশ্বর ভিন্ন অন্য বস্তুরও থাকা আবশ্যক এবং তাহ'লেই তিনি আর অদ্বিতীয় স্বয়ং-সৎ বস্তু হ'তে পারেন না। আমাদের এই সিদ্ধান্তই করতে হ'বে যে, হয় ঈশ্বর সসীম না হয় তিনি আত্ম-সচেতন ন'ন।

দ্বিতীয়ত, ঈশ্বরের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বা প্রয়োজনও থাকতে পারে না। সসীম জীবের পক্ষে কোন না কোন রকম অভাব-বোধই কর্ম-প্রবৃত্তির জনক। অভাব-পূরণ করবার ফলে যে তৃপ্তি লাভ করা যায়, তা-ই উদ্দেশ্যরূপে (Motive) জীবকে কর্মে প্রেরণা দিয়ে থাকে। যিনি সর্বাংশে ও সর্বতোভাবে পূর্ণ, যাঁর কোন অভাব নেই তাঁর কোন কর্মে প্রবৃত্তি হ'তে পারে না এবং তাঁর পক্ষে কর্ম-প্রবৃত্তি এবং প্রাসঙ্গিক ধারণা ও চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন থাকতে পারে না। অনন্ত, সর্ব-নিরপেক্ষ ঈশ্বর কি জন্যই বা ক্রিয়া করবেন এবং কোন প্রয়োজনেই বা আপনার চিন্তা বা প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করবেন? তাঁর পক্ষে উদ্দেশ্য বা উদ্দেশ্য সাধনের উপায় কিছুই থাকতে পারে না।

তৃতীয়ত, ঈশ্বরের সুখদুঃখানুভূতি, আনন্দ, বিদ্বেষ, রাগ, দয়া, সহানুভূতি প্রভৃতি ভাবাবেগও থাকতে পারে না।[1] নিম্নস্তরের সুখদুঃখানুভূতিগুলি (Feelings) আমাদের জড়দেহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। যে সব বস্তুর সংস্পর্শে এলে আমাদের দৈহিক অভাবের পূরণ হয়, আমাদের জীবনী-শক্তি অন্তত সাময়িকভাবে বৃদ্ধি পায় অথবা উত্তেজিত হয়, সেগুলি আমাদের মনে সুখানুভূতি উৎপন্ন করে, এবং যে সব বস্তুর সংস্পর্শে এলে

আমাদের জীবনী শক্তি, অন্তত সাময়িকভাবে ক্ষুণ্ণ বা ব্যাহত হয়, দেহের ক্ষতি হয় সেগুলি আমাদের মনে দুঃখানুভূতি উৎপন্ন করে। উচ্চস্তরের ভাবাবেগগুলি (Emotions), যেমন, হর্ষ, বিষাদ, ক্রোধ, ঈর্ষা ইত্যাদি, নিম্নস্তরের দেহজ সুখ-দুঃখাদির উপর নির্ভরশীল তো বটেই অধিকন্তু এদের উৎপত্তি আমাদের সামাজিক পরিবেশের উপরও নির্ভর করে। দয়া, মায়া, প্রীতি, স্নেহ, ক্রোধ, অহঙ্কার, ঈর্ষা প্রভৃতি অন্য ব্যক্তিদের অনুকূল বা প্রতিকূল ব্যবহারের ফলে জন্মায়। ঈশ্বর অসীম, স্বয়ং-সম্পূর্ণ হ'লে তাঁর কোনও অভাব বা অ-পূর্ণতা থাকতে পারে না ; সুতরাং তাঁর অভাব-পূরণের চেষ্টা বা ইচ্ছার সঙ্গে অপর কোন ব্যক্তির অভাব-পূরণের চেষ্টা বা ইচ্ছার বিরোধ থাকতে পারে না। তাঁকে সাহায্য করার কেউ নেই, তাঁর ইচ্ছায় বাধা দেবার ক্ষমতাও কারও নেই। যদিও কবি ও ভাবুকেরা ঈশ্বরের প্রেম, স্নেহ এমন কি লোভ, দ্বেষ প্রভৃতি কল্পনা করে থাকেন, তাঁর প্রিয় ব্যক্তি অথবা ঘৃণার পাত্র কেউ থাকতে পারে না ; অর্থাৎ, যে অবস্থায় আমাদের মানসিক আলোড়ন বা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, ঈশ্বরের পক্ষে সেই অবস্থার অভিজ্ঞতা হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই।

সুতরাং, অনেক দার্শনিকের মতে ঈশ্বরের আত্ম-সচেতনতা, আত্ম-নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা, ভাবাবেগ প্রভৃতির অভাব থাকায় ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলা যায় না এবং তাঁর সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত সম্বন্ধও (Personal relation) স্থাপন করা যায় না। কবি, ভাবুক, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা ঈশ্বরে ব্যক্তিত্ব আরোপ করে থাকেন বটে, কিন্তু সেটা কল্পনা-বিলাসমাত্র। দার্শনিক দৃষ্টিতে এসব কল্পনার কোনও মূল্য নেই।

6. পরব্রহ্ম ও ঈশ্বর পৃথক না অ-ভিন্ন ? (Is God different from the Absolute or not ?)

পরব্রহ্মের (The Absolute) ধারণা সম্বন্ধে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। সেই আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, "ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব আছে কি না ?" এবং "ঈশ্বর ও পরব্রহ্ম এক না ভিন্ন"—এ দুটি প্রশ্ন পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। যদি আমরা মনে করি যে, ঈশ্বর একজন ব্যক্তি এবং তাঁর সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ হ'তে পারে, তাহ'লে তিনি অনন্ত, স্বয়ং-নির্ভর, সর্বনিরপেক্ষ হ'তে পারেন না, অর্থাৎ, পরব্রহ্ম হ'তে পারেন না। কিন্তু যদি ঈশ্বর ও পরব্রহ্ম অ-ভিন্ন হ'ন তাহ'লে ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলে স্বীকার করা অযৌক্তিক হ'বে। এ সম্বন্ধে দার্শনিকদের মধ্যে বিভিন্ন মত-বাদ প্রচলিত আছে।

একটি মতানুসারে ধর্ম-বিশ্বাসীর ঈশ্বর এবং তত্ত্বজিজ্ঞাসুর পরব্রহ্ম, এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। ঈশ্বরের ধারণা ও পরব্রহ্মের ধারণা, এই দুইয়ের মধ্যে কোনও সমন্বয় সম্ভব নয়। ঈশ্বরকে পরব্রহ্মের সঙ্গে অ-ভিন্ন বলে মনে করার পথে প্রধান বাধা এই যে, পরব্রহ্মের ধারণানুসারে তাঁকে ব্যক্তি বলা যায় না। যে সব গুণ বা ক্ষমতা ব্যক্তিত্বের উপাদান সেগুলি পরব্রহ্মে থাকতে পারে না। এই মতের সমর্থনে যে যুক্তির অবতারণা করা যেতে পারে তার ব্যাখ্যা আগেই করা হয়েছে। অনেক বিখ্যাত দার্শনিক এই যুক্তির বৈধতা স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু পরব্রহ্মের ধারণা ও ঈশ্বরের ধারণা পরস্পর-বিরোধী হ'লে প্রশ্ন উঠবে, এই দুইয়ের মধ্যে কার প্রকৃত অস্তিত্ব আছে? এই প্রশ্নের উত্তরে একশ্রেণীর একত্ববাদী বা অদ্বৈতবাদী দার্শনিক বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে পরব্রহ্মেরই অস্তিত্ব আছে, আমরা অজ্ঞানবশতঃ ঈশ্বরের কল্পনা করে থাকি। অপর এক শ্রেণীর দার্শনিকদের মতে কেবল ঈশ্বরই আছেন, পরব্রহ্ম নাই। প্রাচীন গ্রীসে Xenophanes, Parmenides প্রভৃতি Eleatic সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরা প্রচার করেছিলেন যে, সত্তা (Being) এক ও অদ্বিতীয় "একমাত্র সৎ-ই, আছেন, অ-সৎ নাই"। জগতে যা কিছু আছে সে সমস্তই এক সত্তার অন্তর্ভুক্ত। আমাদের অজ্ঞানের জন্যই আমরা বিভিন্ন বস্তুর ভেদ কল্পনা করি। ঈশ্বর বা বহু দেব-দেবীর অস্তিত্বের কল্পনাও আমাদের অজ্ঞানের ফল। সুতরাং এই সৎ (যাকে আধুনিক পরিভাষায় Absolute বা Whole বলা হয়)-এরই প্রকৃত অস্তিত্ব আছে। অল্প-বুদ্ধি লোকেরা যাকে ঈশ্বর বলে তার অস্তিত্ব নেই। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপে প্রসিদ্ধ দার্শনিক স্পিনোজা (Spinoza) জগৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁর নিজের যে মতবাদ প্রচার করেছিলেন য়ুরোপীয় দর্শনে আজ পর্যন্ত তাকে একত্ববাদ বা অদ্বৈতবাদ (Monism), বিশেষ করে সর্বেশ্বরবাদের (Pantheism), প্রকৃষ্ট উদাহরণ বলে গণ্য করা হয়। স্পিনোজা বলেন যে, চরমসত্তা একটি-ই। একেই তিনি দ্রব্য (Substance) বলেছেন। দ্রব্য অসীম, অনন্ত, স্বয়ং-সিদ্ধ, স্বয়ং-নির্ভর, সর্ব-নিরপেক্ষ সত্তা—জগতের আদি-কারণ। স্পিনোজার ব্যাখ্যানুসারে Substance, The Whole, The Absolute, এই শব্দগুলি সমার্থক। কোনও সসীম বস্তুরই দ্রব্য থেকে পৃথক্ স্বাধীন সত্তা নেই। তাদের সত্তা দ্রব্যেরই সত্তা। আমাদের জ্ঞান যতদিন অ-পূর্ণ থাকে ততদিন আমরা এই সব বস্তুর পৃথক্ পৃথক্ সত্তা আছে বলে মনে করি, কিন্তু আমাদের জ্ঞান যতই পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হ'তে থাকে, ততই এইসব সসীম বস্তুর সীমারেখাগুলি বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং আমরা এক অনন্ত, পরিপূর্ণসত্তা উপলব্ধি করি।

দ্রব্যকে স্পিনোজা ঈশ্বর (God) নামেও অভিহিত করেছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন যে, 'ঈশ্বর' শব্দটি আমরা সাধারণত যে অর্থে ব্যবহার করি, দ্রব্যকে সে, অর্থে 'ঈশ্বর' বলা যায় না। সাধারণত, ঈশ্বর-সম্বন্ধে আমাদের ধারণা মনুষ্যধর্মাশ্রয়ী (Anthropomorphic)। অর্থাৎ, আমরা মানুষে যে সকল গুণ দেখি তাদের সর্বোত্তম আকারগুলিই ঈশ্বরে আরোপ করি। কিন্তু আমাদের অজ্ঞতাই এই অভ্যাসের কারণ। বস্তুত দ্রব্যে এই সকল গুণ থাকতে পারে না। 'বৃহৎ ঋক্ষ' (The Great Bear) বলতে আমরা যেমন একটি প্রাণীবিশেষকে বুঝি, তেমনই আবার একটি নক্ষত্রমণ্ডলীকেও বুঝি, যদিও এই প্রাণী ও এই নক্ষত্র-মণ্ডলীর মধ্যে কোনও মৌলিক সাদৃশ্য নেই। ঠিক তেমনই 'ঈশ্বর' শব্দে আমরা এক সর্ব-মঙ্গলময়, অশেষ গুণ-সম্পন্ন পরম পুরুষকেও বুঝি, আবার দ্রব্যকেও বুঝি। কিন্তু ঈশ্বরে সাধারণত যে সব গুণ আরোপ করা হয় সেগুলির 'দ্রব্যে' থাকার কোন সম্ভাবনা না থাকায় এই শব্দটি আক্ষরিক অর্থে 'দ্রব্যে' প্রয়োগ করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। ঈশ্বব (দ্রব্য) মানুষের মত বা মানুষের ধর্মবিশিষ্ট কোনও পুরুষ (Person) ন'ন। তিনি সত্তা (Being)-মাত্র। তিনি চৈতন্য (Thought) এবং বিস্তৃতি (Extension)-র মাধ্যমে আত্ম-প্রকাশ করেন, কিন্তু স্বরূপত তিনি চৈতন্য-মাত্র বা বিস্তৃতি-মাত্র ন'ন। সুতরাং দ্রব্য (The Absolute)-কে স্পিনোজা ঈশ্বর বললেও দ্রব্য এবং প্রচলিত অর্থে ঈশ্বর বলতে আমরা যা বুঝি, এই দুইটি পৃথক্ এবং ঈশ্বরের যথার্থ অস্তিত্ব নেই। স্পষ্টই বোঝা যায় যে, দ্রব্যের সঙ্গে আমাদের উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ হ'তে পারে না। আমাদের শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসার প্রতিদান হিসাবে দ্রব্যের কাছ থেকে আমরা প্রীতি, সহানুভূতি বা ভালবাসা আশা করতে পারি না। স্পিনোজা ঈশ্বরের ভালবাসার কথা উল্লেখ করেছেন এবং ঈশ্বরকে ভালবাসাই যে আমাদের পরম পুরুষার্থ এমন কথাও বলেছেন, কিন্তু তাঁর মতে এই ভালবাসা আমাদের বিচারবুদ্ধি থেকে উৎপন্ন হওয়া আবশ্যক। ঈশ্বরের (দ্রব্যের) স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের যথার্থ-জ্ঞান হ'লে তাঁর প্রতি আমরা যে অদম্য আকর্ষণ অনুভব করি, সেই হ'ল বিচার-বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা-জনিত ভালবাসা (Intellectual Love of God)। সুতরাং স্পিনোজার দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম-বিশ্বাস প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাস ও ধর্মীয় আচরণের অনুকূল নয়।

প্রসিদ্ধ ইংরাজ দার্শনিক ব্র্যাড্‌লে (Bradley)-র মতে 'ব্যক্তি' বলতে যদি আমরা 'ব্যক্তিমাত্র' (Merely personal) বুঝি তাহলে পরব্রহ্ম 'ব্যক্তি' ন'ন। কিন্তু তিনি 'অতি-ব্যক্তি' (Super-personal) হ'তে পারেন। ব্যক্তি-

মাত্রই সসীম হ'তে বাধ্য[1]। পরব্রহ্ম (The Absolute) সসীম ন'ন, সুতরাং তিনি ব্যক্তি হ'তে পারেন না—এটাই প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত। তাঁর মতে জগতের চরমসত্তা এক অবিভক্ত সর্ব-ব্যাপী, সর্বানুস্যূত চৈতন্য। এটি সুসংহত এবং সকল রকম অন্তর্বিরোধ-রহিত। জগতে যা কিছু আছে—সমস্ত জড়বস্তু ও খণ্ড-চৈতন্য (জীব-চৈতন্য)—এই এক অদ্বিতীয় চৈতন্যের অংশ। এরা সমগ্রের মধ্যে একাত্ম হয়ে আছে, কিন্তু কোন রকম সম্বন্ধ দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত নয়। এরকম বলার স্বপক্ষে যুক্তি এই যে, ব্র্যাড্‌লের মতে সম্বন্ধমাত্রেই অন্তর্বিরোধ (Internal contradiction) আছে, এবং অবভাসিক জগতে (The World of Appearance) অন্তর্বিরোধ থাকলেও সমগ্রে (The Whole) অথবা চরম সত্তায় (Ultimate Reality) অন্তর্বিরোধ থাকতে পারে না। চরমসত্তাকে ঈশ্বর অথবা ব্যক্তি বলে মনে করলে বিরোধের সৃষ্টি হয়। সুতরাং চরম সত্তা বা পরব্রহ্ম ব্যক্তি হ'তে পারেন না। অবশ্য যদি আমরা চিন্তা বা কল্পনায় যা কিছুকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করি, তারই আধারস্বরূপ কোনও কেন্দ্রীভূত চৈতন্যকে ব্যক্তি বলে বিবেচনা করি, তাহ'লে পরব্রহ্মকে ব্যক্তি (ঈশ্বর) বলা সঙ্গত হ'বে। কিন্তু যাঁরা পরব্রহ্মে ব্যক্তিত্ব আরোপ করতে উৎসাহী, অর্থাৎ, যাঁরা পরব্রহ্ম ও ঈশ্বরকে অভিন্ন বলে মনে করেন, তাঁরা সাধারণত এই সিদ্ধান্ত করেন যে, পরব্রহ্ম (বা ঈশ্বর) নিজেকে অন্য ব্যক্তি থেকে পৃথক্ করতে পারেন, বিভিন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গে বিভিন্ন সম্বন্ধ স্থাপন করেন এবং তাদের ব্যবহারের তারতম্যানুসারে হর্ষ বা বিষাদ ভোগ করেন। কিন্তু ব্যক্তিত্বকে এই সঙ্কীর্ণ অর্থে নিলে আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হ'বে যে, পরব্রহ্ম ব্যক্তি (ঈশ্বর) হ'তে পারেন না।[2] তবে, "পরব্রহ্ম ব্যক্তি ন'ন"—এই বাক্যের যদি কেউ এমন অর্থ করেন যে, পরব্রহ্ম 'নির্ব্যক্তিক (Impersonal) তাহ'লে তিনি ভুল করবেন; কারণ, দার্শনিক বিচারে এটাই প্রতিপন্ন হয় যে, পরব্রহ্ম 'অতি-ব্যক্তি' (Super personal), অর্থাৎ ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ব্র্যাডলে পরব্রহ্ম ও তার অবভাস (Appearance)গুলির সম্বন্ধ যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাই থেকে এই সিদ্ধান্তই করতে হয় যে, ঈশ্বরও

---

1 "For me, a person is finite or is meaningless"—F. Bradley. Appearance and Reality.

2 "The Absolute, for me, cannot be God, because in the end the Absolute is related to nothing and there cannot be a practical relation between it and the finite will."—Bradley. Essays on Truth and Reality.

পরব্রহ্মের অবভাসমাত্র, সুতরাং পরমাত্মার সঙ্গে অ-ভিন্ন ন'ন। ঈশ্বরের সত্তা আপেক্ষিক (Relative) সত্তামাত্র, চরমসত্তা নয়। কেবলাদ্বৈতবাদী শঙ্করের মতে এক, অদ্বিতীয়, নির্গুণ সকল প্রকার ভেদরহিত শুদ্ধচৈতন্যই পরমাত্মা। নানা ভেদযুক্ত, বৈচিত্র্যময় জগৎ মায়া বা অবিদ্যা-জনিত ভ্রমমাত্র। রজ্জুতে যেমন সর্প-ভ্রম হয়, অথবা, শুক্তিতে যেমন রজত-ভ্রম হয়, সেইরকম পরব্রহ্মেও জগৎ ভ্রম হয়ে থাকে। এই জগতের ব্যাবহারিক সত্তা থাকলেও পারমার্থিক সত্তা নেই। সকল সসীম বস্তুর মত সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরও পরব্রহ্মের অবভাসমাত্র। মায়োপাধিক ব্রহ্মই সগুণব্রহ্ম বা ঈশ্বর। অর্থাৎ, ঈশ্বর বলে আমরা যাঁর পূজা বা উপাসনা করি, প্রকৃতপক্ষে তাঁর চরম সত্তা নেই। জীবাত্মা ও পরব্রহ্ম অভিন্ন। "জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ"। পারমার্থিক দৃষ্টিতে এই দুইয়ের দ্বৈতভাব মিথ্যা। অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের কাছে পরব্রহ্ম ঈশ্বরের রূপ ধারণ করেন, কিন্তু পরব্রহ্মে কোনও ভেদ না থাকায় তাঁর সঙ্গে আমাদের উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ হ'তে পারে না। একমাত্র নির্গুণ, নির্বিশেষ পরব্রহ্মই সত্য, ঈশ্বর অবভাসমাত্র।

7. ঈশ্বর আছেন পরব্রহ্ম নাই

দ্বৈতবাদী বা বহুবাদী দার্শনিকদের মধ্যে অনেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করলেও ঈশ্বরকে অনন্ত, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, সর্ব-নিরপেক্ষ, সকল সম্বন্ধের অতীত সমগ্র-সত্তা বলে বিশ্বাস করেন না। তাঁদের মতে ঈশ্বর অন্যান্য সসীম জীবদের অপেক্ষা জ্ঞানে ও ক্ষমতায় শ্রেষ্ঠ হ'লেও তাঁর জ্ঞান বা ক্ষমতা সীমাহীন নয়। তিনি সমতুল্য ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (The First among equals, **Primus inter pares**), কিন্তু তিনি সমগ্র-সত্তা ন'ন। সমস্ত বস্তুকে নিজের অন্তর্ভুক্ত করতে পারে এমন কোনও একীভূত অদ্বৈত-সত্তা নেই। জগতের বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে যেমন সাদৃশ্য আছে তেমনই বৈসাদৃশ্যও আছে, যেমন ঐক্য আছে তেমনই অনৈক্যও আছে, কিন্তু সমস্ত ভেদ, অনৈক্য বৈসাদৃশ্য ও বিরোধের আড়ালে এক অখণ্ড, সর্বব্যাপী সত্তা আছে, এরকম মনে করার পক্ষে কোনও যুক্তি নেই।[1] এই জগৎ বহু বিচ্ছিন্ন বস্তুর সমষ্টিমাত্র। ঈশ্বর একজন ব্যক্তি তাঁর শক্তি সাধারণ মানুষের শক্তি

1 "Nothing includes everything or dominates everything". "Each part of the world is in some way connected, in some other ways not connected with its other parts".—W. James. A Pluralistic Universe. (1909)

অপেক্ষা বহুগুণ বেশী হ'লেও তাঁর শক্তিরও সীমা আছে। দেশ, কাল, জড়-জগতের অন্তিম উপাদানস্বরূপ পরমাণুগুলি ও জীবাত্মাদের ঈশ্বর সৃষ্টি করেন নি। তারাও ঈশ্বরের মত অনাদি ও অবিনশ্বর। সুতরাং ঈশ্বরের পক্ষে আত্ম-সচেতন (Self-conscious) হ'তে কোন বাধা নেই। আমরা যেমন অনাত্মা ও আত্মার মধ্যে পার্থক্য করতে পারি, ঈশ্বরও সেই রকম অন্য বস্তু থেকে নিজেকে পৃথক করতে পারেন। দ্বিতীয়ত, ঈশ্বর যেহেতু সসীম, সেইহেতু তিনি নিশ্চয়ই কোন না কোন বিষয়ে অপূর্ণ এবং অপূর্ণতা জনিত অভাব তিনি নিশ্চয়ই অনুভব করেন এবং এখন যা তাঁর নেই তাই পাবার ইচ্ছা করতে পারেন, অথবা, জগৎ কিংবা জগতের অংশবিশেষ এখন যে অবস্থায় আছে তার পরিবর্তন কামনা করতে পারেন। (যেমন, সকল মানুষই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ করুক এটা তাঁর কাম্য হ'তে পারে)। এই সব অভাব পূরণের জন্য তাঁকে সক্রিয় হ'তে হ'বে এবং নিজের চিন্তা ও প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হ'বে। তৃতীয়ত, ঈশ্বরভিন্ন অথচ তাঁর উপর নির্ভরশীল বহু জীবের সংস্পর্শে আসার ফলে তাঁর মনে নানা রকম ভাবাবেগ উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব নয়। সুতরাং ঈশ্বরের আত্ম-সচেতনতা, আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এবং ভাব-প্রবণতা আছে এবং সেজন্য তাঁর ব্যক্তিত্ব আছে এই সিদ্ধান্ত করতে হ'বে। W. James, G. H. Howison প্রভৃতি কোন কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক এই মতের সমর্থক। ভারতীয় ন্যায় দর্শনে যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে তিনিও প্রকৃত পক্ষে সসীম; কারণ, এই দর্শনে দেশ, কাল, পরমাণু জীবাত্মা প্রভৃতিকে অনাদি ও অবিনশ্বর বলে স্বীকার করা হয়েছে, এবং সব কিছুকে নিজের অন্তর্ভুক্ত করতে পারে এমন কোনও অদ্বিতীয় চরম সদ্বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়নি।

৪. সসীম ঈশ্বরবাদের সপক্ষে যুক্তি

সসীম ঈশ্বরবাদের আধুনিক সমর্থকেরা বলেন যে, পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরালে যে চরম সত্তা আছে সেটি এক, অদ্বিতীয় এবং ভেদ-রহিত, অদ্বৈতবাদীদের এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে বস্তুত কোন প্রবল যুক্তি নেই। জগৎ বহু বিভিন্ন বস্তুর এবং জীবাত্মার সমষ্টি, আমরা এইটেই প্রত্যক্ষ করি। এগুলি যে সবই এক অদ্বিতীয় চরমসত্তার অংশ বা অঙ্গ এই ধারণা আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিরোধী। অদ্বৈতবাদীরা বলেন যে, জগতের প্রত্যেক বস্তুই অন্য সকল বস্তুর সঙ্গে নানারূপ সম্বন্ধে আবদ্ধ। এইসব

সম্বন্ধই অন্তর্বর্তী (Internal), অর্থাৎ, যে বস্তুগুলির মধ্যে সম্বন্ধ আছে তাদের প্রকৃতি ও সত্তা এইসব সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে এবং যেহেতু সমস্ত বস্তুই কোন না কোন ভাবে জ্ঞান বা চৈতন্যের বিষয়, সেহেতু প্রত্যেক বস্তুই তার সত্তার জন্য জ্ঞান বা চৈতন্যের সঙ্গে সম্বন্ধের উপর নির্ভরশীল। 9.
অদ্বৈতবাদীদের এই যুক্তি মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। সম্বন্ধগুলির মধ্যে কোন কোনটি অন্তর্বর্তী হ'লেও তাদের অধিকাংশই বাহ্য (External)। যদি দুই বা ততোধিক বস্তুর মধ্যে এরূপ কোন সম্বন্ধ থাকে, তাহ'লে সেই সম্বন্ধের পরিবর্তন হ'লেও সেই বস্তুগুলির মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয়—এই দুইয়ের সম্বন্ধও বাহ্য সম্বন্ধ। জ্ঞানের সহিত সম্বদ্ধ না হ'লে কোন বস্তুর অস্তিত্বই থাকতে পারে না, এই মতও অবিশ্বাস্য। দুইটি আত্ম-সচেতন মানবাত্মার মধ্যে যে সম্বন্ধ তা-ও বাহ্যসম্বন্ধ। দুই বা ততোধিক আত্মা মিলিত হয়ে একটি আত্মায় পরিণত হ'তে পারে না। সুতরাং জগতের যাবতীয় বস্তু ও মানবাত্মা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে এক, অদ্বিতীয় বিশ্ব-চৈতন্য বা বিশ্বাত্মায় পরিণত হ'তে পারে না। চরমসত্তা যদি মাত্র একটি কেন্দ্রে আবদ্ধ না থেকে বহু কেন্দ্রের মধ্যে বিভক্ত হয়ে থাকে, তাহ'লে সমগ্র বিশ্ব অসংখ্য বস্তু ও জীবাত্মার সমষ্টি হ'বে, কিন্তু সেই সমষ্টির অন্তর্গত কোন বস্তুই প্রকৃতপক্ষে অসীম বা সর্ব-নিরপেক্ষ হ'তে পারে না। 'ঈশ্বর' শব্দটি যদি সমগ্র জগতের প্রতিশব্দমাত্র না হয়, তা'হলে তিনিও অসীম বা সর্ব-নিরপেক্ষ হ'তে পারেন না। কেবলমাত্র তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলেই যে কেবল ঈশ্বর সসীম এই সিদ্ধান্ত করতে হয় তা নয়, নৈতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলেও ঐ একই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয়। ঈশ্বর সসীম না হ'লে তাঁর ব্যক্তিত্ব থাকতে পারে না, এবং ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব না থাকলে তাঁর সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ হ'তে পারে না, তাঁকে পূজা বা উপাসনা করতে পারি না, বা তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে পারি না। ঈশ্বর সসীম হ'লে তবেই আমাদের ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য থাকতে পারে এবং আমরা আমাদের পছন্দ অনুসারে কাজ করবার চেষ্টা করতে পারি। আমাদের ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য থাকলে তবেই আমাদের নৈতিক দায়িত্ব থাকতে পারে। ঈশ্বর অসীম হ'লে আমরা বিশ্বাস করতে বাধ্য হই যে, জগতের এবং মানব-জাতির ভবিষ্যৎ পূর্ব হ'তেই নিয়ন্ত্রিত এবং নির্দিষ্ট হয়ে আছে; কারণ, সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান পুরুষের আয়ত্তের বাইরে বর্তমানে কিংবা ভবিষ্যতে কিছুই থাকতে পারে না, এবং এই বিশ্বাস থাকলে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য আমাদের আন্তরিক চেষ্টা হ'তে পারে না। আমরা আমাদের

কর্মদ্বারা ঈশ্বরের সহযোগিতা করলে তবেই তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারেন এই বিশ্বাস নৈতিক ও ধর্মীয় চেতনার পক্ষে অপরিহার্য।

9. এই দুইটি মতবাদের সমালোচনা

প্রথম মতানুসারে পরব্রহ্মই চরমসত্তা এবং ঈশ্বর আমাদের মনঃকল্পিত অথবা অবভাসমাত্র। দ্বিতীয় মতানুসারে ব্যক্তিত্ব-বিশিষ্ট ঈশ্বরেরই যথার্থ অস্তিত্ব আছে এবং কোনও এক অদ্বিতীয় সর্বব্যাপী সত্তা নেই। ঈশ্বর জগতের অংশমাত্র। ঈশ্বর এবং অসংখ্য পরমাণু ও জীবাত্মার সমষ্টি হ'ল জগৎ।

প্রথম মতটির সমালোচনায় বলা যেতে পারে যে, আমাদের ধর্ম-চেতনা যাঁকে ঈশ্বর বলে নির্দেশ করে তাঁর প্রকৃত সত্তা নেই, অথবা তিনি কল্পিতমাত্র এই মত যেমন আমরা বিশ্বাস করতে পারি না, তেমনই আবার ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব আছে এবং সেইজন্যই তিনি সসীম, একথাও অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। ঈশ্বর যদি আমাদের মনের কল্পনামাত্র হ'ন এবং এক, অদ্বিতীয়, নির্গুণ, নির্বিশেষ চৈতন্যই যদি চরমসত্তা হয়, তাহ'লে এই চরমসত্তাকে আমরা শ্রদ্ধা বা ভক্তি নিবেদন করতে পারি না, অর্থাৎ, এরূপ সত্তা আমাদের উপাস্য হ'তে পারে না। আবার, যে ঈশ্বরের জ্ঞান ও ক্ষমতা সীমিত, তিনিও প্রকৃতপক্ষে আমাদের মতই জীববিশেষ এবং তিনিও আমাদের উপাস্য হ'তে পারেন না।

10. পরব্রহ্ম ও ঈশ্বর অ-ভিন্ন (বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ)

এমন অনেক দার্শনিক আছেন যাঁরা সর্বোচ্চ দার্শনিকতত্ত্ব ও আমাদের ধর্ম-চেতনার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনও বিরোধ আছে বলে স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে পরব্রহ্ম ও ঈশ্বর অ-ভিন্ন। ঈশ্বর কোন কল্পিত বা মায়োপাধিক বস্তু (বা অবভাসমাত্র) ন'ন, অথবা তিনি জীবের মত কোন সসীম বস্তুও ন'ন। ঈশ্বর অসীম, অনন্ত, সর্ব-নিরপেক্ষ, সর্বব্যাপী, সর্বানুস্যূত, অদ্বিতীয় হয়েও তিনি যে ব্যক্তিত্বগুণের অধিকারী হ'তে পারবেন না কেন, তার সমর্থনে কোন সুসঙ্গত যুক্তি নেই।

প্রথমত, "অপর কোন বস্তু থেকে নিজেকে পৃথক্ বলে জানতে না পারলে আত্ম-সচেনতা সম্ভব নয়"—এই যুক্তির বিরুদ্ধে বলা যেতে পারে যে, যে বস্তু থেকে আপনাকে পৃথক্ করে জানতে হ'বে তা যে অবশ্যই বাহিরের

কোন স্বতন্ত্র বস্তু হ'বে তা সত্য নয়। ঈশ্বর এক অদ্বিতীয় সত্তা এবং বিশ্বের যাবতীয় বস্তুই তাঁর ধারণা বা চিন্তামাত্র এবং সেজন্য তাঁর উপর নির্ভরশীল, দার্শনিক বিচারের ফলে এরকম সিদ্ধান্ত হ'লে ঈশ্বর এইসব অসংখ্য বৈচিত্র্যময় ধারণা বা চিন্তা থেকে নিজের ঐক্যকে পৃথক্ বলে অনুভব করতে পারেন, এরূপ চিন্তা করলে কোনও অসঙ্গতির সৃষ্টি হয় না। অর্থাৎ, ঈশ্বরের ক্ষেত্রে অনাত্মা ও আত্মার পার্থক্য ঈশ্বর থেকে স্বতন্ত্র কোন দ্রব্য বা শক্তি ও ঈশ্বরের পার্থক্য নয়, এটা ঈশ্বরের ধারণা বা চিন্তাসমূহের সমষ্টি ও তাঁর ঐক্যের মধ্যে পার্থক্য এবং ঈশ্বর এই পার্থক্য অনুভব করেন বলেই তাঁর পক্ষে আত্ম-সচেতন হ'তে কোনও বাধা নেই। সুতরাং ঈশ্বর আত্ম-সচেতন হ'লেই তিনি সসীম হ'বেন, এমন সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক।

দ্বিতীয়ত, ঈশ্বরের সক্রিয়তা ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকতে পারে না বলে যে আপত্তি করা হ'য়েছে, তা-ও খণ্ডন করা যেতে পারে। অভাব-বোধই ক্রিয়ার একমাত্র উৎস—এরকম মনে করার কোনও কারণ নেই। যিনি সর্বতোভাবে পূর্ণ, যার নিজের কোনও প্রয়োজন মেটাবার তাগিদ নেই, তাঁর যাবতীয় ক্রিয়া তাঁর পূর্ণতারই প্রকাশস্বরূপ হ'তে পারে। কবি যেমন তাঁর ভাবোন্মাদনাকে প্রকাশ করবার জন্যই স্বতঃস্ফূর্তভাবে কবিতার আশ্রয় নিয়ে থাকেন, তেমনই স্বয়ং-সম্পূর্ণ ঈশ্বর তাঁর পরিপূর্ণতাকে রূপ দেবার জন্যই জগৎ সৃষ্টি করেন। এটা যদি তাঁর অপূর্ণতার নিদর্শন হয় তাহ'লে বলতে হ'বে যে, সেই অপূর্ণতা তাঁর পূর্ণতারই একটি অঙ্গ।

অসীমতার অর্থ যদি কেবলমাত্র সীমাহীনতা বা অন্তহীনতা হয়, তাহ'লে ঈশ্বর বা পরব্রহ্মকে অসীম বললে তাঁর স্বরূপের যথার্থ ধারণা হয় না। ঈশ্বর সসীম বস্তু থেকে পৃথক, শুধু এই জন্যই তিনি অসীম ন'ন, সমস্ত সসীম বস্তু ও জীব তাঁরই অন্তর্ভুক্ত বা তাঁরই প্রকাশ, এইজন্যই তিনি অসীম। প্রকৃত দার্শনিক দৃষ্টিতে সসীম বস্তু ও জীব ভিন্ন ঈশ্বরের পূর্ণতা নেই। সীমার মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করবার প্রবণতা ঈশ্বরের পূর্ণতার অঙ্গ। সীমার মধ্য দিয়ে অসীমের আত্ম-প্রকাশের যে ব্যাকুলতা, এটাই তাঁর প্রেম বা করুণা। সসীম জীবের দৃষ্টিতে এই তাঁর মাধুর্য গুণ। কবি ও ভাবুকেরা জীবাত্মার প্রতি পরমাত্মার মনোভাব—বিশেষ করে জীবাত্মার সঙ্গে মিলনের জন্য ব্যাকুলতাকে কল্পনার রং-এ রঞ্জিত করে থাকেন এবং মানুষের মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গী প্রভৃতি ঈশ্বরে আরোপ করে থাকেন এবং এরূপ করাই স্বাভাবিক। কিন্তু এইসব কবিত্ব-সুলভ অত্যুক্তি বাদ দিয়েও আমরা বলতে পারি যে, জীব-চৈতন্য ও ঈশ্বর-চৈতন্যের মধ্যে একটি মৌলিক সাদৃশ্য বা ঐক্য আছে। সুতরাং ঈশ্বর ও পর-ব্রহ্ম অভিন্ন এবং ঈশ্বরে

বা পর-ব্রহ্মে ব্যক্তিত্ব আরোপ অযৌক্তিক নয়, এটাই সিদ্ধান্ত করতে হ'বে। তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে যা অসীম, অনন্ত, সর্ব-নিরপেক্ষ চরম সত্তা বা পরব্রহ্ম (The Absolute), ভক্ত ও ভাবুকের দৃষ্টিতে তিনিই সকল কল্যাণগুণের আধার, প্রেমময়, করুণাময়, ঈশ্বর।

দার্শনিকদের মধ্যে যাঁরা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী (যেমন Hegel, রামানুজ ইত্যাদি), তাঁদের মধ্যে অনেকেই উপরে উক্ত মত সমর্থন করেন। জীবাত্মায় যে সব গুণ থাকার জন্য আমরা জীবাত্মাকে 'ব্যক্তি' বলি, সেই সবগুণ পরব্রহ্মে থাকা অসম্ভব নয়, বরং, এইসব দার্শনিকদের মতে, এইসব গুণ পূর্ণমাত্রায় পরব্রহ্মেই থাকা সম্ভব। মানুষের ব্যক্তিত্ব পরব্রহ্ম বা পরমাত্মার ব্যক্তিত্বের তুলনায় সঙ্কুচিত ও সীমিত, ব্যক্তিত্ব পূর্ণমাত্রায় কেবলমাত্র পরব্রহ্ম বা পরমাত্মাতেই থাকতে পারে[1]। পরব্রহ্মের ধারণায় পৌঁছলে আমাদের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা যেমন পরিতৃপ্ত হয়, আমাদের ধর্ম-সাধনাও তেমনই তার চরম লক্ষ্যবস্তু লাভ করে।

এই মতই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।

নির্বাচিত পুস্তক-তালিকা

1. H. Lotze—Outlines of a Philosophy of Religion. Section XXII.
2. M. Edwards—Philosophy of Religion.
3. Galloway—Philosophy of Religion.

1 "Complete personality can only be in God, while to man can belong but a weak and faint copy thereof." Lotze—Outlines of a Philosophy of Religion. p. 72

দশম অধ্যায়

ঈশ্বর ও জগৎ—ঈশ্বরের অতিবর্তিতা ও অন্তর্বর্তিতা

(God and the World—Transcendence and Immanence of the Divine Being)

1. ঈশ্বর ও জগতের সম্পর্ক সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা (Different views of the relation between God and the World)

ঈশ্বরের প্রকৃতি ও পরিদৃশ্যমান জগতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সম্বন্ধে ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদের মনে বিভিন্ন ধারণা আছে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ঈশ্বর ও জগতের মধ্যে এক দুস্তর ব্যবধান আছে বলে মনে করেন। তাঁরা বলেন যে, জগৎ বহু সসীম, দেশ ও কালে অবচ্ছিন্ন বস্তু ও ঘটনার সমষ্টি, ঈশ্বর এক, নিরংশ চৈতন্যময় পুরুষ। জগৎ পরিবর্তনশীল, ঈশ্বর অপরিণামী, দেশ-কালের অতীত। জগতে মালিন্য ও কুশ্রীতার প্রাচুর্য, ঈশ্বর পরম পবিত্র ও সুন্দর। সুতরাং এরকম জগতে ঈশ্বর থাকতে পারেন না, তাঁর অস্তিত্ব জগতের বাইরে। সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, ঈশ্বর স্বর্গে, আকাশের অপর পারে বহু দূরে কোথাও থাকেন। আমাদের থেকে তাঁর দূরত্ব এত বেশী যে, অনেকের মতে তাঁর সম্বন্ধে আমাদের কোনও জ্ঞান হয় না। তিনি বাক্য ও মনের অতীত (অবাঙ্‌মনসগোচর)। সুতরাং ভক্ত ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হ'ন, তাঁকে কাছে পাওয়ার জন্য, তাঁর সঙ্গলাভের জন্য প্রার্থনা করেন। ঈশ্বর ভক্তের সামনে আবির্ভূত হয়ে তার মনের বাসনা পূরণ করুন এই তার আকাঙ্খা।

কেউ কেউ আবার বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বর জগতের ভিতরেই আছেন। ঈশ্বর সর্বত্রই বিরাজ করছেন। জলে, স্থলে, আকাশে, বাতাসে, আগুনে, নদী, সমুদ্র, পর্বত, বৃক্ষলতা সর্বত্রই তিনি আছেন[1]। যা কিছু অশুভ, মন্দ, কুশ্রী বা ঘৃণ্য, তাদের মধ্যেও তিনি আছেন। আবার, মানুষের মন, বুদ্ধি ও হৃদয়েও তিনি আছেন। তিনি সর্বজ্ঞ, সুতরাং প্রত্যেক মানুষের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিন্তা ও অন্তরের বেদনা, আশা আকাঙ্খার সঙ্গেই তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। তিনি অন্তর্যামী, আমাদের প্রত্যেক চিন্তা ও

1 "যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনং আবিবেশ যোঽষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।" শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ২।১৭।

প্রচেষ্টার নিয়ন্তা। তিনি আমাদের আত্মার আত্মা—অন্তরাত্মা, সুতরাং তাঁর কাছে যাওয়ার, তাঁকে কাছে পাওয়ার জন্য দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমাদের অন্তরে ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধির বিষয়। নির্মলচিত্ত লোকের হৃদয়ে ঈশ্বরের উপস্থিতি অতি সহজেই প্রকাশিত হয়। ঈশ্বর জড়-জগতের প্রত্যেক পরমাণুতে আর প্রত্যেক মানুষের মনে আছেন।

ঈশ্বর ও জগতের সম্পর্ক সম্বন্ধে সকল ভক্তের ধারণা বা কল্পনা খুব স্পষ্ট বা সুনির্দিষ্ট নয়। অনেক সময়ে পরস্পরবিরোধী—অন্ততঃ আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী—ধারণা ও কল্পনাও তাঁদের মনে স্থান পেয়ে থাকে। আমাদের ধর্ম-জীবনের উপর এই সব ধারণা ও কল্পনার প্রভাব কি রকম তা স্থির করা এবং দার্শনিক দৃষ্টিতে বিচার করে তাদের মূল্যায়ন করা ধর্ম-দর্শনের কাজ।

2. ঈশ্বরের অতিবর্তিতা বা বিশ্বাতীতভাব (বিশ্বাতীত-ঈশ্বরবাদ)[1] God as transcendent to the world)

ঈশ্বর জগৎ থেকে পৃথক্ ও তাঁর স্থিতি জগতের বাইরে, এই বিশ্বাস আমাদের ধর্ম-বোধের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। দার্শনিক পরিভাষায় ঈশ্বর ও সৃষ্ট জগতের মধ্যে এই পার্থক্য ও দূরত্বকে ঈশ্বরের অতিবর্তিতা (Transcendence) বলা হয়। ঈশ্বর জগতের অতিবর্তী এই মত সত্য হ'লেও ঈশ্বর ও জগতের মধ্যে একটা দৈশিক সম্বন্ধ (spatial relation) আছে, এটা মনে করা অযৌক্তিক হ'বে। কারণ, ঈশ্বর যদি চৈতন্যময় পুরুষ হ'ন তাহ'লে তাঁর সঙ্গে কোনও জড়বস্তুর দৈশিক সম্বন্ধ থাকতে পারে না, অর্থাৎ, কোন একটি জড়বস্তু, যেমন, একটি চেয়ার, যে অর্থে একটি ঘরের বাইরে বা ভিতরে থাকতে পারে সেই অর্থে ঈশ্বর জগতের বাইরে বা ভিতরে থাকতে পারেন না, অথবা, জগৎ ঈশ্বরের বাইরে বা ভিতরে থাকতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বরের অতিবর্তিতাকে জগৎ ও ঈশ্বরের গুণগত বা প্রকৃতিগত পার্থক্য হিসেবেই বুঝতে হ'বে। বিশ্বাতীতঈশ্বরবাদের সমর্থনে একটি প্রধান যুক্তি এই যে, যে জগতের সঙ্গে আমরা পরিচিত তার প্রধান উপাদান হ'ল জড় পদার্থ। এখানে সচেতন জীবও আছে বটে, কিন্তু তাদের চৈতন্য সম্পূর্ণভাবেই জড়বস্তু ও জড়শক্তির উপর নির্ভরশীল। ঈশ্বর চৈতন্যময় বা চৈতন্যস্বরূপ। তাঁর কোন জড়দেহের প্রয়োজন

1 ডাঃ সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য দর্শন—পৃঃ ৩৫০।

নেই। তাঁর ইচ্ছাই জগতের যাবতীয় ঘটনার কারণ। জগৎ দেশ ও কালে বিস্তৃত। দেশ ও কাল ছাড়া আমরা জগৎকে কল্পনাই করতে পারি না, কিন্তু ঈশ্বর দেশ ও কালাতীত। জগৎ বা তার অংশ-বিশেষের জ্ঞানলাভ করতে গেলে যেসব বৌদ্ধিক প্রকারের (categories of the understanding) প্রয়োজন সেগুলিকে ঈশ্বরের প্রতি প্রয়োগ করা যায় না। আমাদের ভাষায় তাঁর স্বরূপ বর্ণনা করা যায় না। সেইজন্য তাঁকে 'অজ্ঞেয়' বলা উচিত।

দ্বিতীয়ত, ঈশ্বরের অতিবর্তিতার সমর্থনে বলা যেতে পারে যে, ঈশ্বর যদি জগতের ভিতরে থাকেন, তাহ'লে তিনি জগতের সকল বস্তুর মধ্যেই থাকবেন—অর্থাৎ, জড়, চৈতন্য, স্থূল, সূক্ষ্ম, বিকারী, অবিকারী, কঠিন, তরল, বায়বীয়, শুভ, অশুভ, পুণ্যাত্মা, পাপাত্মা সকলের মধ্যেই তাঁর প্রকাশ দেখতে পাওয়া যাবে। কিন্তু সেটা কি করে সম্ভব হ'তে পারে? ঈশ্বর যদি বিশ্বগত বা বিশ্বের অন্তর্বর্তী হ'ন তাহ'লে তিনি ক্ষুদ্রতা, নীচতা, কুশ্রীতা, মালিন্য প্রভৃতি দোষে দূষিত হ'বেন। কিন্তু ঈশ্বরকে আমরা কোনও মতেই ক্ষুদ্র, নীচ, কুশ্রী, মলিন, কুক্রিয়াসক্ত বলে ধারণা করতে পারি না।

তৃতীয়ত, ঈশ্বরকে আমরা ইচ্ছা-শক্তি বিশিষ্ট পুরুষ এবং জগতের স্রষ্টা বলে মনে করি। কিন্তু যিনি স্রষ্টা বা নির্মাতা তিনি সৃষ্ট বা নির্মিত বস্তুর ভিতরে থাকতে পারেন না,[1] সুতরাং ঈশ্বর জগতের বাহিরে আছেন।

চতুর্থত, ঈশ্বরের অন্তর্বর্তিতা আমাদের নীতি ও ধর্ম-বোধের বিরোধী। ঈশ্বর জগতের ভিতরে থাকলে তিনি আমাদের মনের ভিতরে আছেন এটাও স্বীকার করতে হ'বে। কিন্তু ঈশ্বর যদি আমাদের মনের মধ্যে থাকেন তাহ'লে আমরা যে ইচ্ছা-শক্তিদ্বারা কাজ করে থাকি, সেটা ঈশ্বরেরই ইচ্ছা-শক্তি বলে স্বীকার করতে হ'বে এবং তাহ'লে আমাদের ইচ্ছার কোনও স্বাতন্ত্র্য থাকতে পারে না। কিন্তু আমরা যদি আমাদের বুদ্ধি অনুযায়ী সৎকর্ম ও অসৎ কর্মের মধ্যে পার্থক্য করে স্বাধীন ইচ্ছানুসারে তাদের একটিকে পছন্দ করতে না পারি তাহ'লে নৈতিক দায়িত্বের কোন অর্থ থাকেনা এবং মানুষ ও জড়বস্তুর মধ্যে কোনও প্রভেদ থাকে না। ধর্ম-বোধের দিক থেকে

---

1 এখানে বিপরীত উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কোন ব্যক্তি একটি বাড়ী তৈরী করে তার ভিতরে থাকতে পারেন। কিন্তু এই উদাহরণ সম্বন্ধে আপত্তি এই যে, বাড়ীর নির্মাতা প্রকৃতপক্ষে শূন্যস্থানে থাকতে পারেন কিন্তু বাড়ীর ভিতরে নয়।

ঈশ্বরের অন্তর্বর্তিতার বিরুদ্ধে আপত্তি এই যে, আমাদের ও আমাদের উপাস্য দেবতার মধ্যে একটা দূরত্ব-বোধ থাকলে তবেই তিনি আমাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তির অধিকারী হ'তে পারেন এবং আমাদের মনে মহৎ প্রেরণার সঞ্চার করতে পারেন। ঈশ্বর ও জগতের মধ্যে একটা পার্থক্যবোধ বিশুদ্ধ, উচ্চ-স্তরের ধর্ম-চেতনার পক্ষে অপরিহার্য। আমাদের উপাস্য দেবতা অসীম, অনন্ত, মহান্, পরম পবিত্র, আমাদের সাধারণ বুদ্ধির অগম্য, চরম রহস্যের আধার, এমন একটা ধারণা আমাদের না থাকলে প্রকৃত ধর্ম-ভাবের স্ফূরণ হয় না এবং আমরা তাঁর কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্ম-সমর্পণ করতে পারি না। যে বস্তু আমাদের চিরপরিচিত, যাকে আমরা প্রতিদিন আমাদের চারদিকে দেখছি তা আমাদের প্রেরণা জোগায় না এবং যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব এইরকম বস্তুতেই সীমাবদ্ধ সেই ঈশ্বর আমাদের ধর্মবোধকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন না।[1] সুতরাং ধর্ম-চেতনার দিক থেকে বিশ্বাতীত-ঈশ্বরবাদই গ্রহণীয়।

য়ুরোপীয় দার্শনিকদের মধ্যে যাঁরা Deist (বিশ্বাতীত-ঈশ্বরবাদী) বলে পরিচিত, যেমন John Toland, Lord Herbert of Cherbury, La Mettrie D' Alember ইত্যাদি, তাঁদের মতে ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্তা। এমন এক সময় ছিল যখন জগতের অস্তিত্ব ছিল না। ঈশ্বর তাঁর বিশেষ ইচ্ছার বলে এক বিশেষ সময়ে এই জগৎকে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির সময়ে ঈশ্বর জগতে যে শক্তি সঞ্চারিত করেছেন সেই শক্তিই কতকগুলি নিয়মানুসারে এই জগৎকে চালিত করছে। ঈশ্বর সাধারণত জগতের কোনও বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন না, তবে জগতের মধ্যে কোন বিশেষ বিপদ উপস্থিত হ'লে মাঝে মাঝে তিনি হস্তক্ষেপ করেন, এবং তখন প্রাকৃতিক নিয়মগুলির ক্রিয়া স্থগিত থাকে। জাগতিক ব্যাপারে ঈশ্বরের এইরকম হস্তক্ষেপকে অতি-প্রাকৃত ঘটনা বা Miracles বলা হয়। সুতরাং এই মতানুসারে ঈশ্বর জগৎকে অতিক্রম করে আছেন। জগৎ ঈশ্বরের সৃষ্ট বা তাঁর উদ্দেশ্য-সাধনের উপায়, কিন্তু ঈশ্বর জগতের মধ্যে নেই।

3. ঈশ্বরের অন্তর্বর্তিতা বা বিশ্বগতভাব (বিশ্বগত-ঈশ্বরবাদ) (God as immanent in the world)।

দ্বিতীয় মতানুসারে ঈশ্বর জগতের ভিতরেই আছেন। এই মতের চরম

1 যাঁরা প্রতিমাপূজা অথবা চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তুর পূজা করেন তারাও এগুলিকে কোন অদৃশ্য শক্তির প্রতীক অথবা বাহক বলে মনে করেন।

আকার হ'ল সর্বেশ্বরবাদ (Pantheism)। জীব ও জড় এই সমস্তই ঈশ্বর (সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম)। য়ুরোপীয় দর্শনে স্পিনোজা (Spinoza) এই মতের প্রধান সমর্থক। ভারতেও উপনিষদগুলির বহু স্থলে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্ম অগ্নি, বায়ু, ক্ষিতি এই সকলের ভিতরে সর্বত্রই আছেন। তিনি মানুষের অন্তরাত্মা, তিনিই মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে চালিত করেন। এই মতের সমর্থনে বলা যেতে পারে যে, ঈশ্বর যদি প্রকৃতই অসীম ও অনন্ত হ'ন তাহ'লে তাঁর বাহিরে কিছুই থাকতে পারে না। যদি কোন সসীম বস্তু তাঁর সত্তার বাহিরে থাকে তাহ'লে সেই বস্তু তাঁকে সীমিত করবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়, তিনি ভিন্ন অপর কোনও বস্তু থাকতে পারে না। ঈশ্বর জগতের অন্তর্বর্তী, অথবা তিনি সর্বভুতে আছেন—একথা বলার অর্থ এই নয় যে, বস্তুগুলির বহিরংশ ঈশ্বর থেকে ভিন্ন। এর অর্থ এই যে, আমরা যে বস্তুকে ক্ষুদ্র, সীমিত, দোষযুক্ত বলে মনে করি, সেটিও ঈশ্বরেরই অংশ। প্রত্যেক বস্তুর ভিতর এবং বাহির—দুইই ভগবৎসত্তার অংশ। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির কাছে এই তত্ত্ব প্রকাশিত হয় না। যে কোনও বস্তুর ভিতরে প্রবেশ করলে, অর্থাৎ তার প্রকৃত স্বরূপের জ্ঞান হ'লে প্রত্যেক জায়গাতেই আমাদের ঈশ্বর-সত্তার উপলব্ধি হয়। ঈশ্বর সর্বভূতে অবস্থান করলে ক্ষুদ্রতা, নীচতা, কুশ্রীতা, মালিন্য প্রভৃতি দোষ ঈশ্বরকে দুষিত করবে এ আপত্তিও অমূলক; কারণ, আমাদের অজ্ঞতা বা অপূর্ণজ্ঞানের জন্যই আমরা জগতে এই সকল দোষ কল্পনা করি। উপযুক্ত সাধনার ফলে যখন আমরা পূর্ণ-জ্ঞান লাভ করব তখন সর্বত্রই এক, নিষ্কলঙ্ক, মঙ্গলময় ঐশীসত্তা উপলব্ধি করতে সক্ষম, হ'ব এবং কোনও ক্ষুদ্রতা, কুশ্রীতা বা মালিন্যের সাক্ষাৎ পাব না। আমাদের পৃথক্ সত্তা বিসর্জন দিয়ে এক সর্বব্যাপী, সর্বানুস্যূত ঐশী সত্তার সঙ্গে আমাদের একাত্মতা উপলব্ধি করাই আমাদের জীবনের চরম সার্থকতা।

কোন কোন দার্শনিকের মতে ঈশ্বর জগতের সর্বভূতে আছেন, এই মতবাদের একমাত্র যৌক্তিক পরিণতি হচ্ছে কেবলাদ্বৈতবাদ (Abstract monism)। এই মতানুসারে একমাত্র ঈশ্বরই আছেন, এই বহু বস্তু-বিশিষ্ট বৈচিত্র্যময় জগতের কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। ঈশ্বর যদি প্রত্যেক বস্তুর ভিতরে থাকেন, অথচ এইসব বস্তুর দোষগুণ তাঁকে স্পর্শ না করে তাহ'লে যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত কেবলমাত্র এই হ'তে পারে যে, এইসব সীমাবদ্ধ বস্তুর কোনও যথার্থ বা পারমার্থিক সত্তা নেই। সুতরাং সর্বেশ্বরবাদকে (Pantheism) যদি বিশ্বগত-ঈশ্বর-বাদ বলে গণ্য করা হয়, তাহ'লে কেবলাদ্বৈতবাদকেও সর্বেশ্বরবাদের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

[শঙ্করের অদ্বৈতবাদকে বিশ্বগত-ঈশ্বরবাদ, না বিশ্বাতীত-ঈশ্বরবাদ বলে গণ্য করা হ'বে, এটি একটি সমস্যা। কারণ, শঙ্কর নির্গুণ নির্বিশেষ ব্রহ্ম এবং সগুণ ব্রহ্মের মধ্যে পার্থক্য করেছেন এবং সগুণ ব্রহ্ম যে মায়ার সৃষ্টি এমন কথাও বলেছেন। নির্গুণ, নির্বিশেষ ব্রহ্ম যদি ঈশ্বর (God) হ'ন তবে ঈশ্বরকে বিশ্বাতীত বা বিশ্বের অতিবর্ত্তী (Transcendent) বলতে হ'বে, কারণ এই ব্রহ্মের সঙ্গে পরিদৃশ্যমান জগতের কোনও সম্পর্কই নেই, এই জগৎ ভ্রমমাত্র, এর কোনও পারমার্থিক সত্তা নেই। আর যদি সগুণ মায়োপাধিক ব্রহ্মই ঈশ্বর হ'ন তাহ'লে ঈশ্বরকে জগতের অন্তর্বর্তী বলতে হ'বে, কারণ জগতের সকল বস্তুই ঈশ্বরের প্রকাশ]

"আমাদের নৈতিক চেতনা ও ধর্ম-সাধনার সঙ্গে সর্বেশ্বরবাদের আবশ্যিক বিরোধ আছে"—দ্বৈতবাদীরা বা বিশ্বাতীত-ঈশ্বরবাদীরা এই বলে সর্বেশ্বরবাদ বা বিশ্বগত-ঈশ্বরবাদের যে প্রতিকূল সমালোচনা করে থাকেন, সর্বেশ্বরবাদীদের মতে তা যুক্তিযুক্ত নয়। এই সমালোচনা দ্বৈতবাদীদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেয় মাত্র। দ্বৈতবাদীরা সততা ও সাধুতার যে আদর্শ আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন সেটা প্রকৃতপক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বা পরমপরুষার্থ নয়। সমাজে প্রচলিত সাধারণ নৈতিক মানদণ্ডানুযায়ী যাঁকে আমরা শ্রেষ্ঠ সাধুপুরুষ বলে মনে করি তাঁর মনেও কুপ্রবৃত্তির প্রভাব আছে, প্রলোভনের আকর্ষণ আছে। তিনি কুপ্রবৃত্তিকে দমন করেছেন, প্রলোভনকে জয় করেছেন, কিন্তু কুপ্রবৃত্তির অস্তিত্বকে একেবারে অস্বীকার করতে পারেন না, বা প্রলোভনকে দমন করার চেষ্টা থেকে নিরত থাকতে পারেন না। তাঁর মনে কর্তব্যবোধ আছে, সৎকর্ম করা উচিত; অসৎকর্ম করা উচিত নয়, এটা তিনি উপলব্ধি করেন। অর্থাৎ, তাঁর মনে এখনও দ্বৈতভাব আছে, তিনি সসীমতার গণ্ডী ছাড়িয়ে যেতে পারেন নি। কিন্তু সর্বেশ্বরবাদীদের মতে যে অবস্থায় পেঁ ছিলে জীব পরমপুরুষার্থ লাভ করে, সেটা এমন একটা অবস্থা যা শুভ এবং অশুভ, এই দুইয়ের পার্থক্যের উর্ধে (Beyond good and evil), যে অবস্থায় কুপ্রবৃত্তির কোনও প্রভাবই নেই, কোনও অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই, কর্তব্য-বুদ্ধির চাপ নেই, কৃত পাপকর্মের জন্য অনুশোচনা নেই। তাঁর মন পরম শান্তিতে পূর্ণ। আবার, ধর্ম-সাধনার যে আকার বা পদ্ধতিকে দ্বৈতবাদীরা প্রশংসা করে থাকেন সর্বেশ্বরবাদীদের দৃষ্টিতে তার মূল্য খুব বেশী নয়। যখন কোন ব্যক্তি উপাস্য-দেবতার কাছে ধন, সম্পত্তি, যশ, জয় ইত্যাদি প্রার্থনা করেন তখন বুঝতে হ'বে যে, তিনি তাঁর জীবভাবের গণ্ডী ছাড়িয়ে যেতে পারেননি, সেইজন্যই 'অল্প' লাভের জন্যই তাঁর আকাঙ্খা, তিনি যে ভূমানন্দ ও অসীম অমৃত-

জীবনের অধিকারী এ উপলব্ধি তাঁর নেই। কিন্তু এই ভূমানন্দ, এই অমৃত-জীবনই আমাদের প্রকৃত লক্ষ্য হওয়া উচিত। বিশ্বাত্মার অদ্বৈত-সত্তার মধ্যে নিজের সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিত্বকে লুপ্ত করে দেওয়াই প্রকৃত ধর্ম-সাধনা এবং সর্বেশ্বরবাদ বা অদ্বৈতবাদ সেই দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

4. ঈশ্বর অতিবর্তী এবং অন্তর্বর্তী দুই-ই (বিশ্বাতীত-ও-বিশ্বগত-ঈশ্বরবাদ) (Concrete Monism)

অনেক দার্শনিকের মতে কিন্তু অতিবর্তিবাদ ও অন্তর্বর্তিবাদ, এই দুই-ই একদেশদর্শী। সর্বোচ্চ তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে এই দুটি মতবাদের সমন্বয় বাঞ্ছনীয়। দ্বৈতাদ্বৈতবাদে ঈশ্বরকে জগতের অতিবর্তী এবং অন্তর্বর্তী দুইই বলা হয়েছে[1]। ঈশ্বর যদি জগতের স্রষ্টিকর্তা হ'ন তাহ'লে তাঁকে জগৎ থেকে পৃথক্ এবং জগতের অতিবর্তী বলে স্বীকার করতে হ'বে। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ স্বয়ংনির্ভর নয়, এর একটি কারণ বা স্রষ্টি-কর্তা প্রয়োজন এবং ঈশ্বরই সেই আদিকারণ বা স্রষ্টি-কর্তা। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর স্রষ্ট জগৎকে অতিক্রম করে আছেন এই সিদ্ধান্তকে যুক্তিযুক্ত বলে স্বীকার করলেও আমাদের মনে রাখতে হ'বে যে, দুটি সসীম জড়-বস্তুর যে সম্বন্ধ ঈশ্বরও জগতের মধ্যে সে ধরনের সম্বন্ধ হ'তে পারে না। দুটি সসীম জড়-বস্তু হয় ভিন্ন হ'বে নতুবা অ-ভিন্ন হ'বে, তাদের মধ্যে একটি হয় অপরটির বাহিরে থাকবে নতুবা ভিতরে থাকবে, কিন্তু ঈশ্বর ও জগৎ পরস্পর থেকে ভিন্ন এবং অ-ভিন্ন দুই-ই, ঈশ্বর জগতের ভিতরেও আছেন আবার বাহিরেও আছেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কোন এক জড়বস্তু যে অর্থে অন্য এক জড়-বস্তুর ভিতরে থাকে ঈশ্বর সে অর্থে জগতের ভিতরে থাকেন না। ঈশ্বর জগৎকে স্রষ্টি করলেও জগৎ তাঁর সত্তার বাহিরে যেতে পারে না, অর্থাৎ ঈশ্বর থেকে স্বতন্ত্র হয়ে থাকতে পারে না, ঈশ্বরের সত্তার অন্তর্ভুক্ত হয়েই থাকে। জগৎ ঈশ্বরের প্রকাশ, এই অর্থেই ঈশ্বর জগতের ভিতরে আছেন। ঈশ্বরের স্রষ্ট জগৎকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে জড়জগৎ ও জীবজগৎ। জড়জগতে আমরা যে শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য, সৌন্দর্য, সুষমা প্রভৃতি লক্ষ্য করি সে সমস্তই হ'ল ঈশ্বরের প্রকাশ। ঈশ্বরের প্রকৃতি জানতে হ'লে আমরা জড়জগতের মাধ্যমে তার খানিকটা ইঙ্গিত পেয়ে থাকি। ভক্ত ও ভাবুক জলে, স্থলে, সাগরে, পর্বতে, ফুলে, ফলে, সর্বত্রই

1 "তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ" ঈশোপনিষদ—৫।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করেন। মানুষের চৈতন্য, বিচার-বুদ্ধি, বিবেক, আদর্শ-প্রীতি প্রভৃতিও ঈশ্বরের প্রকাশ। ঈশ্বরকে যে আমরা সর্বজ্ঞ, ন্যায়-বান, করুণাময়, প্রেমময় বলে বর্ণনা করি তার ইঙ্গিত আমরা পাই মানুষের সদ্‌গুণাবলীর মধ্যে। জড়বস্তু ও আত্ম-সচেতন ব্যক্তির মধ্যে প্রধান ভেদ এই যে, জড়বস্তুদের নিজেদের কোনও স্বতন্ত্র প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য নেই, সচেতন জীবদের জ্ঞানের বিষয় বা ভোগ্য বস্তু হওয়াই যেন তাদের প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য। সুতরাং এরূপ মনে করা যুক্তিসঙ্গত হ'বে যে, জড়বস্তুদের সঙ্গে ঈশ্বরের যে সম্বন্ধ জীবাত্মাদের সঙ্গে তাঁর ঠিক সে ধরনের সম্বন্ধ হ'তে পারে না। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যসাধনে জড়বস্তুগুলি কেবলমাত্র উপকরণ বা উপায় স্বরূপ কাজ করে, কিন্তু আত্ম-সচেতন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন, স্বাধীন ইচ্ছাবিশিষ্ট জীবেরা কেবলমাত্র অপরের প্রয়োজন সাধন করে না, তাদের নিজেদেরই স্বতন্ত্র প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য আছে। সুতরাং ঈশ্বরের প্রয়োজন সাধনে তাদের সচেতন সহযোগিতা আবশ্যক। জড়জগৎ ও জীবজগৎ দুই-ই ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে ঈশ্বরের প্রয়োজন সাধন করে বলে এই দুই জগৎ-ই ঈশ্বরের প্রকাশ।

জগৎ ঈশ্বরের প্রকাশ বটে, কিন্তু আংশিক প্রকাশ। জগৎ ঈশ্বরের পূর্ণ প্রকাশ হ'লে জগতের সর্বত্রই আমরা একই রকম শৃঙ্খলা, সঙ্গতি, সামঞ্জস্য, সৌন্দর্য, সুষমা, সততা, সাধুতা, প্রেম, করুণা ইত্যাদি দেখতাম। কিন্তু জগতে বিশৃঙ্খলা, অসামঞ্জস্য, কুশ্রীতা, অমঙ্গল, অসাধুতা, নীচতা পাপাসক্ততা প্রভৃতিও দেখে থাকি। কিন্তু এই থেকে ঈশ্বর জগতের কোনও কোনও স্থানে আছেন আর কোনও কোনও স্থানে নেই, এরকম সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক হ'বে। ঈশ্বরবাদীরা বলেন যে, অমঙ্গলের মধ্যেই মঙ্গলের ইঙ্গিত আছে। সুতরাং অমঙ্গলও মঙ্গলেরই প্রকাশ। ঈশ্বরকে যদি চরম-সত্তা বলা হয় তাহ'লে জগতে চরমসত্তার প্রকাশের বিভিন্ন মাত্রা (Degrees of Reality) আছে। অর্থাৎ, ঈশ্বরের প্রকাশ কোথাও অল্প পরিমাণে কোথাও অধিক পরিমাণে। জগতে এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে ঈশ্বরের প্রকাশ নেই।

কিন্তু জগতের অন্তর্গত কোন বস্তুই সম্পূর্ণ নির্দোষ বা ত্রুটীহীন নয়। জড়জগতে যে সব বৃহৎ বস্তু আছে তাদের অপেক্ষাও বৃহত্তর বস্তু আমরা কল্পনা করতে পারি, জগতে যে প্রবল শক্তির কাজ দেখি তার অপেক্ষাও প্রবলতর শক্তির কল্পনা করতে পারি। যা বাস্তব জগতে আছে এবং যা সম্ভাবনামাত্র, সমস্তেরই আদিম উৎস ঈশ্বর। সুতরাং ঈশ্বর পরিদৃশ্যমান জড়জগতের ভিতরেও আছেন আবার বাহিরেও আছেন, আবার ঈশ্বর মানুষের মনের

ভিতরে ধীশক্তি, বিবেক, নৈতিক বুদ্ধিরূপে আছেন। কিন্তু মানুষ জগতের অন্তর্ভুক্ত হ'লেও অন্যান্য জড়বস্তু ও মানুষের মধ্যে মৌলিক প্রভেদ আছে। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা আছে এবং সে একটি আদর্শকে নিজের জীবনে রূপায়িত করতে চায়। কিন্তু এই আদর্শকে পূর্ণভাবে নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা তার পক্ষে অসম্ভব। সত্য, শিব ও সুন্দরের একীভূত চরম আদর্শ চিরকালের জন্য ঐশীসত্তায় সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত; কারণ এই আদর্শ ও ঐশীসত্তা অ-ভিন্ন। জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক হয়েও ভিন্ন। পরমাত্মা জীবাত্মার অতিবর্তী। ঈশ্বর ও জগতের সম্বন্ধের এই ব্যাখ্যাই সর্বাপেক্ষা সন্তোষজনক বলে মনে হয়।

5. একেশ্বরবাদ (Monotheism)

ঈশ্বর ও জগতের সম্পর্ক সম্বন্ধে যে মতবাদকে তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ (Concrete Monism) বলা হয়েছে ধর্মতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গীতে তাকেই অনেক সময় একেশ্বরবাদ (Monotheism) বলা হয়। যে মতবাদ অনুসারে ঈশ্বর দুই (দ্বিত্বমূলক ঈশ্বরবাদ) বা বহু (বহুদেববাদ) ন'ন, এক, তাকেই একেশ্বরবাদ বলা উচিত; কিন্তু কখনও কখনও 'একেশ্বরবাদ' শব্দটিকে সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হয়, অর্থাৎ যে মতবাদে ঈশ্বরকে বিশ্বাতীত ও বিশ্বগত দুই-ই বলা হয় তা'কেই একেশ্বরবাদ বলে গণ্য করা হয়।

6. একেশ্বরবাদ, দ্বৈতবাদ সর্বেশ্বরবাদের তুলনামূলক আলোচনা

দ্বৈতবাদ, সর্বেশ্বরবাদ ও একেশ্বরবাদকে তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী এই দুই দিক থেকেই আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথম দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলে প্রধান প্রশ্ন হ'বে—নিরপেক্ষ দার্শনিক বিচারে এই মতবাদগুলির মধ্যে কোনটি সব চাইতে যুক্তিযুক্ত, আর দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলে প্রধান প্রশ্ন হ'বে—এদের মধ্যে কোনটি নৈতিক প্রচেষ্টা এবং ধর্মীয় সাধনার প্রতি সব চাইতে বেশী অনুকূল?

দ্বৈতবাদ অনুসারে জগতে চরমসত্তা দুটি। এই মতবাদের দুটি রূপ। একটি মতানুসারে এই দুটি চরমসত্তা হচ্ছে ঈশ্বর ও জড়দ্রব্য (Matter)। ঈশ্বর চৈতন্যময় পুরুষ, জড়দ্রব্য অচেতন, ঈশ্বর সক্রিয়, জড়দ্রব্য নিষ্ক্রিয়। ঈশ্বর জড়দ্রব্যে গতি সঞ্চারিত করলে তবে জড়দ্রব্য গতিশীল হয়। এই

মতেরও দুটি রূপ আছে। প্রথম মতানুসারে ঈশ্বর এবং জড়দ্রব্য পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ এবং এরা অনন্তকাল ধরেই বর্তমান। দ্বিতীয় মতানুসারে এমন এক সময় ছিল যখন বিশ্বজগৎ কিছুই ছিল না—এমনকি জগতের উপাদান জড়দ্রব্যও ছিল না। এক বিশেষ সময়ে ঈশ্বর জড়পদার্থ অথবা জগৎকে নিছক শূন্য থেকে সৃষ্টি করেছিলেন, অথবা জড়পদার্থকে জগতের রূপ দিয়েছিলেন। দ্বৈতবাদের দ্বিতীয় রূপানুসারে ঈশ্বরের সংখ্যা দুই—একজন মঙ্গলময় এবং অপর একজন তাঁর বিরোধী, সকল অমঙ্গলের আকর। আমরা পূর্বেই দেখেছি, আধুনিক বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিকেরা কেউই ঈশ্বর-দ্বিত্ববাদ সমর্থন করেন না। সুতরাং আমরা এখন দ্বৈতবাদের প্রথম রূপ নিয়েই আলোচনা করব। এই মতানুসারে ঈশ্বর এবং জড়জগৎ সম্পূর্ণ পৃথক্, স্বতন্ত্র ও পরস্পরবিরোধী। কিন্তু ঈশ্বর ও জড়জগৎ সম্পূর্ণ পৃথক্ হ'লে জড়জগৎ ঈশ্বরের এবং জীবাত্মাদের জ্ঞানের বিষয় কি করে হ'তে পারে, অথবা ঈশ্বব কি ভাবে এই জগতের উপর ক্রিয়া করেন, তা বোঝা যায় না। সুতরাং এই দুটিই একটি সাধারণ সত্তার দুটি রূপ, এইরূপ বলা উচিত। কিন্তু জড়দ্রব্য স্বয়ং-প্রতিষ্ঠ হ'তে পারে না। কারণ জড়দ্রব্যের চৈতন্য নেই এবং সে নিজেকে জানে না। কিন্তু ঈশ্বর চৈতন্যময় এবং আত্ম-সচেতন। সুতরাং ঈশ্বর ও জড়দ্রব্য, এ দুইয়ের মধ্যে ঐশীসত্তার প্রাধান্যই স্বীকার করতে হ'বে। অর্থাৎ, ঈশ্বরই মূল সত্তা এবং জড়জগৎ ঈশ্বরের সৃষ্টি, এটাই স্বীকার করতে হ'বে।

7. দ্বৈতবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব

কিন্তু, ঈশ্বর জড়জগৎ সৃষ্টি করেছেন, একথার অর্থ কি? যদি আমরা মনে করি যে, এমন এক সময় ছিল যখন কোন জড়পদার্থ অথবা বৈচিত্র্যময় নানা বস্তুবিশিষ্ট জগৎ আদৌ ছিল না, কিন্তু এক বিশেষ মুহূর্তে ঈশ্বরের মনে সৃষ্টি করবার ইচ্ছা হ'ল এবং তার ফলে এই জগতের জন্ম হ'ল, তাহ'লে এই প্রশ্ন উঠবে যে, ঈশ্বরের মনে ততদিন পর্যন্ত এই ইচ্ছার উদয় হয় নি কেন? কোন বিশেষ ঘটনা বা অবস্থার প্রভাবের ফলে এই ইচ্ছার উদয় হ'ল? ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা তাই থেকে এ প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু একেশ্বরবাদমতে ঈশ্বর ও জগতের মধ্যে একটা শাশ্বত, অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। ঈশ্বরব্যতীত যেমন জগতের কোন সত্তা নেই, তেমনই জগৎ সৃষ্টি না করলে ঈশ্বরের স্বরূপ অর্থাৎ সক্রিয়, আত্ম-সচেতন পুরুষরূপ সম্পূর্ণ-

ভাষে বিকশিত হ'তে পারে না।[1] ঈশ্বর ভেদ-বিহীন নির্বিশেষ ঐক্য ন'ন, বহুরূপ ধারণ করবার প্রবণতা তাঁর স্বভাবগত। সুতরাং এমন কোনও সময় ছিল না যখন জগৎ ছিল না, অথবা এমন সময়ও কখনও আসবে না যখন জগতের অস্তিত্ব থাকবে না। সৃষ্টি কোন ক্ষণিক ঘটনা নয়, ঈশ্বরের পক্ষে এটি একটি শাশ্বত ক্রিয়া।[2] এইভাবে বিচার করলে বোঝা যাবে যে, যাকে সাধারণত সৃষ্টি বলা হয়, তা ঈশ্বরের পক্ষে আত্ম-প্রকাশ। ঈশ্বর ও জগতের সম্বন্ধ কোনও কালিক সম্বন্ধ নয়, চিরন্তন সম্বন্ধ।

৪. একেশ্বরবাদ ও সর্বেশ্বরবাদ

দ্বৈতবাদ যেমন ঈশ্বর ও জগতের মধ্যে ঐকান্তিক পার্থক্য দেখে, সর্বেশ্বরবাদ তেমনই এই দুইয়ের মধ্যে ভেদবর্জিত ঐক্য দেখে। জগৎ ও ঈশ্বর এক, এই মতবাদকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করলে হয় আমরা ঈশ্বরকে অসংখ্য সসীম বস্তুর সমষ্টি বলতে বাধ্য হ'ব, নতুবা ঈশ্বরের ঐক্যকে রক্ষা করবার জন্য সমস্ত সসীম বস্তুর, অর্থাৎ জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে বাধ্য হ'ব। প্রথম বিকল্প স্বীকার করলে সর্বেশ্বরবাদ (Pantheism) স্বভাববাদ (Naturalism) অথবা জড়বাদে (Materialism)এ পরিণত হ'বে, আর দ্বিতীয় বিকল্পটি স্বীকার করলে সর্বেশ্বরবাদ নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদ (Abstract monism) অথবা মায়াবাদ বা জগন্মিথ্যাবাদে (Illusionism or Acosmism) পরিণত হয়। কিন্তু এই দুই প্রকার মতের বিরুদ্ধেই বহু আপত্তি উঠতে পারে। দ্বৈতমূলক ঈশ্বরবাদ ও সর্বেশ্বরবাদ এই উভয়েরই বিরুদ্ধে একেশ্বরবাদীদের প্রধান আপত্তি এই যে, এই দুটি মতবাদ "নির্বিশেষ ঐক্যের নিয়মে" (The Law of Abstract Identity) বিশ্বাস করে। সাধারণ ন্যায়শাস্ত্রমতে "যে বস্তু যাহা তাহা কেবলমাত্র তাহাই" (A thing is what it is. A=A)—এই সার্বিক নিয়মই সকল বিষয়ে সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এরই পরিপূরক নিয়ম হ'ল "নির্বিশেষ বিরোধ-বাধক নিয়ম" (The Abstract Law of Contradiction)। এই নিয়মানুসারে একই বস্তু সম্বন্ধে দুটি বিরোধী ধারণা বা উক্তি সত্য হ'তে পারে না। যদি একটি সত্য হয়, অপরটি নিশ্চয়ই মিথ্যা হ'বে। যেমন, কোন কাগজ সাদা হ'লে সেটা কালো হ'তে পারে না। অথবা, "এই কাগজটি সাদা" এবং "এই

1 "Just as the world would not be a world without God, similarly God would not be God without a world."—Hegel.

2. Creation is not an occasional but an eternal act of God.

কাগজটি কালো"—এই দুটি উক্তিই একই সময়ে সত্য হ'তে পারে না। একটি সত্য হ'লে অপরটি নিশ্চয়ই মিথ্যা হ'বে। "এই কাগজটি সাদা" এবং " এই কাগজটি কালো"—এই দুটি উক্তির মধ্যে প্রথমটি সত্য হ'লে দ্বিতীয়টি নিশ্চয়ই মিথ্যা হ'বে এবং দ্বিতীয়টি সত্য হ'লে প্রথমটি নিশ্চয়ই মিথ্যা হ'বে। জগতের তত্ত্বনির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই দুটি নিয়মকে একসঙ্গে প্রয়োগ করলে আমরা বলতে বাধ্য যে, যা এক তা কখনও দুই বা অনেক হ'তে পারে না। একই জিনিষ একসঙ্গে স্থির এবং গতিশীল হ'তে পারে না, চৈতন্য কখনও জড়বস্তু হ'তে পারে না, জড়বস্তু কখনও চৈতন্য হ'তে পারে না, জগৎ ঈশ্বর হ'তে পারে না, বা ঈশ্বর জগৎ হ'তে পারেন না। একেশ্বরবাদীদের মতে কিন্তু "সবিশেষ ঐক্যের নিয়ম" (The Law of Concrete Identity) এবং "সবিশেষ বিরোধ-বাধক নিয়ম" (The Law of Concrete Contradiction)ই সত্য এবং এই দুটি নিয়মানুসারেই প্রত্যেক বস্তু নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে থাকে। ঐক্যের মধ্যেই ভেদ নিহিত আছে এবং ভেদমাত্রেরই অন্তরালে ঐক্য আছে। কোন বস্তুর সত্তাই তার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নেই, সেই গণ্ডী ছাড়িয়ে আছে, আবার, অন্য বস্তুর সত্তা এর মধ্যে আছে। কোন পদার্থ এক হ'লেও দুই বা বহু, অথবা এটা এক বলেই দুই বা বহু, আবার দুই বা ততোধিক পদার্থ দুই বা বহু হ'লেও এক, অথবা দুই বা বহু বলেই এক। ভেদরহিত ঐক্য বা ঐক্যবর্জিত বহুর সাক্ষাৎ কোথাও পাওয়া যায় না। নির্বিশেষ ঐক্য বা ঐক্যবর্জিত বিভেদ আমরা চিন্তাও করতে পারি না। আবার দুটি বাক্য পরস্পর বিরোধী বলেই যে তাদের মধ্যে একটি সত্য হ'লে অপরটি নিছক মিথ্যা হ'বে এমন নয়। দুটিই আংশিকভাবে সত্য হ'তে পারে, অথবা অবশ্যই হ'বে। এই দুটি আংশিক সত্যের (Partial truths) সমন্বয় করলে আমরা এক উচ্চতর সত্যের সন্ধান পাই। দুটি বস্তুর প্রকৃতি পরস্পর বিরোধী হ'লেই যে তাদের মধ্যে কোনও ঐক্য থাকবে না এমন নয়, বরং তাদের মধ্যে ঐক্য না থাকলে তাদের প্রকৃতিতে বিরোধিতা থাকতে পারত না। বহু আংশিক সত্যের সমন্বয় করলে যে সত্য পাওয়া যায় তা-ই পূর্ণ সত্য (Truth is the Whole)। সসীম মানুষ তার জীবনে পূর্ণ সত্যে পেঁাছতে পারে না, কিন্তু পূর্ণ সত্যের আদর্শ তাকে সত্যানুসন্ধানে প্রেরণা দিয়ে থাকে। পরব্রহ্ম-বাদীদের (Absolutists) মতে দ্বৈতমূলক ঈশ্বরবাদ (Dualistic Theism) সর্বেশ্বরবাদ (Pantheism) এবং কেবলাদ্বৈতবাদ বা নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ (Abstract Monism) নির্বিশেষ ঐক্য-নিয়ম এবং নির্বিশেষ বিরোধ-বাধক নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে প্রত্যেকটিই আংশিক সত্য। পূর্ণ সত্যে

পৌঁছতে হ'লে এই তিনটি মতের সমন্বয়-সাধনের দরকার। দ্বৈতাদ্বৈতবাদে (Concrete Monism) সেই সমন্বয়-সাধন করা হয়েছে। জগৎ ঈশ্বর থেকে ভিন্ন হয়েও অ-ভিন্ন। ঈশ্বর জগতের অন্তর্বর্তী হয়েও অতিবর্তী।

সুতরাং, তত্ত্ববিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী (Metaphysical point of view) থেকে বিচার করলে দ্বৈতাদ্বৈতবাদী একেশ্বরবাদ Monotheism or Panentheism) কেই অপর মতবাদগুলি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে সিদ্ধান্ত করতে হ'বে। নৈতিক উন্নতি ও ধর্ম-সাধনার দিক থেকেও একেশ্বরবাদই শ্রেষ্ঠ। মানুষের ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য আর একেশ্বরবাদ, এই দুইয়ের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই। সত্য, শিব ও সুন্দরের যে সব শ্রেষ্ঠ আদর্শ মানুষকে নৈতিক উন্নতির পথে প্রেরণা দেয়, সেগুলি যে নিছক কাল্পনিক নয়, বরং ঈশ্বরে সেগুলি চিরকাল রূপায়িত হয়ে আছে, এই বিশ্বাস তার নৈতিক চেষ্টায় দৃঢ়তা আনে, মানসিক দুর্বলতা, বাহ্য পরিবেশের প্রতিকূলতা, সাময়িক বিফলতা তাকে নিরস্ত বা হতাশ করতে পারে না। আবার একেশ্বরবাদ ধর্ম-জীবনেরও অনুকূল। একেশ্বরবাদ-মতে পরব্রহ্ম ও ঈশ্বর অ-ভিন্ন। ঈশ্বর ও মানবাত্মা ভিন্ন এবং অ-ভিন্ন দুইই। সুতরাং একদিকে যেমন ঈশ্বর এই অসংখ্য ত্রুটী-বিচ্যুতিপূর্ণ, কুশ্রী, মলিন, পাপপঙ্কিল জগৎ থেকে বহুদূরে, তেমনই আবাব অন্তর্যামীরূপে তিনি আমাদের অন্তরে। সুতরাং যেমন ঈশ্বরের পরমপবিত্রতা ও অতুলনীয় মহিমা মনে রেখে তাঁর উপাসনা করতে পারি, তাঁর কাছে আত্ম-সমর্পণ করতে পারি, তাঁর করুণা ভিক্ষা করতে পারি, তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য, তাঁর মত হওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবার চেষ্টা করতে পারি, তেমনই আবার ঈশ্বর আমাদের অন্তরাত্মা, আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে অ-ভিন্ন, এইকথা মনে রেখে আত্ম-বিশ্বাস লাভ করতে পারি।

নির্বাচিত পুস্তক-তালিকা

1. Galloway—Philosophy of Religion.
2. Martineau—Study of Religion. Vol. II.
3. Pringle-Pattison—The Idea of God., Lecture XIII.

একাদশ অধ্যায়

পরমাত্মা ও জীবাত্মা

(God and the Finite self)

1. জড়বস্তু ও মানবাত্মা (Matter and the Human soul)

জড়বস্তু ও মানুষের মধ্যে প্রধান প্রভেদ এই যে, জড়বস্তু অচেতন আর মানুষ চৈতন্য-বিশিষ্ট। মানুষের অহং-বোধ (self-consciousness) আছে, অর্থাৎ, যে-কোন মানুষ নিজেকে 'আমি' বলে উল্লেখ করতে পারে আর অন্য বস্তু থেকে নিজেকে আলাদা করতে পারে। জড়-বস্তুর এ ক্ষমতা নেই। একটি জড়বস্তু বহু অংশের সমষ্টিমাত্র—এর ঐক্য কোন দর্শকের কাছেই পরিস্ফুট, এর নিজের কোন ঐক্য-বোধ নেই। অপরপক্ষে, প্রত্যেক মানুষের ঐক্য তার নিজের অনুভবগত, সে নিজেকে জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তারূপে অনুভব করে। কোন মানুষের চৈতন্য বা জ্ঞান একই সঙ্গে বাহ্য বস্তুকে এবং নিজেকে প্রকাশিত করে। আমাদের সমস্ত চিন্তা, চেষ্টা, সঙ্কল্প, সুখ দুঃখানুভূতি ও ভাবাবেগের সঙ্গে ওতঃপ্রোত-ভাবে জড়িত আছে এই একটি অনুভব, "আমি আছি"। দার্শনিক দেকার্তের মতে "আমি চিন্তা করছি, অতএব আমি আছি"—এই জ্ঞান থেকেই সমস্ত দার্শনিক আলোচনা আরম্ভ করা সঙ্গত। আমরা প্রত্যেকেই "আমি" বলতে যে বস্তুকে বুঝি তাকেই আমরা 'আত্মা' বলে থাকি। জ্ঞান বা চৈতন্যের মাধ্যমে আত্মা নিজেকে প্রকাশ করে। আত্মার যদি চৈতন্য না থাকত তাহ'লে আত্মার কোন প্রকাশ থাকত না।[1]

আমরা প্রত্যেকেই এক একটি আলাদা আত্মা। একটি বিশেষ মনুষ্য-দেহের সঙ্গে যুক্ত একটি আত্মাকে জীবাত্মা বলা হয়। মানুষের মত ইতর-প্রাণীদেরও আত্মা আছে কিনা, এ সম্বন্ধে দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ

---

1 পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা সাধারণত মন ও আত্মার মূলগত প্রভেদ স্বীকার করেন নি। তাঁদের মধ্যে যাঁরা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন তাঁদের মতে মন সংবেদন, ধারণা, চিন্তা, ভাবাবেগ, ইচ্ছা, প্রযত্ন প্রভৃতি কতকগুলি চেতন ক্রিয়ার সমষ্টি, এবং যে স্থায়ী দ্রব্য এদের পিছনে থেকে এদের ঐক্যবদ্ধ করে সেইটি হ'ল আত্মা। আত্মা ও মন একই পদার্থের দুটি রূপ।

আছে। আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা ইতর প্রাণীদের আত্মা আছে, একথা স্বীকার করেন না। ভারতীয় দার্শনিকেরা ইতর প্রাণীদের আত্মা স্বীকার করেন এবং এটাও বিশ্বাস করেন যে, কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর সে, অর্থাৎ তার আত্মা, ইতর প্রাণীদেহেও জন্ম নিতে পারে। কিন্তু বস্তুত যখন তাঁরা জীবাত্মা সম্বন্ধে আলোচনা করেন তখন তাঁরা কেবলমাত্র মানুষের আত্মা সম্বন্ধেই চিন্তা করেন। এই জীবাত্মার স্বরূপ কি? দেহের সঙ্গে এই আত্মার সম্বন্ধ কি? এই সব প্রশ্ন সম্বন্ধে বিভিন্ন দার্শনিকের বিভিন্ন মত আছে। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, আমরা বিশ্বাস করি যে, আমাদের আত্মা আমাদের দেহে বাস করে এবং একে চালিত করে। একটি আত্মার একই সময়ে একটি দেহ এবং একটি দেহের একটি আত্মা। যাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী তাঁদের মতে ঈশ্বরও একটি আত্মা। তিনিও স্ব-চেতন ও সক্রিয়। তবে জীবাত্মার জ্ঞান, ক্রিয়া-ক্ষমতা প্রভৃতি সীমাবদ্ধ, ঈশ্বরের জ্ঞান ও ক্রিয়া-ক্ষমতার কোন সীমা নেই। তিনি স্বয়ং-সৎ, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, দেশ-কালের অতীত। সেই জন্যই ঈশ্বরকে পরমাত্মা বলা হয়।

2. জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্পর্ক[1] (Relation between the finite self and God)

জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ কি? সহজ বুদ্ধিতে মনে হয় যে, পরমাত্মা আমাদের বাহিরের কোন বস্তু এবং তাঁর সহিত একটি জীবাত্মার সম্বন্ধ দুটি পৃথক্ স্বতন্ত্র সত্তার সম্বন্ধ। পরমাত্মা আমাদের স্রষ্টা, কিন্তু সৃষ্টির পর আমরা পরমাত্মা থেকে পৃথক্। পরমাত্মা ও আমাদের মধ্যে উপাস্য-উপাসক, নিয়ন্তা-নিয়ন্ত্রিত, শাসক-শাসিতের সম্বন্ধ। ভক্তেরা তাঁকে পিতা, মাতা, সখা, প্রেমিক ইত্যাদি নানাভাবে কল্পনা করে তাঁর উপাসনা বা সেবা করে শান্তি ও আনন্দলাভ করে থাকেন এবং সকল রকম বিপদ, দুঃখ, দুর্দশা, পাপতাপ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য তাঁর করুণা ভিক্ষা করেন। কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিরা জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধকে আরও গভীরভাবে অনুধাবন করার প্রয়োজন বোধ করেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে মনে করেন যে জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই যখন চৈতন্যবিশিষ্ট তখন এ দুইয়ের সম্বন্ধ কেবলমাত্র বাহ্যসম্বন্ধ (External relation) হ'তে পারে না। উভয়ের অস্তিত্বই যখন চৈতন্য-

1 অপর একটি অধ্যায়ে ঈশ্বর ও জগতের সম্পর্ক সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাতের আলোচনা করা হয়েছে।

মূলক তখন তাদের সম্বন্ধ নিশ্চয়ই আন্তরিক সম্বন্ধ (Internal relation) হ'বে। পরমাত্মা যদি অসীম হ'ন তাহ'লে জীবাত্মা তাঁর বাহিরের কোন বস্তু হ'লে, অর্থাৎ কোন পৃথক্ স্বতন্ত্র বস্তু হ'লে, পরমাত্মার জ্ঞান ও শক্তি সীমিত বা সঙ্কুচিত হ'বে। অর্থাৎ, পরমাত্মার অসীমতা এবং জীবাত্মার স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য পরস্পর-বিরোধী। সুতরাং পরমাত্মাকে অসীম ও অনন্ত বলে স্বীকার করলে জীবাত্মার স্থান যে পরমাত্মার সত্তার মধ্যেই, অর্থাৎ জীবাত্মার প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক ইচ্ছা, প্রত্যেক সঙ্কল্প যে পরমাত্মার জ্ঞান ও ইচ্ছার অন্তর্ভুক্ত, এটা স্বীকার করতে হ'বে। কিন্তু অপরপক্ষে, জীবাত্মার স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীন ইচ্ছা অন্তত কিছু পরিমাণে না থাকলে তার নৈতিক বা ধর্ম-জীবনের কোনও সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং দার্শনিকের দৃষ্টিতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্পর্কের স্বরূপ বিচার করে দেখতে হ'বে এবং সেই সম্বন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে জীবাত্মার ধর্ম-জীবন ও নৈতিকজীবনের মূল্য নির্ণয় করতে হ'বে।

3. জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্পর্ক সম্বন্ধে বিভিন্ন মত

জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্পর্ক সম্বন্ধে কয়েকটি দার্শনিক মতবাদ প্রচলিত আছে। তাদের মধ্যে দ্বৈতবাদ (Dualism), কেবলাদ্বৈতবাদ (Abstract Monism) ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ (Concrete Monism or Qualified Monism) প্রধান।

(i) দ্বৈতবাদ (Dualism)

দ্বৈতবাদীরা বলেন, পরমাত্মা বা ঈশ্বর অসীম, অনন্ত, দেশকালাতীত, চৈতন্যময় পুরুষ (Person)। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও সকল কল্যাণ-গুণের আধার। তিনি জীবাত্মাগুলিকে তাঁর কোন গূঢ় উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং জীবাত্মা পরমাত্মার মত স্বয়ং-সৎ বস্তু নয়, সে তার সত্তার জন্য পরমেশ্বরের উপর নির্ভরশীল সৃষ্ট জীব। কিন্তু সৃষ্ট হ'বার পর জীবাত্মা কিছু স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী হয়। প্রত্যেক জীবাত্মারই "আমি একজন সচেতন পুরুষ (ব্যক্তি)"—এইরকম অনুভব হয়ে থাকে। "আমার চৈতন্য অপর এক চৈতন্যের অংশ বা আমার ইচ্ছা অপর কোনও ব্যক্তির ইচ্ছা"—এরকম কেউ অনুভব করে না।[1]

---

1 'আমি অপরের জ্ঞান বা চিন্তাকে অনুসরণ করছি, অথবা অন্যের ইচ্ছাদ্বারা আমার ইচ্ছা চালিত হচ্ছে', এরকম অনুভব অবশ্য সকলেরই হ'তে পারে।

রাম, যদু, হরি প্রভৃতি প্রত্যেকেই নিজেকে এক-একটি পৃথক্ ব্যক্তি বলে মনে করে। এইসব ব্যক্তির সংবেদন, চিন্তা, ভাবাবেগ প্রভৃতির মধ্যে সাদৃশ্য থাকতে পারে, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির চিন্তার অর্থ বুঝতে পারে, একের সুখ-দুঃখে অন্য এক ব্যক্তির সহানুভূতি থাকতে পারে, কিন্তু একের সংবেদন বা চিন্তা বা ভাবাবেগ অপরের সংবেদন বা চিন্তা বা ভাবাবেগের সঙ্গে অভিন্ন হ'তে পারে না। প্রত্যেক জীবাত্মারই একটা নিজস্ব দেহ আছে, এবং তার সমস্ত জ্ঞান-ক্রিয়াই এই দেহের মাধ্যমে ঘটে। সুতরাং এক ব্যক্তির চেতনা অন্য যে কোনও ব্যক্তির চেতনা থেকে ভিন্ন হ'তে বাধ্য। আর ব্যক্তি-চৈতন্য যে পরমাত্মা-চৈতন্য থেকে অবশ্যই পৃথক্ হ'বে তা সহজেই বোঝা যায়। পরমাত্মা সর্বজ্ঞ। তাঁর অজ্ঞতা বা ভ্রমের সম্ভাবনা-মাত্র নেই। অপরপক্ষে, জীবমাত্রেরই জ্ঞান সীমিত ও ভ্রান্তিপূর্ণ। পরমাত্মা সর্ব-শক্তিমান, জীবের শক্তি অল্প, পরমাত্মা নিত্যশুদ্ধ, পরমপবিত্র, জীব রিপু, কামনা ও বাসনার দাস। সুতরাং পরমাত্মা ও জীবাত্মা কখনও সর্বাংশে অথবা কোনও অংশেই অ-ভিন্ন হ'তে পারে না। আমাদের ধর্ম-চেতনাও এই পরমাত্মা-জীবাত্মার দ্বৈতভাবের সমর্থক। কোন ব্যক্তি যখন দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে, যখন তার কোন সহায় সম্বল থাকে না, তখন সে এক করুণাময় পুরুষের কাছে আত্ম-নিবেদন করে; যখন সে চরম বিপদের সম্মুখীন হয়, নিজের শক্তির উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে, তখন সে এক সর্ব-শক্তিমান পুরুষের আশ্রয় ভিক্ষা করে; পাপকর্মের অনুশোচনায় যখন তার অন্তর পীড়িত হয় তখন এক নিষ্পাপ পরমপবিত্র পুরুষের সান্নিধ্য একান্ত প্রার্থনীয় হয়ে ওঠে। তাই ধর্ম-জীবন ও নৈতিক জীবনের জন্য জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ-বুদ্ধি অপরিহার্য।

(ii) কেবলাদ্বৈতবাদ (Abstract Monism)

অদ্বৈতবাদী দার্শনিকদের মতে কিন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ-বুদ্ধি তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে চরম সত্যের পরিচয় দেয় না। জীবাত্মা পরমাত্মা থেকে একান্ত ভিন্ন হ'লে জীবাত্মার পক্ষে পরমাত্মার জ্ঞানের কোনও সম্ভাবনা থাকত না। যে জীব একান্তভাবে সীমাবদ্ধ তার পক্ষে কোন অসীম সত্তার কিছুমাত্র পরিচয় পাওয়াও সম্ভব নয়। সসীম জীবাত্মার সত্তা পরমাত্মার সত্তার মধ্যেই হ'তে পারে বাহিরে নয়। একমাত্র পরমাত্মা বা ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোনও বস্তুর বা আত্মার স্বাধীন, স্ব-তন্ত্র সত্তা থাকতে পারে না। এই অদ্বৈত-মত প্রধানত দুরকমের হয়ে থাকে। প্রথম মতানুসারে পরমাত্মা বা ঈশ্বরই একমাত্র সদ্বস্তু, জীবাত্মার কোন সত্তাই নেই। আমি যে

নিজেকে ঈশ্বর থেকে পৃথক্ বলে বোধ করি, সে আমার ভ্রমমাত্র। আর দ্বিতীয় মতে জীবাত্মা ঈশ্বরের অংশমাত্র। সে সম্পূর্ণ স্বাধীন বা স্বতন্ত্র নয়, কিন্তু তার প্রকৃত সত্তা আছে। প্রথম মতটিকে সাধারণত কেবলাদ্বৈতবাদ (Abstract or Unqualified Monism) এবং দ্বিতীয় মতটিকে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ অথবা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ (Concrete Monism or Qualified Monism) বলা হয়। কেবলাদ্বৈতবাদীদের মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। প্রখ্যাত একত্ববাদী দার্শনিক স্পিনোজা বলেন যে, চরমসত্তা একটিই ; একে তিনি দ্রব্য (Substance) বলেছেন। এই দ্রব্যই ঈশ্বর। তিনি সত্তামাত্র। তিনি চৈতন্য (Thought) এবং বিস্তৃতি (Extension)-র মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেন। সকল সসীম বস্তু ও জীব ঈশ্বরের বিকার বা পরিণাম (Modes)-মাত্র। তাদের নিজেদের কোনও সত্তা নেই। ঈশ্বরের সত্তাই তাদের সত্তা। জীব-সত্তার দুটি দিক আছে—মন বা আত্মা ও দেহ। মানুষের মন বা আত্মা চৈতন্যরূপী ঈশ্বরের বিকার বা পরিণাম এবং তার দেহ বিস্তৃতিরূপী ঈশ্বরের পরিণাম। মানুষের জ্ঞান নিম্নস্তরে থাকলে সে নিজেকে সসীম, পরিবর্তনশীল বস্তু বলে মনে করে এবং জগতের সকল ব্যাপারকে নিজের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে। সে নিজের ঈপ্সিত বস্তু লাভ করে সুখে প্রফুল্ল হয় এবং দুঃখে বিপদে অভিভূত হয়। কিন্তু সে যখন চরম জ্ঞান বা প্রজ্ঞা (Intuitive knowledge) লাভ করে তখন সে জগৎকে এক অসীম, অনন্ত কালাতীত সত্তার প্রকাশরূপে (Sub Specie Aeternitatis) দেখতে সক্ষম হয়, এবং প্রত্যেক বস্তুর সঙ্গে প্রত্যেক বস্তুরই যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে এবং প্রত্যেক বস্তুই যে 'দ্রব্য' বা ঈশ্বরের পরিণাম, এটা উপলব্ধি করে। তখন জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ-বুদ্ধি লুপ্ত হয়ে যায়। ভারতীয় অদ্বৈতবেদান্তে বলা হয়েছে যে, জগতের চরমসত্তা এক ও অদ্বিতীয় চৈতন্যস্বরূপ। জীবাত্মা ও ব্রহ্মে বাস্তবিক কোনও ভেদ নেই। শঙ্কর তাঁর কেবলাদ্বৈতবাদ ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, এক, অদ্বিতীয় শুদ্ধ-চৈতন্যই চরমসত্তা। এই শুদ্ধচৈতন্যই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম থেকে পৃথক্ বলে আমরা যা কিছু প্রত্যক্ষ করি সে সমস্তই মায়ামাত্র—জীবের অজ্ঞান বা অবিদ্যা-প্রসূত। জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ কল্পিত। বেদান্তবাক্যের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের ফলে যখন জীবাত্মার তত্ত্বজ্ঞান হয় তখন সে নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে। জীবাত্মা প্রকৃতপক্ষে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত, কিন্তু অবিদ্যার জন্য নিজেকে বদ্ধ বলে মনে করে। এই ভ্রমের সমাপ্তিতেই মুক্তি। য়ুরোপীয় দর্শনে ব্র্যাড্‌লে (F. H. Bradley), বোসাঙ্কোয়েট (B. Bosanquet) প্রভৃতি অধ্যাত্মবাদীদের মতবাদও অনেকটা এইরূপ।

[শঙ্কর নির্গুণ, নির্বিশেষ ব্রহ্ম (The Absolute) এবং সগুণ-ব্রহ্ম—এই দুটিকে পৃথক্ করেছেন এবং সগুণ-ব্রহ্মকেই ঈশ্বর বলেছেন। ব্রহ্ম স্বরূপত নির্গুণ, নির্বিশেষ, অকর্তা হ'লেও আমরা অজ্ঞানবশত এই ব্রহ্মকে জগতের স্রষ্টা ও পালনকর্তা বলে মনে করি। সগুণ-ব্রহ্ম বা ঈশ্বর নির্গুণ ব্রহ্মের প্রাতিভাসিক রূপমাত্র। তাঁর সত্তা ব্যবহারিক সত্তা, পারমার্থিক সত্তা নয়। পরব্রহ্ম (The Absolute)-কে ঈশ্বররূপে কল্পনা করে আমরা তাঁর পূজা, উপাসনা ইত্যাদি করি এবং এইজন্য ঈশ্বর ও জীবাত্মার ভেদবুদ্ধি থাকা আবশ্যক। সুতরাং "শঙ্করের মতে ঈশ্বর ও জীবের সম্পর্ক কি ?" —এই প্রশ্নের উত্তরে বলতে হ'বে যে, অন্য ঈশ্বরবাদীদের মত শঙ্করও দ্বৈত-বাদী, অর্থাৎ তিনি ঈশ্বর ও জীবাত্মার ভেদ মানেন, কিন্তু যদি একমাত্র পরব্রহ্মের চরমসত্তা আছে বলে তাঁকেই ঈশ্বর বলা হয়, তাহ'লে বলতে হ'বে যে, ঈশ্বর ও জীবাত্মা অ-ভিন্ন, পারমার্থিক দৃষ্টিতে এই দুইয়ের মধ্যে কোনও ভেদ নেই।]

(iii) দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ (Concrete Monism or Qualified Monism)

দ্বৈতাদ্বৈতবাদী বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীদের মতে জীবাত্মা পরমাত্মা বা ঈশ্বর থেকে ভিন্ন এবং অ-ভিন্ন দুই-ই। এই দুইয়ের মধ্যে ভেদ যেমন আছে, অভেদও তেমনই আছে। এঁদের মতে এক ভিন্ন যেমন বহুর অস্তিত্ব অসম্ভব, ঠিক তেমনই বহু ভিন্ন একের অস্তিত্ব অসম্ভব। অসীম চৈতন্যময় সত্তার স্বভাবই হ'ল বহুরূপে আত্ম-প্রকাশ করা। এক অদ্বিতীয় চেতনসত্তা নিজেকে বিভক্ত করে অসংখ্য কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে আবির্ভূত হ'ন বা আত্ম-প্রকাশ করেন—এটাই হ'ল চরম সত্য। এই অসীম চেতন-সত্তাই পরমাত্মা বা ঈশ্বর। আর ঈশ্বরের এই সকল অসংখ্য অংশই সসীম জীবাত্মাসমূহ। কোন জড়বস্তু যেমন তার অংশগুলির যোগফল বা গাণিতিক সমষ্টি, ঈশ্বর অবশ্য সে অর্থে জীবদের যোগফল বা সমষ্টি ন'ন। জীবাত্মাকে ঈশ্বরের অংশ বলার অর্থ এই যে, জীবাত্মা ঈশ্বরের এক বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গী (Unique appearance or mode of re-production)। কোন জীববিশেষ পরমাত্মার পরিপূর্ণ প্রকাশ নয়—প্রত্যেক জীবই ঐশীশক্তি ও বিভূতির আংশিক প্রকাশ। এইখানেই পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার পার্থক্য। কিন্তু জীবাত্মার এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যা থেকে বোঝা যায় যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা মূলত এক। ঈশ্বর ও জীব দুইয়েরই চৈতন্য আছে। জীব নিজেকে

এক সসীম ব্যক্তি হিসেবে জানে এবং অন্য জীব থেকে নিজের পার্থক্য অনুভব করে বটে, কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তার নিজের জীবনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে অসীমের দিকে অগ্রসর হওয়ার, পরিপূর্ণতা লাভের চেষ্টা করার আকুল আগ্রহ দেখা যায়। মানুষ নিজের বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট নয়। তার আকাঙ্ক্ষা বিরাট, আশা সুদূরপ্রসারী। তার জ্ঞান ও শক্তি সীমিত, কিন্তু প্রতিক্ষণেই সেই সীমিত জ্ঞান বা শক্তিকে অতিক্রম করার চেষ্টা দেখা যায়। সে পদে পদে ভ্রম করে, কিন্তু সেই ভ্রম সংশোধনের প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করে, সে দুষ্কর্ম করে কিন্তু অনুশোচনাও করে আর তার নিজজীবনে এক চরম পরিপূর্ণতার আদর্শ রূপায়িত করার চেষ্টা করে। মানুষ তার সত্তার সসীম গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। সে যে মুহূর্তে তার সসীমতা উপলব্ধি করে ঠিক সেই সময়েই তার অসীমতাও উপলব্ধি করে। (এইজন্যই কোন কোন দার্শনিক বলেন "To know a limit is to transcend it"—"সীমা সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার অর্থই হ'ল সীমাকে অতিক্রম করা")। আত্ম-সচেতন জীব যে এক বিশ্বাত্মার অংশ, তার এই বৈশিষ্ট্যই সেই ইঙ্গিত বহন করে। আবার, এক জীব অন্য জীব থেকে নিজেকে পৃথক্ বলে অনুভব করে, অন্যের সংবেদন, চিন্তা, ভাবাবেগ প্রভৃতি কখনও আত্মসাৎ করতে পারে না, এটা যেমন সত্য, আত্ম-সচেতন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীবদের মধ্যে এক গভীর ঐক্য আছে, এটাও ঠিক তেমনই সত্য। এক ব্যক্তি অপরের চিন্তার অর্থ বুঝতে পারে, একজনের ভাবাবেগ বহুজনের মনে ঠিক একরূপ ভাবাবেগ সৃষ্টি করতে পারে, একই আদর্শ বহুলোককে একই রকম কর্মে প্রেরণা দিতে পারে। এইজন্যই বহুব্যক্তির পক্ষে একত্র হয়ে সমাজ-জীবন যাপন করা সম্ভব হয়। অর্থাৎ, আত্ম-সচেতন জীবদের জীবনে কোন কোন বিষয়ে পার্থক্য থাকলেও তাদের মূলসত্তা যে একই এটাই বিশ্বাস করতে হ'বে। এই মূলসত্তাই ঈশ্বর বা পরমাত্মা। ঈশ্বর ও মানবাত্মার মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ। উপনিষদের বহু জায়গায় এই মত প্রচারিত এবং ব্যাখ্যাত হয়েছে। বৈষ্ণব দার্শনিক রামানুজ এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মই চরমসত্তা, এই মত প্রচার করলেও, তিনি ব্রহ্মে স্বগত ভেদ স্বীকার করেন। অর্থাৎ, তাঁর মতে ব্রহ্মের সমজাতীয় বা বিজাতীয় অন্য কোন স্বতন্ত্র বস্তুর অস্তিত্ব না থাক্‌লেও তাঁর অভ্যন্তরেই অচিৎ বা জড় দ্রব্যের এবং চিৎ বা সসীম জীবাত্মার যথার্থ সত্তা আছে। এইজন্যই রামানুজের মতবাদকে বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ বলা হয়। ব্রহ্ম ভেদযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এক—রামানুজ তাঁর এই মতবাদের দৃষ্টিকোণ থেকেই ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি শঙ্করের

অদ্বৈতবাদ ও ঐ মতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ মায়াবাদকে গ্রহণ করেন নি। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে হেগেল (Hegel) ও তাঁর অনুবর্তীরা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সমর্থক। Hegel বলেন যে, যে চরম সত্বস্ত কেবলমাত্রই অ-সীম অর্থাৎ সীমা-হীন, সসীম বস্তুর সঙ্গে যার কোনও সম্পর্ক নেই তা অ-পূর্ণ, সুতরাং চরম তত্ত্ব নয়। সমস্ত সসীম বস্তুকে আত্মস্থ করা এবং তাদের মধ্য দিয়ে আত্ম-প্রকাশ করাতেই অসীম সত্তার পরিপূর্ণতা। আত্ম-সচেতন জীব অর্থাৎ জীবাত্মারাই অসীমসত্তা বা পরমাত্মার আত্ম-প্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। পরমাত্মা নিজেকে বহু কেন্দ্রে বিভক্ত করে সেই সব কেন্দ্রের মাধ্যমে নিজের স্বরূপ পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেন। এই সব কেন্দ্রের প্রত্যেকটি জীবাত্মা। সুতরাং জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশ।

পরমাত্মা নিজেকে এইভাবে অসংখ্য জীবাত্মায় বিভক্ত করে আত্ম-প্রকাশ করার কি উদ্দেশ্য থাক্‌তে পারে, সে প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। হেগেলপন্থী দার্শনিকেরা মনে করেন যে, পরমাত্মার পক্ষে এই আত্ম-বিভজনের (Self-differentiation) উদ্দেশ্য হ'ল তাঁর স্বরূপের পূর্ণতা-সাধন (Self-realisation)। অসংখ্য জীবাত্মার মাধ্যমে আত্ম-প্রকাশ করার আগে চরম সত্তা বা পরমাত্মা নির্বিশেষ, অমূর্ত বা অবাস্তব থাকেন[1], আর জীবাত্মাদের আবির্ভাবের ফলে তাঁর পূর্ণতার প্রকাশ হয়। এইসব জীবাত্মার পক্ষে নানা রকম অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে, নানা বৈচিত্র্যময় অবস্থা, দুঃখ, কষ্ট, আনন্দ ও নিরানন্দ ভোগ করে বিশেষ বিশেষ ভাবে পরিপূর্ণতা লাভ করাই জীবনের সার্থকতা। এইসব ব্যক্তিদের পৃথক্ পৃথক্ পরিপূর্ণতা যে পরিপূর্ণতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, সেই পরিপূর্ণতার বিকাশই পরমাত্মার প্রয়োজন বা ইষ্ট। কেবলাদ্বৈতবাদে যে বলা হয় পরমাত্মার পক্ষে জীবাত্মার জীবনের কোনও প্রয়োজনই নেই, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ তার বিপরীত মত পোষণ করে। আবার কোন কোন দার্শনিক বলেন যে, পরমাত্মা যখন অনাদিকাল থেকেই স্বয়ং-সম্পূর্ণ, যখন তাঁর মধ্যে কোনও অভাব বা দৈন্য নেই, তখন তিনি কোন প্রয়োজন মিটাবার তাড়নায় কিছু করেন, একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আমরা শুধু এটাই বলতে পারি যে, এই অসংখ্য জীবাত্মার সৃষ্টি তাঁর লীলামাত্র। কবি যেমন তাঁর প্রাণের উচ্ছ্বাস

---

1 এ কথার অর্থ এই নয় যে, এমন এক সময় ছিল যখন কেবলমাত্র নির্বিশেষ পরমাত্মা ছিলেন আর কোনও জীবাত্মা ছিল না। পরমাত্মা চিরকালই পরিপূর্ণ। সুতরাং জীবাত্মারাও চিরকালই আছে। কেবলমাত্র এই পৃথিবীতেই জীবাত্মা থাকতে পারে এরকম বিশ্বাস করার পক্ষে কোন যথেষ্ট হেতু নেই।

ব্যক্ত করতে কবিতার আশ্রয় নেন, তেমনই পরমাত্মা তাঁর পরিপূর্ণতা ব্যক্ত করার জন্য জীবাত্মার সৃষ্টি করেন। বস্তুত এক পরমাত্মা বহু সসীম জীব-রূপে প্রকট হ'লেন কেন, সে রহস্য সন্তোষজনকরূপে সমাধান করার শক্তি আমাদের নেই।

4. মানুষের ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য (Freedom of the Will)

পরমাত্মা ও জীবাত্মার সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনায় মানুষের ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে অবশ্যই প্রশ্ন উঠবে। সাধারণত আমরা মানুষের ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাস করি। অর্থাৎ, আমরা বিশ্বাস করি যে, প্রত্যেক মানুষেরই যে কোন অবস্থায় কোন বিশেষ ইচ্ছা করার অথবা না করার স্বাধীনতা আছে। এই স্বাধীনতা কোন কাজ করার স্বাধীনতা থেকে পৃথক্। (কোন ব্যক্তি যদি একটি ঘরে আবদ্ধ থাকে তাহ'লে সম্মুখের রাস্তায় কোন বিপদাপন্ন লোককে সাহায্য করবার ইচ্ছা থাকলেও সেই ইচ্ছা পূরণের তার উপায় নেই। এক্ষেত্রে তার কর্মের স্বাধীনতা নেই, কিন্তু ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে।) অর্থাৎ, বহির্জগৎ বা অন্তর্জগতের প্রতিকূল প্রভাব সত্ত্বেও কোন একটি ইচ্ছাকে পোষণ করার ক্ষমতা প্রত্যেক ব্যক্তিরই আছে। সুতরাং 'ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা' বলতে আমরা বুঝব কোন বিশেষ ইচ্ছাকে মনে স্থান দেওয়া অথবা না দেওয়ার স্বাধীনতা। আমাদের দেহে যা কিছু ঘটে সে সমস্তই জড়-জগতের অন্তর্গত এবং এ রকম প্রত্যেক ঘটনাই এক বা একাধিক জাগতিক কার্য-কারণ নিয়মের অধীনে ঘটে থাকে। জড়বাদীদের মতে মানুষের প্রত্যেক ইচ্ছাই এইভাবে জাগতিক নিয়মের অধীন। (প্রত্যেক ইচ্ছার বিশেষ কারণ আছে এবং সেই কারণটি উপস্থিত থাকলে সেই ইচ্ছাও অবশ্যম্ভাবী, তার উপর ব্যক্তির কোন কর্তৃত্ব নেই। অপরপক্ষে, যাঁরা মনকে দেহের ক্রিয়া বা গুণ বলে স্বীকার করেন না, তাঁদের মতে আমাদের ইচ্ছা বা সঙ্কল্প জাগতিক কার্য-কারণ নিয়মের অধীন নয়। কোন শারীরিক বা মানসিক অবস্থা বা ঘটনা কোন ইচ্ছা বিশেষকে যতই প্রভাবিত করুক না কেন, শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি নিজেই তার ইচ্ছা বা সঙ্কল্পকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে।) কোন ব্যক্তির দেহের গঠন, অবস্থা, পরিবেশের প্রভাব সম্বন্ধে আমাদের যতই জ্ঞান থাকুক না কেন, কোন এক বিশেষ মুহূর্তে সে ঠিক কি ইচ্ছা বা সঙ্কল্প করবে, সেই মুহূর্তের আগে কোন হিসাব করে সেটা নির্ভুলভাবে বলে দেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা বাস্তবিকই আছে, না এটা আমাদের একটা ভ্রান্তবিশ্বাসমাত্র, মনোবৈজ্ঞানিক (Psychological), নৈতিক (Ethical) এবং তাত্ত্বিক (Metaphysical) দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সে প্রশ্নের অনেক আলোচনা হয়েছে। এখানে আমরা কেবলমাত্র ঈশ্বর ও জীবাত্মার সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্নটি আলোচনা করব।

5. ঈশ্বর ও জীবাত্মার সম্পর্ক এবং মানুষের ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য

মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমাদের মনে যে সব প্রশ্ন ওঠে তাদের মধ্যে একটি হ'ল, 'ঈশ্বর যদি যথার্থই সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ হ'ন তাহ'লে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা কি করে থাকতে পারে'? জগতে যেখানে যা কিছু ঘটছে সে সমস্তই যদি ঈশ্বরীয় শক্তির প্রকাশ হয় তা হ'লে আমাদের দেহে এবং মনে যা কিছু ঘটে, সেগুলিও অনন্ত সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশ এবং তাঁর ইচ্ছাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ইচ্ছা বা সঙ্কল্প একটি মানসিক ঘটনা। সুতরাং মানুষের প্রত্যেক ইচ্ছাই ঈশ্বরের ইচ্ছাদ্বারা চালিত। আমাদের ইচ্ছা সম্বন্ধে আমরা স্বাধীন এবং আমাদের কর্ম-শক্তি আমাদের স্বাধীন ইচ্ছানুসারে চালিত হয়, এই বিশ্বাস ভ্রান্ত। ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের কিছুই করার ক্ষমতা নেই। আবার ঈশ্বর সর্বজ্ঞ। ভূত, ভবিষ্যৎ বর্তমান সবই তাঁর জ্ঞানের বিষয়। ভবিষ্যতে প্রত্যেক মুহূর্তে কোন ব্যক্তি কোন কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করবে, তা ঈশ্বর জানেন, অর্থাৎ, এই ইচ্ছা কি হ'বে, জগতের আদিকাল থেকেই সেটা স্থির হয়ে আছে, এবং কোন ব্যক্তি যদি বিশ্বাস করে যে, সেই ইচ্ছা ও সেই ইচ্ছানযায়ী কর্ম অন্য রকম হ'তে পারত তাহ'লে সেটা ভ্রান্ত বিশ্বাস হ'বে। কিন্তু এটাও আমাদের মনে রাখতে হ'বে যে, মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা যদি প্রকৃতই না থাকে তাহ'লে মানুষের কর্তব্যজ্ঞান, নৈতিক দায়িত্ববোধ, পাপ-কর্মের জন্য অনুশোচনা, শুভ-বুদ্ধি ও অশুভ-বুদ্ধির দ্বন্দ্ব প্রভৃতির কোন অর্থই থাকে না, মানুষের নৈতিক আদর্শ ও সেই আদর্শের ভিত্তিতে উচ্চতর আধ্যাত্মিক জীবনের কোন স্থানই থাকতে পারে না। কিন্তু আমাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে ধারণার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই, আমাদের ও জড়বস্তুর মধ্যে মূলগত কোনও প্রভেদ নেই—এ চিন্তা আমাদের অসহ্য। এইভাবে আমাদের সম্মুখে যে সমস্যা দেখা দেয় সেই সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান করা একান্তই আবশ্যক বলে মনে হয়।

6. (a) দ্বৈতবাদীদের মত

যাঁরা বিশ্বাতীত ঈশ্বরে বিশ্বাসী তাঁরা এই সমস্যার সহজ একটি সমাধান দিয়ে থাকেন। তাঁদের মতে ঈশ্বর নিশ্চয়ই সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান, কিন্তু তিনি মানবাত্মাকে সৃষ্টি করলেও মানবাত্মার অন্তর্বর্তী ন'ন। তিনি একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে মানবাত্মাকে চিন্তা, ক্রিয়া ও ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়েছেন এবং এই ক্ষেত্র থেকে নিজের শক্তিকে সঙ্কুচিত করেছেন। মানুষ ঈশ্বর-সৃষ্ট ও প্রতি মুহূর্তে ঈশ্বরচালিত জাগতিক ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল হ'লেও একটা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র বা স্বাধীন। ঈশ্বর এই ক্ষেত্রে নিজের শক্তিকে সীমিত করেছেন, কিন্তু এর ফলে তাঁর শক্তির যে সঙ্কোচন ঘটেছে সেটা স্বয়ং-কৃত সঙ্কোচন (Self-imposed limitation), সুতরাং এর জন্য তাঁর অনন্ত শক্তিমত্তার কোন হানি হয়নি। মানুষ যখন তার স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগ করে কোন কু-কর্ম করে তখন সে তার ফল ভোগ করে এবং সেজন্য ঈশ্বর দায়ী ন'ন। সুতরাং তাঁর করুণা, ন্যায়পরায়ণতা ও জীবের প্রতি অনুকম্পা সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, করুণাময় ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের সঙ্গে মানবাত্মার স্বাধীন ইচ্ছায় ও স্বাধীন কর্ম-ক্ষমতায় বিশ্বাসের কোনও বিরোধ নেই। কোন কোন দ্বৈতবাদী আরও একটু অগ্রসর হয়ে বলেছেন যে, ঈশ্বরের জ্ঞান ও শক্তিও সসীম। মানবাত্মারা অনাদিকাল থেকেই বর্তমান এবং ঈশ্বর তাদের সৃষ্টি করেন নি। সুতরাং তারা স্বাধীনভাবে নিজেদের ইচ্ছা প্রয়োগ করে তাদের নিজেদের ইচ্ছামত কাজ করে, একথা বিশ্বাস করতে কোনও বাধা নেই। আর, যেহেতু ঈশ্বরের জ্ঞানও সীমাবদ্ধ, সেইহেতু কোন ব্যক্তি কোন বিশেষ মুহূর্তে তার স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগ করে কি কাজ করবে, সে সম্বন্ধে ঈশ্বরেরও অভ্রান্ত জ্ঞান নেই। সুতরাং জীবদের ইচ্ছা এবং কর্ম বাস্তবিকই স্বাধীন, কিন্তু যেহেতু তারা সসীম বস্তু সেইহেতু তাদের স্বাধীনতা একেবারে অবাধ নয়, এই স্বাধীনতা সীমিত।

যে সব ভারতীয় দার্শনিক ঈশ্বরবাদী অথচ কর্মবাদেও বিশ্বাসী তাঁদের মত এই যে, জীবেরা মূলত নিজেদের কর্মফলেই সুখদুঃখাদি ভোগ করে, কিন্তু জীবেরা তাদের কর্মের কর্তা হ'লেও ঈশ্বরই সকল কর্মের ফলদাতা। এই মতানুসারে জীবেরা তাদের কর্মের জন্য নিজেরাই দায়ী এবং ঈশ্বর বিনা কারণে কোন জীবকে অনুগ্রহ বা নিগ্রহ করেন না। সুতরাং ঈশ্বরকে পক্ষপাতিত্বদোষে অভিযুক্ত করা যায় না। জীবকে তার কর্মের জন্য দায়ী করার অর্থই হচ্ছে যে, জীবের ইচ্ছা করার অন্তত

কিছুটা স্বাধীনতা আছে, সে একান্তভাবে ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল নয়। কিন্তু কোন কোন দার্শনিক কর্ম-বাদ স্বীকার করেও এই মত প্রকাশ করেছেন যে, ঈশ্বরই সব কর্মের কারয়িতা (অর্থাৎ, তিনিই জীবকে কর্ম করান), এই মত গ্রহণ করলে অবশ্য জীব যে তার ইচ্ছা ও কর্ম সম্বন্ধে স্বাধীন, এটা স্বীকার করা যায় না।

(b) সর্বেশ্বরবাদী ও অদ্বৈতবাদীদের মত

কিন্তু যাঁরা বিশ্বগত-ঈশ্বর বা সর্বেশ্বরবাদে (Pantheism) বিশ্বাসী তাঁদের কাছে এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁরা বলেন যে, জাগতিক সকল ক্রিয়ার উৎস, অনন্ত, সর্বশক্তিমান পুরুষের পক্ষে কোন বিশেষ ক্ষেত্র থেকে আপন শক্তির প্রভাব অপসারণ করা অসম্ভব। ঈশ্বর যদি সসীম ব্যক্তিদের সৃষ্টি করে থাকেন তাহ'লে তাদের নিজের সত্তার বাইরে প্রক্ষেপ করতে পারেন না। ঐ জীবেরা সৃষ্ট হ'বার পরও ঈশ্বরের সত্তারই অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকবে, এবং তাদের সত্তার প্রত্যেক অংশ বা উপাদান ঐশী সত্তারই অঙ্গ হয়ে থাকবে। জীবাত্মারা যদি পরমাত্মা বা ঈশ্বরের মতই নিত্যপদার্থ হয় তাহ'লে কোন কোন বিষয়ে তাদের স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা থাকা সম্ভব, কিন্তু সে ক্ষেত্রে ঈশ্বরকে অনন্ত, বিশ্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান ইত্যাদি বলা যুক্তিযুক্ত হ'বে না। জীবের স্বাধীনতা ঈশ্বরের স্বয়ং-কৃত সঙ্কোচনের (Self-imposed limitation) ফল, এই কথাও অযৌক্তিক। ঈশ্বরকে সর্ব-শক্তিমান বলে বর্ণনা করলেও আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, এমন অনেক কাজ আছে (যেমন আত্মহত্যা) যা তাঁর প্রকৃতির বিরোধী, সুতরাং যা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। কোন বিশেষ ক্ষেত্রে আপন শক্তি সঙ্কুচিত করা ঈশ্বরের এমনই একটি কাজ। জগতে যদি কোনও জীব সত্যই স্বাধীনভাবে ইচ্ছা করতে পারে এবং তার ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে পারে, তাহ'লে তার কাজ এবং সেই কাজের ফল ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধী হ'বে (কারণ, কোন ব্যক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করলে তার ইচ্ছা স্বাধীন হ'বে না)। কিন্তু কোন ব্যক্তির একটি কাজের ফল অসংখ্য হ'তে পারে, এবং তার বহু কাজের ফল এবং সেই ফলগুলির ফল সমস্ত জগতে ছড়িয়ে পড়বে, অর্থাৎ, কোনও একজন ব্যক্তি স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগ করে কাজ করলে ক্রমাগত ঈশ্বরের অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটতে থাকবে এবং তার ফলে ঈশ্বরের ক্ষমতা ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হ'তে থাকবে।[1]

1 "If there were a single free being in the Universe, there would

এরকম কল্পনা ঈশ্বরের সর্বব্যাপিতা ও সর্বশক্তিমত্তার বিরোধী। সুতরাং মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করা অযৌক্তিক।

দ্বিতীয়ত, মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতার বিরোধী। কোন ব্যক্তি যখন তার স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগ করে কোন কাজ করে বা করার সঙ্কল্প করে, তখন ঐ ঘটনা ঘটার পূর্বে অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে এই ঘটনা সম্বন্ধে কোন অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী করা অসম্ভব, কারণ, এই ঘটনা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। ঈশ্বরের পক্ষেও এরূপ কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা অসম্ভব। কিন্তু এই যুক্তি স্বীকার করলে ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতার হানি হয়, কারণ, আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হই যে, ভবিষ্যতের বহু ঘটনা সম্বন্ধেই ঈশ্বরের জ্ঞান নেই। অপরপক্ষে, যদি আমরা স্বীকার করি যে, প্রত্যেক মানুষ ভবিষ্যতে কোন কোন ইচ্ছানুযায়ী কাজ করার সঙ্কল্প করবে, ঈশ্বরের সে সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান আছে, তাহ'লে তার অর্থ হ'বে এই যে, মানুষের ইচ্ছা-কৃত প্রত্যেক কাজই পূর্ব থেকে নির্দিষ্ট হয়ে আছে, অর্থাৎ, মানুষের ইচ্ছার কোনও স্বাধীনতা নেই। কোন ব্যক্তি যদি মনে করে "এই বিশেষ ইচ্ছা না করে অন্য রকম ইচ্ছা করাও আমার পক্ষে সম্ভবপর ছিল", তার এই বিশ্বাস ভ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। সর্বেশ্বরবাদীদের এই যুক্তির উত্তরে কোন কোন দার্শনিক বলেন যে, ঈশ্বরের পক্ষে বর্তমান, ভূত ও ভবিষ্যতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অনাদি অনন্তকালের প্রতি মুহূর্তই তাঁর কাছে বর্তমান। সুতরাং মানুষ স্বাধীনভাবেই তার নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করার সঙ্কল্প করে, কিন্তু সে কোন ইচ্ছানুযায়ী কাজ করছে, সে সম্বন্ধে ঈশ্বরের নিশ্চয়ই জ্ঞান আছে। সে জ্ঞান কোনও ভবিষ্যৎ ঘটনার জ্ঞান নয়, (ঈশ্বরের পক্ষে) বর্তমান ঘটনার জ্ঞান[1]। সুতরাং এ ক্ষেত্রে মানুষের ইচ্ছা পূর্ব থেকেই নিয়ন্ত্রিত, একথা বলা চলে না। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা-শক্তি ও ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতার মধ্যে কোনও বিরোধ নেই।

সর্বেশ্বরবাদীরা মনে করেন যে, একমাত্র তাঁদের মতবাদই প্রকৃত ধর্ম-ভাবের পরিপোষক। ঈশ্বর-সত্তা ও জীব-সত্তা যে প্রকৃতপক্ষে একই—এই বিশ্বাস থেকে উৎপন্ন চিন্তা ও ভাবাবেগই ধর্ম-সাধনার প্রকৃত অঙ্গ। জীবের

no longer be any God, no longer links connecting being with being, the universe would fall into disarray".—Martineau', Study of Religion Voll II p. 305

1 "A knowledge of what is free is possible but a fore-knowledge of it is inconceivable."—H. Lotze. Outlines of a Philosophy of Religion. p. 120

অহংকার যখন বিলুপ্ত হয়, যখন সে সমস্ত ভেদ-বুদ্ধি ত্যাগ করে ঈশ্বর-সত্তার মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দেয়, তখনই তার ধর্ম-সাধনার চরম চরিতার্থতা। যে মনোভাব থেকে আমরা ঈশ্বরকে রাজা বা শক্তিমান শাসক বলে কল্পনা করি এবং নানা রকম স্তবস্তুতির সাহায্যে তাঁর মনোরঞ্জন করে পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধি, সাফল্য, যুদ্ধে জয়, এই ধরনের অনুগ্রহ ভিক্ষা করি, প্রকৃত ধর্ম-চেতনার দৃষ্টিতে তার মূল্য খুবই কম। এই রকম মনোভাব থেকেই বহু কুসংস্কারের জন্ম হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি ঈশ্বরকে সর্বভূতে ও সর্বজীবে দর্শন করে থাকেন এবং ঈশ্বর-সত্তার মধ্যে নিজেকে বিসর্জন দিয়ে অসীম শান্তি ও আনন্দ উপভোগ করেন।

সর্বেশ্বরবাদীদের মধ্যে যাঁরা কেবলাদ্বৈতবাদী অথবা মায়াবাদী তাঁদের মতে তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে জীবের স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা নেই। আমরা যে নিজেদের পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা থেকে পৃথক্ ও স্বাধীন বলে মনে করি অবিদ্যা বা অজ্ঞানই তার কারণ। একমাত্র পরব্রহ্ম বা পরমাত্মাই আছেন আর সসীম, সান্ত যা কিছু সবই মিথ্যা। সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিবেচনা করলে জীব সংসারচক্রে বদ্ধ, তার শক্তি সীমিত, জরা-মরণ, ব্যাধি ও দুঃখের ভারে পীড়িত। বর্তমান জীবনে যে কোন সময়ে তার অবস্থা তার অতীতকালে কৃত কর্মের ফল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, অর্থাৎ তত্ত্বদৃষ্টিতে মানবাত্মা ও পরমাত্মা এক ("জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ")। অদ্বৈতবেদান্তে পরমাত্মা ও জীবাত্মার সম্পর্ক সম্বন্ধে এই মতই প্রচার করা হয়েছে। এই মতে জীবের যখন তত্ত্বজ্ঞান হয় তখন সে নিজের এবং পরমাত্মার একাত্মতা উপলব্ধি করতে পারে এবং এই উপলব্ধির ফলেই মুক্তি। জীব প্রকৃতপক্ষে ক্ষুদ্র, পাপী বা বদ্ধ নয়, সে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত এবং এই তার স্বরূপ। আত্মোপলব্ধিই পরম পুরুষার্থ বা নিঃশ্রেয়স (যার অপেক্ষা শ্রেয়ঃ আর কিছুই নাই) এবং তত্ত্বজ্ঞানই তার সহায়ক। পরমপুরুষার্থলাভই যদি ধর্ম-সাধনার উদ্দেশ্য হয় তাহ'লে আত্মোপলব্ধির সহায়ক তত্ত্বজ্ঞান-লাভের চেষ্টাকেই ধর্ম-সাধনা বলতে হ'বে। পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে পার্থক্যবোধ না থাকলে নৈতিক বা ধর্মীয় জীবন অর্থহীন হয়ে পড়ে—সাধারণের মধ্যে প্রচলিত এই বিশ্বাস অদ্বৈতবাদীদের মতে গ্রহণযোগ্য নয়।

(c) বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ

দ্বৈতাদ্বৈতবাদ অথবা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীদের মতবাদে উপরে আলোচিত দুটি মতের সমন্বয়ের চেষ্টা দেখা যায়। এই মতে ঈশ্বর বা পরমাত্মা এক হয়েও বহু আর বহু হয়েও এক। সুতরাং পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে

ঐক্য এবং পার্থক্য দুই-ই আছে। পরমাত্মা ও জীবাত্মার সম্বন্ধ কোন দৈশিক সম্বন্ধ নয়। সুতরাং দুই বা ততোধিক জড়বস্তুর মধ্যে যে ধরনের সম্বন্ধ থাকে, (যেমন কার্য-কারণ সম্বন্ধ প্রভৃতি) পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে সে ধরনের সম্বন্ধ থাকতে পারে না। আবার দু'জন মানুষের মধ্যে যে সম্বন্ধ থাকা সম্ভব ঠিক সেই রকম সম্বন্ধ পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে থাকতে পারে না। সুতরাং এইসব সম্বন্ধের সাহায্যে পরমাত্মা ও জীবাত্মার সম্বন্ধ বোঝবার চেষ্টা করা নিষ্ফল।

পরমাত্মা অসংখ্য জীবাত্মারূপে নিজেকে প্রকাশিত করেছেন, অথবা 'বহু'তে পরিণত হয়েছেন, সুতরাং পরমাত্মা ও জীবাত্মা মূলত এক। আবার, যেহেতু জীবাত্মারূপে পরমাত্মার পরিণাম মিথ্যা বা কল্পিত নয়, যথার্থ, সেহেতু জীবাত্মা স্বতন্ত্রও বটে। জগৎ-সৃষ্টির মাধ্যমে পরমাত্মা আপনার সত্তা ও প্রকৃতির পরিপূর্ণতা সম্পাদন করেন, বা নিজেকে অনন্তবিভূতিসম্পন্ন পুরুষোত্তমরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই হ'ল তাঁর চরম উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন। জীবাত্মাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কল্যাণ এই উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনের অপরিহার্য অঙ্গ। পরমাত্মা একেকটি জীবাত্মার মাধ্যমে একেকটি বিশেষ উপায়ে নিজেকে প্রকাশিত করেন। সুতরাং প্রত্যেক জীবাত্মারই একটি বৈশিষ্ট্য আছে। জগতে এক ব্যক্তির স্থান অন্য কোনও ব্যক্তি অধিকার করতে পারে না। কোন ব্যক্তির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য পরমাত্মার সত্তায় বিলুপ্ত হয় না। জীবাত্মাদের এই পৃথক্ সত্তা ও স্বকীয়তা পরমাত্মার চরম প্রয়োজনের একটি অঙ্গ। অর্থাৎ প্রত্যেক জীবাত্মা পরমাত্মা থেকে পৃথক্ হ'লে তবেই পরমাত্মার চরম প্রয়োজন সম্পূর্ণভাবে সিদ্ধ হ'তে পারে। জীবাত্মা পরমাত্মা থেকে হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বাধীন হ'বে, অথবা জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে ভেদবর্জিত ঐক্য থাকবে, এ রকম ধারণা অসঙ্গত, শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ধারণার বিরোধী। দ্বৈতবাদীমতের অনুসরণ করে যদি বলি যে, পরমাত্মা থেকে জীবাত্মা সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং জীবাত্মা এই অর্থেই স্বাধীন, তাহ'লে শ্রেষ্ঠ দার্শনিক চিন্তার বিরোধিতা করা হ'বে। আর যদি সর্বেশ্বরবাদী বা কেবলাদ্বৈতবাদীদের মত স্বীকার করে বলি যে, পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে ভেদ-বর্জিত ঐক্য আছে তাহ'লেও শ্রেষ্ঠ দার্শনিক চিন্তার অনুমোদন পাওয়া যাবে না। ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্তিমত্তার পরিপ্রেক্ষিতে জীবাত্মার ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে কি না, সেই প্রশ্নেরও এই ভাবেই মীমাংসা করতে হ'বে। জীবাত্মা সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান পরমাত্মারই অংশ বা প্রকাশ। সুতরাং তার ইচ্ছা স্বাধীন কিন্তু সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিত নয়। মানুষ যখন কোন কাজ করবার সঙ্কল্প করে তখন তার মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলীর গঠন ও অবস্থা, তার

পূর্বার্জিত অভ্যাস, প্রবৃত্তি, ভাবাবেগ প্রভৃতি এবং প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ এই সমস্তই তার ইচ্ছাকে প্রভাবিত করে। এই সকলের মাধ্যমে পরমাত্মাই তার ইচ্ছাশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। মানুষ যদি কেবলমাত্র জড়-দেহ হ'ত তাহ'লে এই সব বিবিধ শক্তির প্রভাবাধীন হওয়ার ফলে তার ইচ্ছার কোনও স্বাতন্ত্র্য থাকত না। কিন্তু পরমাত্মা আর এক ভাবেও মানুষের ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করেন। তিনি অন্তর্যামী। তিনি মানুষের মনে ধীশক্তি, বিচার-বুদ্ধি, বিবেক, আদর্শ-প্রীতি প্রভৃতিরূপে আত্ম-প্রকাশ করেন এবং তার ইচ্ছাশক্তিকে চালিত করেন। এ-ও একপ্রকার নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু পরমাত্মা জীবাত্মার ইচ্ছাকে যে ভাবেই নিয়ন্ত্রণ করুন না কেন, কতকগুলি জড়বস্তু অপর একটি জড়বস্তুকে যে ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে বা কোন ক্ষমতাশালী প্রভু বা শাসক যে ভাবে তার অধীনস্থ ব্যক্তিদের আচরণ বা ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করে, এ নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। যখন কোন জীবাত্মার ইচ্ছা তার বিচারবুদ্ধি, বিবেক, আদর্শ-প্রাতি প্রভৃতির প্রভাবে চালিত হয় তখন তার নিয়ন্তা অন্তর্যামী পরমাত্মা। অর্থাৎ, পরমাত্মা কর্তৃক জীবাত্মার নিয়ন্ত্রণ প্রকৃতপক্ষে জীবাত্মার স্ব-নিয়ন্ত্রণ (Self-determination)। এই নিয়ন্ত্রণ থাকা সত্ত্বেও, অথবা এই নিয়ন্ত্রণ আছে বলেই মানবাত্মা স্বাধীন। ঈশ্বর বা পরমাত্মাকে যদি জীবাত্মার বাহিরের কোন শক্তি বলে মনে করি, তবেই "যেহেতু সর্বজ্ঞ ঈশ্বর প্রত্যেক ব্যক্তি ভবিষ্যতে কোন কোন কর্ম করবে তা যথাযথভাবেই জানেন, সেহেতু প্রত্যেক মানুষের প্রত্যেক কর্মই প্রথম থেকে নির্দিষ্ট হয়ে আছে"—এই যুক্তিটিকে মানবাত্মার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অতি প্রবল যুক্তি বলে মনে হ'বে। কিন্তু যদি মানবাত্মার আত্ম-নিয়ন্তৃত্ব স্বীকার করি তাহ'লে এই আপত্তির বিশেষ মূল্য থাকবে না। সুতরাং, দ্বৈতাদ্বৈতবাদীরা এই মত পোষণ করেন যে, কেবলমাত্র তাঁদের মতবাদ অনুসারেই মানুষের ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্যের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

7. জীবাত্মার অমরত্ব (Immortality of the soul)

জীবের, বিশেষত মানুষের, দেহের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই যে তার আত্মার ধ্বংস হয় না, দেহ ধ্বংসশীল হ'লেও আত্মা অবিনশ্বর, এই বিশ্বাস সাধারণত সকল সেশ্বর ধর্মের অঙ্গ। প্রতি মুহূর্তে মানুষ তার সংকীর্ণ পরিধি অতিক্রম করে এক বৃহত্তর জীবনের অংশ গ্রহণ করতে সচেষ্ট। দৈহিক সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য তাকে চরম তৃপ্তি দিতে পারে না। তার এই চেষ্টা তার মধ্যে যে এক

গৌরবময় সম্ভাবনা আছে তারই ইঙ্গিত দেয়। সম্ভাবনাময় জীবন যে মানুষের জড়দেহের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হ'য়ে যাবে, এ চিন্তা মানুষের পক্ষে অসহ্য। সেজন্য মানুষ এক অনন্তজীবন কল্পনা করে, যে জীবনে তার সমস্ত অতৃপ্ত কামনা ও আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হ'বে এবং সে তার জীবনের চরম চরিতার্থতা খুঁজে পাবে।

অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, আমরা যদি সর্বশক্তিমান, সর্ব-মঙ্গলময়, পরমকারুণিক বিশ্ব-নিয়ন্তার অস্তিত্ব স্বীকার করি তাহ'লে আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসও আমাদের পক্ষে অপরিহার্য। ঈশ্বরের অস্তিত্বে যে ব্যক্তির আন্তরিক বিশ্বাস আছে, ঈশ্বরের কৃপালাভ করাই জীবনের চরম চরিতার্থতা বলে যাঁর বিশ্বাস, তিনি অবশ্যই ঈশ্বরের আদেশ পালন করবার জন্য সচেষ্ট হ'বেন। ঈশ্বরের কৃপালাভ করতে হ'লে সাধনা ও শুদ্ধ পবিত্র চরিত্রের অধিকারী হওয়া বা এক কথায় আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন আবশ্যক। কিন্তু মানুষের স্বল্প-পরিসর জীবনের মধ্যে এই লক্ষ্যে পৌঁছনো অসম্ভব। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপালাভ করবার জন্য এই ব্যাকুলতা থাকা সত্ত্বেও যদি তাঁরই ব্যবস্থার ফলে মানুষের জীবন তার দেহের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায় তা হ'লে ঈশ্বরের করুণাময়ত্বে সন্দেহ এসে পড়ে। ঈশ্বরের করুণাময়ত্বে সন্দেহ হ'লে তাঁকে ভক্তি করা অসম্ভব এবং ঈশ্বরকে ভক্তি করা সম্ভব না হ'লে ধর্মবিশ্বসের মূলে আঘাত পড়ে।

(আমাদের ধর্ম-বিশ্বাস আমাদের মনে সৎকর্ম করার প্রেরণা জোগায়। এই প্রেরণার বশে আমরা জীবনে যে সব সৎকর্ম করি তার ফলভোগ করার কামনা করি। নিষ্কামভাবে কর্ম করার জন্য অনেক উপদেশ শুনলেও আমরা যখন দরিদ্রকে দান করি, সমাজ-সেবা করি, দেশের উন্নতির জন্য রাজনীতির চর্চা করি, এমনকি, বিদেশী শত্রুর আক্রমণ থেকে স্বদেশকে রক্ষা করার জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত হই, তখন এই সব শুভকর্মের ফল যে কখন না কখন ভোগ করব, সে আশা রাখি। কিন্তু যদি আমাদের দেহের ধ্বংস হওয়ার সঙ্গেই আমাদের জীবনের সমাপ্তি হয় তাহ'লে আমরা বর্তমান জীবনে যে সব সৎকর্ম করেছি তাদের ফলভোগ করার আশা নষ্ট হ'য়ে যায় এবং ধর্মে আস্থা শিথিল হ'য়ে পড়ে।)

দেহের সঙ্গে সঙ্গে যদি আত্মারও ধ্বংস হয় তাহ'লে তার অর্থ হ'বে এই যে, আত্মা ও দেহ অ-ভিন্ন। আমাদের সমস্ত কামনা, বাসনা, আশা, আকাঙ্ক্ষা দেহের সঙ্গে জড়িত। ইন্দ্রিয়জ সুখই একমাত্র সুখ এবং যে সব বস্তু থেকে ইন্দ্রিয়সুখ পাওয়া যায় সেগুলিই একমাত্র কাম্য। কোন কল্পিত আদর্শের পিছনে ছুটাছুটি না করে যথাসম্ভব অধিক পরিমাণে ইন্দ্রিয়-সুখ

লাভ করার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। (ভারতীয় চার্বাকদর্শনের মূল-নীতি "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ"—এই মনোভাবের পরিচয় দেয়। এই মনোভাব থেকেই সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতা, সমাজ-দ্রোহিতা প্রভৃতির জন্ম। ধর্মে যাঁদের দৃঢ়বিশ্বাস আছে তাঁরা ইন্দ্রিয়-সুখকে চরম মূল্য দিতে পারেন না। সুতরাং আত্মা দেহ হ'তে পারে না।—এই বিশ্বাস আমাদের ধর্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

(জড়বাদীদের মতে আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস কুসংস্কারমাত্র। আমরা দীর্ঘ জীবন চাই দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করার জন্য। দেহ ধ্বংস হ'বার পর দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগের আশা নিরর্থক। সেইজন্য আমরা এক অপার্থিব জীবন কল্পনা করে আধ্যাত্মিক আনন্দ, পরিপূর্ণতা প্রভৃতির কথা বলে আমাদের মনকে সান্ত্বনা দিয়ে থাকি। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে দৈহিক মৃত্যুর পরও যে আত্মার অস্তিত্ব থাকে, এ বিশ্বাসের কোন যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি নেই। দেহ ছাড়া চৈতন্যসর্বস্ব আত্মার কোনও অস্তিত্ব নেই। বহুসংখ্যক জড়-পরমাণুর সমাবেশে এই দেহ তৈরী হয় এবং চৈতন্য-রূপ গুণের আবির্ভাব হয়। চৈতন্য দেহেরই ধর্ম। সুতরাং, যেমন কোন বাদ্য-যন্ত্র ধ্বংস হ'লে ঐ যন্ত্র থেকে নিঃসৃত সুর স্তব্ধ হ'য়ে যায়, ঠিক সেই রকম দেহের ধ্বংসের সঙ্গে তার চৈতন্য-গুণও লুপ্ত হ'য়ে যায়। সুতরাং মৃত্যুর পর কোন অপার্থিব জীবনের চিন্তা অলীক কল্পনামাত্র। অল্পবুদ্ধি মানুষদের ভোলাবার জন্য স্বর্গ, নরক প্রভৃতি কল্পনা করা হয়েছে। যথাসাধ্য দৈহিক সুখভোগই মানুষের পরম পুরুষার্থ। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস এবং ঈশ্বর কর্তৃক আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ধারণার মূলেও আমাদের অজ্ঞতা।)

(জড়বাদীদের মতের সমর্থনে প্রধান যুক্তি এই যে, যে সব স্থানে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্র দেখা যায়, কেবলমাত্র সেই সব স্থানে চৈতন্যের আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়। দেহহীন চৈতন্যের সন্ধান কোথাও মেলে না। আমাদের সঙ্কল্প কাজে পরিণত করার চেষ্টা মস্তিষ্ক, স্নায়ুমণ্ডলী ও পেশীর সাহায্য ভিন্ন সম্ভব নয়। এমনকি আমাদের ক্ষীণতম চিন্তা পর্যন্ত মস্তিষ্কের ভিতরের প্রক্রিয়াগুলির উপর নির্ভরশীল। গভীর নিদ্রায় যখন মস্তিষ্কের ক্রিয়া স্তব্ধ তখন চৈতন্যের লোপ হয়। সুতরাং চৈতন্য মস্তিষ্কেরই ক্রিয়া। মস্তিষ্ক ধ্বংস হ'লে চৈতন্যের লোপও অবশ্যম্ভাবী। আত্মার অমরত্ব কল্পনা-বিলাস-মাত্র।)

জড়বাদীদের মতবাদে আপত্তি করে অধ্যাত্মবাদী ধর্ম-বিশ্বাসী ব্যক্তিরা বলেন যে, আত্মার প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা যা জানি তাই থেকে আমাদের এই ধারণাই হয় যে, আত্মা দেহ থেকে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র। আমাদের সাক্ষাৎ

অনুভব এই ইঙ্গিত দেয় যে, আত্মা অর্থাৎ, যাকে আমরা 'আমি' বলে নির্দেশ করি তা হ'ল চৈতন্য-সর্বস্ব, এবং দেশে বিস্তৃত কোন পদার্থ নয়। সুতরাং যে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলী দেশে বিস্তৃত, আত্মা তাদের সঙ্গে অ-ভিন্ন হ'তে পারে না। আর আমাদের মনের যে সব উচ্চস্তরের চিন্তা, ধারণা, আকাঙ্ক্ষা, প্রবণতা, ইষ্টার্থ-বোধ প্রভৃতিকে আমরা অধ্যাত্মজীবনের অঙ্গ বলে মনে করি, সেগুলি কোন জড়বস্তুর ধর্ম হ'তে পারে না। অনন্ত, অপার্থিব জীবনের জন্য মানুষের যে অদম্য আকাঙ্ক্ষা সেই আকাঙ্ক্ষাই আত্মা যে দেহ থেকে ভিন্ন তা প্রমাণ করে। যাঁরা শাস্ত্রে বিশ্বাসী তাঁরা বলেন যে, যখন সকল ধর্মের শাস্ত্রেই আত্মাকে দেহ থেকে পৃথক্ বলা হ'য়েছে তখন এই মত কখনও মিথ্যা হ'তে পারে না। আর আত্মা যদি দেহ থেকে ভিন্ন হয় তাহ'লে দেহের ধ্বংসের সঙ্গে আত্মাও যে ধ্বংস হ'বেই, একথা নিশ্চয় করে বলা যায় না।

8. আত্মার অমরত্বের বিভিন্ন ব্যাখ্যা

অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকেরা আত্মার অমরত্বের সমর্থনে কতকগুলি যুক্তি দিয়ে থাকেন। সেই যুক্তিগুলি আলোচনা করার আগে 'আত্মা অমর' একথা বলতে কি বোঝা উচিত, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা দরকার। 'আত্মা অমর' বলতে আমরা অন্তত এইটুকু বুঝি যে, আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন এবং দেহের ধ্বংসের সঙ্গে আত্মার ধ্বংস হয় না। কিন্তু এটাই সব নয়। আমরা আরও বুঝি যে, আত্মার কখনই ধ্বংস হয় না, মৃত্যু আত্মাকে কখনই স্পর্শ করতে পারে না। এ বিশ্বাস যদি সত্য হয় তাহ'লে প্রশ্ন উঠবে যে, কোন আত্মা একটি বিশেষ দেহের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার আগেও কি ছিল? অর্থাৎ, আত্মা কি শুধুই মৃতুহীন না জন্ম-রহিতও বটে? হিন্দুধর্মে সাধারণ প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, আত্মার মৃত্যুও নেই, জন্মও নেই। আত্মার যে মৃত্যুও নেই, জন্মও নেই—হিন্দুদের এই বিশ্বাস জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত। অর্থাৎ, হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যে, একটি আত্মা এক দেহ ধ্বংস হ'লে অপর এক দেহ আশ্রয় করে। "মানুষ যেমন জীর্ণবস্ত্র ত্যাগ করে নূতন বস্ত্র পরিধান করে, তেমনই আত্মা একটি দেহ ত্যাগ করে অপর এক দেহ গ্রহণ করে" গীতার এই উক্তিতে অধিকাংশ ধর্ম-প্রাণ হিন্দুই বিশ্বাস করেন। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্লেটো জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস না করলেও, জড়দেহ ধারণ করার আগেও আত্মার অস্তিত্ব থাকে, একথা বিশ্বাস করতেন। জড়-জগতে বাস করার সময় মানুষ যে জড়বস্তুগুলির মধ্যে কখনও কখনও অলৌকিক

সামঞ্জস্য, শৃঙ্খলা ও সুষমা অনুভব করে, সেই অনুভব পূর্ব-স্মৃতি ছাড়া আর কিছু নয়। অর্থাৎ, যে সামঞ্জস্য, শৃঙ্খলা, সুষমা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের বিষয় হ'তে পারে না, সেগুলি স্মৃতির ফলে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির বিষয় হয়। এই স্মৃতি-মূলক অনুভূতিই প্রমাণ করে যে, মানুষ তার বর্তমান জীবনের আগে এমন এক রাজ্যে বাস করত যেখানে কেবলমাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য ভাবরাজি (Intelligible Ideas) আছে। এই ভাবগুলির স্মৃতি মাঝে মাঝে বর্তমান জীবনে মানুষের মনে উদিত হয় এবং সে অচেতন জড়জগতে অপূর্ব শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য, সৌন্দর্য, সুষমা অনুভব করে।[1] যাঁরা খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসী তাঁরা তাঁদের শাস্ত্রোক্ত মতানুসারে বিশ্বাস করেন যে, মানবাত্মার জন্ম আছে কিন্তু মৃত্যু নেই। কোন বিশেষ দেহের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে একটি বিশেষ মানবাত্মার সৃষ্টি হয়, দেহের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আত্মাও বিকশিত হয় এবং কালক্রমে দেহের ধ্বংস হ'লেও আত্মার মৃত্যু হয় না। এই সব মতবাদ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়েছে, এবং এগুলির মধ্যে কোনটি সত্য তা নির্ণয় করা অতীব কঠিন।

অনেকের মনে এই ধারণা আছে যে, আত্মা এক রকম সূক্ষ্ম জড়পদার্থ দিয়ে গঠিত। দেহের ধ্বংসের পরও এর মানুষের আকৃতি থাকে এবং কখন কখন জীবন্ত মানুষদের দৃষ্টিগোচরও হয়ে থাকে। এই প্রেতাত্মারা যে এই পৃথিবীতেই বাস করে এবং নানা রকম কাজের মধ্য দিয়ে তাদের শক্তি প্রকাশ করে এটাও অনেকের বিশ্বাস। বর্তমান যুগের বহু চিন্তাশীল ব্যক্তিই কিন্তু এ বিষয়ে প্রধানত দার্শনিক দেকার্তের (Descartes) মতের অনুসরণ করেন। দেকার্তে প্রচার করেছিলেন যে, আত্মা এবং দেহ সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। আত্মার সারধর্ম (Essence) হ'ল চিন্তা বা চৈতন্য, আর দেহের সারধর্ম হ'ল বিস্তৃতি। আত্মা কখনও স্থান অধিকার করতে পারে না, এর কোনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকার নেই। সুতরাং দেহের মৃত্যুর পর যদি আত্মার অস্তিত্ব থাকে তাহ'লে তাকে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা যাবে না। এই মত সত্য হ'লে আমাদের বিশ্বাস করতে হ'বে যে, দেহের মৃত্যুর পর আত্মার কোনও প্রত্যক্ষগোচর আকার না থাকলেও চৈতন্য থাকে। কিন্তু এখানে প্রশ্ন ওঠে যে, মৃত্যুর পর আত্মার চৈতন্যের কতটা অবশিষ্ট থাকে? চৈতন্যের যে সব ক্রিয়া একান্তভাবে দেহের উপর নির্ভরশীল, যেমন, সংবেদন (sensation) প্রভৃতি, সেগুলি যে বিদেহ আত্মায় থাকতে পারে না, এরূপ মনে করাই যুক্তিসঙ্গত। যে সব উচ্চ-স্তরের চিন্তন-ক্রিয়া

1 Plato-র এই মতবাদকে Theory of Reminiscence বলা হয়।

দেহের কোন প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে না, কেবলমাত্র সেইগুলিই বিদেহ আত্মার মনে ঘটতে পারে (যদিও কোন চিন্তন-ক্রিয়া দৈহিক প্রক্রিয়ার সহযোগিতা ভিন্ন আদৌ ঘটতে পারে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে)। কিন্তু বিদেহ আত্মার যদি দর্শন-শক্তি, শ্রবণ-শক্তি ইত্যাদি না থাকে তাহ'লে উচ্চস্তরের চিন্তা বিষয়-বস্তুর অভাবে ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসতে পারে এবং কালক্রমে হয়ত একেবারে লুপ্ত হয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ, আত্মার যদি মরণোত্তর জীবন থাকে তাহ'লে সেই জীবন এবং বর্তমান জীবনের মধ্যে কোন ধারাবাহিকতা থাকা সম্ভব নয়। যে জীবনে ইন্দ্রিয়জ্ঞানের কোন স্থান নেই, ভাবাবেগ নেই, সামাজিক পরিবেশ নেই, সে রকম জীবন কারও পক্ষে কাম্য বা লোভনীয় হ'তে পারে না।)

অনেকে মনে করেন যে, কোন মানুষ মর্ত্য জীবনে যে সব কাজ করে থাকেন তাদের ফল যদি স্থায়ী হয়, এবং বিশেষ করে পরবর্তী কালের লোকেদের পক্ষে উপকারী ও আনন্দদায়ক হয়, তাহ'লে দৈহিক মৃত্যুর পরও তিনি জীবিত আছেন, এরূপ মনে করা উচিত ("কীর্তির্যস্য স জীবতি")। সম্রাট অশোক সমস্ত ভারতে বহু স্থানে যে সব শিলালিপি ক্ষোদিত করে গিয়েছেন তাদের মধ্যেই তিনি জীবিত আছেন। কবি কালিদাস তাঁর কাব্যের মধ্যেই জীবিত থেকে কাব্যামোদী পাঠকদের আজও আনন্দ দিচ্ছেন। যাঁর কীর্তি যতদিন টিকে থাকবে তিনিও ততদিন জীবিত থাকবেন। কিন্তু এ ধরনের অমরতা বা মরণোত্তর জীবন অল্প কয়েকজনের পক্ষে লোভনীয় হ'লেও মর্ত্য জীবনে যে অহং-জ্ঞান আমাদের নিত্য-সহচর সেই অহং-জ্ঞান বা ব্যক্তিত্ব-হীন জীবন অধিকাংশ লোকের পক্ষেই কাম্য বা লোভনীয় নয়।

কোন কোন দার্শনিক বলেন যে, বাহ্য জগতের সঙ্গে আমাদের ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শের ফলে আমাদের মনে যে সব সংবেদন উৎপন্ন হয় সেগুলি পরস্পরের সঙ্গে গ্রথিত না হ'লে জ্ঞান উৎপন্ন হ'তে পারে না। আমাদেয় অহং-জ্ঞানের ঐক্যের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার ফলেই সংবেদনগুলি পরস্পরের সঙ্গে গ্রথিত হয়ে একীভূত হয়। বস্তুত অহং-জ্ঞানই এই গ্রন্থনার কাজ (Act of synthesis) করে থাকে এবং এই কাজে দেশ (Space) ও কাল (Time), এই দুটি প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের আকার (Forms of Intuition) এবং দ্রব্যত্ব, কার্য-কারণ সম্বন্ধ প্রভৃতি কতকগুলি বৌদ্ধিক প্রকার (Categories of the Understanding) ব্যবহার করে থাকে। সুতরাং দেশ ও কাল অহং-জ্ঞান কর্তৃক সংবেদনগুলির উপর আরোপিত। অহং-জ্ঞান যদি আত্মা হয় তাহ'লে বলতে হ'বে যে, আত্মা দেশ বা কালে নেই, পরন্তু দেশ ও কাল আত্মায় আছে। দেশ ও কাল যদি আত্মার ক্রিয়ার দুটি প্রকার হয় তাহ'লে আত্মা

দেশ ও কালাতীত হ'বে। দেশে না থাকার জন্য আত্মা কখনও বিভিন্ন অংশে বিচ্ছিন্ন হ'বে না, আর কালে না থাকার জন্য কোন এক বিশেষ মুহূর্তে এর সত্তা লুপ্ত হ'তে পারে না। অর্থাৎ, আত্মার ধ্বংস নেই, আত্মা অমর। কিন্তু এই আত্মাও একান্তই বিমূর্ত (Abstract) ও নৈর্ব্যক্তিক (Impersonal)। সংবেদনগুলির ঐক্য-বিধায়ক শক্তি ভিন্ন যে আত্মার অন্য কোনও পরিচয় নেই, সেই আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে সাধারণ লোকের কোনও ঔৎসুক্য নেই।

অদ্বৈত-বেদান্তমতে জীবাত্মা ও ব্রহ্মের মধ্যে পারমার্থিক দৃষ্টিতে কোন ভেদ নেই। জীবাত্মা স্বরূপত ব্রহ্ম; অজ্ঞান বা অবিদ্যার বশেই নিজেকে ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন, জন্ম-মৃত্যুর বশীভূত, সংসার-চক্রে বদ্ধ বলে কল্পনা করে। কিন্তু জীবাত্মা যখন স্বরূপত ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নয় তখন সে স্বভাবতই অজর, অমর। মৃত্যু তাকে স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু আত্মার অমরত্বের এই অদ্বৈতবাদী ব্যাখ্যাও সাধারণ মানুষকে তৃপ্তি বা সান্ত্বনা দিতে পারে না।

কোন কোন দার্শনিক আবার সর্ত-সাপেক্ষ অমরত্বে (Conditional immortality) বিশ্বাসী। সকল মানবাত্মাই অমর নয়। যে আত্মার অন্তর্নিহিত শক্তি পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে বিকশিত হয় নি, যে আত্মা পাপের কালিমালিপ্ত, সে আত্মা অমর নয়। দেহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তারও মৃত্যু ঘটে। যে সব আত্মার অন্তর্নিহিত শক্তি পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হ'তে পারে, যাদের মর্ত্য জীবন পবিত্র—তাদেরই ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময়, তারাই অমরত্বলাভ করতে পারে। এই মত আমাদের নৈতিক প্রচেষ্টায় এবং আধ্যাত্মিক সাধনায় প্রেরণা যোগায় সন্দেহ নেই, কিন্তু অমরত্ব লাভের উপযুক্ততা সম্বন্ধে কোনও সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড পাওয়া সম্ভব নয়, অর্থাৎ, যে সব আত্মা অমরত্ব লাভের অধিকারী এবং যে সব আত্মা অধিকারী নয় তাদের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট ভেদরেখা টানা অসম্ভব।

আত্মার অমরত্বের এই সব বিভিন্ন ব্যাখ্যার দিকে আপাতত দৃষ্টি না দিয়ে সাধারণ বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা আত্মার অমরত্ব বলতে কি বোঝেন ও কোন ধরনের অমরত্ব তাঁদের মতে কাম্য, আমরা সেই সম্বন্ধে আলোচনা করব। সাধারণত আমাদের মরণোত্তর জীবনের ধারণা আমাদের বর্তমান মর্ত্য জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। আমরা এ জীবনে যে সব দুঃখকষ্ট ভোগ করি—যথা, রোগ, দারিদ্র্য, স্বজন-বিয়োগ, প্রবলের অত্যাচার, অন্যায়ের পীড়ন ইত্যাদি—এই সকল থেকে মুক্ত, সুখী ও শান্তি-পূর্ণ জীবনই আমাদের কাম্য। বর্তমান জীবনে আমাদের যে সব আকাঙ্ক্ষা

অতৃপ্ত থেকে গিয়েছে, আমরা আশা করি যে, মরণোত্তর জীবনে সেগুলি তৃপ্ত হ'বে। মরণোত্তর জীবন যদি মর্ত্য জীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হ'ত বা এই দুইয়ের মধ্যে কোনও সাদৃশ্য না থাকত, তাহ'লে আমাদের এ আশা পূর্ণ হ'বার কোনও সম্ভাবনা থাকত না। সুতরাং আমরা চাই যে, মৃত্যু আমাদের জীবনে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হ'লেও আমাদের জীবনে যেন একটা পূর্ণচ্ছেদ না টানে, যেন মৃত্যুর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জীবনের মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা (Continuity) থাকে। এই ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য যা অপরিহার্য সেটি হচ্ছে স্মৃতি-শক্তিবিশিষ্ট চৈতন্য। দেহের ধ্বংসের পর আত্মার যদি চৈতন্য না থাকে এবং পূর্বজন্মের কোনও স্মৃতি না থাকে, তাহ'লে আত্মার ক্রমিক (অবিরাম) অস্তিত্বের কোন অর্থ হয় না। যুক্তিতর্কের খাতিরে যদি আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হই যে, মরণোত্তর জীবনে আত্মার চৈতন্য থাকে না তাহ'লে আত্মার অমরত্ব আমাদের কাছে আর বিন্দুমাত্র লোভনীয় বলে মনে হ'বে না। অমরত্বের আর একটি অপরিহার্য উপাদান হ'ল ব্যক্তিত্ব (Personality)। দেহের মৃত্যুর পরও আত্মার আত্ম-চেতনা, ভাবাবেগ ও ইচ্ছাশক্তি থাকা প্রয়োজন। ইহজীবনে আমরা যেমন নিজেকে অন্য বস্তু এবং ব্যক্তি থেকে পৃথক্ করে জানি, প্রতিকূল অবস্থায় দুঃখ এবং অনুকূল অবস্থায় আনন্দ অনুভব করি, কোন কাজ করবার সঙ্কল্প করি, পরজীবনেও সেইরকম করব, অন্তত করবার সম্ভাবনা থাকবে, এটা আমরা আশা করি। ইহজীবনে আমাদের যে সব অভাব ছিল সেগুলি পরজীবনে দূর করতে গেলে আত্মার ব্যক্তিত্ব থাকা একান্ত প্রয়োজন। আত্মার নৈতিক উন্নতি বা সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা লাভের জন্যও আত্মার ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন। আমরা বিশ্বাস করি যে, ইহজীবনে এমন কাজ করতে হ'বে যার ফলে মৃত্যুর পর আমরা স্বর্গে গিয়ে নানা রকম সুখভোগ করতে পারি, যে সব প্রিয়জন আমাদের ত্যাগ করে গিয়েছে তাদের সঙ্গে আবার মিলিত হ'তে পারি, সকল রকম পীড়াদায়ক সমস্যা থেকে মুক্তি পেয়ে শান্তিলাভ করতে পারি। ইহজীবনে আমাদের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও নৈতিক উন্নতির পথে যে সব বাধা ছিল পরজীবনে সেগুলি থাকবে না, অথচ ইহ-জীবনের সঙ্গে পরজীবনের একটা ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থাকবে, আমরা সাধারণত এইটিই কামনা করি।

9. আত্মার অমরত্বের সপক্ষে যুক্তি

এখন আমাদের জিজ্ঞাসা এই যে, সাধারণ বিচার-বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিরা

যে অর্থে আত্মার অমরত্ব কামনা করেন অথবা অমরত্বে বিশ্বাস করেন, সেই অর্থে আত্মার অমরত্বের সমর্থনে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক যুক্তি আছে কিনা। অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি মনে করেন যে, এরূপ যুক্তি দেওয়া সম্ভব। এই সব যুক্তির মধ্যে কয়েকটি এখানে দেওয়া হ'ল।

((i) দেহকে আমরা যে ভাবে অনুভব করি আর আত্মাকে যে ভাবে অনুভব করি তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এ দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের পদার্থ।) দেহ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থ, আত্মা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নয়, দেহের দৈশিক বিস্তার আছে, আত্মার নেই। দেহের ভিতরে যেসকল ক্রিয়া ঘটে সেগুলি প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন, কিন্তু আত্মা এই সব প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন নয়। আমরা নানা অবস্থার এবং নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে আমাদের আত্মার ঐক্য অনুভব করি, কিন্তু জড়দেহের এরূপ কোন ঐক্য নেই। যাদের স্বভাবের মধ্যে এত পার্থক্য সেই দেহ আর আত্মা কখনও এক হ'তে পারে না এবং তাদের পরিণতিও কখনও এক হ'তে পারে না। (প্রাণের ক্রিয়া বন্ধ হ'লে দেহের বিভিন্ন অংশ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন দিকে চলে যায়, কিন্তু আত্মার অংশ না থাকায় আত্মা এভাবে ধ্বংস হ'তে পারে না।)

(ii) দেহ ভিন্ন আত্মার অস্তিত্ব থাকতে পারে না, এই মত প্রমাণ করবার জন্য জড়বাদীরা বলেন যে, চৈতন্য মস্তিষ্কের অন্তর্বর্তী ক্রিয়া থেকে নিঃসৃত হয়ে থাকে। কিন্তু এক পদার্থ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী অপর একটি পদার্থ কি করে উৎপন্ন হ'তে পারে, সেটা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। মস্তিষ্কের প্রক্রিয়াগুলি একটা বিশেষ স্থানে ঘটে, কিন্তু চিন্তা বা চৈতন্যের ক্রিয়াগুলি কোন স্থানেই ঘটে না। মস্তিষ্কের ভিতরের ক্রিয়াগুলি যান্ত্রিক ক্রিয়া, জড়ের গতির বিভিন্ন রূপ, কিন্তু চিন্তা বা চৈতন্যের ক্রিয়াগুলির অধিকাংশই উদ্দেশ্যমূলক (Teleological)। 'দুই আর দুইয়ে চার হয়' এই সত্যের জ্ঞান কোন স্থানবিশেষে সীমিত নয়, হেতুবাক্য থেকে সিদ্ধান্তে বুদ্ধির গতি জড়-পদার্থের গতি(Physical movement)-র সঙ্গে তুলনীয় নয়। সুতরাং ("দুগ্ধ থেকে যেমন দধি নিঃসৃত হয়, বা যকৃৎ থেকে, যেমন পিত্ত নিঃসৃত হয়, ঠিক সেইরূপ মস্তিষ্কের ক্রিয়া থেকে চিন্তা বা চৈতন্য নিঃসৃত হয়", জড়বাদীদের এই সিদ্ধান্ত হাস্যকর।)

কোন কোন জড়বাদী বলেন যে, চিন্তা বা চৈতন্য মস্তিষ্কের ক্রিয়া থেকে নিঃসৃত না হ'লেও মস্তিষ্কের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে বা রোগের প্রভাবে কোন ব্যক্তির মস্তিষ্ক দুর্বল হয়ে পড়লে তার পক্ষে চিন্তা করা সম্ভব নয়। প্রত্যেক মানসিক ক্রিয়ার মস্তিষ্ক বা স্নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। সুতরাং কোন মানসিক ক্রিয়াই শারীরিক-

ক্রিয়া ছাড়া ঘটতে পারে না। স্নায়ুমণ্ডলীসমেত মস্তিষ্ক একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ যন্ত্র-বিশেষ। এটি নিজের নিয়মানুসারেই চলে, চিন্তা বা চৈতন্যের কোনও শক্তি এর উপর ক্রিয়া করতে পারে না। মন মস্তিষ্কের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল একটি উপবস্তু(Epi-phenomenon)-মাত্র। এই মত কিন্তু যুক্তিসহ বলে মনে হয় না। এমন বহু চিন্তন-ক্রিয়া আছে যাদের অনুরূপ কোন ক্রিয়া বা গতি মস্তিষ্কের মধ্যে আবিষ্কার করা যায় না। কোন ব্যক্তি যখন কোন পারিবারিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করবার জন্য চেষ্টা করেন, বা বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেন, বা সৌন্দর্য উপভোগ করেন, বা দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করেন, তখন তাঁর মনে যে সব চিন্তার উদয় হয় তাদের প্রত্যেকটির অনুরূপ কোন বিশেষ ক্রিয়া মস্তিষ্কে বা দেহে খুঁজে পাওয়া যা'বে না। সুতরাং আমাদের চিন্তা যে প্রত্যেক বিষয়েই মস্তিষ্কের ক্রিয়াদ্বারা নিয়ন্ত্রিত তার কোন উপযুক্ত প্রমাণ নেই। চিন্তা বা চৈতন্য যে আত্মার সার-ধর্ম সেই আত্মা মস্তিষ্কের ছায়া বা ক্ষণিক কার্য বা উপ-বস্তু হ'তে পারে না। মস্তিষ্কের ধ্বংসের সঙ্গেই যে আত্মার বিনাশ হ'বে, সে সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। বরং উচ্চ স্তরের মননক্রিয়ার জন্য আত্মা দেহের উপর নির্ভরশীল নয়, এরূপ মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে।

আত্মার, প্রত্যেক মনন-ক্রিয়ার অনুরূপ কোন না কোন দৈহিক ক্রিয়া আছে, অথবা দেহ ভিন্ন চৈতন্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায় না, এ দুটিকে তথ্য হিসাবে স্বীকার করলেও আত্মা যে দেহ থেকে উৎপন্ন হয়, এ রকম সিদ্ধান্ত অনিবার্য হ'বে না। কারণ,(দেহ আত্মার যন্ত্র বা প্রকাশের মাধ্যমও হ'তে পারে। সুতরাং দেহের ধ্বংসের সঙ্গে আত্মার ধ্বংস অনিবার্য নয়।)*

(iii) কিন্তু দেহের ধ্বংসের সঙ্গেই আত্মার ধ্বংস হয় না এটা স্বীকার করে নিলেও প্রশ্ন থেকে যায় যে, আত্মার জীবন যে অনন্ত কাল স্থায়ী হ'বে তার প্রমাণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাত্মবাদীরা বলেন যে, আত্মার স্বভাবের মধ্যেই তার প্রমাণ আছে। আত্মা এক ও নিরংশ, অর্থাৎ কতকগুলি বিভিন্ন বস্তুর সমষ্টিমাত্র নয়, সুতরাং কোনও সময়েই এর ঐক্যের ধ্বংস হ'বার সম্ভাবনা নেই।

(iv) চৈতন্য যদি আত্মার সার-ধর্ম হয় তাহ'লে দেহের মৃত্যুর পর অবশ্যই আত্মায় চৈতন্য থাকবে এবং যে সকল উচ্চস্তরের চিন্তা ও ভাবাবেগের জন্য আত্মা দেহের উপর নিভর করে না, সেগুলিও থাকবে। সুতরাং আমরা যাকে ব্যক্তিত্ব বলি তা-ও থাকবে। দৈহিক সম্ভোগ সম্বন্ধে ইহজীবনে আমরা যে সকল আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি সেগুলি তৃপ্ত

হ'বার সম্ভাবনা অবশ্য বিদেহ জীবনে থাকতে পারে না, কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর ইষ্ট বস্তুর জন্য যে সব আকাঙ্ক্ষা সেগুলি তৃপ্ত হ'তে পারে।

(v) দার্শনিক চিন্তার ফলে আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য যে, জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ বা প্রকাশ। পরমপুরুষ পরমাত্মা বিশ্ব-সৃষ্টির মাধ্যমে যে চরম প্রয়োজন সিদ্ধ করতে চান, প্রত্যেক জীবাত্মা সেই প্রয়োজনের কোন না কোন অংশের সিদ্ধির সহায়ক। সুতরাং তত্ত্ব-দৃষ্টিতে প্রত্যেক জীবাত্মারই জগতে একটি বিশেষস্থান ও মূল্য আছে। সেই মূল্য সংরক্ষণের জন্য প্রত্যেক আত্মারই অনন্ত জীবন থাকা আবশ্যক। সুতরাং আত্মা অমর।

(vi) (অনেকে বাস্তব তথ্যের সাহায্যে আত্মার অমরত্ব প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন।) তাঁদের ধারণা এই যে, মানুষের আত্মা দেহের ধ্বংসের পরেও আকাশে বাতাসে সঞ্চরণ করে এবং নানা উপায়ে তার জীবিত আত্মীয়-বন্ধুগণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে। নানা দ্রব্যের মাধ্যমে প্রেতাত্মাদের সঙ্গে কথা বলা বা ভাবের আদান-প্রদান করা সম্ভব, এটাও অনেকে বিশ্বাস করেন। (এই ধরনের তথ্য সংগ্রহ করে পরীক্ষা করে দেখার উদ্দেশ্যে England-এ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে Sir Oliver Lodge প্রমুখ কয়েকজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের পরিচালনায় Psychical Research Socicty নামে এক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমিতির সভ্যেরা মানবাত্মার অমরত্বের সমর্থনে অনেক বাস্তব তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন কিন্তু তাঁদের সিদ্ধান্তগুলি এখনও পর্যন্ত সাধারণভাবে বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিকদের, চূড়ান্ত সমর্থন পায়নি।)

(vii) কোন কোন দার্শনিক এই সব যুক্তির চাইতে নৈতিক যুক্তির উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁদের মতে বিশুদ্ধ জ্ঞানমূলক বিচারের (Theoretical Reason) দৃষ্টিতে যে সব সত্য প্রতিভাত হয় না ব্যবহারিক বিচারের (Practical Reason) দৃষ্টিতে তাদের আভাস পাওয়া যায়। আত্মার অমরত্ব সেইরূপ একটি সত্য। এই সত্য প্রমাণ করার জন্য ন্যায়শাস্ত্রসম্মত কোন নির্ভুল যুক্তি নেই, কিন্তু সার্থক নৈতিক জীবনের প্রয়োজনের দিক থেকে বিচার করলে একে একটি অবশ্যস্বীকার্য সত্য (Necessry postulate) বলে বিশ্বাস করতে হ'বে। বিখ্যাত দার্শনিক Immanuel Kant এই প্রসঙ্গে বলেন যে, ইন্দ্রিয়জ সুখভোগের প্রলোভনে বিচলিত না হ'য়ে কেবলমাত্র বিশুদ্ধ ব্যবহারিক বুদ্ধি (Pure Practical Reason)-প্রসূত নিঃসর্ত আদেশ (The Categorical Imperative)[1] পালন

1 "যখনই কোন কাজ করতে যাচ্ছ তখনই বিচার করে দেখবে যে, যে নীতি অনুসারে ঐ কাজটি করবে তদনুসারে সকলেই প্রত্যেক ক্ষেত্রে সেই কাজ করুক, এটা বাঞ্ছনীয় কি না।"

করে যাওয়াই মানুষের প্রধান কর্তব্য। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে কর্তব্যের জন্য কর্তব্য করা (Duty for duty's sake)-তেই মানুষের চরম চরিতার্থতা। কিন্তু মানুষের পক্ষে ইন্দ্রিয়-সুখের আকর্ষণ এত প্রবল যে, তার প্রকৃতিকে সম্পূর্ণভাবে বিচারবুদ্ধির বশে আনা অতি দুরূহ। এই কাজ মর্ত্য জীবনের অল্প-পরিসরের মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই কর্তব্যের আহ্বান থেকে মানুষের মুক্তি নেই। সুতরাং মানুষ দৈহিক মৃত্যুর পরও তার চরম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চেষ্টা করার সুযোগ পাবে—এটা স্বীকার করে নিতে হ'বে। কিন্তু এই উদ্দেশ্য পুরাপুরি সাধন করবার জন্য অনন্তকালের প্রয়োজন। সুতরাং মানবাত্মা অমর, এটাও স্বীকার করতে হ'বে। বলা বাহুল্য যে, এ রকম যুক্তিকে বিশুদ্ধ বিচার-বুদ্ধি দিয়ে সমর্থন করা যায় না।

মানবাত্মার অমরত্বের স্বপক্ষে সাধারণত যে সব যুক্তি দেওয়া হয়ে থাকে সেগুলির উল্লেখ করা হ'ল। এইসব যুক্তির কোনটিই সম্পূর্ণ সন্তোষজনক বলে মনে হয় না। এ সম্বন্ধে আর একটি মতের উল্লেখ করে এই প্রসঙ্গের উপসংহার করা যেতে পারে। (এটা আমরা ইই স্বীকার করতে বাধ্য যে, দেহের ধ্বংসের সঙ্গে মানুষের জীবনে যে পরিবর্তন আসে সেটা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, মরণোত্তর জীবন বলে যদি কিছু থাকেও, তাহ'লে সেই জীবন আর বর্তমান জীবনের মধ্যে কোন ঐক্যসূত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন) যে জীবন একান্তরূপেই দেহ-নির্ভর, দেহের ধ্বংসের পর সে জীবনে কোন ভোগ্যবস্তু বা ক্রিয়ার উপকরণ না থাকারই সম্ভাবনা। অপরপক্ষে, যে ব্যক্তি ইহজীবনেই তাঁর চিন্তাকে নিছক দেহের প্রয়োজন থেকে বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হয়েছেন, তাঁর মানসিক গঠন এমন এক স্তরে পৌঁছতে পারে যার ফলে মরণোত্তর জীবনেও ইহজীবনের ঐক্যসূত্র অটুট থাকে। অর্থাৎ, মানুষের মন কিছুটা পরিণত হ'লে তবেই অমরত্ব একটা সার্থক রূপ নিতে পারে। সেইজন্য কোন কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি মনে করেন যে, অমরত্বলাভ করার জন্য সাধনার প্রয়োজন। এই সাধনায় যিনি যত অগ্রসর হ'তে পারবেন অমরত্বলাভ করবার সম্ভাবনা তাঁর পক্ষে তত বেশী হ'বে।

10. পরা গতি

মানুষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা কাম্যবস্তু কি? কোন অবস্থায় পৌঁছলে মানুষ তার জীবনের চরম চরিতার্থতা বা পরিপূর্ণতা পায় এবং অনুভব করে

কাণ্টের মতে আমাদের প্রতি আমাদের বিচার-বুদ্ধির এইটাই আদেশ। এই আদেশ কোন পূর্ব-সর্তের উপর নির্ভর করে না।

যে, তার আর কিছু কাম্য নেই, সে সম্বন্ধে সকল ধর্মেই কোন না কোন ধারণা আছে। এই চরম পূর্ণতা বা পরিতৃপ্তির অবস্থাকে কখন অক্ষয় স্বর্গলাভ কখন বা মুক্তি, অপবর্গ, নির্বাণ, মোক্ষ প্রভৃতি বলা হয়েছে। এইসব ধারণার মধ্যে কিন্তু অল্পবিস্তর প্রভেদ আছে। (জড়বাদী দর্শনের মতে অবশ্য দেহের ধ্বংস অথবা মৃত্যুই মুক্তি। মানুষ জীবিত থাকতে যে সব দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে তার মৃত্যু হ'লেই সব কিছুর পরিসমাপ্তি। খ্রীষ্ট-ধর্মে বলা হয় যে, মানুষের চরম কাম্য Salvation—পাপ থেকে মুক্তি। মানুষের সব দুঃখ-দুর্দশার মূলে আছে পাপকর্ম। মানুষ যতদিন পর্যন্ত না পাপপ্রবৃত্তি সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করতে পারছে ততদিন পর্যন্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে তার মুক্তি নেই। করুণাময় ঈশ্বরই মুক্তিদাতা (Saviour) যীশুখ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র অথচ তাঁর সঙ্গে অ-ভিন্ন। ঈশ্বরই যীশুখ্রীষ্টরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন) এবং কি ভাবে মানুষ পবিত্র আদর্শ জীবন যাপন করতে পারে তা-ই শিক্ষা দিয়েছিলেন।) মানুষ যীশুখ্রীষ্টকে ঈশ্বরের একমাত্র অবতার বলে স্বীকার করে তাঁর শরণাগত হ'লে এবং তাঁর শিক্ষা অনুসারে জীবন-যাপন করলে পরিণামে সমস্ত পাপ থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে। ভারতীয় দর্শনে মুক্তি সম্বন্ধে নানা রকম মত আছে। (চার্বাক ভিন্ন অন্য সকল দর্শনেই বলা হয়েছে যে, নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে এবং জগতের চরম তত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতাই মানুষের সকল দুঃখদুর্দশার মূল। মানুষ অজ্ঞতার বশে নিজেকে দেহের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করে এবং দেহজ প্রবৃত্তির তাড়নায় নানা রকম কুকর্ম করে থাকে। কামনা বা বাসনার তাড়নায় কাজ করার ফলে মানুষকে বারবার জন্মগ্রহণ করতে হয়। এই হ'ল সংসার-চক্র। এই সংসার-চক্র থেকে মুক্তি পাওয়াই প্রকৃত মুক্তি।) ন্যায়দর্শনে বলা হয় যে, মানুষের দেহাত্ম-বোধই তার দুর্দশার কারণ। ন্যায়-দর্শনে জীবাত্মা, পরমাত্মা, আত্মার সঙ্গে দেহের সম্পর্ক প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সব তত্ত্বকথা বলা হয়েছে সেগুলির যথার্থ মর্ম গ্রহণ করতে পারলে এই দেহাত্মবোধ দূর হয়ে মানুষ তার আত্মার স্বরূপ জানতে পারে, এবং তার ফলে মুক্তি বা অপবর্গ-লাভ করে। মুক্ত আত্মায় চৈতন্য থাকে না, সুতরাং দুঃখবোধ অথবা সুখবোধ কিছুই থাকে না। সাংখ্যমতে পুরুষ বা জীবাত্মা চৈতন্যস্বরূপ, নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার, সকল দুঃখরহিত ও নিত্যমুক্ত, কিন্তু প্রকৃতির সংস্পর্শে এলে প্রকৃতিতে বুদ্ধি, মন প্রভৃতি উৎপন্ন হয় এবং মনে সুখ-দুঃখানুভূতির উদ্ভব হয়, এবং বুদ্ধি সুখ-দুঃখানুভূতিকে 'আমার' বলে নিশ্চয় করে। বুদ্ধিতে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব পড়ে বলে বুদ্ধিও চেতন বলে প্রতীয়মান হয়। পুরুষ নিজেকে বুদ্ধির (অর্থাৎ প্রকৃতির) সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করে। এটা

অবশ্য ভ্রম, কিন্তু এই ভ্রম হয় বলেই পুরুষ নিজেকে সুখদুঃখ-ভোগী, বদ্ধ বলে মনে করে। যথার্থজ্ঞান উৎপন্ন হ'লে পুরুষের এই ভ্রম দূর হয়ে যায় এবং সে বন্ধন থেকে, অর্থাৎ যে অবস্থাকে বন্ধন বলে কল্পনা করছিল তা-ই থেকে, মুক্ত হয়। এই মুক্তির অবস্থার নাম কৈবল্য। মুক্তিতে সকল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটে, কিন্তু কোন সুখানুভূতি থাকে না। (বৌদ্ধমতে মানব-জীবন দুঃখময়। জন্মই সকল দুঃখ-দুর্দশার কারণ। জীবের অবিদ্যার জন্যই সে বারবার জন্মগ্রহণ করে। এই অবিদ্যা দূর হ'লেই পুনর্জন্ম নিবারিত হয় এবং জীব নির্বাণলাভ করে।) এই নির্বাণ সুখ-দুঃখ প্রভৃতি সকল রকম অনুভূতিহীন এক চরম শান্তির অবস্থা। পূর্ব-মীমাংসামতে বেদবিহিত কর্ম সুসম্পন্ন করতে পারলে জীবের অক্ষয় স্বর্গবাস হয়। (অদ্বৈতবেদান্তমতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক। জীবাত্মা অবিদ্যার জন্য নিজেকে ব্রহ্ম হ'তে ভিন্ন, সুখ-দুঃখভোগী বদ্ধ জীব বলে মনে করে। ব্রহ্ম ও জীবের ঐক্যের জ্ঞান হ'লে জীব বন্ধন দশা থেকে মুক্ত হয়। এই অবস্থার নাম মোক্ষ।) মোক্ষদশায় কেবলমাত্র সর্বদুঃখের নিবৃত্তি হয় না—এটা একটা দিব্য আনন্দের অনুভূতির অবস্থা। ব্রহ্ম ও জীবাত্মা যে পরমার্থত এক এই যথার্থজ্ঞান উৎপন্ন হ'লে তবেই জীবের মুক্তি হ'তে পারে, মুক্তির আর অন্য কোনও পথ নেই। বিশিষ্টাদ্বৈতমতেও (রামানুজমতে) ব্রহ্মের স্বরূপের জ্ঞান জীবাত্মার মুক্তির পক্ষে অপরিহার্য, কিন্তু মুক্তিলাভের জন্য কর্মের এবং ভগবদ্ভক্তিরও প্রয়োজনীয়তা আছে। মুক্তাবস্থায় জীব অনন্ত আনন্দের অধিকারী হয়, কিন্তু ব্রহ্ম ও জীবের ভেদ-বুদ্ধি লুপ্ত হয় না।

নির্বাচিত পুস্তক-তালিকা

1. Martineau—Study of Religion.
2. Galloway—Philosophy of Religion.
3. A. S. Pringle-Pattison—The Idea of God. Lecture. XIII.
4. A. S. Pringle-Pattison—The Idea of the Immortality of the soul.

দ্বাদশ অধ্যায়

ঈশ্বর ও অমঙ্গলের সমস্যা

(God and the Problem of Evil)

1. ভূমিকা

"পরমকারুণিক পরমেশ্বরের সৃষ্ট জগতে এত অমঙ্গল কেন ?" —এই প্রশ্ন চিরকালই ধর্ম-প্রাণ মানুষদের মনকে পীড়িত করেছে। যে সব ঐতিহাসিক ধর্মে এক ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে সেই সকল ধর্মের শাস্ত্রগুলিতে ঈশ্বরকে জগতের সৃষ্টি-কর্তা, সর্বশক্তিমান, সকল কল্যাণগুণের আধার, সর্বজ্ঞ, করুণাময়, ন্যায়বান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ, ঈশ্বরের সৃষ্ট প্রাণীদের দুঃখ ও ক্লেশের অন্ত নেই। প্রত্যেক প্রাণীকেই জন্মের পরমুহূর্ত থেকে নানা রকম দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়। ক্ষুধা-তৃষ্ণাজনিত কষ্ট, রোগ-যন্ত্রণা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি প্রাণীমাত্রেরই প্রায় নিত্যসঙ্গী। মানুষের দুঃখ-কষ্টের তালিকা আবার আরও দীর্ঘ ; রোগ-যন্ত্রণা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদিত আছেই, তাছাড়া তাদের নানা রকম মানসিক যন্ত্রণাও ভোগ করতে হয়। আত্মীয়-স্বজনদের মৃত্যু, জীবন-যুদ্ধে অসাফল্য, আর্থিক ক্ষতি, বন্ধুদের কৃতঘ্নতা, দুর্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার প্রভৃতি এই তালিকার মধ্যে পড়ে। রিপুর তাড়নায় দুষ্কর্ম করার জন্য মানুষের প্রবৃত্তি, দুকর্মের কুফল, পাপ-বোধ, পাপকর্মের জন্য অনুশোচনা আর এক-শ্রেণীর অমঙ্গল। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগের ফলে এইসব অমঙ্গলের উৎপত্তি। পরস্পরের মধ্যে কলহ, বিবাদ, নিষ্ঠুর হিংসাত্মক কাজ, বিভিন্ন শ্রেণী, জাতি ও দলের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, এই সবই মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগের ফল। সাধারণ মানুষ অবশ্য এই সব অমঙ্গল সম্বন্ধে বিশেষ কোন চিন্তা করা আবশ্যক মনে করে না, কিন্তু প্রাণীদের এই সব দুঃখ কষ্ট যাঁদের গভীরভাবে বিচলিত করে, তাঁদের অনেকের মনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। তাঁরা হতাশভাবে প্রশ্ন করেন—"ন্যায়বান সর্ব-শক্তিমান করুণাময় ঈশ্বরের রাজ্যে এত অমঙ্গল কেন ? তবে কি ঈশ্বর নেই, অথবা তাঁর সম্বন্ধে তাঁর ভক্তেরা যে সব কথা বলে থাকেন সে সবই মিথ্যা ?" শাস্ত্রবাক্যে ও মহাপুরুষদের উপদেশে যাঁদের বিশ্বাস আছে তাঁদের মধ্যে অনেকে বলেন, "হাঁ, জগতে অনেক অমঙ্গল আছে সত্য,

কিন্তু তাহ'লেও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস ত্যাগ করা আমাদের পক্ষে উচিত নয়। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে অমঙ্গলের সমস্যা সমাধান করা অসম্ভব বলে বোধ হ'লেও ঈশ্বরের প্রতি অবিচলিত ভক্তি থাকলে কখনও না কখনও এ সমস্যার সমাধান হ'তে পারে, কিন্তু যতদিন না ঈশ্বর করুণা করে আমাদের জ্ঞানদান করেন ততদিন পর্যন্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস করা এবং তাঁর কাছে পরিপূর্ণভাবে আত্ম-সমর্পণ করা ভিন্ন অন্য উপায় নেই।"

মানুষের বিচার-বুদ্ধির ক্ষমতায় যাঁদের আস্থা আছে, তাঁরা বলবেন যে, বিচার-বুদ্ধিদ্বারা এই সমস্যার মীমাংসা করা যায় না, এটাই বা আমরা স্বীকার করব কেন? সমস্যাটি দুরূহ বটে, কিন্তু নিবিষ্টভাবে চিন্তা করলে এই সমস্যার সম্পূর্ণ সন্তোষজনক কোনও সমাধান না পাওয়া গেলেও সেই সমাধানের দিকে হয়ত কিছুটা অগ্রসর হওয়া যেতে পারে।

2. অমঙ্গল-সমস্যার বিভিন্ন সমাধান

অমঙ্গলের সমস্যাটিকে সংক্ষেপে এই ভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে। "জগতে নানা অমঙ্গল আছে। ঈশ্বর যদি এই সব অমঙ্গল নিবারণ করতে না পারেন তাহ'লে তিনি সর্বশক্তিমান ন'ন। আর যদি অমঙ্গল নিবারণ করতে সক্ষম হয়েও এটা না করেন তাহ'লে তিনি করুণাময় হ'তে পারেন না।" ঈশ্বর যদি সর্বশক্তিমান অথবা করুণাময় না হ'ন তাহ'লে তিনি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র হ'তে পারেন না। এমন কি তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সন্দেহ উপস্থিত হয়। ঈশ্বর যদি বন্যাকবলিত নিরীহ লোকেদের উদ্ধার না করেন তাহ'লে বুঝতে হ'বে যে, তাঁর দয়া নেই, আর যদি তাঁর তাদের উদ্ধার করবার ইচ্ছা থাকে, অথচ করেন না, তাহ'লে তাঁর ক্ষমতার অভাব আছে বুঝতে হ'বে। অথবা, যদি ঐ রকম লোকেরা বার-বার ধ্বংস হয়ে যায় তাহ'লে আমরা এও সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, যে সব প্রাকৃতিক নিয়মের কবলে পড়ে জীবেরা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে সেই সব নিয়মের কার্যকারিতা কিছু সময়ের জন্য নষ্ট করে সেই জীবদের রক্ষা করার ইচ্ছা বা ক্ষমতাসম্পন্ন কোন শক্তির অস্তিত্ব নেই।

এটা স্পষ্ট যে যাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না, যাঁরা মনে করেন যে জগতে যা কিছু ঘটছে, সে সমস্তই অসংখ্য প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে চালিত অসংখ্য অচেতন পরমাণুর ঘাত-প্রতিঘাতের ফল, তাঁদের পক্ষে অমঙ্গল সম্বন্ধে এ ধরনের কোন সমস্যাই নেই। তাঁদের মতে এ সম্বন্ধে আমাদের একমাত্র করণীয় হচ্ছে, যে সমস্ত জাগতিক কারণের

জন্য জীবেরা এবং বিশেষত মানুষেরা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে সেগুলি সম্বন্ধে সুনিয়মিতভাবে অনুসন্ধান করা এবং সেগুলি যাতে ঘটতে না পারে সেজন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা। জগতে অমঙ্গল কোথা থেকে এল, কেন এল, এর উদ্দেশ্য কি? —এসব প্রশ্নের সাধারণভাবে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা সময় ও শ্রমের অপব্যবহারমাত্র। যাঁরা বহুদেবতা ও অপদেবতায় বিশ্বাসী এবং যাঁরা মনে করেন যে, এই সমস্ত দেবতা ও অপদেবতারাই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আমাদের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের কারণ, তাঁদের সম্বন্ধেও বলা চলে যে, তাঁদের পক্ষে অমঙ্গলের প্রশ্ন সাধারণভাবে সমগ্র জগৎ সম্বন্ধে কোন সমস্যার সৃষ্টি করে না। কোন কোন দেবতার অনুগ্রহে আমরা সুখ-সমৃদ্ধি ভোগ করি; আবার কোন কোন অপদেবতার বিদ্বেষের ফলে আমরা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করি। কোনও দেবতা বা অপদেবতা যখন সর্বশক্তিমান ন'ন এবং যখন তাঁদের মধ্যেই ক্ষমতার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে, তখন আমরা কোন বিশেষ দেবতা বা অপদেবতাকে আমাদের সুখ-দুঃখের জন্য দায়ী করতে পারি না। স্তব, স্তুতি, মন্ত্র, পূজার্চনা প্রভৃতি দিয়ে এই সব দেবতা ও অপ-দেবতাকে সন্তুষ্ট রাখাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। সাধারণ-ভাবে অমঙ্গল-সমস্যা সমাধানের চেষ্টার কোনও সার্থকতা নেই।

যাঁরা অমঙ্গল-সমস্যার সমাধানের জন্য বিশেষ আগ্রহী ন'ন তাঁদের মধ্যে এক শ্রেণীর দার্শনিকদের উল্লেখ করা যেতে পারে। এঁদের মতে তথাকথিত অমঙ্গল-সমস্যা প্রকৃতপক্ষে কোন সমস্যাই নয়; কারণ, অমঙ্গলের কোন প্রকৃত সত্তা নেই। জগতে যে অমঙ্গল আছে, এই ধারণা আমাদের অজ্ঞানপ্রসূত। বিখ্যাত পাশ্চাত্য দার্শনিক স্পিনোজার মতে জগতের সকল বস্তুই ঈশ্বরের বিকার (Modes)। ঈশ্বর স্বয়ং-সম্পূর্ণ, সর্বদোষ-বর্জিত, সর্ব-ব্যাপী, অদ্বিতীয় সত্তা। এই জগৎ তাঁর থেকে উদ্ভূত এবং তাঁতেই স্থিত। প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বর আর জগতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং জগতে কোনও দোষ-ত্রুটী থাকতে পারে না। আমাদের জ্ঞানের অপূর্ণতার জন্যই আমরা জগতে দোষ-ত্রুটী দুঃখ, কষ্ট, অমঙ্গল ইত্যাদি কল্পনা করে থাকি। কিন্তু যখন সমস্ত বস্তু ও ঘটনাকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে একই সত্তার প্রকার বলে উপলব্ধি করি, অর্থাৎ যখন আমরা জ্ঞানের সর্বোচ্চ স্তরে উঠি, তখন জগৎকে সম্পূর্ণভাবেই সুশৃঙ্খল, সুসমঞ্জস, শ্রী ও মাধুর্য-মণ্ডিত বলে মনে হয়। সুতরাং অমঙ্গল যখন নেই তখন অমঙ্গলঘটিত সমস্যাও নেই।

অদ্বৈতবেদান্তে বলা হয়েছে যে, পরব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ, কিন্তু মায়া বা অবিদ্যার প্রভাবে ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশিত হ'তে পারে না, সেই জন্যই

অবভাসিক জগতে দুঃখ, কষ্ট, পাপ ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়। মানুষ যখন পূর্ণজ্ঞান লাভ করে তখন সে সমগ্র জগৎকেই ব্রহ্মময় বলে উপলব্ধি করে। সুতরাং অমঙ্গলের প্রকৃত অস্তিত্ব নেই।

অমঙ্গল সমস্যার এই প্রকার সমাধানকে কিন্তু প্রকৃত সমাধান বলা চলে না। সমস্যাটিকে এক ক্ষেত্র থেকে অপর এক ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করা হয় মাত্র। যদি আমরা স্বীকার করি যে, জগতে যে সব দোষ-ত্রুটী, দুঃখ-কষ্ট প্রভৃতি দেখতে পাওয়া যায়, সে সব অবিদ্যা বা অজ্ঞান-প্রসূত, তাহ'লে আমাদের অজ্ঞতাও ত একটি দোষ, এবং এই দোষের উদ্ভব বা উপস্থিতি কি করে সম্ভব হ'ল? কেবলাদ্বৈতবাদীরা এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে সক্ষম হয়েছেন বলে মনে হয় না। স্পিনোজা আমাদের জ্ঞানের তিনটি স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে, আমাদের জ্ঞান যখন সর্বনিম্নস্তরে থাকে তখন প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের ভ্রান্ত ধারণা জন্মায়। কিন্তু জ্ঞানের এই যে স্তরবিভাগ এটি ত চরমতত্ব (Absolute truth), এবং নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক পূর্ণসত্তায় বহু অনর্থের জনক নিম্নস্তরের জ্ঞান স্থান পেল কেন? ভারতে কেবলাদ্বৈতবাদীরা বলেন যে, আমরা ভ্রমবশত ব্রহ্মে দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদি আরোপ করি। বস্তুত পারমার্থিক দৃষ্টিতে দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদি কিছু নেই। কিন্তু এই ভ্রমবশত আরোপকার্য, এটাও প্রকৃত তত্ত্ব, এবং এক, অদ্বিতীয় চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মসত্তার সঙ্গে ভ্রমের সঙ্গতি কি ভাবে হ'তে পারে? সুতরাং মনে হয় যেন কেবলাদ্বৈতবাদীরা সমস্যাটির প্রকৃত সমাধানের চেষ্টা করেন নি।

যাঁরা সমগ্র জগতের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং এক সর্বশক্তিমান করুণাময় সৃষ্টিকর্তা বিধাতা পুরুষের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, তাঁদের কাছেই আমাদের প্রশ্ন একটি সাধারণ সমস্যার আকারে দেখা দেয় এবং তাঁরাই এই সমস্যার সমাধানে আগ্রহী। বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি, ধর্ম-প্রাণ ভাবুক ও দার্শনিক এই দলের অন্তর্গত।

3. দ্বৈতমূলক ঈশ্বরবাদ

কেউ কেউ, এমন কি কোন কোন দার্শনিকও মনে করেন যে, ঈশ্বরকে এক অদ্বিতীয় চরমসত্তা বলে স্বীকার করলেই অমঙ্গল সমস্যার উদ্ভব হয়, কিন্তু ঈশ্বর থেকে পৃথক্ ও স্ব-তন্ত্র অন্য কোন দ্রব্য, শক্তি বা ব্যক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করলে এই সমস্যার কিছুটা সমাধান হ'তে পারে। যেমন, ঈশ্বর থেকে পৃথক্, ঈশ্বর-নিরপেক্ষ এবং ঈশ্বরের ন্যায়ই চিরস্থায়ী

জড়পদার্থের (Matter) অস্তিত্ব স্বীকার করলে এই সিদ্ধান্ত করতে পারা যায় যে, জগতে যা কিছু দোষ-ত্রুটী আছে সেই সমস্তের জন্য এই জড়পদার্থই দায়ী, আর যা কিছু শুভ, মঙ্গলময় ও সুন্দর তা-ই ঈশ্বরের সৃষ্টি। ঈশ্বরের শুভ ইচ্ছা বা মঙ্গলময় প্রচেষ্টা জড়পদার্থের কাছে বাধা পেয়ে বিফল হয়ে যায় এবং সেই জন্যই আমরা সর্বত্র অপূর্ণতা, অ-শুভ, অ-মঙ্গলের পরিচয় পাই।

ধারণা-বাদী (Idealist) প্রাচীন গ্রীক্ দার্শনিক প্লেটো (Plato)-র মতে ধারণা-সমূহ (Ideas or Forms) শুদ্ধসত্তার আধার হ'লেও এগুলি থেকে পৃথক্ একটি পদার্থ আছে। এটিকে তিনি কখনও জড় (Matter বা Hyle) কখনও দেশ (Space), কখনও শূন্য (Non-being) বলেছেন। জগতে যে ঐক্য, শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য ও সুষমা আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে, বিচার-বুদ্ধি (Reason)র দৃষ্টিতে তাদের উৎস হ'ল এই ধারণাসমূহ, আর জগতে একই শ্রেণীভুক্ত বিভিন্ন বস্তুর পার্থক্য ও বিরোধ থেকে উদ্ভূত অসামঞ্জস্য, বিশৃঙ্খলা, কুশ্রীতা প্রভৃতির জন্য দায়ী ঐ দ্বিতীয় পদার্থ। চরম মঙ্গলের ধারণা (The Idea of the Good), যাকে প্লেটো কখনও ঈশ্বর থেকে ভিন্ন এবং কখনও ঈশ্বরের সঙ্গে অ-ভিন্ন বলে বর্ণনা করেছেন, ধারণা-সমষ্টির মাধ্যমে আত্ম-প্রকাশ করে থাকে। এই ধারণাগুলি ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের বিষয় নয়। বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা (Reason)-র সাহায্যেই আমরা এদের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে পারি। ধারণাজগতে কেবল শুদ্ধ-সত্তা, শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে সর্বত্রই অ-ভাব, অসত্য, বিশৃঙ্খলা ও কুশ্রীতা। এই জড়পদার্থ থেকে বাধা পায় বলেই বিশুদ্ধ ধারণাগুলি বহির্জগতে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশলাভ করতে পারে না। বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার দৃষ্টিতে অমঙ্গল বলে কিছু নেই।

সাংখ্য-দর্শনে পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদ স্বীকার করা হয়েছে। পুরুষ নিত্যসিদ্ধ, নিত্যমুক্ত, চৈতন্যস্বরূপ সত্তা, আর প্রকৃতি অচেতন, ত্রিগুণাত্মিকা সদা পরিবর্তনশীল শক্তি, জগদ্বৈচিত্র্যের মূল কারণ। দুঃখ-কষ্ট, ত্রিতাপ অমঙ্গল প্রভৃতির আবাস প্রকৃতি। শুদ্ধচৈতন্য পুরুষকে কোনও দুঃখ-কষ্টই স্পর্শ করে না। পুরুষ যে প্রকৃতি থেকে পৃথক্, এই জ্ঞানের অভাবই পুরুষের দুঃখ-কষ্টের কারণ। প্রকৃতি আছে বলেই পুরুষ নিজেকে প্রকৃতির সঙ্গে অ-ভিন্ন মনে করে দুঃখাদিদ্বারা অভিভূত হয়ে থাকে। প্রকৃতি দ্বারা বাধা পায় বলেই পুরুষ দৃশ্যমান জগতে নিত্যস্বরূপে প্রকাশিত হ'তে পারে না।[1]

---

1 সাংখ্যদর্শনোক্ত পুরুষ অবশ্য ঈশ্বর ন'ন, তা সত্ত্বেও কোন কোন দ্বৈতবাদী দর্শনে কি

কোন কোন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিরা বিশ্বাস করেন যে, জগতে দুটি বিরোধী শক্তির সংগ্রাম চলছে। এদের মধ্যে একটি শুভ-শক্তি, অপরটি অশুভ-শক্তি। শুভ-শক্তিই ঈশ্বর। তিনি ন্যায়বান এবং করুণাময়, আর তাঁর বিরোধী শক্তি ক্রূর, হিংসাপরায়ণ এবং জীবের অনিষ্টকারী। বাইবেলে এই দ্বিতীয় শক্তিকে শয়তান (Satan) বলা হয়েছে। শয়তানের কাজ হচ্ছে প্রতি পদে ঈশ্বরের শুভেচ্ছা ব্যাহত করা, তাঁর সৃষ্ট জীবদের নানা রকম প্রলোভন দেখিয়ে পাপের পথে নিয়ে যাওয়া এবং তাদের অশেষ ক্ষতিসাধন করা। পারসীকদের প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র জেন্দাভেস্তায় 'অহুরা মজ্‌দা' এবং 'অহ্রিমান' নামে দুই বিরোধী শক্তির কথা আছে। অহুরা মজ্‌দা সর্বগুণান্বিত করুণাময় ঈশ্বর আর অহ্রিমান্ ঠিক তাঁর বিপরীত। জগতে যা কিছু ভাল তা এসেছে ঈশ্বর বা অহুরা মজ্‌দার কাছ থেকে, আর যা কিছু মন্দ তার জন্য দায়ী শয়তান বা অহ্রিমান্। যে মতবাদে এরূপ দুটি বিরোধী শক্তির কল্পনা করা হয় তাকে **ঈশ্বর-দ্বিত্ববাদ** (Di-Theism বা Manichaeism) বলা হয়। যাঁরা এই দ্বিত্ব-বাদে বিশ্বাস করেন তাঁরা অমঙ্গল-সমস্যা সমাধানের একটি সহজ সূত্র পেয়েছেন বলে দাবী করতে পারেন। ঈশ্বর অনন্ত শক্তিমান হ'লেও সর্বশক্তিমান ন'ন। তাঁর উদ্দেশ্য-সাধনের পথে অনেক বাধা আছে; সুতরাং তাঁর সৃষ্ট জগতে যদি কিছু অমঙ্গল থাকে তা-তে তাঁর করুণাময়ত্বের কোন হানি হয় না।

দ্বৈত-মূলক ঈশ্বরবাদ অথবা ঈশ্বর-দ্বিত্ববাদ স্বীকার করলে হয়ত অমঙ্গল-সমস্যার একটা সহজ সমাধান হ'তে পারে, কিন্তু তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলে এই ধরনের মতবাদকে সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত বলে মনে করা যায় না। ভাল এবং মন্দ, মঙ্গল এবং অমঙ্গল, উপকারী এবং ক্ষতিকর জগতের সর্বত্রই পরস্পরের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত যে, কোনও বস্তুর কতটা অংশ ঈশ্বরের সৃষ্টি ও তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন এবং কতটা অংশের জন্য ঈশ্বর থেকে পৃথক্ কোন বস্তু (যেমন অচেতন জড়বস্তু), অথবা ঈশ্বর-বিদ্বেষী অপর কোন শক্তিমান ব্যক্তি (যেমন শয়তান অথবা অহ্রিমান্) দায়ী, তা নির্ণয় করার কোন উপায় নেই। অচেতন জড়বস্তু যে স্বরূপত মন্দ বা অমঙ্গলের উৎস, এ রকম মনে করার সপক্ষে কোন প্রবল যুক্তি নেই। আমাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বহু উপাদান যখন আমরা জড়-বস্তুর মধ্যেই পেয়ে থাকি তখন আমাদের যাবতীয় দুঃখকষ্টের জন্য জড়-বস্তুকেই একান্তভাবে দায়ী করা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। ঈশ্বর-দ্বিত্ববাদকেও

ভাবে অমঙ্গল-সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে, তার উদাহরণস্বরূপ সাংখ্যদর্শনের মতবাদের উল্লেখ করা হ'ল।

এইভাবে সমালোচনা করা যেতে পারে। ঈশ্বর গোলাপ-ফুল সৃষ্টি করেছেন কিন্তু শয়তান গোলাপ-ফুলের কাঁটা সৃষ্টি করেছে, এটা বিশ্বাস করা কঠিন। একই বস্তু বিশেষ অবস্থায় বিষ এবং অপর এক অবস্থায় উপকারী ঔষধ। যে আগুন ভিন্ন আমাদের জীবনযাত্রা অচল হয়ে পড়ে, সেই আগুনই আবার সময়বিশেষে আমাদের সর্বস্ব পুড়িয়ে ছাই করে দেয়; সুতরাং এই সব বস্তুর কতটা অংশ ঈশ্বরের সৃষ্টি আর কতটা অংশ ঈশ্বর-বিরোধী কোন শক্তির সৃষ্টি, তা জানবার কোন উপায় নেই। শয়তান আমাদের পাপকার্য করতে প্রলুব্ধ করে, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের মনে পাপকার্য করবার প্রবৃত্তি সৃষ্টি না করলে মানুষকে প্রলুব্ধ করবার জন্য শয়তানের চেষ্টা বিফল হ'ত। সুতরাং আমাদের দুঃখযন্ত্রণা এবং আমাদের কৃত পাপকার্যের কুফল প্রভৃতির জন্য জড়বস্তু, শয়তান বা অহ্রিমান্‌কে দায়ী করলে সেটা দার্শনিক বিচারে যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচিত হ'বে না। সুতরাং দ্বৈতমূলক ঈশ্বর-বাদ বা ঈশ্বর-দ্বিত্ববাদ সাধারণ লোকের কাছে চিত্তাকর্ষক বলে মনে হ'লেও দার্শনিক দৃষ্টিতে এসব মতবাদের বিশেষ মূল্য নেই।

4. একেশ্বরবাদ

যাঁরা এক অদ্বিতীয় সর্বশক্তিমান প্রেমময়, করুণাময় ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন তাঁদের মধ্যে অনেকে বলেন যে, অমঙ্গল এই জগতের পূর্ণতা (Perfection)-র একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অমঙ্গলের মাধ্যমেই আমরা মঙ্গলের প্রকৃত রূপের সন্ধান পাই। দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা প্রভৃতি আছে বলেই সুখ, স্বস্তি, স্বাচ্ছন্দ্য আমাদের কাছে এত মনোরম বলে বোধ হয়। রিপুর দুর্বার প্রলোভন আছে বলেই আত্মসংযম, সততা, নিষ্ঠা, সত্যবাদিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের আমরা প্রশংসা করে থাকি। দুঃখযন্ত্রণাবিহীন, সরল, নিষ্পাপ জীবনের বিশেষ মূল্য আমরা দিই না। নানারূপ দুঃখ, কষ্ট, অভাব, দারিদ্র্য, রিপুর তাড়না প্রভৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করার ফলেই আমাদের প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিকশিত হ'তে পারে। বিচার-বুদ্ধিবিশিষ্ট, বিবেকবান, আদর্শনিষ্ঠ জীবই ঈশ্বরকর্তৃক সৃষ্ট সমস্ত বস্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। জগতের বহু বিরোধী-শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করে মানুষ যাতে তার মনুষ্যত্বকে বিকশিত করবার সুযোগ পায় এবং সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতালাভ করতে পারে, সেই জন্য ঈশ্বর নিজেই নানারূপ অমঙ্গলের সৃষ্টি করেছেন। আমরা যে সব বস্তুকে অশুভ বা অবাঞ্ছনীয় বলে মনে করি, সেগুলিকে জগৎ সৃষ্টির চরম উদ্দেশ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখি বলেই তাদের এত ভয়াবহ বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে

জগতের উৎকর্ষ সাধনের জন্য তাদেরও প্রয়োজন আছে। সুতরাং মানব-জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশই যদি জগৎ-স্রষ্টার উদ্দেশ্য হয় তাহ'লে অমঙ্গলকে মঙ্গল বা শ্রেয়ের উপায় বলে বুঝতে হ'বে এবং তাহ'লে ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা এবং করুণাময়তায় অবিশ্বাস করবার কোন হেতু থাকবে না। অর্থাৎ, জগতে প্রচুর অমঙ্গলের অস্তিত্ব থাকলেও ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান ও করুণাময় বলতে কোন বাধা নেই, বরং অমঙ্গলের মধ্যেই ঈশ্বরের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়।

সমগ্র জগৎকে আমরা দুই অংশে ভাগ করতে পারি—প্রাকৃতিক জগৎ ও মনুষ্য-জগৎ। প্রাকৃতিক জগৎ মানুষের ইচ্ছার পরিচালনাধীন নয়; এখানে যা কিছু ঘটে সে সমস্তই কতকগুলি অমোঘ প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই ঘটে। এই জগতে মানুষের সুখ, দুঃখ, আশা, আকাঙ্ক্ষা, সাফল্য, নৈরাশ্য প্রভৃতির কোন স্থান নেই। মনুষ্যেতর প্রাণীরা এই প্রাকৃতিক জগতের অন্তর্ভুক্ত। তাদের অতি নিম্নস্তরের জ্ঞান বা চৈতন্য, সুখ-দুঃখবোধ ইত্যাদি থাকলেও প্রাকৃতিক জগতের উপর তাদের কোন স্থায়ী প্রভাব নেই। কিন্তু প্রাকৃতিক জগতের একাংশের উপর মানুষ তার নিজ বুদ্ধির বলে প্রভাব বিস্তার করেছে। সে আপন বুদ্ধিবলে এমন সব বস্তু নির্মাণ করতে পারে যারা মানুষের ইচ্ছানুসারে চালিত হয়, এবং মানুষের কর্তৃত্ব মেনে নিতে এবং মানুষের নিয়মানুসারে কাজ করতে বাধ্য। বহু মানুষ একত্র মিলে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করে এবং এদের মাধ্যমে নানা অভাব দূর করে নিজেদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবার জন্য চেষ্টা করে। জড়জগতের একাংশ মানুষ আত্মসাৎ করেছে এবং এই জগতে যে সব শক্তি কাজ করে তাদের যথাসাধ্য নিজের বশীভূত করে নানাভাবে ব্যবহার করে। জগতের যে অংশের সঙ্গে মানুষ এমন ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট সেই অংশের পরিধির মধ্যে প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে মানুষের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, চরিত্র গঠিত হয়, কর্ম-ক্ষমতা বাড়ে। কিন্তু এই সংঘর্ষের ফলে মানুষের বহু দুঃখকষ্টভোগও অনিবার্য। আবার মানুষের দুঃখ, দুর্দশা, মানসিক অশান্তি প্রভৃতির একটা বড় অংশ তার স্বাধীন ইচ্ছার অপব্যাবহারের ফল। মানুষ যদি প্রত্যেক ক্ষেত্রে তার ইচ্ছা-শক্তিকে শুভ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য চালনা করত তাহ'লে এই সব দুঃখ-কষ্ট, মানসিক অশান্তি থেকে মুক্ত থাকত। কিন্তু এই স্বাধীন ইচ্ছার যথাযথ ব্যবহারের ক্ষমতাতেই মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্ব। এই ক্ষমতার অভাবে মানুষ ও ইতর প্রাণীর ব্যবধান অনেকটাই লুপ্ত হয়ে যায়। মানুষের ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য থাকলেই তার অপব্যবহারের সম্ভাবনাও নিশ্চয়ই থাকবে, কিন্তু এই অপব্যবহারের

সম্ভবনা রোধ করার আন্তরিক চেষ্টাই সকল রকম নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির মূল।

একেশ্বরবাদীরা মনে করেন যে, এই সব তথ্যের সাহায্যে অমঙ্গল-সমস্যার একটা সুসঙ্গত সমাধান করা সম্ভব। জগতে যে সব বস্তু আছে এবং যে সব ঘটনা ঘটে সেগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে চিন্তা না করে তাদের মধ্যে যে নানা রকম সম্বন্ধ আছে সেগুলির দিকে দৃষ্টি রেখে বিবেচনা করলে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় যে, জগতে যা কিছু ঘটে সকলেরই মূলে কোন না কোন উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু কোন ইষ্টসিদ্ধি যদি উদ্দেশ্য হয় তাহ'লে সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে সব উপাদান, সামগ্রী বা প্রক্রিয়ার প্রয়োজন সেগুলিও শুভ বা বাঞ্ছনীয় হ'বে। উদ্দেশ্য-সাধনের উপায়গুলিকে সেই উদ্দেশ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে সেগুলি সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং ঈশ্বরের সৃষ্ট জগৎকে বিচার করতে হ'লে এই সৃষ্টির উদ্দেশ্যের কথা মনে রাখতে হ'বে। সুখদুঃখবোধ বা ইষ্টানিষ্ট-জ্ঞানযুক্ত জীবের অস্তিত্ব না থাকলে, শুভ-অশুভ মঙ্গল-অমঙ্গলের কোন ভেদ থাকত না। বিচারবুদ্ধিবিশিষ্ট বিবেকবান জীব অর্থাৎ মানুষই সৃষ্ট পদার্থগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, আর যিনি সত্য, শিব ও সুন্দরের সর্বোচ্চ আদর্শকে নিজের জীবনে রূপায়িত করতে সক্ষম হয়েছেন তিনিই শ্রেষ্ঠ মানব। আদর্শ মানবসৃষ্টি বা জগতে মনুষ্যত্বের পরম বিকাশকেই করুণাময় পরমেশ্বরের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য মনে করা যুক্তিসঙ্গত। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে ঈশ্বর যে সকল উপায় অবলম্বন করেন, বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে সেগুলির প্রত্যেকটিকে জীবের পক্ষে সুখকর অথবা মঙ্গলজনক বলে মনে নাও হ'তে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী হ'লে সেগুলিকেও শুভ বা মঙ্গলজনক বলে স্বীকার করতে হ'বে। এস্থলে আরও মনে রাখতে হ'বে যে, অমিশ্র সুখভোগই মানুষের পক্ষে পরম ইষ্ট নয়। সুতরাং শ্রেষ্ঠ, আদর্শ জীবন লাভ করার জন্য চেষ্টার পথে যদি নানা রকম দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয় তাহ'লে এটাকে ঈশ্বরের নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক বলে মনে করা সঙ্গত হ'বে না। রুক্ষ ও প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে কঠোর সংঘর্ষের ফলে মানুষের শারীরিক শক্তি ও চারিত্রিক উৎকর্ষ বাড়ে এবং অন্তরের কুপ্রবৃত্তির তাড়না প্রতিরোধের চেষ্টায় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়। সুতরাং এই দৃষ্টিতে বিচার করলে জগতে যে সব ব্যবস্থার ফলে মানুষের দুঃখযন্ত্রণা, মানসিক অশান্তি ইত্যাদি ভোগ করে সেগুলিকে বিশুদ্ধ অমঙ্গল বলে সিদ্ধান্ত করা উচিত হ'বে না। প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সংঘর্ষ যদি না থাকত তাহ'লে হয়ত সে দুঃখযন্ত্রণার কবল থেকে

মুক্ত থাকত, আর যদি তার ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য না থাকত তাহ'লে তার পক্ষে পাপ ও পুণ্যের কোন প্রভেদ থাকত না ; কিন্তু তার মানুষ্যত্বের মহিমা বা মর্যাদা থাকত না, মানুষ আর ইতরপ্রাণী বা জড়বস্তুর মধ্যে কোন প্রভেদ থাকত না। নানা প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়ে, নানা বাধা-বিপদ অতিক্রম করে, নানা প্রলোভনের সঙ্গে সংগ্রাম করে জয়ী হয়ে মানুষ অমৃতত্বের অধিকারী হ'বে, দিব্যজীবন লাভ করবে—এই যদি ঈশ্বরের উদ্দেশ্য হয় এবং জগতের সমগ্র বিধি-ব্যবস্থা যদি সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী হয় তাহ'লে কারুণিকতায় অথবা সর্বশক্তিমত্তায় সন্দেহ করা অযৌক্তিক হ'বে।

5. একেশ্বরবাদীদের মতের সমালোচনা

এই মতটি অনেকাংশে যুক্তিযুক্ত বলে মনে হ'লেও অনেক চিন্তাশীল দার্শনিক এই মতের প্রতিকূল সমালোচনা করেছেন। এই মতের বিরুদ্ধে প্রথম আপত্তি এই যে, এই বিশাল, বৈচিত্র্যময় জগতের তুলনায় অতি অল্প সংখ্যক তথ্যের উপরই এই মতটিকে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করা হয়েছে। যে সকল তথ্য এই মতের অনুকূল কেবলমাত্র সেইগুলিকেই বিবেচনা করা হয়েছে, আর প্রতিকূল তথ্যগুলিকে পরিহার করা হয়েছে। এর ফলে যুক্তিটির শক্তি অনেক পরিমাণে কমে গিয়েছে। ইতর-প্রাণীজগতের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, ইতরপ্রাণীরা অসংখ্য ক্ষেত্রে যে সব শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করে সেগুলি থেকে তাদের কি উপকার হয়, অথবা তারা কি শিক্ষালাভ করে তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। এক নিরীহ দুর্বল প্রাণী যখন একটি হিংস্র মাংসাশী পশুর আক্রমণে জর্জরিত হয়ে প্রাণত্যাগ করে তখন এই যন্ত্রণাভোগের ফলে যে ঐ প্রাণীটির কোন উপকার হয় একথা কেউ স্বীকার করবেন না, অথচ প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে হিংস্র পশুদের পক্ষে অন্য প্রাণীদের হত্যা করা ছাড়া উপায় নেই। জলপ্লাবনের ফলে যখন দলে দলে গবাদি পশু প্রাণ হারায় তখন এই প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার ফলে তাদের কি উপকার বা শিক্ষালাভ হয়, তা-ও আমরা বুঝতে পারি না। বৈজ্ঞানিকেরা অবশ্য প্রাণিজগতে ক্রমবিকাশের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'জীবন-সংগ্রাম' (Struggle for existence), 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' (Survival of the fittest) প্রভৃতি নিয়মের কথা বলে থাকেন, কিন্তু এই সব নিয়মানুসারে এক একটি প্রাণি-জাতির ক্রমবিকাশ ঘটলেও যে সব প্রাণী নানা যন্ত্রণা সহ্য করে জীবনযাত্রায় পরাজিত হয়ে পৃথিবী ত্যাগ করে

তাদের সান্ত্বনার কি হেতু থাকতে পারে? কোন কোন দার্শনিক এই মত প্রকাশ করেছেন যে, ইতর-প্রাণীরা সুখ-দুঃখ ভোগ করে না, তারা চলমান যন্ত্রমাত্র। কিন্তু ইতর প্রাণীদের মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলীর গঠন এবং বিশেষ বিশেষ অবস্থায় তাদের ব্যবহার পরীক্ষা করলে এ মতকে যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় না। মানুষের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, মানুষকে এমন অনেক কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় যার ফলে দুর্দশাগ্রস্ত লোকের কোন উপকার বা চারিত্রিক উন্নতি হওয়া সম্ভব নয় বলেই মনে হয়। যে সব শিশু বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মগ্রহণ করে বা বংশগত রোগযন্ত্রণা ভোগ করে বা অসৎ লোকেদের পাপকার্যের ফলে যে সব অমঙ্গলের সৃষ্টি হয়, তাদের প্রত্যেকটিই যে আদর্শ মনুষ্যত্বের বিকাশের সহায়ক, আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় এই মতের সমর্থন নেই। কোন ব্যক্তির দুরারোগ্য ব্যাধি হ'লে বা অকালমৃত্যু ঘটলে বা অর্থাভাবে দারুণ কষ্ট পেলে মনুষ্যসমাজ এগুলি থেকে শিক্ষা পেতে পারে, ভবিষ্যতে যাতে এই সব দুর্দশা রোধ করতে পারা যায় সেজন্য ব্যবস্থা করতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তি দুর্দশা ভোগ করে তার দুর্দশা যে প্রতি ক্ষেত্রেই তার ভবিষ্যৎ উন্নতির কারণ হ'বে, এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। এ রকম আরও বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। এই সব তথ্য বিবেচনা না করলে পূর্বোক্ত মতবাদকে চিত্তাকর্ষক বলে মনে হ'বে, কিন্তু যিনি সত্যান্বেষী তাঁর পক্ষে এগুলিকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়।

এই মতবাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, এর সমর্থকেরা ঈশ্বর কর্তৃক জগৎ সৃষ্টি ও প্রতিপালনের চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলেন সে সম্বন্ধে আমাদের সকলের মধ্যে মতৈক্য হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। সকল রকম চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক সদ্গুণে ভূষিত, দিব্যজীবনের অধিকারী আদর্শ মানব সৃষ্টি করাই যে সমস্ত জাগতিক ব্যবস্থার চরম উদ্দেশ্য, এটা জানা গেল কি উপায়ে? এইটিকেই যথার্থ উদ্দেশ্য বলে প্রথমে স্বীকার করে নিলে অবশ্য জগতের বহু ঘটনার সুসঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, কিন্তু প্রকৃত ঘটনাগুলির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করলে আমাদের অন্য সিদ্ধান্ত করতে হয়। মানুষের মঙ্গল, সততা, ধর্ম-ভাব প্রভৃতির সঙ্গে জাগতিক নিয়মগুলির যেন কোনও সংস্পর্শই নেই, বরং অনেক ক্ষেত্রে বিরোধিতা আছে। নদীর খরস্রোত সাধুব্যক্তির নৌকার প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে না, ধার্মিক ব্যক্তিকে রক্ষা করার জন্য বজ্রপাতের গতিপথ বদলায় না, ঝঞ্ঝাবাত চরিত্রবান ব্যক্তির সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে এমনও দেখা যায় না[1]। জগতের ভবিষ্যৎ

---

1. "Streams will not curb their pride
The just man not to entomb

সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত এই যে, জ্যোতিষ্কগুলি থেকে ক্রমাগত তাপ বিকীরণের ফলে কালক্রমে জগতের এমন একটা হিমশীতল অবস্থা আসবে যখন প্রাণী বলে জগতে কিছুই থাকবে না, মানুষ তার অক্লান্ত চেষ্টায় যা কিছু গঠন করেছে—তার সভ্যতা, সংস্কৃতি, নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা, সমস্তই মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যাবে।[2] সুতরাং প্রকৃত তথ্যের উপর যদি কোন মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তাহ'লে আদর্শ মনুষ্যত্বের বিকাশকে জগতের উদ্দেশ্য বলে স্বীকার করা যায় না। সুতরাং জগতের সমস্ত বিধি-ব্যবস্থা যে আদর্শ মনুষ্যত্বের বিকাশের পক্ষে উপযোগী, এটি যেমন সন্দেহের বিষয়, জগৎ-স্রষ্টার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, সে সম্বন্ধেও সন্দেহের প্রচুর অবকাশ আছে। সুতরাং একেশ্বরবাদীরা যে যুক্তির সাহায্যে অমঙ্গল সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেন সেটি অত্যন্ত দুর্বল।

6. কর্মবাদ

এই প্রসঙ্গে হিন্দুধর্মে প্রচলিত কর্মবাদের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই মতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজ কর্মানুসারে ফলভোগ করে থাকে। কোন জীব কোন বিশেষ কর্মের ফলভোগ করবে তার জন্য ঈশ্বর দায়ী ন'ন। তিনি করুণাময়। সব জীব সুখলাভ করুক, এটাই তাঁর ইচ্ছা। কিন্তু কোন ব্যক্তিবিশেষ সৎ কাজ করবে অথবা অসৎ কাজ করবে এটা তার নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। সুতরাং তার নিজের সুখদুঃখের জন্য সে নিজেই দায়ী। কর্মবাদের সঙ্গে সাধারণত জন্মান্তরবাদও জড়িত। আমরা এ জন্মে যে সুখদুঃখ ভোগ করি সেগুলি কেবলমাত্র আমাদের এ জন্মের কর্মফল নয়, আমাদের পূর্বজন্মের কর্মেরও ফল এবং আমরা এ জন্মে যে সকল কর্ম করি তার ফলভোগ এ জন্মে অথবা পরজন্মে অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে যে নানা বিষয়ে প্রভেদ আছে—যেমন কেউ বুদ্ধিমান, কেউ নির্বোধ, কেউ কর্মদক্ষ, কেউ সর্বকর্মে অপটু, কেউ বিদ্বান, কেউ

Nor lightning go aside
To give his virtues room
Nor is that wind less rough
That blows a good man's barge".

2. "All the labours of the ages, all the devotion, all the iuspiration, all the noon-day brightness of human genius are destined to extinction in the vast death of the solar system". B. Russell—Mysticism and Logic (Penguin book) p. 51.

মূর্খ, কেউ ধনী, কেউ দরিদ্র, কেউ সুখী, কেউ দুঃখী—তার জন্য ঈশ্বরে পক্ষপাতিত্ব দোষ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। সুতরাং ঈশ্বরের সর্ব-শক্তিমত্তা ও করুণাময়ত্বের সঙ্গে অমঙ্গলের কোন বিরোধ নেই।

কিন্তু আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা কর্মবাদকে (ও তার সঙ্গে সংযুক্ত পুনর্জন্মবাদকে) কতটা সমর্থন করে, সেটা বিচার্য। ন্যায়বান, পক্ষপাত-শূন্য করুণাময় ঈশ্বরের অস্তিত্বকে পূর্ব-স্বীকার্য (Postulate) বলে মেনে নিলে অবশ্য কর্মবাদের সপক্ষে একটা যুক্তি পাওয়া যায়; কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব পূর্বেই স্বীকার না করে যদি প্রকৃত তথ্যের ভিত্তিতে কর্মবাদের সত্যতা যাচাই করা হয় তাহ'লে এর সমর্থক যুক্তিকে অত্যন্ত দুর্বল বলেই মনে হ'বে।

কর্মবাদের সমর্থনে কোন সর্বজনগ্রাহ্য প্রত্যক্ষপূর্ব যুক্তি (Apriori argument) নেই। "কার্য-মাত্রেরই কারণ থাকবে"—এই সার্বিক নিয়মের ভিত্তিতে কর্মবাদ প্রমাণ করা অসম্ভব। কোন ব্যক্তি যদি বর্তমানে দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করে তার একটা কারণ অবশ্যই থাকবে, কিন্তু সেই কারণ যে কেবলমাত্র তারই কৃত কর্ম, এরূপ মনে করার কোন হেতু নেই। এর অসংখ্য অন্য কারণ থাকতে পারে। কোন মোটর চালকের অসতর্কতার ফলে নিরীহ পথচারীর মৃত্যু ঘটতে পারে। কোন দুষ্ট ব্যক্তির চক্রান্তের ফলে সাধুব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে পারে; অজ্ঞ, অপটু চিকিৎসকের চিকিৎসার ফলে রোগীর মৃত্যু ঘটতে পারে—এ সবই আমাদের প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট। অপরপক্ষে, পরম পুণ্যাত্মা ব্যক্তিও দুঃখ ভোগ করেন এবং পাপী ব্যক্তিও সুখভোগ করে, এ রকম ব্যাপারও অহরহ দেখা যায়। সুতরাং কোন ব্যক্তির দুঃখ-দুর্দশার জন্য প্রাকৃতিক ঘটনা বা অবস্থা অথবা অন্য ব্যক্তির কর্ম যে কারণ হ'তে পারে না, এরূপ সিদ্ধান্ত করার পক্ষে কোন তথ্য-ভিত্তিক যুক্তি নেই। কোন ব্যক্তির দুঃখদুর্দশার জন্য কেবলমাত্র অতীতে কৃত তার নিজের কর্মই দায়ী, এই বিশ্বাস উৎপন্ন করতে গেলে আমাদের কোন বিশেষ কর্মের ফলে কোন সুখ, এবং কোন বিশেষ কর্মের ফলে কোন দুঃখ উৎপন্ন হয়, সেটা দেখানো প্রয়োজন। বিশেষ করে যেখানে বর্তমান জন্মের সুখ-দুঃখের জন্য পূর্বজন্মের কর্মকে কারণ বলা হচ্ছে, সেখানে অন্তত কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ কর্মের সঙ্গে বিশেষ ফলের নিত্যসংযোগ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা প্রয়োজন। কিন্তু এরূপ করা অসম্ভব। অধিকন্তু, প্রকৃত তথ্যের ভিত্তিতে জন্মান্তরবাদ প্রতিষ্ঠিত করা অত্যন্ত কঠিন। যে ব্যক্তি মৃত্যুর পর অপর এক ব্যক্তিরূপে জন্মাল সে এবং ঐ অপর ব্যক্তি যে অ-ভিন্ন তার প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে স্মৃতির নিরবচ্ছিন্নতায়। অর্থাৎ, যদি ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তি

তাঁর পূর্বজন্মের কথা নির্ভুলভাবে স্মরণ করতে পারেন তবেই প্রমাণ হ'তে পারে যে, এই দুই ব্যক্তি একই ব্যক্তি। এইরূপ জাতিস্মর ব্যক্তির কথা মাঝে মাঝে শোনা যায় বটে, কিন্তু এরূপ ব্যক্তিরা তাঁদের পূর্ব-জন্মের যে সব বিবরণ দিয়ে থাকেন সেগুলির সত্যতা সন্দেহাতীত নয়। কেবলমাত্র বর্তমান জন্মে কতকগুলি ব্যক্তির মধ্যে কোন কোন বিষয়ে বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করে সেই বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা করার জন্য পর্ববর্তী জন্মের যে কল্পনা, তার কোন দৃঢ় ভিত্তি নেই।

7. সসীম ঈশ্বরবাদ

ডব্লিউ জেমস্ (W. James) প্রমুখ কয়েকজন দার্শনিক মনে করেন যে, অমঙ্গল-সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় হ'ল ঈশ্বরকে সসীম বলে স্বীকার করা। এঁরা ঈশ্বর-দ্বিত্ববাদী ন'ন তবে বহুবাদী, অর্থাৎ এঁরা ঈশ্বর থেকে পৃথক্ এবং সর্বাংশে না হ'লেও কিছু পরিমাণে স্বতন্ত্র জীবাত্মা সমূহের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। এঁদের মতে সমগ্র জগৎ ঈশ্বর এবং অসংখ্য জীবাত্মার সমষ্টি। আমরা যাকে জড়বস্তু (Matter) বলি তার কোন প্রকৃত সত্তা নেই, এটা বহু জীবাত্মার পরস্পরের উপর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন একটি অবভাস (Appearance)-মাত্র। জীবাত্মাদের বিভিন্ন শ্রেণী আছে। উচ্চ শ্রেণীর জীবাত্মাদের ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য ও কর্ম-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আছে। ঈশ্বরের ক্ষমতা জীবাত্মাদের ক্ষমতাদ্বারা সীমিত (ঈশ্বর-সদৃশ কোন দ্বিতীয় শক্তি বা জড়বস্তুদ্বারা নয়)। তিনি সর্বেসর্বা (All in all) বা সর্ব-শক্তিমান ন'ন। তিনি মূলত জীবাত্মাদের মতই, তবে বহুগুণে অধিক শক্তিমান। তিনি সমকক্ষদের মধ্যে প্রথম (Primus inter pares)। ঈশ্বরের শক্তি সীমিত হওয়ার জন্যই তিনি একা স্বতন্ত্রভাবে জগতের সমস্ত অমঙ্গল দূর করতে পারেন না। তিনি আমাদের সাহায্যের উপর নির্ভর করেন। বর্তমানে জগতে অনেক দোষ-ত্রুটী আছে, এবং এই সমস্ত দোষ-ত্রুটী দূর করে জগৎকে সর্বাংশে এবং সম্পূর্ণভাবে নির্দোষ করবার দায়িত্ব কেবলমাত্র ঈশ্বরের নয়, আমাদেরও।

অন্যান্য দার্শনিকেরা কিন্তু সসীম-ঈশ্বর-বাদ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ন'ন। তাঁদের মতে জগতের যে স্রষ্টা বা নিয়ন্তা অসীম ন'ন, প্রকৃতপক্ষে তাঁকে ঈশ্বর বলা যায় না। কারণ এরূপ পুরুষের জ্ঞান এবং ক্ষমতার সীমা আছে, এটা স্বীকার করলেই আমাদের এটাও স্বীকার করতে হ'বে যে, এই সীমা কোথায় এবং কতদূর বিস্তৃত সে সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কিছু বলা যায় না। সুতরাং

জগতে যেখানেই দোষ-ত্রুটী দেখতে পাওয়া যায়, সব ক্ষেত্রেই সেগুলিকে ব্যাখ্যা করার জন্য যদি ঈশ্বরের অক্ষমতার উল্লেখ করা হয়, তা'হলে শেষপর্যন্ত ঈশ্বর ও আমাদের মধ্যে জ্ঞান ও ক্ষমতার ব্যাপারে কোনও প্রভেদই থাকে না এবং ঈশ্বরের সাহায্য বা করুণাভিক্ষা করা নিরর্থক হয়ে পড়ে। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান, এই বিশ্বাস না থাকলে মানুষের ধর্ম-জীবনের মূল ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।

8. দুঃখবাদ (Pessimism)

জগতে দুঃখ, দুর্দশা, পাপ ও অমঙ্গলের প্রাচুর্যের কথা চিন্তা করলে অনেক সময়ে আমাদের মনে আমাদের জীবনের সার্থকতা সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ ও নৈরাশ্য জন্মায়। আমরা হতাশভাবে প্রশ্ন করি—এই অশেষ দুঃখ-দুর্দশার কবল থেকে পরিত্রাণ পাবার কি কোনও উপায় নেই? যাদের মন ও শরীর দুর্বল, যারা দরিদ্র, সমাজ-ব্যবস্থার ফলে অত্যাচারিত, তাদের মনে এই ধারণা হওয়াই স্বভাবিক যে, জগৎ দুঃখময়, জীবনের আদিতেও দুঃখ অন্তেও দুঃখ। সুতরাং এ জীবন যত শীঘ্র শেষ হয়ে যায় ততই মঙ্গল। ঈশ্বরই আমাদের ভাগ্য-বিধাতা। তিনি সর্বশক্তিমান ও পরম করুণাময়, তাঁকে আশ্রয় করলে সকলের দুঃখ দূর হয়—ধার্মিক ব্যক্তিরা এই সকল কথা বলে সাধারণ লোকদের সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেন, কিন্তু সে চেষ্টা সব সময়ে সফল হয় না। এমন দার্শনিকও কেউ কেউ আছেন যাঁরা জগতের প্রকৃতি সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করেই এই সিদ্ধান্তে পেঁৗছেচেন যে, জগতে সুখ থেকে দুঃখের ভাগ অনেক বেশী, সাধারণ মানুষের পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে সুখলাভের কোন আশা নেই। দুঃখের কবল থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র উপায় জন্ম-নিবারণ। জন্ম হ'লেই দুঃখ অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং যাতে জন্ম না হয়, সেই চেষ্টা করতে হ'বে। দেহের ধ্বংস, অর্থাৎ দৈহিক মৃত্যুই কিন্তু জীবনের সমাপ্তি নয়। এক দেহ ধ্বংস হ'লে জীব নিজ কর্মফলে অপর এক দেহে জন্ম নেয়। সুতরাং যাতে পুনর্জন্ম না হয় সেই চেষ্টা করা প্রয়োজন। বুদ্ধ বলেছেন যে, অবিদ্যা, অর্থাৎ জগৎ সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের অভাবই জন্মের আদি কারণ এবং জন্মই দুঃখের কারণ। সুতরাং দুঃখ নিবারণ করতে হ'লে জন্ম নিবারণ করা প্রয়োজন, এবং জন্ম-নিবারণ করতে হ'লে শেষ পর্যন্ত অবিদ্যা দূর করা প্রয়োজন। জার্মাণ দার্শনিক Schopenhauer (শোপেনহাওয়ার) বলেন যে, জগৎ দুঃখময়। আমরা যাকে সুখ বলে মনে করি এবং যাকে আয়ত্ত করার জন্য নানারকম চেষ্টা

করি, সেটা মরীচিকামাত্র। জন্ম হ'লেই দুঃখ অবশ্যম্ভাবী এবং জন্মের কারণ হচ্ছে "বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা" (The Will to Live)। এই আকাঙ্ক্ষাই সকল অনর্থের মূল এবং একে দূর করতে না পারলে দুঃখ নিবারণের কোন সম্ভাবনা নেই। যাঁরা সর্ব-শক্তিমান পরম করুণাময় ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন তাঁরা সাধারণত সুখবাদী বা আশাবাদী (Optimist) হয়ে থাকেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বরের রাজত্বে সুখের চাইতে দুঃখের আধিক্য থাকতেই পারে না। মানুষের জীবনে যা কিছু দুঃখ ও অমঙ্গল দেখতে পাওয়া যায়, ঈশ্বরের কৃপায় সে সমস্তই দূর করা সম্ভব। ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীনে মানব-সমাজ ক্রমাগত জ্ঞান ও কর্মের ক্ষেত্রে উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে এবং এমন এক সময় নিশ্চয়ই আসবে যখন সমস্ত অমঙ্গল দূর হ'য়ে যাবে অথবা অমঙ্গলের পরিমাণ অনেক কমে যাবে। যাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে দৃঢ়বিশ্বাসী অমঙ্গলসমস্যা তাঁদের বিচলিত করতে পারে না, এবং তাঁরা এই সমস্যার দার্শনিক সমাধান আবিষ্কার করবার জন্য বিশেষ আগ্রহীও ন'ন।

9. উপসংহার

ধর্ম-প্রাণ ব্যক্তির ভাবাবেগের দৃষ্টিতে অমঙ্গল-সমস্যা সমাধানের চেষ্টা না করে যদি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই সমসার বিচার করা হয় তাহ'লে এইরকম একটা সমাধান করা যেতে পারে।—

এক, অদ্বিতীয়, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, ন্যায়বান, করুণাময়, মঙ্গলময় পরমেশ্বর এই পরিদৃশ্যমান জগতের স্রষ্টা, এটা স্বীকার করে নিলেও আমাদের স্বীকার করতে হ'বে যে, ঈশ্বর যে জগৎ সৃষ্টি অথবা নির্মাণ করবেন তার একটা নির্দিষ্ট রূপ বা আকার নিশ্চয়ই থাকবে। ঈশ্বরের পক্ষে সৃষ্টি করা অথবা আত্ম-প্রকাশ করা একই, এবং 'প্রকাশিত হওয়া'র অর্থই হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট রূপ বা আকার নেওয়া। যার কোনও নির্দিষ্ট রূপ বা আকার নেই সেটি কোন বস্তুই নয়। জগৎ যদি দেশ ও কালে প্রকাশিত হয় তাহ'লে তার কতকগুলি অংশ থাকবে, সেই অংশগুলির মধ্যে সম্বন্ধ থাকবে এবং সেই সম্বন্ধগুলি কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন থাকবে। জগৎ যদি দেশ ও কালের মাধ্যমে প্রকাশিত না হয় তাহ'লে অন্য কোন মাধ্যমে প্রকাশিত হ'বে এবং সেই প্রকাশেরও কতকগুলি নিয়ামক ব্যবস্থা থাকবে। সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরও সম্পূর্ণ অনির্দিষ্ট, অনিয়ত জগৎ সৃষ্টি করতে পারেন না। এতে অবশ্য ঈশ্বরের শক্তির অভাব সূচিত হয় না,

ঈশ্বর যে বুদ্ধি বা প্রজ্ঞাস্বরূপ, তাঁর স্বভাবে চরম বিরোধিতা নেই, এটাই সূচিত হয়। জগতের প্রত্যেক বস্তু ও ঘটনা যদি নিয়মের অধীন হয় তাহ'লে কোন কিছুই স্বয়ংসম্পূর্ণ, দোষত্রুটীবিহীন হ'তে পারে না। স্পষ্ট, সসীম জগৎমাত্রেরই এই ত্রুটী অবশ্যম্ভাবী এবং সেইজন্য সেই জগতের অধিবাসী জীবমাত্রেরই সুখ-দুঃখভোগ অনিবার্য।

ঈশ্বরকে আমরা সাধারণত যে ভাবে কল্পনা করি এবং তাঁর কাছে যে ব্যবহার প্রত্যাশা করি, সেটা মানুষ সম্বন্ধে আমাদের ধারণাকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। ঈশ্বরে মনুষ্য-ধর্ম আরোপ করা (Anthropomorphism) আমাদের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা। ঈশ্বরকে আমরা পিতা, মাতা, সখা, রাজা, শাসক ইত্যাদিরূপে কল্পনা করি এবং আমাদের সঙ্গে ঈশ্বরের ব্যবহারও এই সব সম্বন্ধের উপযোগী হ'বে আশা করি, কিন্তু তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে এ ধরনের কল্পনার অসম্পূর্ণতা সহজেই ধরা পড়ে।

জগৎকে দেশ ও কালে থাকতে হ'লে এবং স্থায়ীভাবে থাকতে গেলে এর প্রত্যেক বস্তু ও ঘটনাই কতকগুলি সাধারণ নিয়মের বশে চলবে, এটা অবশ্যম্ভাবী। কোন সাময়িক উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্য অথবা কোন বিশেষ জীবের প্রয়োজনে সেই সব নিয়মের ব্যতিক্রম হ'তে পারে না। প্রাকৃতিক নিয়মের পক্ষপাতহীনতা অপরিহার্য। প্রাকৃতিক নিয়মের সার্বিকতা ও অলঙ্ঘণীয়তা স্বীকার করে নিলে জীবেরা দুঃখকষ্ট ভোগ করে কেন, তার একটা সদুত্তর পাওয়া যায়। তবে কি জীবের সুখদুঃখ শুভাশুভের সঙ্গে ঈশ্বরের কোনও সম্পর্ক নেই? এর উত্তরে আমরা বলতে পারি যে, ঈশ্বরের প্রকাশ এই জগতের মাধ্যমে হ'লেও মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শের মাধ্যমেই তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হয়ে থাকে। জড়জগতের সঙ্গে মানুষের জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এই জগতের মধ্যেই, সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মের বশ্যতা স্বীকার করেই মানুষকে বাঁচতে হয়। মানুষ জগৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করতে, আত্মোপলব্ধি করতে চায়। মানুষের এই আশা, আকাঙ্ক্ষা, আদর্শানুরাগ প্রভৃতির মাধ্যমেই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ আত্ম-প্রকাশ। মানুষ অথবা মানুষ অপেক্ষাও কোন উন্নততর জীব নানা বাধা, বিপত্তি ও প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চরম সার্থকতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। জড়সত্তা থেকে প্রাণ-সত্তা, প্রাণসত্তা থেকে বিজ্ঞান-সত্তা, বিজ্ঞান-সত্তা থেকে চৈতন্য-সত্তা, চৈতন্য-সত্তা থেকে ঐশী-সত্তা বা দিব্য-সত্তায় পরিণতি লাভ করাই যেন সমগ্র জগতের মূল লক্ষ্য। ঈশ্বরের প্রেম বা করুণা এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই প্রকাশিত হচ্ছে। কোন বিচ্ছিন্ন বস্তু বা ঘটনা আমাদের দুঃখের কারণ হ'লে ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা ও করুণাময়তায় সন্দেহ করা অযৌক্তিক, অর্থাৎ

মানুষের রীতি এবং ঈশ্বরের রীতি যে ঠিক এক রকম হ'বে, এটা আমরা আশা করতে পারি না। একটা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে জগৎকে বিচার করাই যুক্তিসঙ্গত।

নির্বাচিত পুস্তক-তালিকা

1. J. Martineau—A Study of Religion.
2. M. Edwards—Philosophy of Religion.
3. A. S. Pringle-Pattison—The Idea of God, Lecture. XX

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ধর্মবিরোধী মতবাদ

(ধর্ম যে ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনকে প্রভাবিত করে, একথা অস্বীকার করা যায় না।) যেমন ব্যক্তিমনে ধর্মীয় ধারণা, আবেগ, অনুভূতি ও ইচ্ছার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়, তেমনই সামাজিক সংস্থা হিসেবেও ধর্মকে বিশ্বজনীন (universal) বলা যায়। (এমন কোন মানব-সমাজ বা এমন কোন মানব-সম্প্রদায় নেই, যেখানে ধর্ম-বিশ্বাসী লোক দেখা যায় না, বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয় না।) সুতরাং মানব-জীবনে ধর্মের অস্তিত্ব অস্বীকার করার অর্থ আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতাকেই অস্বীকার করা। ধর্মের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব সর্বজনস্বীকৃত হ'লেও তাত্ত্বিক বা দার্শনিক বিচারে ধর্মের বাস্তবতা স্বীকার করা যায় কিনা, এ-সম্বন্ধে মতবিরোধ আছে। আমরা একাধিকবার উল্লেখ করেছি যে, (অতীন্দ্রিয় সত্তায় বিশ্বাস ও তার ব্যাপারে বিশেষ ধরনের আবেগ, অনুভূতি ও ক্রিয়ানুষ্ঠান নিয়েই ধর্ম। 'বিশেষ ধরনের' শব্দের তাৎপর্য হ'ল, অতীন্দ্রিয় সত্তার ব্যাপারে যে-কোন অনুভূতি, আবেগ ও ইচ্ছাকেই ধর্ম বলা যায় না। ইন্দ্রজালের মধ্যেও অতীন্দ্রিয়ে বিশ্বাস আছে, (কিন্তু ইন্দ্রজালকে ঠিক ধর্ম বলা হয় না। অতীন্দ্রিয়কে মানুষের পক্ষে মঙ্গলকর ও মানুষের সুখ-দুঃখের ব্যাপারে সহানুভূতিশীল বলে বিশ্বাস করাই হ'ল ধর্মের বিশেষ লক্ষণ, এবং এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই ধর্ম ইন্দ্রজাল থেকে পৃথক্।) অবশ্য এখানে মনে রাখা দরকার যে, যে অতীন্দ্রিয়ে বিশ্বাসকে ভিত্তি করে ধর্ম গড়ে ওঠে, তা' যে কেবল ইন্দ্রিয়ের আগ্রাহ্য তাই নয়, মানুষের তুলনায় তাকে অনেক শক্তিমান ও একেশ্বরবাদে তাকে সর্বশক্তিমান বলেও কল্পনা করা হয়। কিন্তু এই অতীন্দ্রিয় ও অতিমানবীয় শক্তি বাস্তব, না মানুষের কল্পনামাত্র, এ সম্বন্ধে দার্শনিক বিচারের অবকাশ আছে। অনেক চিন্তানায়ক ধর্মের তাত্ত্বিক বাস্তবতা, এমন কি ব্যক্তিজীবনে ও সমাজ-জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করেছেন। ধর্ম-দর্শনে ধর্মের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। সুতরাং ধর্মের বাস্তবতা যাঁরা অস্বীকার করেছেন, ব্যক্তি-জীবনে ও সমাজ-জীবনে ধর্মের মূল্য ও প্রয়োজনীয়তার বিরুদ্ধে যাঁরা মত দিয়েছেন, তাঁদের সম্বন্ধে আলোচনা না করলে, ধর্মদর্শনের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

ধর্ম-বিরোধী মতবাদগুলিকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। কতকগুলি মত হ'ল দার্শনিক ও কতকগুলি বৈজ্ঞানিক। অর্থাৎ কেউ কেউ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ধর্মের বাস্তবতা ও যথার্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, আবার কেউবা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মের বাস্তবতাকে অস্বীকার করেছেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যাঁরা ধর্মের বিরোধিতা করেছেন, তাঁদের মধ্যে কেউবা ধর্মের সমালোচনা করেছেন সমাজ-বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে। কারণ, ধর্ম একটি সামাজিক সংস্থা ও সামাজিক রীতি-নীতি এবং আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। আবার কোন কোন চিন্তানায়ক ধর্মের সমালোচনা করেছেন এবং অবাস্তবতা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে ; কারণ, তাঁদের মতে ব্যক্তি নিয়েই সমাজ, ও ধর্মের প্রকৃত উৎপত্তি ব্যক্তির মনে। ধর্ম-বিরোধী মতবাদগুলির মধ্যে আমরা কয়েকটি প্রধান ও বিশিষ্ট মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করব। প্রথমে আমরা বৈজ্ঞানিক মতবাদগুলি আলোচনা করব, ও পরে আলোচনা করব দার্শনিক মতবাদগুলি নিয়ে। বৈজ্ঞানিক মতবাদগুলির মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক মত নিয়ে আমরা আলোচনা আরম্ভ করব।

1. মনঃসমীক্ষণ (Psycho-analysis) : ফ্রয়েড (Freud)-এর মত

মনঃসমীক্ষণ মূলত মানসিক রোগের একটি চিকিৎসা-পদ্ধতি। কিন্তু এই চিকিৎসা-পদ্ধতির ব্যবহার করতে গিয়ে মানুষের মন সম্বন্ধে যে-সব তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলির সুসংহতির ফলে মন সম্পর্কে যে বিশেষ মতবাদ গড়ে উঠেছে তাকেও বলা হয় মনঃসমীক্ষণ (Psycho-analysis)। সিগমুণ্ড ফ্রয়েড (Sigmund Freud) বিংশ শতকের প্রথম ভাগে ভিয়েনায় এই পদ্ধতির প্রচার করেন। ফ্রয়েড ঠিক এই পদ্ধতি বা মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা না হ'লেও এই মতের প্রচার ও প্রসারের ব্যাপারে তাঁর অবদান সর্বপ্রধান এবং বর্তমান মনঃসমীক্ষণ-মতবাদের সঙ্গে ফ্রয়েডের নাম ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা ফ্রয়েডের মতই আলোচনা করব। ধর্ম সম্বন্ধে ফ্রয়েডের মত আলোচনার পূর্বে সাধারণভাবে মনঃসমীক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

ফ্রয়েডের মতে মানুষের মনের প্রধানত তিনটি স্তর আছে—সংজ্ঞান (conscious), আসংজ্ঞান (pre-conscious) ও নির্জ্ঞান (unconscious)। ফ্রয়েড মানসিক রোগের চিকিৎসার ব্যাপারে এই নির্জ্ঞান স্তরের সম্বন্ধেই বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। আমাদের সংজ্ঞানে যেমন ধারণা,

প্রক্ষোভ (emotion), আবেগ ও ইচ্ছা আছে, ঠিক তেমনই আছে আমাদের নির্জ্ঞানে। বরং সংজ্ঞানে যেগুলি থাকে তাদের তুলনায় নির্জ্ঞানের ধারণা প্রক্ষোভ ও ইচ্ছার সংখ্যা অনেক বেশি। অথচ এদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা সচেতন নই। কিন্তু আমাদের সংজ্ঞানের ভুল-ভ্রান্তি, এবং অনেক প্রক্ষোভ ও ক্রিয়া-কলাপের ব্যাখ্যা বাস্তব ও সংজ্ঞানের কোন বৃত্তি দিয়েই সম্ভব নয়। ফ্রয়েডের মতে এগুলির উপযুক্ত ব্যাখ্যা মেলে নির্জ্ঞান স্তরকে বিশ্লেষণ করলে। যে পদ্ধতিতে নির্জ্ঞানে বিভিন্ন ধারণা, প্রক্ষোভ, ইচ্ছা ইত্যাদির অস্তিত্বের চিহ্ন পাওয়া যায়, তার নাম অবাধ-ভাবানুষঙ্গ-পদ্ধতি (Free-association method)।

(ফ্রয়েডের আর একটি বিশিষ্ট মত হ'ল, যৌন আবেগই মানব-মনের মৌল আবেগ (impulse)। এটি প্রধানত জাতিসংরক্ষণ-প্রবৃত্তি ; এবং আত্মরক্ষণ-বৃত্তি থেকে একে পৃথক্ করা যায়। কিন্তু এই যৌন আবেগ বা প্রবৃত্তি কোন না কোন ভাবে আমাদের অন্য সমস্ত আবেগ ও প্রবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত থাকে। অবশ্য যৌন আবেগ শব্দটি ফ্রয়েড ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। এর দ্বারা যে বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গমেচ্ছাই বোঝায় তা নয়, ব্যাপক অর্থে এর দ্বারা যে-কোন সুখ-প্রবৃত্তিকেই বোঝানো হয়। ফ্রয়েডের মতে সংজ্ঞানে আমাদের অনেক ইচ্ছা ও আবেগ, ও প্রধানত যেগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যৌন আবেগের সঙ্গে যুক্ত, সেগুলির অধিকাংশেরই চরিতার্থতা সম্ভব নয়। সামাজিক ও অন্যান্য কারণে এগুলি অপূর্ণ থেকে যেতে বাধ্য হয়। এই অপূরিত বাসনা ও আবেগগুলি অনেক সময়ই সামাজিক বিচারে কুৎসিত বলে বিবেচিত হয় বলে অবদমিত হয়, ও নির্জ্ঞানে নির্বাসিত হয়। নির্জ্ঞান স্তরটি এমনই একটি স্তর যার সম্বন্ধে স্মৃতিও সম্ভব নয়। সুতরাং এই অবদমিত বাসনা ও আবেগগুলি কখনও স্মৃতিরূপেও সংজ্ঞানে আসে না। কিন্তু নির্বাসিত হ'লেও, এগুলি একেবারে লুপ্ত হয় না। বরং বলা যায়, অবদমনের ফলে এক দিক থেকে তাদের শক্তি-বৃদ্ধি হয় ও তারা নানা ভাবে নানা ছদ্মবেশে সংজ্ঞানে আসবার চেষ্টা করে। তাদের এই ছদ্মবেশ ধারণের কারণ হ'ল, মনের প্রহরী। এই প্রহরীও নির্জ্ঞানেই থাকে। সুতরাং তাকে এড়িয়ে সংজ্ঞানে আসতে গেলে এই সব অবদমিত ইচ্ছার ছদ্মবেশ ধারণ ছাড়া উপায় নেই। তাই সংজ্ঞানের ভুল-ভ্রান্তি, স্বপ্ন ও প্রক্ষোভের মধ্য দিয়ে তারা আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে।)

(ফ্রয়েড আরও বলেছেন যে, শিশুর মানসিকতা গড়ে ওঠে প্রধানত মা ও বাবাকে ঘিরে। কারণ মা-বাবার সঙ্গেই তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সুতরাং শিশুর যৌন জীবনে ও যৌন-কামনায় মা ও বাবার স্থান

সর্বপ্রধান।) মা ও বাবাকেই শিশুর প্রথম ও প্রধান কামপাত্র বলা যেতে পারে। এখন (মা-বাবার পরস্পরের সম্পর্কও শিশুর মনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। শিশুর মা-এর প্রতি যে আবেগ ও আকর্ষণ, তা প্রধানত বাধা পায় বাবার দিক থেকে। সে মনে করে বাবার অস্তিত্বই মা ও তার মধ্যে দূরত্বের সৃষ্টি করেছে, অথবা মাকে পাবার ব্যাপারে বাধাস্বরূপ। সুতরাং বাবার প্রতি তার রোষ থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু বাবা তার কাছে কেবল রোষের পাত্রই নয়। বাবার প্রতি তার আকর্ষণ ও ভালবাসাও থাকে। কেননা, বাবাও অনেক ক্ষেত্রেই তার সুখানুভূতির কারণ। একই বস্তুর প্রতি প্রীতি ও বিদ্বেষ এই উভয় ভাব থাকাকেই ফ্রয়েড বলেছেন 'উভয়বলতা' (ambivalence)।)

শিশু-মনস্তত্ত্বের এই সব ব্যাপারকে ভিত্তি করেই বয়স্ক মানুষের ধর্ম-জীবন গড়ে ওঠে। ফ্রয়েড তাঁর "টোটেম ও টাবু" (Totem and Taboo) গ্রন্থে আদি মানবের ধর্ম-জীবন বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, টোটেম প্রথার মধ্যে ধর্মের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। একটি হ'ল 'টোটেম' সম্বন্ধে কতকগুলি বিধি ও নিষেধ, আর অপরটি হ'ল, সমগোষ্ঠী-বিবাহের নিষেধ। টোটেম প্রাণীকে পূর্ব-পুরুষ বলে কল্পনা করা হয়। সাধারণভাবে তার হত্যাও নিষিদ্ধ, এবং এই কারণেই টোটেম অতি শ্রদ্ধার পাত্র। আবার অন্য দিকে বিশেষ উৎসব ও অনুষ্ঠানে টোটেমকে হত্যা করা হয় ও দলবদ্ধভাবে ভোজন করা হয়। এই দুটি প্রথার মধ্যে ও টোটেমের প্রতি এই দু'ধরনের মনোবৃত্তির মধ্যে মানুষের পিতা-মাতার প্রতি উভয়বলতা (ambivalence)-ই প্রকাশ পায়। আবার টোটেম প্রথায় সমগোষ্ঠী-বিবাহ নিষিদ্ধ; অর্থাৎ একই টোটেম শ্রেণীভুক্তদের মধ্যে বিবাহ ও যৌন সম্বন্ধ বিশেষ অপরাধ বলে গণ্য হয়। এই ধরনের অপরাধের জন্য অনেক সময় প্রাণদণ্ডের পর্যন্ত ব্যবস্থা আছে। এই নিষেধ প্রধানত মাতা-সন্তান অজাচার (incest) নিষেধেরই প্রতীক। সুতরাং বলা যায় যে, টোটেম প্রথার মধ্যে শিশু-মনস্তত্ত্বের দুটি প্রধান বৃত্তিই প্রতিফলিত হয়েছে—পিতার প্রতি তার মনোভাব ও মাতার সম্পর্কে তার বাসনার নিষেধ ও দমন। টোটেম-দেবতা আসলে পিতারই প্রতীক। মনস্তাত্ত্বিক বিচারে টোটেম-দেবতার সঙ্গে আদিম মানুষের সম্বন্ধ ও পিতার সঙ্গে শিশুর সম্বন্ধের মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন ফ্রয়েড।[1] তাঁর মতের প্রমাণ হিসেবে তিনি কিছু কিছু শিশুর মনঃসমীক্ষার ফলাফল উদ্ধৃত করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে, বিভিন্ন জীব-জন্তুর ব্যাপারে তাদের

---

[1] Totem and Taboo, (Pelican Books), Eng. Tr.—A.A. Brill, Page 225.

ধারণা ও প্রক্ষোভ টোটেম-দেবতার প্রতি আদিম মানুষের ধারণা ও প্রক্ষোভেরই মত। বিশ্লেষণে আরও পাওয়া গেছে যে, এই সব শিশুর কাছে এই সব বিশেষ জীবজন্তু আসলে পিতারই প্রতীক। এই ধরনের নানা ঘটনা থেকে ফ্রয়েড সিদ্ধান্ত করেছেন যে, (মানুষের কাছে ঈশ্বর আসলে পিতারই প্রতীক এবং মানুষ পিতার সম্বন্ধে তার ধারণার সাহায্যই তার ঈশ্বরকে কল্পনা করে এবং ঈশ্বরের ব্যাপারে তার যে প্রতিন্যাস (att tude) তা অনেকাংশে পিতার ব্যাপারে তার প্রতিন্যাসেরই মত। সুতরাং ঈশ্বর পিতারই প্রতিভূ। কিন্তু শিশুর চিন্তা ও ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে যুক্তি ও বুদ্ধির তুলনায় আবেগ ও প্রক্ষোভেরই প্রাধান্য থাকে। সুতরাং তার কল্পনা অনেকাংশেই অন্ধ আবেগের দ্বারা চালিত হয়। এই অন্ধ আবেগ আবার প্রধানত সুখান্বেষণেরই আবেগ। (ঈশ্বর সম্পর্কে মানুষের ধারণা, প্রক্ষোভ ইত্যাদি এই সুখানুভূতির পরিপ্রেক্ষিতেই নির্ধারিত হয়। সুতরাং এ-ব্যাপারে বাস্তবতার তুলনায় আবেগনির্ভর কল্পনাই বেশি কার্যকর। এই কারণে ফ্রয়েড ঈশ্বরের বাস্তবতা স্বীকার করেন না। বরং তাঁর মতে ঈশ্বর মানুষের কল্পনারই অভিক্ষেপ (projection)।) ফ্রয়েডের মতে ধর্মকে সত্য বলে মনে করা বা ঈশ্বরকে বাস্তব বলে বিশ্বাস করা, সত্য ও কল্পনার মধ্যে পার্থক্যবোধের অভাবই সূচিত করে। মনঃসমীক্ষার দ্বারা ধর্ম ও ঈশ্বরের অবাস্তবতা ও কাল্পনিকতাই প্রমাণিত হয়। শিশুর অপরিণত চিন্তা ও কল্পনায় পিতা ও মাতার সম্বন্ধে যে ধারণা ও অনুভূতি থাকে তা'ই আরোপিত হয় তার ঈশ্বরের ধারণায়। এর সঙ্গে বাস্তব ঘটনার কোন সম্বন্ধ নেই। তাই গভীর ধর্মপ্রাণতা অস্বাভাবিক মন ও বাস্তব বুদ্ধির অভাবেরই পরিচায়ক।

ফ্রয়েডের বিরুদ্ধে প্রথমেই বলা যায় যে, মানুষের ধর্ম-জীবনের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা গেলেও, তার দ্বারা ধর্ম কাল্পনিক, একথা প্রমাণিত হয় না। মনঃসমীক্ষায় ধর্মের মনস্তাত্ত্বিক উৎপত্তির যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা' যদি সত্য বলে স্বীকার করা হয়, তবুও ধর্মীয় বিশ্বাস যে মূল্যহীন, এ-কথা বলা যায় না। কোন একটি বিশ্বাসের মনস্তাত্ত্বিক ইতিহাসের সঙ্গে সেই বিশ্বাসের তত্ত্বগত বাস্তবতা ও মিথ্যাত্বের কোন সম্পর্ক নেই। কোন ধারণা মানব মনে কল্পনার মাধ্যমে উৎপন্ন হ'লেও তার যে বাস্তবতা নেই, এ-কথা জোর করে বলা যায় না। কারণ, মানুষের মনে ধারণাটির উৎপত্তির কথা হ'ল ব্যক্তিমনের সঙ্গে তার সম্বন্ধের কথা, আর যাথার্থ্য ও বাস্তবতার প্রশ্ন হ'ল তার স্বরূপ ও প্রকৃতির কথা। কোন ব্যক্তিবিশেষের মনের সঙ্গে তার বিশেষ সম্বন্ধ না থাকলেও তা' মিথ্যা হয়ে যায় না।

দ্বিতীয়ত, আমাদের সব ইচ্ছাকেই অলীক বলা যায় না। বরং আমাদের অধিকাংশ ইচ্ছারই কোন না কোন বাস্তব ভিত্তি আছে; এবং এগুলি পরিবেশের সঙ্গে আমাদের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলেই উৎপন্ন হয়। সুতরাং মানুষের ঈশ্বরাকাঙ্ক্ষা ঈশ্বরের বাস্তবতাই প্রমাণ করে। (ইংরেজ দার্শনিক বোসাঙ্কে (Bosanquet)-র মতে আমাদের ক্ষুধা যেমন খাদ্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করে, তেমনই আমাদের ধর্মীয় ও ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষাও ঈশ্বরের বাস্তব অস্তিত্বই প্রমাণ করে।)

তৃতীয়ত, ফ্রয়েড তাঁর মতবাদের সমর্থনে কতকগুলি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি তাঁর দৃষ্টান্ত ও উপাত্ত সংগ্রহের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা দেখাতে পারেন নি। কারণ তাঁর দৃষ্টান্তগুলি প্রধানত অস্বাভাবিক মন বা মনোবিকলনের দৃষ্টান্ত। তাছাড়া (তিনি ধর্ম-বিশ্বাসের অন্ধ অনুষ্ঠানগত রূপটিই দেখেছেন। কিন্তু ধর্মের অন্য রূপও আছে। সেখানে মানুষের সক্ষ্ম বিচার-শক্তি ও ধর্মের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। সেখানে ধর্মীয় আদর্শ ও নৈতিক আদর্শ এক ও অভিন্ন।) অন্য যে-কোন ধারণা বা বিশ্বাসের মতই ধর্মেরও প্রকৃত মূল্যায়ন হয় তার উৎপত্তিকালীন স্থূল ও প্রাথমিক রূপ দিয়ে নয়, উন্নত ও পরিণত অবস্থায় তার যে রূপে প্রকাশ ঘটেছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে। এই পরিণত ধর্মের সঙ্গে নীতির বা বিজ্ঞানের কোন বিরোধ নেই। ধর্ম এখানে নীতি ও বিজ্ঞানের পরিপূরক।

চতুর্থত, ফ্রয়েড টোটেম-প্রথাকেই ধর্মের প্রাথমিক রূপ বলে বিশ্বাস করেছেন এবং এই প্রথাকে বিশ্বজনীন বলেও স্বীকার করেছেন। কিন্তু ধর্মের উৎপত্তির সম্বন্ধে নৃবিদ্যাগত আলোচনার সময় আমরা দেখেছি যে, টোটেম-প্রথা খুবই আদিম হ'লেও, একে ঠিক আদিমতম প্রথা বলা যায় না। জীভন্স্ প্রাক্-টোটেম ধর্মের কথাও উল্লেখ করেছেন। অবশ্য তিনি স্বীকার করেছেন যে, এই প্রাক্-টোটেম ধর্মের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অনেকাংশেই কল্পনানির্ভর। তাছাড়া টোটেম-প্রথা একটি অতি প্রাচীন প্রথা, সন্দেহ নেই, কিন্তু যারা টোটেমকে মানে তারা যে সকলেই টোটেমকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে, এমন নয়। আবার আদিম গোষ্ঠীচেতনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকলেও সমস্ত আদি জাতির মধ্যেই যে টোটেমপ্রথার প্রচলন আছে তা-ও বলা যায় না। সুতরাং টোটেম-প্রথার বিশ্বজনীনতার ব্যাপারেও সন্দেহের অবকাশ আছে, এবং সব ধর্মই যে টোটেম-প্রথার মাধ্যমে বিবর্তিত হয়েছে তা'ও সত্য নয়। অতএব টোটেম-প্রথার মানসিকতা বিশ্লেষণ করলেই ধর্মের তাৎপর্য ও প্রকৃত মূল্য বিচার করা যায় না।

শেষত, (ধর্ম-জীবনের অনুতাপ, ক্ষমাভিক্ষা, প্রার্থনা, আত্মনিবেদন ইত্যাদি

বাসনাকে মিথ্যা ও অলীক বলে প্রমাণ করা যায়, এমন কোন যুক্তি মনঃ-সমীক্ষণ দেখাতে পারে নি। মানব-জীবনে জীবন রক্ষার প্রয়োজনে আহার, নিদ্রা ইত্যাদি জৈবিক বৃত্তির যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনই প্রয়োজন আছে উন্নত জীবনের প্রয়োজনে উচ্চ আদর্শ অনুসরণের।) আর উচ্চ মানবিক আদর্শ অনুসরণের জন্যই জীব হিসেবে মানুষ অন্য সব জীবের থেকে পৃথক্।

সুতরাং মনঃ-সমীক্ষণ ধর্মের যে ব্যাখ্যা দেয় তা' ধর্মের সাধারণ ও পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা বলে গ্রহণ করা যায় না।

2. মার্কস্‌বাদ (Marxism)

(ফ্রয়েড যেমন মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ধর্মকে অসার, অবাস্তব ও কাল্পনিক বলে ব্যাখ্যা করেছেন এবং ধর্মপ্রাণতাকে অস্বাভাবিক মনের পরিচায়ক বলেছেন, জার্মান সমাজবিজ্ঞানী কার্ল মার্কস্ (Karl Marx) তেমনই ধর্মের অসারতা ও অপ্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে।

উনবিংশ শতকের শেষভাগে কার্ল মার্কসের মতবাদ ইউরোপীয় সমাজ-বিজ্ঞানে ও রাজনৈতিক জীবনে আলোড়ন আনে। পরে বিংশ শতকের প্রথমভাগে লেনিন প্রমুখ নেতাদের সাহায্যে এই মতবাদ বিশেষভাবে প্রচারিত হয় ও রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আনতে সাহায্য করে।)

(দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপারে কার্ল মার্কস্ জড়বাদী। তাঁর মতে জগতের মৌল ও একমাত্র উপদান হ'ল জড়পদার্থ (Matter)। আমরা যাদের প্রাণ ও মন বলি, সেগুলি জড়েরই জটিলতর প্রকাশ। মার্কস্ জড়ের বিবর্তনের যে ধারাটি আবিষ্কার করেন, তার মূল ধারণা হেগেল (Hegel) থেকে প্রাপ্ত। এই ধারাটিকে দ্বান্দ্বিক (Dialectical) ধারা বলা হয়।) হেগেল অবশ্য দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির প্রয়োগ দেখিয়েছেন চিন্তার ক্ষেত্রে। কেননা, হেগেলের মতে চিৎশক্তিই হ'ল জগতের মূল উপাদান। হেগেলের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি বলে, আমাদের কোন চিন্তা বা ধারণাই স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয়। যে কোন ধারণাই তার বিপরীত ধারণাকে নির্দেশ করে। বিপরীত ধারণার সাহায্যেই তার তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায়। যেমন, জড়ের ধারণা বুঝতে গেলে অ-জড়ের বিপরীত বলে তাকে বুঝতে হ'বে। আবার অ-জড়কেও জড়ের বিপরীত বলে বুঝতে হ'বে। আবার এই উভয় ধারণার সমন্বয় হয় প্রাণীর ধারণার মধ্যে। প্রাণী জড়ও বটে আবার অ-জড়ও বটে, আবার এই উভয়েরই অতিরিক্ত পদার্থ।

মার্কস এই পদ্ধতির ব্যবহার দেখিয়েছেন জড়ের বিবর্তনের ক্ষেত্রে। তার মতে জড়পদার্থের বিবর্তন ঘটে বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে।

কার্ল মার্কস্ ছিলেন প্রধানত সমাজবিজ্ঞানী। তাঁর মতে সমাজের বিবর্তনের ক্ষেত্রেও জড়-শক্তিই কাজ করে। সমাজ-জীবনের অন্য সব দিক, (রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি) অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপরই নির্ভর করে। অর্থনৈতিক শক্তি আসলে জড়শক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আবার উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। সুতরাং সমাজ-জীবন প্রধানত উৎপাদন ব্যবস্থাকে ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে। তাই বিশেষ যুগে বিশেষ ধরনের উৎপাদন-ব্যবস্থা ও তার সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পদের বণ্টন-ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে বিশেষ ধরনের সামাজিক, নৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আদর্শের প্রাধান্য দেখা দেয়। আর এই বিশেষ ধরনের সামাজিক আদর্শগুলি সেই বিশেষ অর্থনৈতিক-ব্যবস্থাকেই টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে। কিন্তু জড়শক্তির স্বাভাবিক গতিতেই বিপরীত উৎপাদন ব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটে ; এবং প্রচলিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদর্শগুলির সঙ্গে তার বিরোধ বাধে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয় হয় জড়শক্তিরই, অর্থাৎ নতুন উৎপাদন-ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক-ব্যবস্থার। সুতরাং মার্কসের মতে অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থাই হ'ল সামাজিক ঘটনাগুলির একমাত্র না হ'লেও, প্রধান নিয়ামক।

যে-কোন সামাজিক সংস্থার মত ধর্মও সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে ও সেই কাঠামোকেই টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে। সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সংস্থার মত ধর্মের ব্যাপারেও পরিবর্তন আসে। যতদিন পর্যন্ত কোন সামাজিক সংস্থার অর্থনৈতিক কাঠামোকে রক্ষা করার ব্যাপারে প্রয়োজন থাকে, ততদিন পর্যন্তই তা টিকে থাকে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রয়োজন শেষ হ'লেই সংস্থাটির অবলুপ্তি ঘটে। এই ভাবে প্রাচীন বহু আদর্শ, নীতি ও সামাজিক সংস্থাই আজ অবলুপ্ত, বিস্মৃত। অন্য যে-কোন সংস্থার সম্বন্ধে যে-কথা সত্য, ধর্মের সম্বন্ধেও তা' সত্য।

আদিম বর্বর সমাজকে বাদ দিলে এতদিন পর্যন্ত যে সমাজ-ব্যবস্থা চলে আসছে তা প্রধানত শোষণেরই সহায়ক। মার্কসের সমসাময়িক য়ূরোপীয় সমাজ ছিল ধনতান্ত্রিক (Capitalist) সমাজ। সুতরাং তাঁর লেখায় তিনি ধনতন্ত্রের সম্বন্ধেই বিশদ্ আলোচনা করেছেন। তাঁর অনুগামীদের মতে সামন্ততন্ত্র (Feudalism) ও ধনতন্ত্র উভয় ক্ষেত্রেই সমাজের মধ্যে অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাগ দেখা যায়। মুষ্টিমেয় কিছু লোক অধিকাংশ লোকের শ্রমের

সুফল ভোগ করে ও অধিকাংশ লোক কোনও রকমে বেঁচে থাকার মত খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয় পায়।) অর্থাৎ, ধনিক-শ্রেণী দরিদ্র ও শ্রমিক-শ্রেণীকে শোষণ করে নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি করে চলে। অন্য সব সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংস্থার মত ধর্মও এই শোষণ ব্যবস্থাকেই টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করেছে। ধনিক-শ্রেণীও নিজের স্বার্থেই ধর্ম ও ধর্মীয় সংস্থাগুলিকে নানা ভাবে সাহায্য করেছে ও করছে। (সাধারণ মানুষ, যাদের শ্রমের উপর ভিত্তি করে সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা ও অর্থনীতি টিকে আছে, তারা ধর্মের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে ও সমাজে যে অসমতা ও অন্যায় শোষণ চলছে তার প্রতিবাদ করতে পারে না। সুতরাং মার্কস্ ধর্মকে আফিমের সঙ্গে তুলনা করেছেন। শোষিত জনসাধারণ এই আফিমের মোহে আচ্ছন্ন থাকে ও যে ন্যায্য অধিকার ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থেকে তারা সমাজ-জীবনে বঞ্চিত হয়, তা' পরজীবনে লাভ করার আশা করে। সুতরাং মার্কসের মতে "ঈশ্বরে বিশ্বাস হ'ল বিকৃত সভ্যতার মধ্যপ্রস্তর (Belief in God is the key-stone of a perverted civilization)"। রুশ সমাজতান্ত্রিক নেতা লেনিন (Lenin) তাঁর এক প্রবন্ধে বলেছেন যে, আদিম বর্বর মানুষ যেমন প্রাকৃতিক শক্তিকে বুঝতে পারত না ও তাকে ভয় করত, আধুনিক যুগের সাধারণ মানুষও তেমনই যন্ত্রের অন্ধশক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞ। আদিম বর্বর মানুষ প্রাকৃতিক শক্তির ভয়ে যেমন তাকে পূজা করত, আধুনিক অজ্ঞ মানুষও নিজের অসহায় অবস্থা থেকে মুক্তির কামনায় ধর্ম ও ঈশ্বরে বিশ্বাস করে।[1] আর এই ভাবেই ধর্ম শোষণ-ব্যবস্থাকে টিকে থাকতে সাহায্য করে। ধর্ম শোষিত ও অক্ষমকে শিক্ষা দেয় সহনশীলতা, আত্মনিবেদন ইত্যাদির, আর শোষককে শিক্ষা দেয় দয়া ও দানের। কিন্তু এই দয়া ও দান, সে যে শোষণ ও সামাজিক অন্যায় করে, তার তুলনায় সান্ত্বনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর দ্বারা সামাজিক অসমতা ও শোষণ দূর হয় না। কেননা, ধর্ম ধনী ও দরিদ্রকে সমদৃষ্টিতে দেখে না।)

কার্ল মার্কসের মতে বৈজ্ঞানিক বিচারে ঈশ্বরের কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ হয় না। বিশেষ সামাজিক ব্যবস্থায় সমাজের মধ্যে শ্রেণীবৈষম্য ও শোষণকে টিকিয়ে রাখার জন্যই ধর্মকে ও ধর্মবিশ্বাসকে রক্ষা করা হয়। আর সাধারণ মানুষ অজ্ঞ বলেই তা' সম্ভব হয়। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে যখন সামাজিক শোষণের অর্থাৎ সমাজে অর্থনৈতিক শোষণের অবসান ঘটবে, মানুষের

---

1 V. I. Lenin. Collected works, Vol. 10. (Moscow), Eng. Tr. Art., Socialism and Religion.

অজ্ঞতা দূর হ'বে, মানুষ যখন যন্ত্রের শক্তিকে বুঝতে শিখবে, তখনই সামাজিক সংস্থা হিসেবে ধর্মের প্রয়োজনও শেষ হ'বে, আর তা' ধীরে ধীরে লুপ্ত হ'বে। ব্যক্তিগত চিন্তায় অস্তিত্ব থাকলেও সামাজিক সংস্থা হিসেবে ধর্মের অবলুপ্তি ঘটবে। পরে জড়বাদের ধারণা ও চিন্তা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে ব্যক্তি-জীবনেও ধর্মের প্রয়োজন শেষ হ'বে।

মার্কসীয় মতবাদের সমালোচনায় প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে যে, দার্শনিক মতবাদ হিসেবে জড়বাদ সর্বজনস্বীকৃত নয়। (মার্কস্‌বাদীদের মতে জড়শক্তির সম্বন্ধে অজ্ঞতাই ধর্মের মূল) কিন্তু তাঁরা জগৎকে যে ভাবে ব্যাখ্যা করেন তা' এখনও নির্ভুল প্রমাণিত হয় নি। কালের বিচারে জড়ের আবির্ভাব প্রথমে হ'য়ে থাকতে পারে, (কিন্তু বিবর্তনের মৌল উপাদান বলে জড়কে স্বীকার করার অসুবিধা আছে। প্রাণ ও চেতনা জড়পদার্থের বিবর্তনের বিশেষ বিশেষ স্তরে আবির্ভূত হ'লেও তাদের সব কিছুই যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা যায় না।) প্রাণী ও চেতনপদার্থের ব্যবহারের মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে, যাদের সম্বন্ধে জড়পদার্থের মত যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পূর্বাভাস বা ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়। এই সব বস্তুর আচরণ অনেক ব্যাপারেই অনিশ্চিত। তাছাড়া আধুনিক বিজ্ঞানে জড়বস্তুর ধারণারও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। জড়ের স্বরূপ কি, সে সম্বন্ধেও বিজ্ঞানীরা সকলে একমত ন'ন।

দ্বিতীয়ত, (ধর্ম যে সর্বক্ষেত্রেই বিকৃত সভ্যতার পরিচায়ক তা নয়।) যদি উন্নত সভ্যতা বলতে আমরা কেবল জড়বাদী সভ্যতাকেই না বুঝি, তাহ'লে বলা যায়, (অনেক উন্নত ধরনের মানব সভ্যতাই ধর্মজীবন ও ধর্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত।) প্রকৃতপক্ষে, মার্কস্‌বাদীরা ধর্মীয় চেতনার উপযুক্ত বিশ্লেষণ করেন নি; আর সেই কারণেই ধর্মকে মনে করেছেন মিথ্যা ও অবাস্তব।

তৃতীয়ত, (মার্কসীয়রা ধর্মকে জনগণের আফিম বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ধর্ম-চেতনা মানুষের মনে জড়তা আনে না, অথবা মানুষকে জীবনের সুখ-দুঃখের ব্যাপারে অসংবেদনশীলও করে তোলে না। আবার ধর্ম মানুষের মধ্যে অকর্মণ্যতা বা নিশ্চেষ্টতাও আনে না। বরং ধর্মপ্রাণ মহা-পুরুষদের জীবনে আমরা এর বিপরীত দৃষ্টান্তই দেখি। প্রকৃত ধর্মবোধ মানুষকে আশাবাদী ও নির্ভীক করে তোলে। জীবনের দুঃখ ও কষ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উৎসাহ দেয়। ধর্ম মানুষকে লোভ ও পাপের পথ থেকে বিরত করে। গভীর ধর্মবোধ মানুষকে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে আত্ম-নিয়োগ করতে অনুপ্রাণিত করে।)

চতুর্থত, আদিম বর্বর জীবনে প্রাকৃতিক শক্তির ব্যাপারে মানুষের কেবলমাত্র ভীতি থেকেই ধর্মের উৎপত্তি হয় নি। মানব-মনের আরও অন্যান্য আবেগ, বা প্রক্ষোভ, যেমন, বিস্ময়, ভক্তিমিশ্রিত ভয়, রহস্যবোধ, অসীমের অনুভূতি ইত্যাদি, মানুষের ধর্ম-চেতনা ও ধর্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে। কিন্তু মার্কসীয়রা সেগুলি সবই অগ্রাহ্য করেছেন।

পঞ্চমত, ধর্ম-বিশ্বাস ও ধর্ম-চেতনা কোনও নির্দিষ্ট শ্রেণীর অনুভূতির ব্যাপার নয়। যারা শোষিত, যারা জাগতিক সুখশান্তি থেকে বঞ্চিত, কেবল তারাই যে ধর্মের মধ্যে ও পরজীবনের কল্পনায় সান্ত্বনা খোঁজে তা' নয়। বরং বলা যায় যে, কেবল অর্থনৈতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে মানুষের আধ্যাত্মিক আকুতি তৃপ্ত হয় না। অসীমের আকর্ষণ, পরম-সত্ত্বার সঙ্গে মিলিত হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ধনিক-শ্রেণীর মানুষকেও ধর্ম-জীবনে আকৃষ্ট করেছে। এই সব মহান পুরুষেরা তাঁদের আদর্শের জন্য সমস্ত পার্থিব ঐশ্বর্য ত্যাগ করেছেন।

ষষ্ঠত, মার্কসীয়রা বিশ্বাস করেন, প্রকৃত ন্যায়ের ভিত্তিতে যে সমাজ গড়ে উঠবে, সে সমাজে ধর্ম অবলুপ্ত হ'বে। কিন্তু ধর্মই মানুষের হৃদয়ে পরিবর্তন আনতে পারে। ফলে মানুষ ধর্মের প্রেরণায় সমস্ত শোষণের অবসান ঘটাতে উদ্বুদ্ধ হ'তে পারে। মার্কসীয়রা যে ন্যায়পরায়ণ সমাজের কথা বলেন তা' একমাত্র মানুষের হৃদয়বৃত্তির পরিবর্তনের মাধ্যমেই আনা সম্ভব। আর এ ব্যাপারে ধর্মের সক্রিয় ভূমিকা থাকতে পারে।

উপসংহারে বলা যায় যে, কার্ল মার্কস্‌ ও তাঁর অনুগামীরা ধর্মের স্বরূপটি দেখেন নি। তাঁরা ধর্ম বলতে বুঝেছেন কতকগুলি অন্ধ বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান পালনকে। কিন্তু আচারনিষ্ঠতা বা অনুষ্ঠানসর্বস্বতাই ধর্ম নয়। সত্য, শিব ও সুন্দরের আদর্শই মানব জীবনের পরম আদর্শ। এই পরম আদর্শের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ও ভক্তিই যথার্থ ধর্ম। ধর্মীয় আকাঙ্ক্ষা মানুষকে পরম আদর্শ লাভে অনুপ্রাণিত করে, উদ্বুদ্ধ করে সেই পরম সত্তার সঙ্গে মিলিত হ'তে, যাঁর মধ্যে জীবনের শ্রেষ্ঠ ও পরম আদর্শগুলি মিলিত হ'য়েছে, সার্থক হ'য়েছে। সুতরাং কতকগুলি অন্ধ বিশ্বাস ও অন্ধ সংস্কার যেমন ধর্ম নয়, তেমনই যান্ত্রিক নিয়মে অনুষ্ঠান পালনও যথার্থ ধর্ম নয়। যথার্থ ধর্ম হ'ল পরম-সত্তার সঙ্গে, অসীমের সঙ্গে মানুষের মিলন-প্রয়াস। ধর্ম মানুষের স্বভাবগত। অসীমের কল্পনা ও পরম-সত্তার সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষা মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই উপ্ত। মানুষের আচার-অনুষ্ঠানকে বাহ্যত নিয়ন্ত্রণ করা যায়, কিন্তু তার আন্তরিক ধর্মবোধ ও অনুভূতিকে নষ্ট করা যায় না। মানুষের ধর্মীয় চিন্তা বা কল্পনার সম্পূর্ণ

অবলুপ্তি ঘটতে পারে না। সমাজের যে অবস্থাই আসুক না কেন মানুষের চিন্তার ও কল্পনার অবকাশ সেখানে থাকবেই।

3. জড়বাদ (Materialism) ও প্রাকৃতবাদ (Naturalism)

ধর্মের সম্বন্ধে যে দু'টি মত আলোচনা করা হ'ল, সে দু'টি প্রধানত বৈজ্ঞানিক মতবাদ। এগুলিতে নির্দিষ্ট এক একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মের ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানের দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ, অথচ ধর্ম মানুষের সমস্ত চেতনাকে জুড়ে থাকে। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি যে বিশেষ কাজে, বিশেষ অনুভূতিতে বা বিশেষ ইচ্ছায় ধার্মিক তা নয়, তার সমগ্র চেতনাই ধর্মভাবাপন্ন। সুতরাং কোন বিশেষ সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মের ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে। তাই ধর্মের ব্যাখ্যা করতে হ'বে মানুষের জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। কিন্তু বিজ্ঞানের নিজস্ব প্রয়োজনেই কোন কিছুর সম্বন্ধে সামগ্রিক দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং ধর্মের মত বস্তুর যথাযথ মূল্যায়ন হয় দার্শনিক বিচারে। দর্শনই সামগ্রিক দৃষ্টিতে ধর্মের যথাযথ বিচার ও বিশ্লেষণ করতে পারে। অতএব আমরা দার্শনিক বিচারে ধর্মের বিরোধী মতবাদগুলি নিয়ে আলোচনা করব। এর মধ্যে প্রথমে যে মতবাদটি নিয়ে আমরা আলোচনা করব, ব্যাপক অর্থে তাকে বলা যায় প্রাকৃতবাদ (Naturalism).

প্রাকৃতবাদ আসলে যে-কোন ধরনের অতিপ্রাকৃতবাদ (Supernaturalism) বা চেতনবাদ (Spiritism)-এর বিরোধী। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পাশ্চাত্ত্য দেশে প্রাকৃতবাদ বিশেষভাবে ধর্মবিরোধী মতবাদরূপে প্রসার লাভ করে। প্রাকৃতবাদ জগৎ ও জীবনকে প্রাকৃত বিজ্ঞানগুলিতে (পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন ইত্যাদি) স্বীকৃত পদার্থ ও ধারণার সাহায্যে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। সুতরাং প্রাকৃতিবাদ (পরমাণু, গতি ইত্যাদিকেই জগতের মৌল উপদান অথবা মানুষের বুদ্ধিগ্রাহ্য মৌল পদার্থ বলে স্বীকার করে, ও এইগুলির সাহায্যেই জগৎকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে।) প্রাকৃতবাদে অতিপ্রাকৃত, অতীন্দ্রিয়, আদর্শ বা উদ্দেশ্যের কোন স্থান নেই। এই মতবাদ অতি প্রাচীন। (প্রাচীন গ্রীক্‌দেশে সোফিষ্ট (Sophist) বলে পরিচিত দার্শনিকরা এই ধরনের মত পোষণ করতেন। ডেমক্রাইটাস্ (Democritus) ও লিউসিপ্পাস্ (Leucippus) প্রমুখ দার্শনিকরা জগতের জড়বাদী ব্যাখ্যা দেন। প্রাচীন ভারতবর্ষে একমাত্র চার্বাক ছাড়া জগতের সামগ্রিক জড়বাদী ব্যাখ্যা আর কোন দার্শনিক মতবাদের মধ্যে পাওয়া যায় না। অবশ্য পরমাণবাদ ভারতবর্ষে একটি অতি প্রাচীন মতবাদ।)

প্রাকৃতবাদের নানা রূপ। যুগে যুগে বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তাধারায় এর প্রকাশ হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। এড্‌ওয়ার্ড্‌স্ (Edwards) তাঁর "ধর্মের দর্শন" (The philosophy of Religion) গ্রন্থে প্রাকৃতবাদকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন—(a) নির্বিচার প্রাকৃতবাদ (Dogmatic Naturalism) বা জড়বাদ (Materialism), ও (b) অজ্ঞেয়বাদী প্রাকৃতবাদ (Agnostic Naturalism)। জড়বাদ থেকে পৃথক্ করে দেখাবার জন্য অজ্ঞেয়বাদী প্রাকৃতবাদকে অনেক সময় কেবল 'প্রাকৃতবাদ'-ও বলা হয়।

(a) **জড়বাদ**: পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ইত্যাদি প্রাকৃত বিজ্ঞানগুলি যে বস্তু নিয়ে আলোচনা করে জড়বাদ সেই জড়পদার্থকেই বিশ্বজগতের মৌল উপাদান বলে স্বীকার করে। এই মতবাদ অনুযায়ী জড় পরমাণুগুলিই দৃশ্যমান জগতের একমাত্র উপাদান, এবং দৃশ্যমান জগৎ ছাড়া অন্য কোন জগৎ জড়বাদী স্বীকার করেন না। জড়বাদীদের মতে পরমাণুপুঞ্জ ও তাদের গতি দিয়েই জগতের সব কিছুকেই ব্যাখ্যা করা যায়। জগৎ ও মানুষের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যার ব্যাপারে কোন চেতনা, ইচ্ছা, আদর্শ বা উদ্দেশ্যকে স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। যা কিছু ঘটে সবই গতিমান ও সচল পরমাণু ও ইলেক্ট্রনের (Electron) খেলা। সুতরাং প্রাণ, মন, ইত্যাদি সব কিছুই জড়েরই নানা বিবর্তিত রূপ; এবং আদর্শ, মূল্য, উদ্দেশ্য ইত্যাদির কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই। প্রাকৃত বিজ্ঞান জগতের যে বর্ণনা দেয়, জগতে তার অতিরিক্ত আর কিছুই নেই। যাকে জীবন বা প্রাণ বলা হয়, তা' জড়দেহেরই বিশেষ অবস্থামাত্র। আবার জড়দেহও বিশেষ ধরনের পরমাণু-সংস্থান ছাড়া আর কিছুই নয়। ঈশ্বর বা অতি-প্রাকৃতের কোন স্থান জড়বাদে নেই। সুতরাং ধর্মও জড়বাদীর মতে কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত।

উনিশ শতকের বিজ্ঞানীদের জড়বাদী ব্যাখ্যা আজ আর দর্শনের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকৃত হয় না। কারণ জড়বাদ বিচিত্র বস্তুর গুণগত ও মূল্যগত পার্থক্য স্বীকার করে না। জগতের সব কিছুকে জড়পদার্থের পরমাণু, তাদের গতি ও গাণিতিক সম্বন্ধ দিয়ে বোঝানোর অর্থ সূক্ষ্মতর বস্তুকে স্থূলতর বস্তুর ধারণা দিয়ে ব্যাখ্যা করা। এক কথায় বলা যায় যে, জড়পরমাণুর সাহায্যে জগতের গাণিতিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে জড়বাদ অতিসরলীকরণ দোষে দুষ্ট হয়েছে। সরলতা দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার আদর্শ হ'লেও, জগতের সমস্ত জটিল ও বিচিত্র বস্তুর অতি-সরল ব্যাখ্যা মানুষের বুদ্ধি ও কল্পনাকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। কেননা, তা'হলে জটিল ও বৈচিত্র্যময়

বিশ্বের অনেক কিছুই থেকে যায় অব্যাখ্যাত, অস্পষ্ট। (তাই বুকনার (Büchner), কার্ল ভগ্ (Karl Vogt) প্রমুখ বিজ্ঞানীদের জড়বাদ আজ আর চিন্তা জগতে কোন আলোড়ন সৃষ্টি করে না।)

(b) প্রাকৃতবাদ: ধর্মের ক্ষেত্রে প্রাচীন ও স্থূল জড়বাদের তুলনায় গভীরতর সমস্যার সৃষ্টি করেছে প্রাকৃতবাদ বা অজ্ঞেয়বাদী প্রাকৃতবাদ। অতিসরলতা দোষ প্রাচীন জড়বাদকে মতবাদ হিসেবে দুর্বল করেছে। কিন্তু আধুনিক প্রাকৃতবাদ জড়বাদের তুলনায় অনেক কম উগ্র ও ব্যক্তব্য উপস্থাপনের ব্যাপারেও অনেক সংযত। জ্ঞানের ক্ষেত্রে অজ্ঞেয়বাদকে সমর্থন করে বলে এই মতবাদ প্রাচীন জড়বাদীদের মত জগতের আদিম ও মৌল উপাদানের স্বরূপ সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট উক্তি করে নি। এই মতে পদার্থ রূপে 'জড়' ও 'চেতন' এই দু'টির স্বরূপই আমাদের অজানা। পরমসত্তা কি, তা আমরা জানতে পারি না। প্রত্যক্ষগ্রাহ্য প্রপঞ্চ (Phenomenon)-কেই আমরা জানি। সুতরাং প্রাকৃতবাদ বিশ্বজগৎকে এই প্রপঞ্চের পরিপ্রেক্ষিতেই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে, আর এই প্রপঞ্চ বা প্রত্যক্ষগ্রাহ্য জগৎ বলতে বস্তুত জড়জগৎকেই বোঝানো হয়েছে। চেতনার জগৎকে এই জড়জগতেরই ছায়াস্বরূপ বা উপপ্রপঞ্চ (Epi-phenomenon) বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই ছায়াসত্তা জ্ঞান বা জীবনের ব্যবহারিক নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে একেবারেই অকেজো, অপ্রয়োজনীয়। সুতরাং একে স্বচ্ছন্দে অগ্রাহ্য করা যায়। আধুনিক কালে হাক্স্‌লী (Huxley) এই মতের একজন প্রধান সমর্থক। তিনি মানুষকে বলেছেন 'সচেতন যন্ত্র' (Conscious automaton); এবং এই যন্ত্রে চেতনার কাজ অনেকটা ব্যবসায়ের অক্রিয়-অংশীর (Sleeping partner) মত। চেতনা স্বপ্ন দেখে যে, সেই সব কিছু করছে, কিন্তু আসলে যা-কিছু কাজ, তা' জটিল দেহ-যন্ত্রটিই করে। অতএব (মানুষের চেতনা আসলে যেন একটি উপাঙ্গ (Appendage)-এর মত। শরীরের ক্রিয়া-কলাপ নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে চেতনা একেবারেই অক্ষম। সুতরাং শরীরের সব ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ব্যাখ্যা যান্ত্রিক পদ্ধতিতেই দেওয়া যায়)

প্রাকৃতবাদে মানুষের চেতনার মত ঈশ্বরকেও বিশ্বযন্ত্রের অক্ষম ছায়ামাত্র বলে বর্ণনা করা হয়। ঈশ্বর যেন চিরনিদ্রিত ও চিরস্বপ্নাভিভূত, বিশ্বনাটকের চিরদ্রষ্টা। বিশ্বজগতের নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে একেবারেই অপারগ, অক্ষম।

বিবর্তনের ক্ষেত্রে ডারউইন (Darwin) প্রাকৃতবাদী। তাঁর প্রাকৃতবাদে বিবর্তনকেও যান্ত্রিক ও প্রাকৃত নির্বাচন পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

জীবজগতের যা-কিছু বিবর্তন, তা'র সবই আকস্মিক ভেদ ও প্রাকৃত নির্বাচন (natural selection) দিয়েই নির্দিষ্ট হয়। এর মূলে কোন ইচ্ছা-শক্তি বা উদ্দেশ্য কাজ করে না।

জেমস্ ওয়ার্ড (James Ward) তাঁর "প্রাকৃতবাদ ও অজ্ঞাবাদ" (Naturalism and Agnosticism) গ্রন্থে প্রাকৃতবাদের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, জড়বাদের সঙ্গে প্রাকৃতবাদের কোন ব্যবহারিক ভেদ নেই।[1] প্রাকৃতবাদ যে-কোন আধ্যাত্মিকতাকে ও চেতনাকে জ্ঞানের অতীত বলে আলোচনার অযোগ্য বলেছে। কিন্তু চেতনাকে আলোচনার অযোগ্য বলে বাদ দেওয়া আর জড়বাদী রীতিতে চেতনার বাস্তবতা অস্বীকার করার মধ্যে কোন ব্যবহারিক পার্থক্য নেই। কিন্তু উভয় মতের বিরুদ্ধেই বলা যায় যে, যান্ত্রিক মতবাদ নির্দিষ্ট সীমিত ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ঘটনাকে ব্যাখ্যার ব্যাপারে যথেষ্ট উৎকর্ষ অর্জন করতে পারলেও, জগৎ ও জীবনের সামগ্রিক ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হয়নি। সীমিত ক্ষেত্রে, যেখানে বস্তুর পরিমাণগত সম্বন্ধ নির্ধারণ করা যায়, সেখানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে প্রাকৃতবাদ বা জড়বাদের অবদান অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু সামগ্রিক দর্শন হিসেবে প্রাকৃতবাদ নির্ভরযোগ্য নয়। জীবনের সব কিছুকেই পরিমাণ ও গাণিতিক হিসেবে পরিমাপ করা যায় না।

দ্বিতীয়ত, প্রাকৃতবাদ জীবনের একটি দিককেই প্রধান বলে স্বীকার করেছে; সেটি হ'ল প্রত্যক্ষগ্রাহ্য জড়ের গতিপ্রকৃতি। কিন্তু মানুষের জীবনের বা অনুভূতির অন্য দিকও আছে। প্রত্যক্ষগ্রাহ্য জড়জগতের তুলনায় মানুষের জীবনে তার মূল্য কিছু কম নয়। প্রাকৃতবাদ এদিকটিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেছে। কিন্তু আমরা যেমন জগৎকে প্রত্যক্ষ করছি, তেমনই তার মূল্যায়নও করছি। এই মূল্যের কথা, এই আদর্শের কথা, প্রাকৃতবাদে একেবারেই অস্বীকার করা হয়েছে। তাই প্রাকৃতবাদ জীবনের যে-ছবি তুলে ধরে তা' আংশিক, দার্শনিক বিচারে অসম্পূর্ণ। জীবনের এই মূল্যবোধের দিকটির সঙ্গেই ধর্মের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ। সুতরাং যাঁরা এই মূল্যবোধকে অগ্রাহ্য করেন, তাঁদের পক্ষে ধর্মের তাৎপর্য ও বাস্তবতা বিচার করা সম্ভব নয়।

তৃতীয়ত, প্রাকৃতবাদ মানুষের মনকে উপপ্রপঞ্চ, ছায়াময় ও অক্রিয় বলে বর্ণনা করেছে। হাক্স্লী বলেছেন, "যান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমাদের শরীরের মধ্যে যে-সব পরিবর্তন ঘটেছে, আমাদের মানস বৃত্তিগুলি আমাদের

---

1 James Ward. Naturalism and Agnosticism (3rd Ed., 1906) Vol II., Page 206.

চেতনায় তারই প্রতীকমাত্র (Our mental conditions are simply the symbols in consciousness of the changes which take place automatically in the organism)।"[1] কিন্তু যা অক্ষম, যা অক্রিয়, শারীর ক্রিয়ায় যা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক, সেই প্রতীকের অস্তিত্বের কারণ কি ? শারীর ক্রিয়ায় যা একেবারেই নিষ্প্রয়োজন, তেমন উপাঙ্গকে প্রকৃতিই তার অমোঘ নিয়মে নির্দয়ভাবে বর্জন করে। চেতনা যদি কেবল অনাবশ্যক উপাঙ্গমাত্র হ'ত তাহ'লে, প্রকৃতি কালিদাসকে তার কবিচেতনা দিয়ে ভারাক্রান্ত করত না। কালিদাসের কাব্য পাঠও আমাদের পক্ষে কেবলমাত্র জড় উদ্দীপকের প্রতি জড়ের প্রতিক্রিয়ামাত্র নয়। এ হ'ল রসানুভূতি ও রসোপলব্ধির ব্যাপার। একে প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Reflex action) বলে ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। সুতরাং প্রাকৃতবাদ জীবনের যে ব্যাখ্যা দেয় তা'র সঙ্গে মানুষের আন্তরিক অনুভূতি উপলব্ধি ও চেতনার কোন সামঞ্জস্য নেই। এই জন্যই প্রাকৃতবাদ জীবনদর্শন হিসেবে অচল।

4. ওগুস্ত্ কোঁৎ (Auguste Comte)-এর প্রত্যক্ষবাদ (Positivism)

ফরাসী দার্শনিক ওগুস্ত্ কোঁৎ-এর মতবাদে প্রাকৃতবাদেরই এক ভিন্ন প্রকাশ দেখা যায়। উনিশ শতকের এই দার্শনিকের মতবাদ প্রত্যক্ষবাদ বলে পরিচিত। অন্যান্য প্রাকৃতবাদীদের মত তিনিও প্রত্যক্ষের অতীত কোন সত্তার সম্বন্ধে নীরব থাকারই পক্ষপাতী। এদিক থেকে তিনি অজ্ঞেয়বাদেরই সমর্থক। বস্তুর স্বরূপ যেমন আমাদের অজ্ঞাত, তেমনই তাদের আদি কারণ বা পরম অর্থ ও উদ্দেশ্যও আমাদের অজানা। আমরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে, অর্থাৎ পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ও তুলনার সাহায্যে জাগতিক বস্তুগুলিকে ও তাদের পরস্পরের পৌর্বাপর্য, সাদৃশ্য, ইত্যাদি সম্বন্ধগুলিকে জানতে পারি ; আর তা'দের মধ্যকার এই সব নির্দিষ্ট সম্বন্ধ ও সমতার নামই হ'ল 'নিয়ম'। বস্তুর স্বরূপ, তাদের আদি ও উদ্দেশ্য আমরা জানিনা বলেই বস্তু-জগৎ সম্পর্কে আমাদের কোন পরম, নিত্য ও অপরিবর্তনীয় জ্ঞান বলে কিছু নেই। আমাদের সব জ্ঞানই সাপেক্ষ (Relative)। কিন্তু তাই বলে আমাদের হতাশার কোন কারণ নেই। জগৎ সম্বন্ধে যে সাপেক্ষ জ্ঞান আমাদের পক্ষে সম্ভব, তা'ই আমাদের একমাত্র ব্যবহারযোগ্য ও কার্যকর জ্ঞান। এই জ্ঞানের সাহায্যেই প্রকৃতির সম্বন্ধে আমাদের পূর্বদর্শন (foresight)

---

1 Jame Word উদ্ধৃত, ঐ গ্রন্থ, Vol. I, Page 179.

সম্ভব ; আবার এই জ্ঞান দিয়েই আমরা প্রাকৃতিক ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করি।) 'Savoir pour prévoir'—পূর্বদর্শনের জন্যই জানা। যদিও প্রাকৃতিক বস্তুগুলিকে মানুষের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পূর্বদর্শনই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট ও একমাত্র জ্ঞান, তবুও যুগে যুগে মানুষ 'পরম' জ্ঞান লাভ করার চেষ্টা করেছে এবং এই ধরনের জ্ঞান সে লাভ করতে পেরেছে বলেও বিশ্বাস করেছে। সুতরাং কোঁৎ-এর মতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানই যে একমাত্র ব্যবহার্য জ্ঞান, এ-কথা বুঝতে মানুষের অনেক বছর কেটে গেছে ; অর্থাৎ প্রত্যক্ষবাদের ধারণায় পৌঁছতে মানুষের চিন্তাশক্তির যথেষ্ট উন্নতির প্রয়োজন হয়েছে। তাই অগুস্ত্ কোঁৎ যে-কোন রকম তত্ত্ববিদ্যাগত আলোচনারই বিরোধী।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রত্যক্ষকে একমাত্র কার্যকর জ্ঞান বলে মানলেও, ও তত্ত্ববিদ্যাগত বিমূর্ত কল্পনার বিরোধী হ'লেও, কোঁৎ অভিজ্ঞতাবাদ (empiricism) স্বীকার করেন না। তাঁর মতে অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কশূন্য বিচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষ বা পর্যবেক্ষণের কোন মূল্য নেই ও এই ধরনের পর্যবেক্ষণ জগৎ সম্বন্ধে আমাদের নির্ভরযোগ্য জ্ঞানও দিতে পারে না। অন্যান্য পর্যবেক্ষণের সঙ্গে যুক্তভাবে যখন কোন পর্যবেক্ষণকে আমরা বুঝি ও সেটিকে যখন একটি নিয়মের সাহায্যে ব্যাখ্যা করি, তখনই সেই পর্যবেক্ষণের প্রকৃত তাৎপর্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সুতরাং প্রাচীন অভিজ্ঞতাবাদ (empiricism) বিচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষকেই যথেষ্ট বলে মনে করে ; কিন্তু আধুনিক প্রত্যক্ষবাদ (positivism) সুসংবদ্ধ প্রত্যক্ষকেই মূল্য দিয়েছে। অভিজ্ঞাবাদ ও প্রত্যক্ষবাদের এই মৌলিক পার্থক্যটি অনেকেই লক্ষ্য করেন না। ফলে প্রত্যক্ষবাদের ব্যাখ্যা তাঁদের লেখায় অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ থেকে যায়। অথচ প্রত্যক্ষবাদীদের মতে এই ভেদের জন্যই সাধারণ বা ইতরজনের প্রত্যক্ষ ও বিজ্ঞানীর প্রত্যক্ষের মধ্যে অনেক পার্থক্য।

কোঁৎ-এর মতে বর্তমান প্রত্যক্ষবাদী পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার পূর্বে বিজ্ঞান আরও দু'টি পর্যায় পার হয়ে এসেছে। সে দুটি হ'ল ঈশ্বরতত্ত্বের (Theological) পর্যায় ও তত্ত্ববিদ্যার (Metaphysical) পর্যায়।

আদিম অবস্থায় মানুষ যে কোন প্রাকৃতিক ব্যাপারকে তারই নিজের মত কোন সত্তার ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত বলে মনে করত। তারপর ক্রমশ একটি অতি-প্রাকৃত শক্তি একই জাতীয় পদার্থের উপর কর্তৃত্ব করে বলে কল্পনা করা হ'ত। এই কল্পনা-পরিবর্তনকে ভক্তিবস্তুবাদ (Fetichism)-এর স্তর থেকে বহুদেববাদ (Polytheism)-এ উন্নতি বলা যায়।

কারণ প্রথম, অর্থাৎ ভক্তিবস্তুবাদের স্তরে প্রতিটি বস্তুকেই এক একটি পৃথক্ দৈববস্তু বলে মনে করা হ'ত, আর পরের স্তরে একই জাতীয় পদার্থকে একই দেবতার অধীন বলে কল্পনা করা হ'ত। ঈশ্বরতত্ত্বের পর্যায়ে আরও উন্নতি লক্ষ্য করা যায় একেশ্বরবাদ (monotheism)-এর স্তরে। এই স্তরে জগতের সব কিছুই একই ঈশ্বরের ইচ্ছা ও শক্তির প্রকাশ বলে কল্পনা করা হ'ত। দ্বিতীয় পর্যায়ে, অর্থাৎ তত্ত্ববিদ্যার পর্যায়ে মানুষ দৈবশক্তি বা দৈব-ইচ্ছার বদলে কতকগুলি পদার্থ বা বিমূর্ত ধারণার সাহায্যে জাগতিক ঘটনার ব্যাখ্যা করত। এই সব পদার্থ বা বিমূর্ত ধারণাগুলিকে জগতের মৌলিক উপাদান বলে কল্পনা করা হ'ত। জগতের গতিপ্রকৃতির প্রধান পরিচালক এখন আর ঈশ্বর ন'ন, 'প্রকৃতি'। এই 'প্রকৃতি' কতকগুলি নির্দিষ্ট ধারায় বা নিয়মে কাজ করে, অথবা পরম মঙ্গলের দিকে এর প্রবণতা আছে, অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান জগৎ নির্দিষ্ট কোন অর্থ সাধন করছে। এই সব নানা ধরনের কল্পনার সাহায্যে মানুষ তার পরিবেশকে ব্যাখ্যা করত। সর্বশেষে এল আধুনিক প্রত্যক্ষবাদের পর্যায়। এই পর্যায়ে এই সব বিমূর্ত ও অস্পষ্ট ধারণাকে বিদায় দেওয়া হ'ল। সাক্ষাৎ পর্যপবেক্ষণ ও পরীক্ষণের দ্বারা নির্ধারিত অপরিবর্তনীয় ও বিশ্বজনীন প্রাকৃতিক নিয়মের সাহায্যে প্রত্যক্ষগ্রাহ্য ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়া হ'ল। কিন্তু এই সব প্রাকৃতিক নিয়মের চরম বা অন্তিম ব্যাখ্যা মানুষের অজ্ঞাত বা জানার ক্ষমতার অতীত বলে কোঁৎ মনে করতেন। সুতরাং জগতের ব্যাখ্যার ব্যাপারে নিরীশ্বরবাদ ও ঈশ্বরবাদ সমান অনিশ্চিত। কেননা, মানুষের দীর্ঘকালের চিন্তা সত্ত্বেও জগতের আদি ও অন্ত সম্বন্ধে কোন সন্তোষজনক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া আজও সম্ভব হয় নি। আদি ও অন্ত এই দু'টিই আমাদের জ্ঞানের অতীত এবং এই দু'টির মধ্যবর্তী অংশ-টুকুই প্রকৃতপক্ষে আমাদের জ্ঞানের গোচর। সুতরাং কোঁৎ প্রত্যক্ষগ্রাহ্য ঘটনা ও সার্বিক (universal) নিয়মের মধ্যেই জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছেন। প্রত্যক্ষবাদী হিসেবে তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না ও কোন ব্যাপারে দৈব ব্যাখ্যারও তিনি পক্ষপাতী ন'ন। তাঁর মতে যে-কোন ঘটনার প্রত্যক্ষবাদী ব্যাখ্যাই হ'ল একমাত্র নির্ভরযোগ্য ও নির্ভুল ব্যাখ্যা। সুতরাং সাধারণ অর্থে ওগুস্ত্ কোঁৎ-এর মতবাদ ধর্মবিরোধী মতবাদ।

বুদ্ধির ক্ষেত্রে ধর্মীয় ধারণা ও বিশ্বাসকে অস্বীকার করলেও, তাঁর সমাজ-বিজ্ঞানে কোঁৎ ধর্মকে অগ্রাহ্য করেন নি। বরং তাঁর দর্শনে তিনি ধর্ম ও নৈতিক সাধনার উপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। কিন্তু প্রত্যক্ষবাদী কোঁৎ-এর ধর্ম কোন অতীন্দ্রিয় ও অতিজাগতিক সত্তাকে নির্ভর করে গড়ে ওঠেনি। প্রত্যক্ষগ্রাহ্য মানুষের নানা সদ্‌গুণই তাঁর ধর্মের প্রধান উপজীব্য।

এইজন্য কোঁৎ-প্রবর্তিত ধর্মের নাম 'মানবতার ধর্ম'। কোঁৎ মনে করতেন মানুষের সততা, সত্যবাদিতা, দয়া, ক্ষমা, ইত্যাদি উচ্চ নৈতিক গুণ শ্রদ্ধা ও সাধনার যোগ্য ও সেই কারণেই পূজনীয়। সুতরাং কোন অতিপ্রাকৃত দেবতার কল্পনা ছেড়ে কোঁৎ মানুষকেই দেবতাজ্ঞানে পূজা করতে বলেছেন। তবে এই মানুষ কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি-মানুষ নয়, সমগ্র মানবতাকেই তিনি ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করতে বলেছেন। কোঁৎ-এর মতে ব্যক্তিমানুষ তার সমাজ ও পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন পদার্থ নয়, বরং তার চিন্তায়, তার ব্যবহারে তার ভাষায়, আদর্শে সে সমাজেরই সৃষ্টি। তাই ব্যক্তিমানবকে বাদ দিয়ে কোঁৎ মানুষের মধ্যে যে-সব অতি উন্নত নৈতিক গুণ আছে, তাদেরই সমন্বয় করেছেন তাঁর মহান মানবতার ধারণার মধ্যে। মানবতা মানুষের উচ্চ নৈতিক সত্তারই বিমূর্তরূপ। এই মানবতাই পূজিত হওয়া উচিত, একেই আদর্শরূপে অনুসরণ করা উচিত। কোঁৎ নিজেকে এই মহান মানবতার পূজারী বলে ঘোষণা করেন। স্ত্রীলোকের মধ্যে ক্ষমা, ভালবাসা, ধৈর্য ইত্যাদি গুণের বিশেষ প্রকাশ লক্ষ্য করে তিনি তাঁর পূজিত মানবদেবতাকে স্ত্রীলোক বলে কল্পনা করেছেন। সুতরাং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী স্বীকার করলেও কোঁৎ বিজ্ঞানকে মানবকল্যাণের সহায়ক বলেই কল্পনা করতে চেয়েছেন। প্রত্যক্ষবাদী হ'লেও তাঁর দর্শনে বিজ্ঞানের স্থান মানবতার পরে। মানবতার সেবার মধ্যেই বিজ্ঞানের সার্থকতা।

কোঁৎ-এর মতবাদের প্রথম ও প্রধান সমালোচনা হ'ল, তিনি ঈশ্বর স্বীকার না করেও ধর্ম স্বীকার করেছেন। তিনি কোন অতীন্দ্রিয় ও অতিজাগতিক সত্তায় বিশ্বাস করেন না বলেই মানবতার ধর্ম প্রচার করেছেন। সুতরাং তাঁর ধর্ম হ'ল নিরীশ্বরবাদী ধর্ম। কিন্তু যে মানবতাকে কোঁৎ পূজা করতে চেয়েছেন, সে মানবতাও জাগতিক নয়। জগতে আমরা যে সব মানুষকে দেখি, তাদের ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে উচ্চ নৈতিক গুণের প্রাধান্য দেখা যায় বটে, কিন্তু সমস্ত উচ্চ মানবিক গুণের সমন্বয় কোন একটি ব্যক্তির মধ্যে প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং প্রত্যক্ষবাদী কোঁৎ অপ্রত্যক্ষ বস্তুর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীনতা ও নির্লিপ্ততা প্রকাশ করলেও, যে মানবতাকে তিনি পূজা করতে চেয়েছেন, তা' প্রত্যক্ষের গোচর নয়। একই আধারে সমস্ত মানবিক ও নৈতিকগুণের সমন্বয় কোন জাগতিক ঘটনা নয়, একটি অতীন্দ্রিয় আদর্শমাত্র। সুতরাং ঈশ্বর-বিহীন ধর্মের কথা বলতে গিয়ে কোঁৎ অতীন্দ্রিয় আদর্শের কথাই বলেছেন; আর এই অতীন্দ্রিয় আদর্শের সঙ্গে সাধারণ ও সার্বিক অর্থে ঈশ্বরের বিশেষ কোন পার্থক্য নেই।

দ্বিতীয়ত, কারও কারও মতে কোঁৎ-এর 'মানবতার ধর্ম' বিমূর্ত

(abstraction) দোষে দুষ্ট। তিনি যে মানবতার কথা কল্পনা করেছেন তা কোন মূর্ত বস্তু নয়, একটি অমূর্ত ধারণামাত্র। কিন্তু প্রিংগ্‌ল্‌-প্যাটিসন (Pringle-Pattison) তাঁর "ঈশ্বরের ধারণা" (The Idea of God) গ্রন্থে কোঁৎ-এর বিরুদ্ধে এই ধরনের সমালোচনার বিরোধিতা করে বলেছেন যে, এই ধরনের সমালোচনার দ্বারা আমরা ধর্ম থেকে তথা নিগূঢ় ও গভীর দর্শন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের ভাবমিলনই ধর্মের মূল কথা। কিন্তু মানবতা-সামান্য (universal)-কে যদি অমূর্ত বলে অস্বীকার করা হয়, তাহ'লে পরম সামান্য ঈশ্বরকেও অমূর্ত বলে বিদায় দিতে হয়[1]। ফলে ধর্মের অবলুপ্তি ঘটে।

কোঁৎ ব্যক্তি-মানবের আংশিক স্বাধীনতা ও স্বতঃক্রিয়তা (autonomy) স্বীকার করেছেন, কিন্তু ব্যক্তিকে সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বলে কল্পনা করতে পারেন নি। তাঁর মতে ব্যক্তি তার বুদ্ধি, ক্রিয়া-কলাপ ও আবেগ-অনুভূতির ব্যাপারে তার নিজের সমাজেরই সৃষ্টি। সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির আঙ্গিক সম্বন্ধ। অবশ্য, সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ আঙ্গিক হ'লেও, অন্য যে কোন জীবদেহের সঙ্গে সমাজ-দেহের প্রধান পার্থক্য ব্যক্তির স্বতঃক্রিয়তায়। অন্য কোন জীবদেহের অবয়বের এই স্বতঃক্রিয়তা নেই। প্রিংগল-প্যাটিসন্-এর মতে কোঁৎ-এর মতবাদের প্রকৃত দোষ হ'ল, তিনি মানবতাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে কল্পনা করেছেন, ও বাহ্য-প্রকৃতির সঙ্গে তার যে আঙ্গিক সম্বন্ধ আছে তা লক্ষ্য করেন নি। মানব-জাতির ক্রমবিকাশে বাহ্য-প্রকৃতি সহায় হয়েছে, একথা মেনেও কোঁৎ বাহ্য-প্রকৃতিকে মানুষের ভাল মন্দের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন ও নির্লিপ্ত বলে কল্পনা করেছেন। তাই তাঁর মতে বিজ্ঞানের প্রধান কাজ হ'ল, এই বাহ্য প্রকৃতিকে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করা, আর তা সম্ভব না হ'লে সেই প্রকৃতির সঙ্গে অভিযোজনের চেষ্টা করা। কিন্তু ব্যক্তির সঙ্গে যেমন সমাজের আঙ্গিক সম্বন্ধ, সমগ্র মানবতার সঙ্গে বাহ্য-প্রকৃতিরও সেই রকম আঙ্গিক সম্বন্ধ।

তৃতীয়ত, কোঁৎ তত্ত্ববিদ্যার যে বর্ণনা দিয়েছেন তা' গ্রহণযোগ্য নয়। প্রিংগল-প্যাটিসন্-এর মতে তত্ত্ববিদ্যার মূল উদ্দেশ্য হ'ল বিভিন্ন বস্তুর পারস্পরিক সম্বন্ধের যথাযথ ব্যাখ্যা দেওয়া; আর তারই সাহায্যে জগতের বিচিত্র বস্তুগুলিকে সুষম ও সুশৃঙ্খল একটি ব্যবস্থার অঙ্গরূপে দেখানো। এই ধরনের ব্যাখ্যা দেওয়ার অর্থ বিচিত্র বস্তুর মূলে যে গভীর ও পরম তত্ত্বটি রয়েছে, তা' আবিষ্কার করা।[2]

1 A. S. Pringle-Pattison—Idea of God, Lecture VII, Page, 113.
2 The Idea of God, Lecture VII, page 113.

চতুর্থত, প্রত্যক্ষবাদী হয়েও কোঁৎ প্রত্যক্ষ ও জ্ঞানকে প্রাধান্য দিতে পারেন নি। অন্যান্য প্রত্যক্ষবাদীরা প্রাকৃতবাদ ও জড়বাদের সঙ্গে নিজেদের এক করে ফেলেছেন। কিন্তু কোঁৎ অনুভূতি ও আবেগকে অস্বীকার করতে পারেন নি। ফল্‌কেনবার্গ (Falckenberg)-এর মতে তিনি হৃদয়কে বুদ্ধির উপরে স্থান দিয়েছেন।[1] এদিক থেকে বুদ্ধিবাদী হিসেবেও তিনি তাঁর মতের সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারেন নি। অবশ্য, মানবিক মূল্য ও আদর্শকে স্বীকার করে কোঁৎ ভাববাদী দার্শনিকদের প্রশংসাভাজন হয়েছেন।

উপসংহারে বলা যায় যে, কোঁৎ উগ্র প্রত্যক্ষবাদী ছিলেন না। বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার সমর্থক কোঁৎ মানব-জীবনে ধর্মীয় ও নৈতিক আদর্শের মূল্য স্বীকার করেছেন। ফলে তাঁর দর্শনে এক ধরনের দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায়। এই দ্বন্দ্ব বাহ্য-প্রকৃতির সঙ্গে মানবতার, প্রত্যক্ষ-বিজ্ঞানের সঙ্গে নৈতিকতার। আর এই দ্বন্দ্বে তিনি শেষ পর্যন্ত নৈতিকতার পক্ষেই তাঁর সমর্থন জানিয়েছেন তাঁর 'মানবতার ধর্মে'। 'মানবতার' পূজারী বলে তিনি নিজেকে প্রচার করেন। কিন্তু এই মানবতার পূজা আসলে নৈতিক গুণের, নৈতিক আদর্শেরই পূজা। সুতরাং ফল্‌কেন্‌বার্গ-এর ভাষায় বলা যায়, "Beneath the surface of the most sober enquiry mystical and dictatorial tendencies pulsate in Comte from the beginning, and science was for him simply a means to human happiness—অতি সংযত অনুসন্ধানের গভীরে অনুভূতি ও প্রভুত্বকারিতার প্রবণতা প্রথম থেকেই কোঁৎ-এর মধ্যে অনুরণিত হচ্ছিল, এবং তাঁর মতে বিজ্ঞান মানুষের সুখের উপায়-মাত্র"।[2] সুতরাং কোঁৎ-এর প্রত্যক্ষবাদকে ঠিক ধর্ম-বিরোধী মতবাদ বলা যায় কিনা, এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। কেননা, ঈশ্বর স্বীকার না করলেও ধর্মকে তিনি স্বীকার করেছেন। আর তাছাড়া 'ঈশ্বরবিহীন ধর্মের' তিনিই যে একমাত্র বা আদি প্রচারক ছিলেন, তা-ও নয়। প্রাচীন-কালে ভারতবর্ষেও ঈশ্বর-বিহীন ধর্মের প্রচার ছিল। জৈন ও বৌদ্ধধর্মে ঈশ্বরের কোনও স্বীকৃতি নেই। অবশ্য প্রশ্ন করা যায় যে, এই ধর্মগুলি শেষ পর্যন্ত তাদের ঈশ্বরবিহীনতা রক্ষা করতে পেরেছিল কিনা? কারণ, বৌদ্ধরা বুদ্ধকে পূজা করে ভগবান তথাগতরূপে। জৈনদের কাছেও জিন বা তীর্থঙ্কররা অতিমানব ও অসাধারণ পুরুষ। তাঁদের সর্বজ্ঞতা ও জ্ঞানের অসীমতা তাঁদের ঈশ্বরের পর্যায়েই উন্নীত করেছে।

---

1 Falckenberg—History of Modern Philosophy, (Eng. Trans. by A. C Armstrong, Jr.) page. 561.

2 ঐ একই পৃষ্ঠায়।

5. যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ (Logical Positivism)

অজ্ঞেয়বাদী প্রাকৃতবাদীরা ও প্রত্যক্ষবাদী ওগুস্ত্ কোঁৎ অতীন্দ্রিয়ের আলোচনা থেকে বিরত হয়েছেন মানুষের জ্ঞানের সসীমতার যুক্তিতে। তাঁদের মতে মানুষের জ্ঞানের শক্তি সীমাবদ্ধ। অতীন্দ্রিয়, অতিপ্রাকৃত ও অপ্রত্যক্ষকে জানবার উপায় আমাদের নেই; এবং ব্যাবহারিক জীবনে এই অতীন্দ্রিয় ও অতিপ্রাকৃতের কোন মূল্যও নেই। সুতরাং দর্শনে ও বিজ্ঞানে অতিপ্রাকৃতের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যৌক্তিক প্রত্যক্ষ-বাদীর তত্ত্ববিদ্যা, ধর্ম ইত্যাদির মূল্যহীনতা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন সম্পূর্ণ অন্য যুক্তিতে। এঁদের মতে যুক্তিশাস্ত্রে আমরা বিভিন্ন 'যৌক্তিক বচন' (logical proposition)-এর পারস্পরিক সম্বন্ধ বিচার করি। অর্থাৎ, এক বা একাধিক 'বচনের' যাথার্থ্যের ভিত্তিতে অন্য বচনের যাথার্থ্য নির্ধারণের চেষ্টা করি; এবং একমাত্র 'বচন' (proposition)-এর ক্ষেত্রেই এই যাথার্থ্য বিচার করা সম্ভব। অর্থাৎ, যুক্তিশাস্ত্রের বিচারে যা' বচন নয়, তা' সত্য কি মিথ্যা তা' নির্ধারণ করা যায় না। এঁদের মতে বচনের সত্যাসত্য নির্ধারণ করা যায় ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। সুতরাং ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতা দিয়ে যার যাথার্থ্য নির্ধারণ করা যায় না, এমন বস্তু যৌক্তিক অর্থে বচন নয়, এবং তার সত্যাসত্য নির্ধারণ করা যায় না বলে 'অর্থহীন' (meaningless)। এই দিক দিয়ে বিচার করলে তত্ত্ববিদ্যা, ধর্ম, নীতি ইত্যাদি বিষয়ের বচনগুলি যথার্থ অর্থে যৌক্তিক বচন নয়, 'অর্থহীন' শব্দসমষ্টিমাত্র, কারণ পরম তত্ত্বের বিষয়ে বা ইন্দ্রিয়াতীত কোন সত্তার বিষয়ে আমরা যে-সব বাক্য প্রয়োগ করি বা পাই, সেগুলির কোনটিই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিয়ে যাচিয়ে নেওয়া যায় না। ফলে এই বাক্যগুলি সত্য কি মিথ্যা তা' নির্ধারণ করা যায় না। আর যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের মতে যা সত্যও নয়, মিথ্যাও নয় তাই অর্থহীন। এই কারণেই যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা তত্ত্ববিদ্যা, ধর্ম, নীতি ইত্যাদিকে দার্শনিক আলোচনার ক্ষেত্র থেকে নির্বাসিত করতে চেয়েছেন। সুতরাং অন্য প্রত্যক্ষবাদী বা প্রাকৃতবাদীরা যেমন মানুষের জ্ঞানশক্তির অক্ষমতার জন্য তত্ত্ববিদ্যা বা ধর্মের আলোচনা থেকে বিরত হয়েছেন, যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা তেমনই এই বিষয়গুলির স্বকীয় দোষের জন্যই এদের আলোচনা নিষিদ্ধ করতে চেয়েছেন। আর এঁদের মতে এই দোষ হ'ল তত্ত্ববিদ্যা ও ধর্মের যৌক্তিক অর্থহীনতা।

বিশেষভাবে ধর্মের ব্যাপারে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীর মত হ'ল, তথাকথিত

ধর্মীয় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত বচনগুলির কোন দার্শনিক ও যৌক্তিক মূল্য নেই। এগুলি ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যাচাই করা যায় না, তাই অর্থহীন। এগুলি মানস বৃত্তি হিসেবে মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হ'তে পারে, কিন্তু দার্শনিক আলোচনার বিষয় হ'তে পারে না। প্রখ্যাত যৌক্তিক প্রত্যক্ষ্যবাদী এয়ার (Ayer) তাঁর "ভাষা, সত্য ও যুক্তি" (Language, Truth and Logic) গ্রন্থে বলেছেন, "নীতিবাদীর মত ঈশ্বরবাদীও বিশ্বাস করতে পারেন যে, তাঁর অভিজ্ঞতা হ'ল জ্ঞানীয় অভিজ্ঞতা, কিন্তু, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁর জ্ঞানকে তিনি প্রত্যক্ষের দ্বারা নির্ধারণযোগ্য বচনে রূপ দিতে পারছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা নিশ্চিত যে, তিনি নিজেকে প্রতারিত করছেন।"[1]

যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের বিরুদ্ধে প্রথমেই বলা যায় যে, ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতাকে এই মতবাদে যে স্থান দেওয়া হয়েছে, তা যথাযোগ্য নয়। একথা স্বীকার করতে বাধা নেই যে, কোন বচনের যদি অর্থ বা তাৎপর্য থাকে, তা'হলে কোন একটি বিশেষ অবস্থায় তা সত্য হ'বে, ও অপর কোন এক অবস্থায় তা মিথ্যা হ'বে ; এবং এই সত্যতা বা মিথ্যাত্ব নির্ধারণের কোন নির্দিষ্ট নীতিও থাকবে। আর একথাও মানতে বাধা নেই যে, এই যাথার্থ্য নির্ধারণের ব্যাপারে কোন এক ধরনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও প্রয়োজন। কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা যে একমাত্র ইন্দ্রিয়জ ছাড়া আর কিছুই নয়, একথা কি জোর দিয়ে বলা যায়? একথা মেনে নেওয়ার অর্থ, একমাত্র লৌকিক বর্ণনামূলক বচনেরই তাৎপর্য বা অর্থ আছে। কিন্তু ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতা ছাড়াও ত' আরও অন্য ধরনের প্রত্যক্ষ থাকতে পারে। অবশ্য এই ধরনের অলৌকিক প্রত্যক্ষের উপযুক্ত বর্ণনা ও যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা না পাওয়া গেলেও এর সম্ভাবনাও যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের বাধক।

দ্বিতীয়ত, সত্যাসত্য নির্ধারণ করা বলতে ঠিক কি বোঝানো হয়, এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের কাছে পাওয়া যায় না। কেননা, কোন বচনকে যাচাই করার অর্থ যদি বর্তমান বা ভবিষ্যতে ঐ বচনের অনুকূল কোন অভিজ্ঞতা হওয়া বোঝানো হয়, তা'হলে অতীত ঘটনার নির্দেশক কোন বচনকে যাচাই করার উপায় নেই। যা পূর্বে ঘটে গেছে তার সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা হ'তে পারে না ; এবং এঁদের মত স্বীকার করলে এই ধরনের অতীত ঘটনার নির্দেশক বাক্যেরও কোন অর্থ বা তাৎপর্য থাকার কথা নয়।

1 A. J. Ayer. Language, Truth and Logic, Ch. VI, page 115.

তৃতীয়ত, ইন্দ্রিয়-জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ ব্যক্তিভেদে ভিন্ন। সুতরাং ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার বিচারে একই বচনের তাৎপর্য সকলের কাছে এক নয়। যদি তাই হয়, তা'হলে ভাষার সাহায্যে পারস্পরিক আদান-প্রদান অসম্ভব হয়ে ওঠে। যে-কথা আমি বোঝাতে চাই, তা অপরের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়।

চতুর্থত, ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কোন সার্বিক বচনেরই যাথার্থ্য যাচাই করা যায় না। এমন কি যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের নিজস্ব মত, "কোন বচন ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার সাহায্যে গৃহীত না হ'লে সত্য হ'বে না," এই বচনটিও ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার সাহায্যে যাচাই করা যায় না; ফলে এটিও অর্থহীন হয়ে পড়ে। এই সব অসুবিধার জন্যই যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদে যাথার্থ্য নির্দ্ধারণের ব্যাপারটি নতুন করে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয়েছে।

পঞ্চমত, যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা অভিযোগ করেন যে, প্রাচীন দার্শনিকরা পূর্ব-কল্পিত ধারণা নিয়ে দার্শনিক আলোচনা আরম্ভ করেন। কিন্তু এঁদের সম্বন্ধেও বলা যায় যে, এঁরাও পূর্ব-কল্পিত ধারণা নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করেছেন। কারণ, এঁদের মতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎই একমাত্র বাস্তব জগৎ। সুতরাং এঁরাও এক ধরনের নির্বিচারবাদী। যাঁরা অন্যের ব্যাপারে কঠোর সমালোচনা করেন, তাঁদের নিজেদের পূর্ব-প্রকল্প সম্বন্ধেও নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছদৃষ্টি হওয়া উচিত।

শেষত, যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা যেন স্বেচ্ছাকৃতভাবে চিন্তার ক্ষেত্রে দৈন্য এনেছেন। বাস্তব জগৎ যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎমাত্র নয়, তার পরিধি যে আরও অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত, একথা তাঁরা চিন্তার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাকৃত-ভাবে এড়িয়ে গেছেন। ফলে চিন্তাকে তাঁরা সীমাবদ্ধ করেছেন।

উপসংহারে বলা যায় যে, যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী সমালোচনার ফলে দর্শনের ক্ষেত্রে অনেক অপ্রয়োজনীয় আলোচনা বন্ধ হয়েছে ও নতুন ধরনের তাত্ত্বিক আলোচনার সূচনা হয়েছে বটে, কিন্তু ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতাকে প্রাধান্য দেওয়ায়, অভিজ্ঞতাবাদের দোষ-ত্রুটি এর মধ্যে এসে পড়েছে। ফলে এই দর্শন হয়েছে অসম্পূর্ণ ও সীমাবদ্ধ।

6. চার্বাকের মত

চার্বাকের মতবাদ আলোচনা করার প্রধান অসুবিধা হ'ল, চার্বাক দর্শনের কোন সূত্রগ্রন্থ বা পুঁথি পাওয়া যায় না। অথচ প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারায় চার্বাক একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। অন্য

সব প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক মতবাদেই চার্বাকের উল্লেখ পাওয়া যায়, সমর্থনের জন্য নয়, সমালোচনার উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ, (প্রত্যেক দর্শনেই চার্বাক-দর্শনকে খণ্ডন করা হয়েছে। এ-ব্যাপারে আস্তিক (বেদের সমর্থক) ও নাস্তিক (বেদ-বিরোধী), উভয় গোষ্ঠীই একমত। প্রধান দার্শনিক মতবাদগুলির মধ্যে একমাত্র 'ন্যায়', 'যোগ' ও 'রামানুজ-বেদান্ত' ছাড়া আর কোন দর্শনেই ঈশ্বরকে তত্ত্ব বা পদার্থরূপে স্বীকার করা হয় নি। 'অদ্বৈতবেদান্তে' ঈশ্বরের স্বীকৃতি থাকলেও ঈশ্বরকে পরমতত্ত্ব বলে মানা হয় নি। 'অদ্বৈত-বেদান্তে' পরমতত্ত্ব একমাত্র নির্বিশেষ ব্রহ্ম। এ ছাড়া 'সাংখ্য', 'মীমাংসা', 'জৈন' ও 'বৌদ্ধ' দর্শনেও তত্ত্ব হিসেবে ঈশ্বরের কোন স্বীকৃতি নেই। সুতরাং 'ন্যায়,, 'যোগ' ও রামানুজ-বেদান্ত ছাড়া অন্য সব দার্শনিক মতবাদকেই ঈশ্বর-বিরোধী বলা যায়। কিন্তু এদের সকলকে ধর্ম-বিরোধী বলা যায় কিনা, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ, প্রাচীন ভারতবর্ষে 'ধর্ম' শব্দের অর্থ, বর্তমানে ধর্ম বলতে আমরা সাধারণত যা বুঝি, তা' থেকে ভিন্ন ছিল।) আর তা ছাড়াও তথাকথিত ঈশ্বরবিহীন ধর্মগুলিও তা'দের ঈশ্বরবিহীনতা রক্ষা করতে পেরেছে কিনা, এ-সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ আছে।

কিন্তু (চার্বাক দর্শনকে সবদিক থেকেই ধর্ম-বিরোধী মতবাদ বলা যায়।) এই কারণেই ধর্মবিরোধী মতবাদের আলোচনায় চার্বাকের মত উল্লেখ না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। চার্বাক নামের বা এই নামের সঙ্গে যুক্ত মতবাদের উৎপত্তি নিয়ে অনেক মতবিরোধ আছে যার সঙ্গে আমাদের বর্তমান আলোচনার কোন সম্পর্ক নেই। (চার্বাক দর্শনের আর এক নাম 'লোকায়তমত'।) এর আক্ষরিক অর্থ হ'ল জনসাধারণের অনুধাবনযোগ্য বা জনপ্রিয়। কিন্তু প্রাচীন চার্বাকবিরোধীদের দেওয়া এই নাম চার্বাক মতের সম্বন্ধে তাঁদের শ্রদ্ধার সূচক নয়।

চার্বাকের মতে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র ও নির্ভরযোগ্য উৎস। অনুমান বা শাব্দজ্ঞান প্রত্যক্ষনির্ভর এবং বাস্তব জ্ঞানের উৎস হিসেবে মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ, অনুমান ও শাব্দজ্ঞানের ক্ষেত্রে সব সময়েই সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। সুতরাং প্রত্যক্ষে যা পাওয়া যায় না, তার বাস্তবতা স্বীকার করা যায় না। প্রত্যক্ষে আমরা চারটি মৌলিক পদার্থ সম্বন্ধে জানতে পারি। এই চারটি হ'ল ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও বায়ু। অতএব চার্বাক এই চারটি পদার্থেরই অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন; এবং তাঁর মতে জগতে আমরা যা কিছুর সংস্পর্শে আসি তা' সবই এই চারটি মৌলিক পদার্থ থেকে উদ্ভূত। আত্মা, ঈশ্বর, জন্মান্তর ইত্যাদির কোনটিই প্রত্যক্ষে পাওয়া যায় না;

সুতরাং এদের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। অন্যান্য দর্শনে জগতের কর্তা ও স্রষ্টা হিসেবে ঈশ্বরের অস্তিত্বের যে-সব অনুমান প্রমাণ দেওয়া হয়েছে, তিনি সেগুলিকে অস্বীকার করেছেন। (চার্বাক-মতে জগতের কোন স্রষ্টা বা কর্তা নেই। ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ ও বায়ু, এই চারটি পদার্থের যোগাযোগের ফলেই বিচিত্র বস্তুর সৃষ্টি হয়। এই সৃষ্টির মূলে কোন বুদ্ধি বা চিন্তাশক্তির অবদান নেই। প্রত্যেক প্রাকৃত বস্তুরই স্বভাব ও নিজস্ব প্রকৃতি আছে, আর এদের ব্যবহার এই স্বভাবের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়, বাইরের কোন শক্তির দ্বারা নয়। এই ধরনের মতকে 'স্বভাববাদ' বলা হয়। কর্মের ফলদাতা হিসেবেও চার্বাক ঈশ্বর স্বীকার করেন না। কারণ তিনি কর্মবাদ ও জন্মান্তরে বিশ্বাসী ন'ন। প্রাচীন ভারতে স্বীকৃত ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চারটি পুরুষার্থের মধ্যে চার্বাক কেবলমাত্র অর্থ ও কামকেই স্বীকার করেন। সুতরাং নৈতিকতার কোন মূল্য তাঁর কাছে নেই। চার্বাক মনে করেন, ঈশ্বর ও ধর্ম আসলে পুরোহিতদের সৃষ্টি। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরোহিতরা অজ্ঞ ও অন্ধ-বিশ্বাসী মানুষদের শোষণ করে। এই-সব আচার বা অনুষ্ঠানের কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। কারণ, যে ঈশ্বর এই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ভিত্তি, কোন ভাবেই তাঁর অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় না।)

চার্বাকের মতের প্রধান গুণ হ'ল, অনুমান প্রমাণের যেটি প্রধান ত্রুটি সেটি তিনি বিশেষভাবে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু প্রত্যক্ষের প্রামাণিকতার উপর তিনি যত জোর দিয়েছেন, তা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা প্রত্যক্ষেও ভ্রান্তির সম্ভাবনা আছে। তাছাড়া (চার্বাক ঈশ্বর ও ধর্ম ছাড়াও নৈতিকতাকে একেবারেই অস্বীকার করেছেন। ফলে তিনি যে নীতি প্রচার করেছেন তা পাশবিক নীতি। বিশেষ করে ইন্দ্রিয়-ভোগকেই মানব-জীবনের একমাত্র কাম্য বলে স্বীকার করায়, চার্বাক প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকদের সকলেরই সমালোচনার পাত্র হয়েছেন। চার্বাক দর্শনের নীতিহীনতা বা পাশব নীতিই ভারতীয় দার্শনিকদের কাছে চার্বাক দর্শনকে হেয় ও গ্রহণের অযোগ্য বলে প্রমাণ করেছে।)

উপসংহারে এই কথা বলা যায় যে, চার্বাক দর্শন সম্বন্ধে আমাদের বর্তমান জ্ঞান এতই অল্প যে, আমাদের পক্ষে এই দর্শনের যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব নয়। এই দর্শনের মূল্যায়নের আরও একটি অসুবিধা হ'ল, বর্তমানে চার্বাক-দর্শন সম্বন্ধে কিছু জানতে গেলে আমাদের সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে হয় চার্বাকের প্রাচীন ভারতীয় সমালোচকদের উপর। কেবলমাত্র সমালোচকের উদ্ধৃতি থেকে কোন দার্শনিক চিন্তাধারার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা

করা অসম্ভব। এইসব অসুবিধা মেনে নিয়েও বলা যায় যে, অনুমান সম্বন্ধে চার্বাকের আপত্তির মধ্যে যথেষ্ট সূক্ষ্ম বিচারশক্তির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু চার্বাকের অধিবিদ্যা (metaphysics)-কে স্থূল নির্বিচারী জড়বাদ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। আধুনিক জড়বাদ ও প্রাকৃতবাদ এই স্থূল জড়বাদ থেকে অনেক পরিবর্তিত হয়েছে, অনেক এগিয়ে এসেছে। সুতরাং (চার্বাকের জড়বাদ আজ লুপ্তপ্রায়। দর্শনের ক্ষেত্রে এর ঐতিহাসিক মূল্য ছাড়া আর বিশেষ কোন মূল্য নেই।) কিন্তু সবচেয়ে বেশি অসামঞ্জস্য ও স্থূলতা লক্ষ্য করা যায় চার্বাকের নীতিবিদ্যায়। এই ধরনের নীতি মানুষের সমাজ-জীবনকে অস্বীকার করে কেবলমাত্র স্থূল আত্মসুখ ও ইন্দ্রিয়সুখেরই নির্দেশ দেয়। যে পাশব নীতির কথা চার্বাক প্রচার করেছেন বলে জানা যায়, তা শিক্ষার বা অভ্যাসের ব্যাপার নয়, সাহজিক প্রবৃত্তির ব্যাপার। পশু হিসেবে মানুষও স্বাভাবিকভাবেই ইন্দ্রিয়সুখ কামনা করে, এর জন্য কোন শাস্ত্র বা উপদেশের অপেক্ষা রাখে না। ধর্ম ও নীতির ব্যাপারে এই স্থূলতার জন্য অন্যান্য জড়বাদী ও প্রাকৃতবাদী দর্শনের মত চার্বাক-দর্শনও অসম্পূর্ণ ও গ্রহণের অযোগ্য।

যে ক'টি ধর্মবিরোধী মতবাদ নিয়ে আলোচনা করা হ'ল, সেগুলি পরস্পর থেকে নানা ব্যাপারে পৃথক্ হ'লেও সব ক'টি মতবাদই একই পূর্বকল্পের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সব বিভিন্ন মতবাদের সমর্থকেরা সকলেই প্রত্যক্ষকেই জ্ঞানের প্রধান ও চরম নির্ভরযোগ্য উৎস বলে স্বীকার করেছেন। প্রত্যক্ষ বলতে এখানে অবশ্য বাহ্য প্রত্যক্ষকেই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, এঁরা সকলেই জ্ঞানের প্রামাণ্য যাচাই করতে ও জ্ঞাত বস্তুর স্বরূপ ও বাস্তবতা নির্ণয় করতে বাহ্য প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করেছেন। যা প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য নয়, যা ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায় না, তাকে তাঁরা সত্য বা বাস্তব বলে মানতে রাজী ন'ন। সুতরাং অতীন্দ্রিয় ও অতিপ্রাকৃতের ব্যাপারে কেউবা উদাসীন, আবার কেউবা প্রত্যক্ষভাবে বিরোধী। তাঁদের মতে অতীন্দ্রিয় ঈশ্বর অলীক এবং ধর্মের কোন বাস্তব ভিত্তি নেই।

কিন্তু আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, জ্ঞানের ব্যাপারে প্রত্যক্ষ-বাদকে যাঁরা পূর্বকল্প বলে স্বীকার করেছেন তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে জীবনের সামগ্রিক ও সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। আমাদের জীবনের একটা বড় অংশই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ব্যাপার নয়। বিশ্বজগতের সঙ্গে মানুষের প্রধানত দু'টি সম্পর্ক। একটি হ'ল, জ্ঞানের সম্পর্ক আর অপরটি মূল্যায়নের। আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে প্রতি নিয়তই আমাদের

পরিবেশকে, এই বিশ্বকে জানছি। যা আছে, যা আমাদের কাছে প্রকাশিত হচ্ছে এই জগৎ প্রপঞ্চরূপে, তাকে গ্রহণ করছি। এই জ্ঞানই আমাদের বাস্তবতার জ্ঞান। বিভিন্ন প্রাকৃত বিজ্ঞানের কাজ হ'ল এই বাস্তব প্রকৃতির রূপটি আমাদের কাছে তুলে ধরা। বাস্তব প্রকৃতির সম্বন্ধে আমরা প্রতিনিয়ত যা জানছি তাকেই একটি সুসংহত রূপ দেওয়া। আমাদের এই বাস্তব জ্ঞান প্রধানত প্রত্যক্ষনির্ভর। অনুমান সেখানে প্রত্যক্ষের পরিপূরক। কিন্তু আনুমানিক সিদ্ধান্তেরও শেষ ও চূড়ান্ত বিচার হয় প্রত্যক্ষ দিয়ে। তাই যা' প্রত্যক্ষের অগোচর প্রাকৃত বিজ্ঞানে তার কোন স্থান নেই। অবশ্য প্রত্যক্ষ বলতে ঠিক কি বোঝানো হয়, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। প্রাকৃত বিজ্ঞানে সাধারণত প্রত্যক্ষ বলতে বাহ্য-প্রত্যক্ষকেই বোঝানো হয়েছে।

কিন্তু বাস্তবকে প্রত্যক্ষ করা ছাড়াও মানুষের সঙ্গে তার পরিবেশের আর একটি সম্বন্ধ আছে। সেটি হ'ল মূল্যায়নের সম্বন্ধ। মানুষ তার পরিবেশকে শুধু জানছে তাই নয়, তার মূল্যায়নও করছে। তাই বড় শিল্পীর আঁকা একটি ছবি আমাদের কাছে বাস্তব সত্য হিসেবে শুধু কতকগুলি রং ও রেখার সমষ্টি নয়, সেটি আমাদের কাছে সুন্দর। ছবিটির সৌন্দর্যকে আমরা অনুভব করি, মূল্য দিই। আবার যখন কারও কোন কাজকে আমরা সৎ বা ন্যায্য বলে স্বীকার করি, তখনও তার মূল্যায়ন করি। এই মূল্যায়ন ব্যক্তিনির্ভর হ'লেও সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। কারণ, কোন কিছুর মূল্য বিচার করার সময় আমরা তা' করি কোন মান (Standard) বা আদর্শের মাপকাঠিতে। এই আদর্শ আমাদের প্রত্যক্ষকে অতিক্রম করে থাকে। যা বস্তুত দিক্-কালের গণ্ডিতে আছে, যা ঘটে, তা আমরা পাই প্রত্যক্ষে, আর যা' হওয়া উচিত বা হ'তে পারে তা আমরা প্রত্যক্ষ দিয়ে পাই না। অথচ, এই আদর্শের অনুভব ছাড়া মূল্যায়নও সম্ভব নয়। মানবজীবনে এই রকম তিনটি পরম মূল্য বা আদর্শ আছে যাদের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ তার পরিবেশের চরম মূল্যায়ন করে। এই তিনটি আদর্শ হ'ল সত্য, শিব ও সুন্দরের আদর্শ। এই আদর্শগুলিকে পরম আদর্শ বা পরম মূল্য বলা হয় এই জন্য যে, অন্য যে কোন আদর্শ আমাদের কাছে মূল্যবান হয় অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসেবে। অর্থ আমরা কামনা করি, তার নিজস্ব বা স্বকীয় কোন গুণের জন্য নয়, তার দ্বারা অন্য উদ্দেশ্য সাধন করা যায় বলে, কিন্তু সত্যকে আমরা মূল্য দিই তা সত্য বলেই। শিব ও সুন্দরের আদর্শ সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। তাই সত্য, শিব ও সুন্দরের আছে স্বকীয় মূল্য বা পরম মূল্য।

এখানে স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন যে, এই পরম আদর্শ বা মূল্যগুলি

আমাদের ব্যক্তিগত ধারণা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। এদের সকলেরই এক ধরনের আবশ্যিকতা (Necessity) ও অনিবার্যতা আছে। যখন কোন জ্ঞানকে আমরা সত্য বলে মানি, তখন তাকে মিথ্যা বলবার ইচ্ছা থাকলেও আমরা তা' পারি না। আমরা তাকে সত্য বলে স্বীকার করতে বাধ্য হই। আবার কোন ব্যক্তির কোন কাজকে যখন আমরা সৎ বলি, তখন তার মধ্যে আমরা এমন কিছু অনুভব করি যা' আমাদের বিচার শক্তিকে ও মন্তব্যকে বাধ্য করে। ইচ্ছা করলেও তাকে অস্বীকার করবার উপায় আমাদের নেই। আমাদের সমাজ-চেতনা, আমাদের নীতিবোধ আমাদের মূল্যায়নকে বাধ্য করে। নৈতিক মূল্যবোধকে অনেকে সাপেক্ষ, অস্থায়ী ও পরিবেশনির্ভর বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মতে দেশে দেশে ও কালে কালে নৈতিক মূল্যমানের ভিন্নতা ঘটে। সুতরাং সামাজিক পরিবেশই আমাদের নৈতিক মূল্যবোধের নির্ধারক। কিন্তু এর বিরুদ্ধে বলা যায় যে, সমাজ-সংস্কারকদের নৈতিক চেতনা ও মূল্যবোধ সমাজ-স্বীকৃত নীতির উর্ধে ওঠে ও অনেক ক্ষেত্রেই তার বিরোধিতা করে। নৈতিক আদর্শের বাস্তবতা ছাড়া সমাজ-সংস্কারকদের নীতিবোধকে ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ এঁদের সকলেরই নীতিবোধ যুগের তুলনায় অনেক এগিয়ে থাকে।

সুন্দরের আদর্শকে অনেকেই বিশেষভাবে ব্যক্তিগত পছন্দের ব্যাপার বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মতে সৌন্দর্য-বিচারের সময় আমরা আমাদের নিজেদের ভাল লাগার উপর নির্ভর করি। কিন্তু সত্য ও শিবের মত সুন্দরও বাস্তব। আমাদের ব্যক্তিগত রসবোধ দিয়ে তাকে অস্বীকার করা যায় না। সূক্ষ্ম ও উচ্চতর বৈজ্ঞানিক সত্যকে উপলব্ধি করবার জন্য ও উন্নত নৈতিক আদর্শের মূল্য বোঝবার জন্য যেমন উপযুক্ত শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রয়োজন, মহৎ সৌন্দর্যকে অনুভব করবার জন্যও ঠিক তেমনই শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রয়োজন। শিল্পের সৌন্দর্য কারও ব্যক্তিগত কল্পনা নয়, এর মধ্যে আমরা পরম সত্তাকেই ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করি। সুতরাং সত্য, শিব ও সুন্দরের আদর্শের বাস্তবতা অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য একথা বলা যায় না যে, সত্য, শিব ও সুন্দরের আদর্শগুলি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সম্পূর্ণ, নির্ভুল ও অপরিবর্তনীয়। কেননা, আমাদের পক্ষে সত্য, শিব ও সুন্দর কোন স্থির নির্দিষ্ট আদর্শ নয়। পরমসত্তার অঙ্গরূপে তারা আমাদের চেতনায় ক্রমপর্যায়ে প্রকাশিত হয়। ধীরে ধীরে জীবনের নানা অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির মধ্য দিয়ে আমরা এই সব আদর্শকে ক্রমশ উপলব্ধি করি। এগুলি আমাদের কাছে সচল, গতিমান, 'অধরা'। আর এই কারণেই এগুলি আমাদের কাছে আদর্শরূপেই থাকে।

সত্য, শিব ও সুন্দরের পরম আদর্শগুলিই মানব-জীবনে ধর্মের বাস্তবতা প্রমাণ করে। ঈশ্বর হ'লেন, পরম আদর্শগুলির মিলনকেন্দ্র। মানুষের তিনটি বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতাব ভিত্তিস্বরূপ হ'লেও এই তিনটি আদর্শ মূলত ভিন্ন নয়। এক অদ্বিতীয় পরমসত্তার মধ্যে এরা এক ও সার্থক, একই পরমসত্তা, একই ঈশ্বরের মহিমার প্রকাশ। এই তিন পরম আদর্শের মধ্যেই মানুষের জীবনের সমস্ত আশা ও আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয়, সার্থক হয়। মানবিক আদর্শ হিসেবে তাই এরা মানব-জীবনের অন্য আর সব কিছুর মতই বাস্তব ও সত্য। আর এই আদর্শের বাস্তবতা, এই আদর্শের অনুসরণ ও সাধনাই ধর্ম-জীবনকে সার্থক করে, ধর্ম-জীবনকে বিশিষ্টতা ও ব্যাস্তবতা দেয়। সুতরাং এই সব পরম আদর্শ ও মূল্যের ভিত্তিরূপেই ধর্ম বাস্তব।

প্রত্যক্ষনির্ভর মতবাদগুলিতে মূল্যের কোন স্থান নেই। একমাত্র কোঁৎ ব্যতীত, এঁদের মধ্যে কোন মতবাদীই মানবিক মূল্যের বাস্তবতা স্বীকার করেন নি। কিন্তু মানব জীবনে মূল্য ও আদর্শকে বাদ দিয়ে জীবনের তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করার অর্থ জীবন সম্বন্ধে এক অতি অসম্পূর্ণ ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী নেওয়া। আব এই আংশিক ও সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে বোঝবার চেষ্টা অসফল ও ব্যর্থ হ'তে বাধ্য।

নির্বাচিত পুস্তক-তালিকা

1. D. Miall Edwards—The Philosophy of Religion
2. Sigmund Freud—Totem and Taboo (Pelican Books) Eng. Tr., A. A. Brill.
3. McIver and Page—Society, An Introdvctory Analysis.
4. V I. Lenin—Collected Works, Vol 10. (Moscow), Eng. Tr.
5. James Ward—Naturalism and Agnosticism.
6. A. S Pringle-Pattison—Idea of God.
7. R. Falckeaberg—History of Modern Philosophy, (Eng, Tr., A. C. Armstrong Jr.)
8. A. J. Ayer—Language, Truth and Logic.

চতুর্দশ অধ্যায়

প্রচলিত ধর্মমতগুলির মূলকথা

এ পর্যন্ত ধর্ম সম্বন্ধে আমরা যে-সব আলোচনা করেছি তা' দার্শনিক ও অংশত বৈজ্ঞানিক। এই সব আলোচনায় ধর্মকে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে ও সমাজ-জীবনে একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সার্বজনীন ব্যাপার বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। এই কারণেই কোন বিশেষ ধর্মমত সম্বন্ধে আলোচনা না করে ধর্মকে সার্বিক ও সাধারণ অর্থে ব্যবহার করা হ'য়েছে; এবং ধর্ম-দর্শনের উদ্দেশ্যও তাই। কিন্তু ধর্ম প্রধানত ব্যবহারিক। আচার, অনুষ্ঠান, ক্রিয়া, প্রার্থনা ইত্যাদির মধ্য দিয়েই হয় ধর্মের অভিব্যক্তি। ধর্মের এই অভিব্যক্তি ও মর্ত রূপটিকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র বিমূর্ত ধারণার সাহায্যে ধর্মের স্বরূপটি বোঝার চেষ্টা সফল হওয়া কঠিন। আমরা সাধারণত চিন্তা করি দৃষ্টান্ত ও প্রতিরূপ (image)-এর মাধ্যমে। মনস্তাত্ত্বিক বিচারে প্রতিরূপহীন চিন্তা (imageless thought) সম্ভব কিনা, এ তর্কের মধ্যে না গিয়েও বলা যায়, আমাদের চিন্তা সাধারণত প্রতিরূপকে আশ্রয় করেই অগ্রসর হয়। আর এই প্রতিরূপ আবার প্রত্যেক্ষকেই নির্ভর করে গড়ে ওঠে। সুতরাং ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যে প্রতিরূপের আশ্রয় নেয় তা-ও প্রত্যক্ষকে নির্ভর করেই তৈরী হয়। প্রকৃত ও প্রচলিত ধমমতগুলির যে-সমস্ত আচার, অনুষ্ঠান, ক্রিয়াপদ্ধতি আমরা প্রত্যক্ষ করি, সেগুলিকে বাদ দিয়ে ধর্মের কোন স্পষ্ট চিত্র আমাদের মনে রূপায়িত হ'তে পারে না। সুতরাং মানুষের ধর্ম-প্রবণতার বিচিত্র অভিব্যক্তি ও বিচিত্র প্রকাশের দৃষ্টান্ত হিসেবে নির্দিষ্ট কোন কোন ধর্মমতের আলোচনা বাঞ্ছনীয়। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা নির্দিষ্ট কতকগুলি ধর্মমতের আচার, অনুষ্ঠান, বিশ্বাস ও ক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করব। আমরা এমন কয়েকটি ধর্মমতের আলোচনা করব যেগুলি আজও প্রচলিত, অর্থাৎ যেগুলির অনুগামীদের আজও দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য এদের মধ্যেও সবগুলির বিশদ আলোচনা সম্ভব নয় বলেই, মাত্র কয়েকটি সম্বন্ধেই সংক্ষেপে আলোচনা করব। এই বিশেষ ধর্মমতগুলি হ'ল (A) হিন্দু, (B) জৈন, (C) বৌদ্ধ, (D) খ্রীষ্ট, (E) ইসলাম, (F) শিখ, ও (G) পারসীক ধর্ম। আধুনিক ভারতবর্ষে ও ভারতের বাইরেও এই সব ধর্মের অনুগামীদের যথেষ্ট সংখ্যায় দেখা যায়।

(A) হিন্দুধর্ম

স্বল্প পরিসরে হিন্দুধর্মের সম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরা অসম্ভব। এর যথাযথ সংজ্ঞার্থ নির্ণয় করাও কঠিন। কারণ, হিন্দুধর্ম ঈশ্বরের কোন প্রত্যাদেশ বা ব্যক্তিবিশেষের আধ্যাত্মিক অনুভূতি, অভিজ্ঞতা বা বাণীকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে নি। যুগ যুগ ধরে মানুষের নানা চিন্তা, কল্পনা, অনুভূতি ও ব্যবহার থেকে রূপ নিয়েছে এই ধর্ম। তাই ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্যের দিক থেকে হিন্দুধর্ম আধুনিক জগতের ধর্মগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান। বিভিন্ন যুগের অসংখ্য মুনি, ঋষি, আচার্য ও ভক্তের বিচিত্র ধর্মীয় ও নৈতিক অভিজ্ঞতা ও উপদেশই হ'ল হিন্দুধর্মের ভিত্তি। তাই প্রাচীন ও আধুনিক কালের নানা চিন্তাধারা ও অনুভূতির সমন্বয় ঘটেছে হিন্দুধর্মে। ঐতিহাসিক বিচারে হিন্দুধর্মের ভিত্তি হ'ল : (a) 'শ্রুতি' বা বেদ ও উপনিষদ, (b) মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর ইত্যাদি 'স্মৃতি' বা ধর্মশাস্ত্র, (c) ছত্রিশটি 'পুরাণ' ও 'উপপুরাণ', (d) রামায়ণ ও মহাভারত ইত্যাদি 'ইতিহাস', (e) ছ'টি 'বেদাঙ্গ', এর মধ্যে আছে শ্রৌত, গৃহ্য ও ধর্মসূত্র, এবং (f) ছ'টি 'বেদোপাঙ্গ' বা ষড়দর্শন (সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত)। যে ধর্মের ভিত্তি এত ব্যাপক ও বৈচিত্র্যময়, সেই ধর্মের অভিব্যক্তির মধ্যেও ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্য থাকাই স্বাভাবিক। সুতরাং কোন একটিমাত্র আদর্শকে হিন্দুধর্মের আদর্শও বলা যায় না, এবং আদর্শে পৌঁছবার কোন একটিমাত্র মার্গ বা পথকেও হিন্দুর ধর্মীয় পথ বলে চিহ্নিত করা যায় না। কিন্তু এত বৈচিত্র্যের মধ্যেও হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার মধ্যে এক ঐক্য-ধারা লক্ষ্য করা যায়। এই ধারাটিকেই হিন্দুধর্মের মূলধারা বলা যায়। এই ধারাই যুগ যুগ ধরে এই ধর্মের উপধারাগুলিকে প্রাণশক্তি যুগিয়েছে।

ব্যুৎপত্তিগত অর্থে 'হিন্দু-ধর্ম' বলতে সিন্ধুনদের উপত্যকা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যে ধর্ম গড়ে উঠেছিল তা'কেই বোঝায়। এই অর্থে জৈন, বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্মকেও হিন্দুধর্ম বলা যায় এবং অনেকে এই ধর্মগুলিকেও হিন্দুধর্ম বলেই বর্ণনা করেছেন; কিন্তু নানা দিক থেকে হিন্দুধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হ'লেও প্রচলিত অর্থে এই ধর্মগুলিকে হিন্দুধর্ম বলা হয় না। তার কারণ নানা বৈচিত্র্যের মধ্যেও হিন্দুধর্মের মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যার জন্য ভারতবর্ষের অন্য যে-কোন ধর্মের সঙ্গে হিন্দধর্মের পার্থক্য নির্দেশ করা যায়।

(i) **বেদ—হিন্দুধর্মকে এককথায় বৈদিকধর্ম বলে বর্ণনা করা যায়। চতুর্বেদই (ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব) হিন্দুধর্মের মূল। বিবর্তনের পথে**

একাধিক অবৈদিক চিন্তাধারা ও প্রথা এই ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হ'লেও এবং সমস্ত হিন্দু দেব-দেবীর উল্লেখ বেদের মধ্যে পাওয়া না গেলেও বেদকেই হিন্দুরা প্রধান ও প্রামাণ্য ধর্মগ্রন্থ বলে স্বীকার করেন। যে ধর্মের আচার প্রথা বা চিন্তাধারা হিন্দুধর্মের অন্তর্ভূত বলে পরিচিত, তা' অন্যান্য হিন্দু-ধর্মের তুলনায় নানা দিকে বিশিষ্ট হ'লেও বেদকে নিশ্চয়ই প্রামাণ্য ও অকাট্য বলে বিশ্বাস করে।

বেদের ঐতিহাসিক উৎপত্তি আজও গবেষণার বিষয়। তবে বেদ যে মানুষের সর্ব-প্রাচীন সাহিত্যকীর্তি, এ সম্বন্ধে প্রায় সকলেই একমত। চারটি বেদের মধ্যে ঋক্, সাম ও যজুর্বেদের বিষয়বস্তুর মধ্যে যথেষ্ট ঐক্য দেখতে পাওয়া যায়। অথর্ববেদ এদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন না হ'লেও এর বিষয়ের কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এদের মধ্যে আবার ঋগ্বেদই সবচেয়ে প্রাচীন। ম্যাক্স মূলরের (Max Müller) মতে ঋগ্বেদের আদি অংশ বর্তমান আকারে রচিত হয় খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ থেকে ষষ্ঠ শতকের মধ্যে (খ্রীষ্টপূর্ব 1200-600)। পরবর্তীকালে তিলক ও জ্যাকবি (Jacobi) বেদের আদি রচনাকাল খ্রীষ্ট জন্মের সাড়ে চার হাজার থেকে আড়াই হাজার বছর পূর্বে বলে নির্দেশ করেন।[1]

বেদের প্রধানত দু'টি ভাগ—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। মন্ত্রগুলি হ'ল দেবতা ও ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন ও প্রার্থনা। এগুলি ছন্দে রচিত। ব্রাহ্মণগুলিতে বৈদিক ক্রিয়া পদ্ধতি যাগ-যজ্ঞ ইত্যাদির বর্ণনা পাওয়া যায়। এগুলিতে মন্ত্রের ব্যাখ্যাও করা হয়। ব্রাহ্মণগুলি প্রধানত গদ্যে রচিত। ব্রাহ্মণ-গুলির কিছু অংশে দার্শনিক তত্ত্বালোচনাও করা হয়েছে। এগুলিকেই উপনিষদ, বলা হয়। হিন্দুধর্মে ও ভারতীয় দর্শনে এই উপনিষদের স্থান অদ্বিতীয়। এগুলিকে ভারতীয় দর্শনিক চিন্তাধারার উৎস বলা হয়। শুধু বৈদিক নয়, বেদবিরোধী ভারতীয় দর্শনের উপরও উপনিষদের প্রভাব অনস্বীকার্য।

(ii) একেশ্বরবাদ—ঋগ্বেদে একাধিক দেব-দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সব বৈদিক দেবতা প্রথমে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে অভিন্ন ছিল। বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এই সব বৈদিক দেবতার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। সুতরাং নামের উল্লেখ না থাকলে কেবলমাত্র বর্ণনা থেকে এদের মধ্যে পার্থক্য বোঝা অসম্ভব হ'ত; এবং মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র ইত্যাদি

1. Tarapada Chowdhury, Art. The Vedas, History of Philosophy, Eastern and Western Vol. I, Edited by Radhakrishnan and others, page 40.

কোন একটি দেবতার প্রার্থনায় সেই দেবতাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বর্ণনা করার পদ্ধতি বৈদিক যুগেই দেখা যায়। ম্যাক্স্ মূলর এই প্রথাকেই 'একদেব প্রাধান্যবাদ' (henotheism) বলে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং অতি প্রাচীনকাল থেকেই হিন্দুধর্মে একেশ্বরবাদের প্রবণতা দেখা যায়। বৈদিক যুগের পর পৌরাণিক যুগে বহু দেব-দেবী স্বীকার করা হয়েছে, এবং এদের সকলেই এক একটি বিশেষ কর্তব্যে রত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু সেই-যুগেও ইন্দ্রকে দেবরাজ বলে স্বীকার করা হয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য দেবতাদের তুলনায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের স্থান ঊর্ধ্বে বলে কল্পনা করা হয়েছে। আবার কখনও বা বিষ্ণু, কখনও বা মহাদেবকে দেবাদিদেব বলা হয়েছে। এই একেশ্বরবাদের প্রবণতা হিন্দুধর্মের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই প্রবণতা হিন্দুর বহু দেবতায় বিশ্বাসের তুলনায় গভীরতর। ঋগ্বেদেও স্থানবিশেষে তেত্রিশটি দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে এবং প্রজাপতিকে চতুস্ত্রিংশত্তম ও অন্য সকল দেবতার প্রধান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই ধরনের আরও অনেক দৃষ্টান্ত বেদে দেখানো যায়, যেখানে একেশ্বরবাদের ধারণা খুবই স্পষ্ট। অবশ্য একথা মনে রাখা দরকার যে, এই সর্বপ্রধান ঈশ্বর হিন্দুধর্মে বা বেদেও সর্বক্ষেত্রে একই দেবতা ন'ন। অর্থাৎ বৈদিক যুগ থেকেই এই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এক এক সময়ে এক এক বিশেষ দেবতাকে। সুতরাং হিন্দুধর্মের একেশ্বরবাদেরও কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার মত।

(iii) অদ্বৈতবাদ—একেশ্বরবাদের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্মের মধ্যে অদ্বৈতবাদের প্রবণতাও অতি প্রাচীনকাল থেকেই বর্তমান। একেশ্বরবাদের সঙ্গে অদ্বৈতবাদের বিশেষ কোন ধারণাগত সম্বন্ধ নেই। বিশ্বের অন্যান্য অনেক ধর্মই একেশ্বরবাদী। খ্রীষ্ট, ইসলাম ইত্যাদি বিশ্বজনীন ধর্মগুলি একেশ্বরবাদী, কিন্তু এগুলি অদ্বৈতবাদী নয়। বরং বলা যায়, একেশ্বরবাদী ধর্মের সঙ্গে দ্বৈতবাদের ধারণাই যুক্ত থাকে। যাঁরা জগতের এক ও অদ্বিতীয় স্রষ্টিকর্তা মানেন, তাঁরা স্রষ্টাকে তাঁর সৃষ্টি থেকে পৃথক্ বলেই কল্পনা করেন। তাঁরা সাধারণত ঈশ্বরের জগদ্ব্যাপিতা স্বীকার করেন না। সুতরাং সর্বেশ্বরবাদ (Pantheism) একটি দার্শনিক ধারণা, ধর্মীয় বিশ্বাস নয়। ধর্মের মধ্যে পূজ্য ও পূজকের ভেদ স্বীকার করাই স্বাভাবিক। হিন্দুধর্মের মধ্যেও এই ভেদ স্বীকার করা হয়। কিন্তু প্রাচীন বৈদিক ধর্মে একেশ্বরবাদের সঙ্গে সর্বেশ্বরবাদও লক্ষ্য করার বিষয়। অবশ্য ঋগ্বেদের 'পুরুষ-সূক্তে' সৃষ্টির যে বর্ণনা আছে, তাকে ঠিক সর্বেশ্বরবাদও বলা যায় না। কেননা, যে পরম পুরুষ এই জগৎ ব্যেপে আছেন, তাঁকে জগতের সঙ্গে সমব্যাপী বলে কল্পনা

করা হয় নি। বরং বলা হয়েছে তিনি এই বিশ্ব থেকে 'দশাঙ্গুল' পরিমাণ অতিরিক্ত হয়ে আছেন। সুতরাং তিনি যেমন একদিকে জগদ্ব্যাপী, তেমনই আর এক দিকে তিনি জগতের ঊর্ধে। প্রার্থনীয় দেবতা যে বিশ্বচরাচরে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন, এই ধারণা ও বিশ্বাসও আদি হিন্দু ও বৈদিক ধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য। এই অদ্বৈতবাদ বিশেষভাবে ব্যক্ত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে উপনিষদে বা বেদান্তে। উপনিষদ্ গ্রন্থগুলি প্রাচীন ভারতের গভীর ও সূক্ষ্ম দার্শনিক চিন্তার অপূর্ব নিদর্শন।

(iv) অবতারবাদ—বৈদিক বা সনাতন হিন্দুধর্মের একেশ্বরবাদ ও অদ্বৈতবাদ অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে একটি বিশিষ্ট রূপ নেয় অবতারবাদে। অন্যান্য অনেক বিশ্বাসের মত অবতারে বিশ্বাসও আধুনিক হিন্দুধর্মের একটি প্রধান অঙ্গ। প্রধানত পৌরাণিক যুগেই এই অবতারবাদের প্রচার হয়। বিভিন্ন পুরাণের সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্রগুলি ঈশ্বরের অবতাররূপে স্বীকৃত হয়। 'অবতার' পদের আক্ষরিক অর্থ হ'ল অবতীর্ণ হওয়া। ধর্ম-বিশ্বাস প্রসঙ্গে এর অর্থ হ'ল, দেবতার পৃথিবীতে অবতীর্ণ বা আবির্ভূত হওয়া। জগতের সর্বময় কর্তা ও নিয়ন্তা সমগ্র জগৎ ব্যেপে থাকলেও কালবিশেষে পৃথিবীতে বিশিষ্ট পুরুষরূপে অবতীর্ণ হ'ন ও লীলা করেন মানুষের সঙ্গে। কিন্তু হিন্দুদের বিশ্বাস যে, যখনই পৃথিবীতে পাপ, অধর্ম ও গ্লানি বৃদ্ধি পায়, অত্যাচারের মাত্রা অধিক হয়, জীবের নৈতিক অধোগতি ঘটে, তখনই পরম করুণাময় ঈশ্বর জীবের কল্যাণের জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হ'ন ও অন্যায় ও পাপ বিদূরিত ক'রে সত্য ও ন্যায়ের ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। যুগের প্রয়োজনে অবতারের ব্যক্তিত্ব ও ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়। তিনি কখনও বা যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে অধর্মাচরণকারী ও অত্যাচারীকে হত্যা করে ন্যায়-ধর্মাচরণকারীদের রক্ষা করেন, আবার কখনও বা অহিংসা-ধর্ম প্রচার করে জীবের নৈতিক অধোগতি থেকে জীবকে রক্ষা করেন। সুতরাং অবতার জীবকে অমঙ্গল থেকে ত্রাণ করবার জন্য জগতে আবির্ভূত হ'ন। অবতারের এই আবির্ভাবের নির্দিষ্ট কতকগুলি লক্ষণ থাকে। এর মধ্যে প্রধান হ'ল অন্যায়, অধর্ম ও অত্যাচারের প্রাবল্য। তাছাড়া, যে নরশরীরে তাঁর আবির্ভাব ঘটে, তিনি বহু অসাধারণ ও আদর্শ গুণাবলী নিয়ে জন্ম-গ্রহণ করেন। তাঁর আচরণে ও চরিত্রে অলৌকিকত্ব ও অসাধারণত্বের প্রকাশ ঘটে। হিন্দুদের বিশ্বাস, ন্যায় ও সত্যধর্মাচারণকারীরা সমসাময়িক হ'লেও অবতারের দেবত্ব অনুভব করেন এবং তাঁকে দেবতাজ্ঞানেই তাঁর অনুগামী হ'ন।

পুরাণগুলিতে ব্রহ্মাকে জগতের সৃষ্টি-কর্তা, বিষ্ণুকে পালন-কর্তা ও

মহেশ্বরকে সংহার-কর্তারূপে কল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে বিষ্ণুকেই দেবতাদের সর্বপ্রধান ও ঈশ্বর বলে স্বীকার করা হয়েছে। রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যে বিষ্ণুরই নররূপে আবির্ভাব ও লীলার কাহিনী বিধৃত আছে। রামায়ণের প্রধান চরিত্র ও তাঁর তিন ভ্রাতা, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন, বিষ্ণুরই অবতার। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণও বিষ্ণুর অবতার। মহাভারতের অংশ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ঈশ্বরের এই অবতার-রূপে আবির্ভাবের কথা স্পষ্টত স্বীকার করা হয়েছে।[1] সুতরাং ভক্ত হিন্দুরা স্বীকার করেন যে, ন্যায়-ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য যুগে যুগে অবতাররূপে ঈশ্বরের আবির্ভাব ঘটে।

কবি জয়দেব তাঁর দশাবতার স্তোত্রে বিভিন্ন সময়ে কেশব বা বিষ্ণুর দশটি অবতারের কথা বর্ণনা করেছেন। এগুলির মধ্যে আটটি পৌরাণিক। কিন্তু এই দশাবতারের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ অবতারের কোন উল্লেখ নেই। এঁদের মধ্যে অবশ্য সব ক'টি নররূপী অবতার ন'ন। প্রথমটি মীন (মৎস্য)রূপে প্রলয়জল থেকে বেদকে উদ্ধার করেন। দ্বিতীয়টি কূর্ম (কচ্ছপ)রূপে পৃথিবীকে বহন করেন। তৃতীয়টি বরাহরূপে দন্তের সাহায্যে পৃথিবীকে উত্তোলন করেন। চতুর্থটি নরসিংহরূপে প্রহ্লাদপিতা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন। পঞ্চম অবতারের নাম বামন। ইনি দানগ্রহণচ্ছলে রাজা বলিকে পাতালে প্রেরণ করেন। ষষ্ঠ অবতারে বিষ্ণুর পরশুরামরূপে আবির্ভাব। এই অবতারে তিনি পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন। সপ্তম অবতারে রামচন্দ্র রাক্ষসরাজ রাবণকে বধ করেন। অষ্টম অবতারে বলরামরূপে তিনি পৃথিবী কর্ষণ করেন হলের (লা [illegible]র) সাহায্যে। বুদ্ধকে কেশবের করুণাময় নবম অবতাররূপে বর্ণনা করেছেন জয়দেব। এই অবতারে তিনি অহিংসা-ধর্ম প্রচার ও বেদোক্ত যজ্ঞ-ক্রিয়ার নিন্দা করেন। জয়দেবের মতে দশম অবতার কল্কিরূপে ম্লেচ্ছ নিধন করেন। শ্রীচৈতন্যের পরবর্তী যুগের বৈষ্ণবরা, বিশেষত বাঙ্গালী বৈষ্ণবরা, শ্রীচৈতন্যকে বিষ্ণুর অবতার বলে স্বীকার করেন। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক বৈষ্ণবদের মধ্যেও এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল। বর্তমানে অনেকেই পরমহংস রামকৃষ্ণকে যুগাবতার বলে বিশ্বাস করেন। সুতরাং জগদীশ্বর যে ধর্মসংস্থাপনের জন্য বিশিষ্ট আত্মা

1 যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 4; 7; 8।

বা পুরুষরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে তাঁর কার্য সম্পাদন করেন, এ ধারণা আজও অনেক হিন্দুর মধ্যে বদ্ধমূল। রামচন্দ্র রাবণকে যুদ্ধে নিহত করে ন্যায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীকৃষ্ণ কংস, শিশুপাল ইত্যাদিকে হত্যা করেন এবং কুরুক্ষেত্রে ধর্মযুদ্ধে পাণ্ডবদের, অর্থাৎ ন্যায়ধর্মের পক্ষে থেকে পাণ্ডবদের ধর্মোপদেশ দেন ও নানা ভাবে সাহায্য করে ন্যায়ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন।

খ্রীষ্ট, ইসলাম ইত্যাদি ধর্মে অবশ্য স্বীকার করা হয় যে, ঈশ্বর কাল-বিশেষে জগতের মানুষকে সত্য-ধর্মের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাঁর নির্বাচিত পুরুষকে প্রেরণ করেন। যীশু খ্রীষ্টধর্মে ঈশ্বরের পুত্র বলে স্বীকৃত। কিন্তু তিনি ঈশ্বরের অতি প্রিয় পুত্র হ'লেও স্বয়ং ঈশ্বর ন'ন। ইসলামধর্মেও মহম্মদকে ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ (রসুল) বলে বর্ণনা করা হয়, কিন্তু তিনি স্বয়ং ঈশ্বর ন'ন। সুতরাং হিন্দুধর্মে যে অর্থে রাম বা কৃষ্ণকে অবতার বলা হয়, যীশু ও মহম্মদকে সেই অর্থে অবতার বলা যায় না। এই ব্যাপারে হিন্দুদের বিশ্বাসের সঙ্গে খ্রীষ্ট ও ইসলাম ধর্মের বিশ্বাসের পার্থক্য লক্ষণীয়।

(v) **বর্ণাশ্রম**—প্রাচীন হিন্দুধর্মে সমাজের মানুষদের চারটি ভাগে ভাগ করা হ'ত। এগুলির নামই 'বর্ণ'। ব্যক্তিজীবনেও কয়েকটি স্তরভাগ ছিল। এগুলিকে বলা হ'ত 'আশ্রম'। সুতরাং সামাজিক ব্যক্তির পক্ষে, দু' রকমের কর্তব্য পালনীয় বলে বিবেচিত হ'ত—বর্ণের কর্তব্য ও আশ্রমের কর্তব্য। এই দুটির সংহত রূপেরই নাম 'বর্ণাশ্রম ধর্ম'। যে কোন সমাজের পক্ষেই এই ধরনের বর্ণবিভাগ বা কর্মবিভাগ (Division of labour) আবশ্যক এবং হিন্দু-সমাজও এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম নয়। জন্মের দ্বারাই ব্যক্তির বর্ণ নির্ধারিত। মানুষের ব্যক্তিত্ব (Personality) তার বংশগতি ও পরিবেশের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। সুতরাং যার যে বর্ণে জন্ম হয়, বংশগতি ও পরিবেশের প্রভাবে তার মানসিকতাও সেই ধরনেরই হয়। অবশ্য এর ব্যতিক্রম হয় না, এমন নয়। প্রাচীন হিন্দু-সমাজেও এই ব্যতিক্রমের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাই ব্রাহ্মণ বর্ণে জন্ম হ'লেও জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম ক্ষত্রিয় মনোভাবাপন্ন ছিলেন; আবার কোন কোন ক্ষত্রিয় রাজাকেও ব্রাহ্মণদের পরমতত্ত্বের বিষয়ে উপদেশ দিতে দেখা যায় উপনিষদে। সুতরাং প্রধানত জন্মের দ্বারা নির্ধারিত হ'লেও বর্ণের ব্যাপারে কঠোরতা ছিল না প্রাচীন আর্য-সমাজে।

ভারতীয় আর্যরা প্রধানত তিনটি বর্ণে বিভক্ত ছিল—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় (রাজন্য) ও বৈশ্য (বিশ্)। প্রথম বর্ণের লোকেরা প্রাচীন আদর্শ ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ, বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ড পালন ও রক্ষণ ও পরমতত্ত্বের সন্ধানে নিযুক্ত

ছিল। গীতায় এদের স্বভাব সম্বন্ধে বলা হয়েছে, মানসিক স্থিরতা, সংযম, তপস্যা, পবিত্রতা, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান (পরমতত্ত্বের জ্ঞান) ও আস্তিক্য হ'ল ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত।[1] সাহস, তেজ, ধৃতি (ধৈর্য), দক্ষতা যুদ্ধে অপলায়ন, দান ও কর্তৃত্ব করবার প্রবৃত্তি হ'ল ক্ষত্রিয়ের স্বভাব।[2] বৈশ্যের স্বভাব কৃষিকর্ম, গোরক্ষা ও বাণিজ্য।[3] সংস্কৃতির ধারণ ও সংরক্ষণ ব্রাহ্মণের কাজ, রাজ্যশাসন ও শত্রুনিধন ক্ষত্রিয়ের কাজ, এবং সমাজের অর্থনীতি রক্ষা ও উন্নতি সাধন বৈশ্যের কাজ। যে কোন সমাজের পক্ষেই এই ধরনের কর্মবিভাগ আবশ্যিক। চতুর্থ বর্ণ, অর্থাৎ শূদ্রদের সৃষ্টি হয় সম্ভবত অনার্যদের আর্য-সমাজে স্থান দেওয়ার ফলে। শূদ্রের ধর্ম অপর তিন বর্ণের সেবা করা। বেদ অধ্যয়ন এদের পক্ষে অনুচিত বলে বিবেচিত হ'ত। কারও কারও মতে আর্য ভাষা ও ঐতিহ্যের সঙ্গে অপরিচয়ই এই নিষেধের কারণ। কিন্তু ইতিহাস (রামায়ণ ও মহাভারত) ও পূরাণ ইত্যাদিতে লৌকিক ভাষায় আলোচিত পরমতত্ত্বের অধ্যয়নে শূদ্রের কোন বাধা ছিল না। সুতরাং শেষ পর্যন্ত আর্য-সমাজে চারটি বর্ণের উদ্ভব ঘটে।

'আশ্রম' অর্থে ব্যক্তির জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের কথা বোঝানো হয়। এই পর্যায়গুলির মধ্য দিয়ে ব্যক্তি ধীরে ধীরে পরমার্থ লাভের বা মোক্ষের দিকে অগ্রসর হয়। ভারতীয় হিন্দু মোক্ষকেই পরম পুরুষার্থ বলে স্বীকার করে, এবং আশ্রমগুলি এই পুরুষার্থ লাভেরই উপায়মাত্র। আর্য সমাজে ও হিন্দুধর্মে চারটি আশ্রমের স্বীকৃতি আছে—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। প্রথমটিতে গুরুগৃহে শাস্ত্রপাঠ ইত্যাদির দ্বারা সমাজের সংস্কৃতি, আদর্শ, ও ঐতিহ্যের সঙ্গে ব্যক্তির পরিচয় ঘটে। এই আশ্রমে পরবর্তী আশ্রমের জন্যও শিক্ষালাভ হয়। ব্রহ্মচর্য অবস্থায় ছাত্রকে নানা রকম কঠোরতা, আত্ম-সংযম ইত্যাদি অভ্যাস করতে হ'ত প্রাচীন আর্য-সমাজে। ফলে, তার পরবর্তী আশ্রমের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা সে অর্জন করত। সুতরাং ব্রহ্মচর্যকে গার্হস্থ্য আশ্রমেরই প্রস্তুতিপর্ব বলা যায়।

দ্বিতীয় আশ্রমে ব্যক্তি সংসার-জীবনে প্রবেশ করে স্বামী ও পিতারূপে তাঁর সাংসারিক কর্তব্য পালন করে। তার পেশা ও বৃত্তিও এই কর্তব্যের অন্তর্ভূত।

তৃতীয় আশ্রমের নাম বানপ্রস্থ। এই আশ্রমে ব্যক্তি তার সাংসারিক

---

1 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, 18 ; 42.

2 ঐ, 18 ; 43.

3 ঐ 18 , 44.

কর্তব্য পালনের পর ভবিষ্যদ্বংশীয়দের হাতে সংসারের ভার দিয়ে বনে গমন করে। বানপ্রস্থ-জীবন কিন্তু শারীরিক সুখের জীবন নয়। বরং শারীরিক ভোগ শেষের পব বানপ্রস্থ হয়। এই আশ্রমে ব্যক্তি লোকালয় ত্যাগ করে বনে যায়, বনের ফল-মূল ভক্ষণ করে অতি সরল জীবন যাপন করে ও পরমার্থের ধ্যানে ও সাধনায় দিন কাটায়। এ অবস্থায় ব্যক্তি কুটীর বেঁধে বাস করতে পারে ও অতিথি-সেবা করতে পারে। সুতরাং এই তৃতীয় আশ্রমে গার্হস্থ্য আশ্রমের কিছু অবশেষ থাকে।

চতুর্থ বা সন্ন্যাস আশ্রমে ব্যক্তি সম্পূর্ণ মুক্তভাবে বিচরণ করে। ভিক্ষার অন্ন বা ঐ ধরনের স্বাভাবিকভাবে লব্ধ বস্তুই তার একমাত্র উপজীব্য। তার কোন স্থায়ী বাসস্থান নেই। সে কোথাওই এক রাত্রির বেশি অবস্থান করে না। সব ক'টি আশ্রমই সকল বর্ণের জন্য বিহিত কিনা, এ সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায় প্রাচীন ভারতবর্ষে। কোন কোন মতে সন্ন্যাস বা যতি আশ্রম কেবলমাত্র ব্রাহ্মণের পক্ষেই পালনীয়। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রথম তিনটি ও বৈশ্যের পক্ষে প্রথম দু'টি, অর্থাৎ, ব্রহ্মচর্য ও গার্হস্থ্যই পালনীয়। কিন্তু মহাভারতের মতে বর্ণ ব্যক্তিবিশেষের পরমার্থ লাভের পথে বাধা হ'তে পারে না। বিদুর শূদ্রাণীর সন্তান হয়েও শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের অধিকারী ও নির্মল পবিত্র চরিত্রের মানুষ ছিলেন এবং সর্বশেষে যতির অবস্থা প্রাপ্ত হ'ন। আধুনিক হিন্দুধর্মে বা হিন্দু-সমাজে এই ধরনের কোন কঠোর বর্ণ-বিভাগ নেই। যাগ-যজ্ঞক্রিয়াদির জন্য ব্রাহ্মণরা নির্দিষ্ট হ'লেও, অন্যান্য বৃত্তির ব্যাপারে কোন বর্ণবিভাগের কঠোরতা নেই। তাছাড়া ব্রাহ্মণদেরও বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করতে দেখা যায়। রাজ্য শাসনের ব্যাপারও ক্ষত্রিয়দের জন্য নির্দিষ্ট নয়। সুতরাং প্রাচীন হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বর্ণ ও আশ্রমের অস্তিত্ব থাকলেও আধুনিক হিন্দুধর্মে এর বিশেষ কোন মূল্য নেই।

(vi) যাগ-যজ্ঞ—অন্যান্য যে-কোন ধর্মের মতই হিন্দুধর্মও কতকগুলি বিশ্বাস ও ধারণার সমষ্টিমাত্র নয়। ধর্মের মধ্যে যেমন বিশ্বাস ও ধারণার স্থান আছে, তেমনই স্থান আছে ক্রিয়া-অনুষ্ঠানেরও। বিশেষত সামাজিক সংস্থা হিসেবে কোন ধর্ম তার ক্রিয়া ও আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই নিজের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। ধর্মের বাহ্য রূপ ফুটে ওঠে তার আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে। তাই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের কথা বাদ দিয়ে কোন ধর্মের সামাজিক রূপটি বোঝা যায় না। আনুষ্ঠানিক ধর্মগুলির পার্থক্য তাদের অনুষ্ঠানের মধ্যে। হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার মধ্যে যে ঐক্য দেখা যায় তা একদিকে যেমন বিশ্বাসগত ও ধারণাগত, আর একদিকে তেমনই আনুষ্ঠানিক।

বিভিন্ন ব্যাপারে এই অনুষ্ঠানগত একতা হিন্দুধর্মের অন্তর্গত সমস্ত গোষ্ঠী ও উপগোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য বজায় রেখেছে। আর এই আনুষ্ঠানিকতা মূলত বৈদিক। তাই বিভিন্ন গোষ্ঠীর অন্তর্ভূত হিন্দুরা তাঁদের জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যুর ব্যাপারে আজও বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডই অনুসরণ করেন। হিন্দুধর্মের এই আনুষ্ঠানিক দিকটি বুঝতে গেলেও বৈদিক অনুষ্ঠানের আলোচনায় আসতে হয়।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই দেবতাকে উপহার বা 'বলি' উৎসর্গ করা আনুষ্ঠানিক ধর্মের একটি প্রধান অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। বৈদিক ধর্মেও দেবতার উদ্দেশ্যে নানা ধরনের উপহার উৎসর্গ করার প্রথা অতি প্রাচীন। বেদের মন্ত্রগুলি প্রধানত দেবতার প্রতি উপহার উৎসর্গ করার জন্যই উচ্চারিত বা গীত হ'ত। বেদের ব্রাহ্মণে এই ধরনের উপহার উৎসর্গ ও যজ্ঞ অনুষ্ঠানের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। যে উৎসর্গ একদিন মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল, তা-ই ক্রমশ নির্দিষ্ট আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াপদ্ধতির রূপ নিল। ফলে সৃষ্টি হ'ল বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের। এই আনুষ্ঠানিকতা বৈদিক ধর্মে ক্রমশ এতই প্রাধান্য পেল যে, মানুষ বিশ্বাস করতে লাগল যে, কর্মের বা যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা দেবতাদের ফলদানে বাধ্য করা যায়; আর শুধু তাই নয়, দেবতারা এই ক্রিয়ানুষ্ঠানের জন্যই তাঁদের দেয় ফল দিতে সক্ষম হ'ন। পুরাণ ইত্যাদিতে দেবতাদের এই ধরনের চিত্রই পাওয়া যায়। এই কারণেই মীমাংসা দর্শনের যুগে দেবতাদের তুলনায় বৈদিক অনুষ্ঠানেরই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা হয়েছে। এই যুগেই 'কল্পসূত্র' রচিত হয়। কল্পসূত্রে বৈদিক ক্রিয়াকর্ম সংক্ষেপে অর্থাৎ সূত্রাকারে বিধৃত আছে। কল্পসূত্রের তিনটি প্রধান অংশ—শ্রৌত্র, গৃহ্য ও ধর্মসূত্র। এই যুগ প্রাচীন বৈদিক যুগের পরবর্তী। মনু ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্র এই যুগেই রচিত। আজও হিন্দুর জন্ম, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদির সময় এই সব স্মৃতিশাস্ত্র অনুযায়ী কর্মের অনুষ্ঠান করা হয়। এই ক্রিয়াকর্মের মধ্য দিয়েই প্রাচীন বৈদিক ধর্মের ঐতিহ্য আজও অব্যাহত। বেদের ব্রাহ্মণে যে সব যজ্ঞানুষ্ঠানের বিধিনিষেধ পাওয়া যায় সেগুলি কল্পসূত্রের শ্রৌতসূত্রে সংহত করা হয়েছে। গৃহ্যসূত্রে সংসার ও গৃহ-জীবনের আদর্শের বর্ণনা আছে এবং বিবাহ, উপনয়ন ইত্যাদি ক্রিয়ার বিবরণ আছে। ধর্মসূত্রে সমাজ ও রাষ্ট্র-জীবনের আদর্শ, নীতি ইত্যাদির বর্ণনা আছে। এই সব ক্রিয়া ও অনুষ্ঠান প্রধানত পুরোহিতদের ব্যাপার। অনেক ক্ষেত্রে এই সব বৈদিক ক্রিয়াকর্ম অত্যন্ত কঠোর ও জটিল। অবশ্য সকলেই এই কঠোরতা সমানভাবে পালন করেন না। কিন্তু বৈদিক কর্মকাণ্ডের কঠোরতা হিন্দুধর্মের সমস্ত শাখায় সমান নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা না হ'লেও, কোন

হিন্দুই এগুলির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন না। প্রাচীন বৈদিক ধর্মে আনুষ্ঠানিক কর্মের উপর জোর দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু সাধারণ নৈতিক গুণকে অবহেলা করা হয় নি। বরং নৈতিক পবিত্রতা বা শুদ্ধতাকে বৈদিক কর্মের প্রস্তুতি-পর্ব বলে কল্পসূত্রের মধ্যেও স্বীকার করা হয়েছে[1]। বেদ-বিহিত কর্মকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়—কাম্যকর্ম, প্রতিসিদ্ধকর্ম ও নিত্যকর্ম। কাম্যকর্ম পালন করা হয় স্বর্গলাভ, পুত্রলাভ ইত্যাদি নির্দিষ্ট অর্থ সাধন করার জন্য। প্রতিসিদ্ধ বা নিষিদ্ধ কর্ম হ'ল এমন কর্ম যা' মানুষকে পাপযুক্ত করে এবং অশুভ ও দুঃখজনক ফল দেয়। নিত্যকর্ম হ'ল সামাজিক বর্ণ অনুযায়ী কর্ম যা অবশ্য পালনীয়। নিত্য-কর্মের নির্দিষ্ট কোন ফল ব্যক্তিজীবনে ভোগ হয় না। কিন্তু নিত্যকর্ম পালন না করলে মানুষ পাপযুক্ত হয় বলে বিশ্বাস করা হয়। সুতরাং নিত্যকর্মের আবশ্যকতা ব্যক্তিগত নয়, সামাজিক। সমাজের জন্য এই ধরনের কর্মপালন একান্ত প্রয়োজনীয়। বৈদিক কর্মের ও উৎসর্গের যে নিশ্চিত ফল আছে এবং মানুষ এই কর্মের দ্বারা তার কাম্য ফল ভোগ করে, এই বিশ্বাস প্রাচীনকালের আর্যদের মত ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের মধ্যে আজও বর্তমান। এই ধরনের কর্মকে ঋণ বলে স্বীকার করা হয়। বৈদিক ধর্মে মানুষের তিনটি ঋণ বা ঋণত্রয়ের উল্লেখ আছে—দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ। দেবঋণ শোধ করা হয় বৈদিক যজ্ঞ ইত্যাদি ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে; ঋষিঋণ শোধ হয় বেদের অধ্যয়ন ইত্যাদির মাধ্যমে বৈদিক সংস্কৃতি রক্ষা করে; আর পিতৃঋণ শোধ হয় প্রজনন ও জাতি সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে।

(vii) **জন্মান্তর ও পরজীবন**—হিন্দুধর্মে কর্মবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ জন্মান্তরবাদের। যে কোন কর্মেরই মূল্যায়ন হয় তার ভবিষ্যৎ ফলের পরিপ্রেক্ষিতে; আর এই ফলভোগ হয় প্রধানত মরণোত্তর জীবনে বা পরজীবনে। সুতরাং বর্তমান জীবনে যে পবিত্রতা পালন করা হয়, বা যে কর্ম করা হয় তা' ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতিমাত্র। জন্মান্তরবাদের অধিবিদ্যাগত বা তাত্ত্বিক ভিত্তি যা'ই হ'ক না কেন, নৈতিক জীবনে এর মূল্য অস্বীকার করা যায় না। আত্মার স্থায়িত্বের ভিত্তিতেই বর্তমান জীবনে সমস্ত রকমের অসংযম নিষেধ করা হয়েছে, নির্দেশ দেওয়া হয়েছে শুদ্ধ, পবিত্র ও সংযত জীবন যাপনের[2]। জন্মান্তরে বিশ্বাস হিন্দুধর্মের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, আর শুধু হিন্দুধর্ম নয়, অন্যান্য ভারতীয় আর্য

1 M. Hiriyanna, Outlines of Indian Philosophy, page 108

2 পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা, 109

(জৈন, বৌদ্ধ) ধর্মেরও একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য জন্মান্তরবাদ। এ-ব্যাপারে বৈদিক ও অবৈদিক ধর্মের মধ্যে বিশেষ ঐক্য দেখতে পাওয়া যায়। জন্মান্তরের ধারণা গ্রীক সংস্কৃতিতেও লক্ষণীয়। একই আত্মা একাধিকবার জন্ম ও মৃত্যুবরণ করে, এই ধারণা অন্য সেমীয় ধর্মে (খ্রীষ্ট, ইসলাম ইত্যাদি) পাওয়া যায় না। আবার আত্মার অবিনশ্বরতা স্বীকার করলেও এই সব ধর্মে আদি সৃষ্টিকালে আত্মার উৎপত্তির কথা স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু বৈদিক বা ভারতীয় আর্য ধর্মগুলিতে আত্মার উৎপত্তি বা বিনাশ কিছুই স্বীকার করা হয় নি। সুতরাং হিন্দুধর্মে আত্মা শুধু অবিনশ্বর নয়, নিত্য। জন্মান্তরের ধারণা বৈদিক নয় বলে অনেকে মত প্রকাশ করেছেন। এঁদের মতে আত্মার অবিনশ্বরতার সঙ্গে একই আত্মার বহু জন্মের ধারণা আদিম বিশ্বাস থেকে সংযোজিত। আর্যরা ভারতবর্ষে আসার পর যে-সব আদিবাসীদের সংস্পর্শে এসেছিলেন, সম্ভবত তাদের প্রভাবেই আর্যধর্মের মধ্যে জন্মান্তরের ধারণা যুক্ত হয়েছে। কেননা, আদিম কল্পনায় মানুষ মৃত্যুর পর বৃক্ষ বা অন্যজাতীয় প্রাণীর রূপ ধারণ করতে পারে[1]। কিন্তু বেদোত্তরকালীন পুরাণ ছাড়াও বেদের মধ্যেও জীবের একাধিক মরণের উল্লেখ আছে[2]; আর পুনর্জন্ম স্বীকার না করলে একাধিকবার মৃত্যুরও অর্থ হয় না। উপনিষদে যে মোক্ষের উল্লেখ আছে তা হ'ল এই জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে চিরমুক্তি। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, জন্মান্তরের ধারণা হিন্দুধর্মের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। আর শুধু জন্মান্তর নয়, মানুষ তার নিজের কৃতকর্মের ফল ভোগ করে এই বিশ্বাসও অতি প্রাচীনকাল থেকেই হিন্দুধর্মের আর একটি বৈশিষ্ট্য। আবার এই বিশ্বাসের মূলে আছে সার্বিক কারণতায় বিশ্বাস। বিশ্বচরাচরের সব কিছুই এক অমোঘ নিয়মে বাঁধা, এই ধারণার উল্লেখ পাওয়া যায় ঋগ্বেদের 'ঋত'র ধারণার মধ্যে। 'ঋত' হ'ল এক সার্বিক নীতি। এটি যে শুধু বাহ্য জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করে তাই নয়, একে মানুষের নৈতিক জীবনেরও নিয়ামক বলে বিশ্বাস করা হ'ত বৈদিকযুগে। পরবর্তী যুগে 'ধর্ম' বলতে সব কিছুর ধারক ও আশ্রয় অর্থে এ-জাতীয় নিয়মকেই বোঝানো হ'ত। সুতরাং অতি প্রাচীনকাল থেকেই হিন্দুধর্মে নৈতিক পবিত্রতার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

1 Encyclopaedia of Religion and Ethics, Edited by, James Hastings, Vol. 12 Art. Transmigration.

2 History of Philosophy Eastern and Western Vol. 1, Art, The Vedas,

কিন্তু নৈতিকতা ও ইন্দ্রিয়-সংযমের উপর জোর দেওয়া হ'লেও, জাগতিক সুখ ও সম্ভোগকে একেবারে অস্বীকার করা হয় নি বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মে। উপনিষদের মোক্ষের আদর্শ যে সকলের জন্য নয়, এ-কথা স্বীকার করা হয়েছে। মোক্ষের কথা বাদ দিলে হিন্দুধর্মে মানবজীবনের তিনটি আদর্শ বা পুরুষার্থের উল্লেখ করা হয়। এইগুলি হ'ল ধর্ম, অর্থ ও কাম। এই তিনটির মধ্যে অর্থ বলতে ধন-সম্পদ ও কাম বলতে ইন্দ্রিয়-ভোগকেই বোঝানো হয়। এই দুটিকে পুরুষার্থ বলার অর্থ, ভোগকে হিন্দুধর্মে সম্পূর্ণ মূল্যহীন বলে অস্বীকার করা হয় নি। এদিক দিয়ে অন্যান্য কয়েকটি ভারতীয় ধর্মের (জৈন, বৌদ্ধ) সঙ্গে হিন্দুধর্মের মৌল পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তবে এই ত্রিবর্গের মধ্যে ধর্মের স্থান সবার উপরে ; এবং ধর্ম বলতে আত্মসংযম ও নৈতিক আদর্শকেই বোঝানো হয়। ধর্ম পদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হ'ল যা ধারণ করে বা আশ্রয় দেয়। সুতরাং এই পদের যথাযথ তাৎপর্য কি, তা' অনেক ক্ষেত্রেই অস্পষ্ট। কিন্তু এর প্রকৃত তাৎপর্য সম্বন্ধে যত অস্পষ্টতাই থাকুক না কেন, একথা সর্বত্রই স্পষ্টত স্বীকার করা হয়েছে যে, ধর্ম ভবিষ্যৎ জীবনে ফল দান করে এবং নৈতিক সংযম ও পবিত্রতা এই ধর্ম অর্জনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। ধর্ম ও নীতির সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে, পুরাণে ধর্মকে যমের সঙ্গে অভিন্ন বলে কল্পনা করা হয়েছে ও যমকে মানুষের পাপ-পুণ্যের বিচারক ও ফলদাতা দেবতা বলা হয়েছে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ধর্ম কি, তা নির্দ্ধারণ করতে বেদ বা প্রাচীন কোন প্রথার উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, ধর্ম ঠিক আমাদের ইন্দ্রিয় বা অভিজ্ঞতা-গ্রাহ্য নয়, এবং অতীন্দ্রিয় কোন উপায়েই ধর্মকে জানা যায়, এই হ'ল হিন্দুদের বিশ্বাস।

(viii) মার্গ—জীবনে পরমার্থলাভের উপায় বা পথ সম্পর্কে হিন্দুদের মধ্যে মতভেদ আছে, যেমন আছে মানবজীবনের পরমার্থের সম্বন্ধে। যাঁরা ত্রিবর্গ স্বীকার করেন, তাঁদের মতে পরমার্থ হ'ল স্বর্গলাভ ; আর ইহজীবনে সংযত ও পবিত্র জীবনযাপন করে ও ধর্মাচরণ করে স্বর্গলাভ করা যায়। স্বর্গ অর্থে তাঁরা নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও দেবতাদের সঙ্গ বোঝেন। যাঁরা মোক্ষকেই পরমার্থ বলে স্বীকার করেন তাঁরাও সংযম ও পবিত্রতার উপর জোর দেন। কিন্তু এঁরা ইন্দ্রিয়-সংযমের কঠোরতা ও সব রকমের ভোগ থেকেই নিরত হওয়াকে পরমার্থ অর্থাৎ মোক্ষলাভের পক্ষে আবশ্যক বলে মনে করেন। তাই এঁরা সন্ন্যাসজীবন যাপন করাকেই মোক্ষলাভের উপায় বলে স্বীকার করেন। পরমার্থ লাভের যে সব উপায়ের কথা বলা হয়েছে, সেগুলিকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়—কর্ম, যোগ বা তপস্যা

ও ভক্তি[1]। কর্ম বলতে প্রধানত বেদবিহিত কর্মকেই বোঝানো হয়। এই কর্মের দ্বারা মানুষ ত্রিবর্গ (ধর্ম, অর্থ, কাম) লাভ করে ও ধর্মের মাধ্যমে স্বর্গলাভ করে। যোগ অর্থে সংযত বা রোধ করা বোঝানো হয়। যোগের দ্বারা বিভূতি বা অলৌকিক শক্তিও অর্জন করা যায়। কিন্তু এখানে আমরা যোগ অর্থে কঠোর তপস্যা বা অভ্যাসকেই বুঝব। কেননা, এই তপশ্চর্যার দ্বারা মানুষ তার অভীষ্ট লাভ করতে পারে বলে হিন্দুদের বিশ্বাস। যোগের নানা অঙ্গ। এর মধ্যে কিছু শারীরিক আর কিছু মানসিক। শারীরিক যোগ বা বহিরঙ্গ যোগ বলতে ইন্দ্রিয়-সংযম, আসন, আহার-নিদ্রার ব্যাপারে কঠোর নিয়ম পালন ইত্যাদি বোঝানো হয়; এবং অন্তরঙ্গ যোগ বলতে ধ্যান, ধারণা, সমাধি ইত্যাদিকে বোঝানো হয়। মোক্ষলাভের ক্ষেত্রে ধ্যান, ধারণা ও সমাধির মূল্য উপনিষদেও স্বীকার করা হয়েছে। উপনিষদে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের কথা বলা হয়েছে। শ্রবণের অর্থ উপযুক্ত গুরুর কাছে বৈদিক তত্ত্ব শ্রবণ। মননের অর্থ এই শ্রুত বা অধীত বাক্যগুলির যথাযথ বিচার ও বিশ্লেষণ। নিদিধ্যাসনের অর্থ বৈদিক তত্ত্বের ধ্যান। এই অর্থে জ্ঞান যোগের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যে সত্য ধ্যান করতে হ'বে তার গ্রহণ ও বোধ হওয়া প্রয়োজন। কোন কোন মতে আবার জ্ঞানকেই একটি পৃথক মার্গ বলে স্বীকার করা হয়। অর্থাৎ পরম পদার্থ বা ব্রহ্মের সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান হ'লেই মুক্তি হয়। কর্ম ও যোগ ছাড়া যে তৃতীয় মার্গের উল্লেখ পাওয়া যায় তার নাম ভক্তিমার্গ। ভক্তির অর্থ পরমপুরুষ সম্বন্ধে প্রীতিযুক্ত শ্রদ্ধা। ভক্তির সাহায্যে ভক্ত ঈশ্বরের সঙ্গে প্রীতির ও আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তোলে। যোগ যেমন জ্ঞানপ্রধান, ভক্তি তেমনই আবেগপ্রধান। ভগবদ্গীতায় ব্যক্তির স্বাভাবিক মানসিক প্রবণতা অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ মার্গ অনুসরণ করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এখানে হিন্দুধর্মের অধিকার ভেদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। হিন্দুধর্মের মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা ও শক্তির ভেদ স্বীকার করা হয়; এবং এই স্বাভাবিক প্রবণতা অনুযায়ী ধর্মাচরণের নির্দেশ নেওয়া হয়। এই স্বাভাবিক প্রবণতা ভেদই হ'ল হিন্দুর জাতিভেদ বা বর্ণভেদ প্রথার ভিত্তি। অবশ্য প্রথমে যা' ছিল স্বাভাবিক প্রবণতার ভেদ, পরে তা'ই বংশগত ভেদের রূপ নেয়। [ব্যক্তির মানসিক গঠন ও প্রবণতা-ভেদের উল্লেখ গ্রীক দার্শনিক প্লেটো (Plato)-র লেখার মধ্যেও পাওয়া যায়।] ভক্তির সাহায্যে পরমপুরুষ বা ঈশ্বরের প্রসাদ লাভ করা যায়। ঈশ্বরের এই প্রসাদ বা কৃপাই

1 Hiriyanna. Outlines of Indian Philosophy, page 107.

পরমার্থ লাভের (সে পরমার্থ স্বর্গই হ'ক আর মোক্ষই হ'ক) একমাত্র উপায় বলে ভক্তিবাদীরা স্বীকার করেন।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, আধুনিক হিন্দুধর্ম বহু শাখায় বিভক্ত। এর মধ্যে শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্তই প্রধান। এই এক একটি শাখারও আবার একাধিক প্রশাখা আছে। এদের সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়। এই সব বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার আচার ও অনুষ্ঠানের মধ্যেও অনেক প্রভেদ আছে। সুতরাং যে সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির কথা উপরের আলোচনায় উল্লেখ করা হ'ল তারও অনেক বিবর্তন ঘটেছে আধুনিক হিন্দুধর্মে। এর কারণ, বৈদিক হিন্দুধর্ম দেশী ও বিদেশী অন্যান্য ধর্মের দ্বারা স্বাভাবিক-ভাবেই প্রভাবিত হয়েছে। কিন্তু এই সব অনুষ্ঠানগত পার্থক্য সত্ত্বেও হিন্দু-ধর্মের শাখা-প্রশাখাগুলি একাধিক ক্ষেত্রে বৈদিক ক্রিয়া, বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানকে স্বীকার করে এবং সেই কারণেই এদের সকলকে একই হিন্দু-ধর্মের শাখা বলে চিহ্নিত করা যায়। হিন্দুধর্মের প্রচার প্রধানত ভারতবর্ষেই। সারা ভারতে হিন্দুদের অসংখ্য মন্দির, তীর্থক্ষেত্র ও পীঠস্থান দেখতে পাওয়া যায়। হিন্দু মন্দিরগুলির অনেকগুলিই স্থাপত্যশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন বলে স্বীকৃত।

(B) জৈনধর্ম

উৎপত্তির প্রাচীনতার দিক থেকে জৈন ধর্ম বিশেষভাবে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। জৈন ধর্মকে বৈদিক ধর্ম বলা না গেলেও, আর্যধর্ম বলা যায়। কারণ আর্যরা ভারতে বসতি করবার সময় থেকেই আর্য সংস্কৃতির মধ্যে দু'টি ভিন্নমুখী ধারা লক্ষ্য করা যায়—একটি বেদভিত্তিক, অপরটি বেদবিরোধী। এই বেদ-বিরোধী সংস্কৃতিও আর্য সংস্কৃতিরই অঙ্গ। জৈন ও বৌদ্ধ চিন্তাধারা ও সংস্কৃতি এই বেদবিরোধী বা নাস্তিক সংস্কৃতিরই বাহক। নাস্তিক চিন্তাধারা প্রধানত বেদের আনুষ্ঠানিকতার বিরোধিতা করেছে। অতএব বেদের তুলনায় নিঃসন্দেহে এর প্রাচীনত্ব কম। কিন্তু বেদের রচনাকালেও যে এই ধরনের নাস্তিক চিন্তাধারার অস্তিত্ব ছিল, তার নিদর্শন পাওয়া যায় কোন কোন বৈদিক প্রার্থনায় ও মন্ত্রে।[1] সুতরাং বেদবিরোধী নাস্তিক চিন্তাধারা প্রায় বেদেরই সমসাময়িক বলা যায়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নাস্তিক পদটি এখানে বিশেষ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। সাধারণত নাস্তিক পদে

1 Hiriyanna. Outlines of Indian Phylosophy, page, 16.

আমরা নিরীশ্বরবাদীই বুঝি। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারায় বৈদিক বা বেদের প্রাধান্য যাঁরা স্বীকার করেছেন, এমন দার্শনিকরা নিজেদের আস্তিক ও বেদবিরোধীদের নাস্তিক বলেই বর্ণনা করেছেন। আমরা বর্তমান আলোচনায় শব্দসংক্ষেপের জন্য নাস্তিক পদটি বেদবিরোধী অর্থেই ব্যবহার করেছি।

জৈনধর্মের উৎপত্তির কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। জৈন গ্রন্থাদিতে চব্বিশ জন 'জিন' বা তীর্থঙ্করের নাম পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে সর্বশেষ তীর্থঙ্কর হ'লেন 'বর্ধমান' বা 'মহাবীর'। ইনি গৌতমবুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন বলে ইতিহাসবিদরা স্বীকার করেন। এঁর পূর্ববর্তী তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথও ঐতিহাসিক-স্বীকৃত পুরুষ। ইনি খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতকে জীবিত ছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।[1] কিন্তু এঁরা জৈনধর্মের প্রচারক হ'লেও, কেউই এই ধর্মের প্রবর্তন করেন নি। এই জায়গাতেই বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে জৈনধর্মের উৎপত্তিগত পার্থক্য। গৌতমবুদ্ধ নিজের সাধনা দিয়ে যে সত্য লাভ করে 'বুদ্ধ' হ'ন, তাই সকলের মধ্যে প্রচার করেন, আর তাঁর প্রবর্তিত ও প্রচারিত মতই বৌদ্ধধর্ম বলে পরিচিত। কিন্তু জিন বা তীর্থঙ্করেরা জৈনমতেই সাধনা করেন ও সেই মতই প্রচার করেন।[2] জৈনমতের প্রধানত দু'টি দিক—(1) জৈন অধিবিদ্যা (Metaphysics) ও (2) জৈন নীতি (Ethics)। জৈন নীতি জৈন অধিবিদ্যানির্ভর ; এবং জৈন নীতিই জৈনধর্মের বহিরঙ্গ। সুতরাং জৈনধর্মের বহিরঙ্গের আলোচনার পূর্বে জৈন অধিবিদ্যা সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।

(i) জীব ও অজীব—জৈন অধিবিদ্যায় দু'রকমের দ্রব্যের স্বীকৃতি আছে—জীব ও অজীব। অজীব অর্থে জড়দ্রব্যকে বোঝানো হয়, এবং এই জড়দ্রব্য আকাশ, কাল, ধর্ম, অধর্ম ও পুদ্‌গল, এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত। আকাশ বলতে দিক্ (Space)কে বোঝানো হয়। ধর্ম ও অধর্ম শব্দ দু'টি জৈন দর্শনে বিশেষ পারিভাষিক (technical) অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এর সঙ্গে নৈতিক গুণের কোন সম্পর্ক নেই। ধর্মের সাহায্যে বস্তুর ক্রিয়া ও গতি সম্ভব হয় ও অধর্মের সাহায্যে জড়বস্তু স্থির থাকে। জৈনদর্শনে পুদ্‌গল বলতে আমরা আধুনিককালে জড়পদার্থ (Matter) বলতে যা বুঝি, তাই বোঝানো হয়। তবে পুদ্‌গল জড়পদার্থের একেবারে প্রাথমিক অবস্থা। পুদ্‌গল অত্যন্ত সূক্ষ্ম পরমাণু এবং এর কোন নির্দিষ্ট রূপ বা গুণও নেই।

1 ঐ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা 43

2 Encyclopaedia of Religion and Ethics, Edited by J. Hastings Vol. 7. Art. Jainism.

ক্ষিতি জল, তেজ বা বায়ু পুদ্‌গলের পরিণত অবস্থা। পুদ্‌গল দিয়েই জীবের সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীর উৎপন্ন হয়। পুদ্‌গল দিয়েই জগতের যাবতীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম বস্তুর সৃষ্টি হয়। পুদ্‌গলের গতি বা স্থিতি আকাশের মধ্যেই সম্ভব; আর শুধু আকাশ নয়, লোকাকাশের মধ্যেই সম্ভব। সুতরাং জৈনদর্শনে আকাশের দু'টি বিভাগ কল্পনা করা হয়, একটি লোকাকাশ ও অপরটি অলোকাকাশ। এই লোকাকাশের মধ্যেই জীব, পুদ্‌গল ইত্যাদির ক্রিয়া চলে এবং অলোকাকাশ চিরশূন্য। জীব মুক্ত বা কেবলী অবস্থায় লোকাকাশেরই ঊর্ধতম দেশে অবস্থান করে।

জীব প্রধানত দু'রকমের—সংসারী ও মুক্ত। সংসারী জীব শরীরী ও নানা কর্মের দ্বারা বদ্ধ। এই বদ্ধাবস্থাও সব জীবের এক রকম নয়। এদের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরে আছে একেন্দ্রিয় জীব। বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি এই জাতীয় জীব। এদের একটিমাত্র ইন্দ্রিয় আছে। এছাড়াও আছে সূক্ষ্ম একেন্দ্রিয় জীব যাদের খালি চোখে প্রত্যক্ষ হয় না। এরা ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ুকে আশ্রয় করে থাকে। ঠিক এই রকমেরই আছে, দ্বিরিন্দ্রিয়, ত্রীন্দ্রিয়, চতুরিন্দ্রিয় ও পঞ্চেন্দ্রিয় জীব। সাধারণত উন্নত ধরনের প্রাণী হ'ল পঞ্চেন্দ্রিয় প্রাণী। তবে মানুষের মধ্যে এই পঞ্চেন্দ্রিয় ছাড়া মন নামে একটি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ও আছে। অবশ্য মানুষ ছাড়াও ষড়েন্দ্রিয় প্রাণী স্বীকার করা হয়েছে। এঁরা হ'লেন দেব ও নারক (নরকবাসী)। মুক্ত জীবকে 'কেবলী'ও বলা হয়। বন্ধনমুক্ত জীব অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত দর্শন, অনন্ত শান্তি ও অনন্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী।[1] কিন্তু সংসারী অবস্থায় জীব যখন পুদ্‌গল ইত্যাদির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে এদের দ্বারা বদ্ধ হয় তখন তার ঐ-সব ধর্ম বা গুণ সীমিত ও বদ্ধ হয়। জীবের স্বরূপই হ'ল জ্ঞান। সুতরাং বাধা বা বন্ধন না থাকলে জীব সর্বজ্ঞ। জীবের জ্ঞানের জন্য ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হয় বাধা অপসারণের জন্য। আবার এক অর্থে এই ইন্দ্রিয়গুলিও জীবের সর্বজ্ঞতাকে সীমিত ও বদ্ধ করে। মুক্ত জীবের পক্ষে জ্ঞানের জন্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। জৈন-মতে সংসারী ও মুক্ত জীবের সংখ্যা অগণ্য। অর্থাৎ, জৈনরা অসংখ্য জীবের অস্তিত্ব মানেন। এই জীবগুলি সবই অসৃষ্ট অর্থাৎ নিত্য। কিন্তু নিত্য হ'লেও অন্যান্য দ্রব্যের মতই জীবের পর্যায় ও গুণভেদ আছে। এ ব্যাপারে জৈনদের মতের সঙ্গে বেদান্তমতের বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। জীবের পক্ষে সংকোচন ও প্রসারণও সম্ভব। দেহের আকৃতি-ভেদে জীব সংকুচিত বা প্রসারিত হয়।

1 Hiriyanna, Outlines of Indian Philosophy, page. 158.

(ii) **কর্ম**—কর্মের ধারণা ও জন্মান্তরবাদ প্রাচীন ভারতীয় আর্য ধর্মগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য হ'লেও, এ ব্যাপারে জৈনধর্ম বিশেষভাবে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। জৈনমতে কর্ম প্রধানত দু'রকমের—দ্রব্যকর্ম ও ভাবকর্ম। সূক্ষ্ম পুদ্গল থেকে দ্রব্যকর্মের সৃষ্টি। পুদ্গল জীবের সঙ্গে সংযুক্ত হয় ও জীবের কার্মণশরীরের উৎপত্তি হয় এই ভাবেই। কার্মণশরীর অত্যন্ত সূক্ষ্ম। কার্মণশরীরকে আশ্রয় করেই গড়ে ওঠে স্থূলশরীর। সুতরাং জৈনমতে কর্ম এক ধরনের জড়-পদার্থ। দ্রব্যকর্ম ছাড়াও আছে ভাবকর্ম। মানসিক প্রবৃত্তি ও প্রবণতা ইত্যাদি নিয়েই জীবের ভাবকর্ম। এই ভাবকর্মের জন্যই অর্থাৎ জীবের বিভিন্ন ধরনের প্রবৃত্তি ও প্রবণতার জন্যই কর্ম পুদ্গল জীবের দ্বারা আকৃষ্ট হয়। জীবের প্রতি কর্মের এই ধাবমানতার নাম 'আশ্রব'। এই দু'রকমের কর্মকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে জীবের সাংসারিক দশা। কর্মের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্যই জীবের জন্মান্তর লাভ হয়। ক্রিয়া ও ফল অনুযায়ী কর্মকে আটটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম, জ্ঞানাবরণীয়-কর্ম জীবের স্বাভাবিক জ্ঞানকে সীমিত ও আবৃত করে। দ্বিতীয়, দর্শনাবরণীয়-কর্ম সম্যক দর্শন বা বিশ্বাসকে আবৃত করে। তৃতীয়, মোহনীয়-কর্ম মোহ উৎপাদন করে। চতুর্থ, বেদনীয়-কর্ম সুখ-দুঃখ ইত্যাদি বেদনা বা অনুভূতির কারণ। পঞ্চম, নাম-কর্ম জীবের নামরূপ বা বিশেষ ধরনের শরীর উৎপন্ন করতে সাহায্য করে। ষষ্ঠ, অন্তরায়-কর্ম জীবের ঊর্ধ্বগতি ও উন্নতিতে কোন রকম বাধা সৃষ্টি করে। সপ্তম, গোত্র-কর্ম জীব কোন ক্ষেত্রে ও কোন বংশে জন্মগ্রহণ করবে তা নির্দ্ধারণ করে। অষ্টম, আয়ুষ্য-কর্ম জীবের আয়ু বা জীবনকাল নির্দ্ধারণ করে। মানুষ বা মনুষ্যেতর সমস্ত জীবের সংসার-জীবনই এই বিভিন্ন ধরনের কর্মের দ্বারা নির্দিষ্ট; এবং এই কর্মের সংস্পর্শ থেকে মুক্তিই জীবের মোক্ষ বা নির্বাণ। নির্বাণ সম্ভব হয় তপস্যা ও যোগের সাহায্যে চিত্তশুদ্ধির মাধ্যমে। নির্বাণ অবস্থার প্রাপ্তি হ'লে জীব আর জন্মগ্রহণ করে না এবং তার স্বরূপে অবস্থান করে। এই অবস্থায়ই জীব দেবত্ব প্রাপ্ত হয়ে লোকাকাশের উর্ধতম দেশে বিরাজ করে। তখন জীবের থাকে অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত দর্শন, অনন্ত শান্তি ও অনন্ত ঐশ্বর্য। কর্ম গুরু, সুতরাং কর্মই জীবকে তার স্বাভাবিক উন্নত অবস্থা থেকে নামিয়ে আনে।

(iii) **অনেকান্তবাদ বা স্যাদ্বাদ**—জৈন দর্শেনের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল অনেকান্তবাদ বা স্যাদ্বাদ। জৈনরা বিশ্বাস করেন যে, দ্রব্যের স্বরূপ অনির্দিষ্ট। তাকে কোন একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সম্পূর্ণভাবে

বর্ণনা করা যায় না। পরমতত্ত্বকে যাঁরা নির্গুণ, নির্বিশেষ ব্রহ্ম বলে বর্ণনা করেছেন (বেদান্তবাদী) বা যাঁরা বস্তুর ক্ষণস্থায়িত্ব মানেন (বৌদ্ধ) তাঁরা উভয়েই একান্তবাদী। প্রকৃতপক্ষে কোন একটি বর্ণনা বস্তুর স্বরূপকে ব্যক্ত করতে পারে না। তাই যে-কোন বর্ণনাই 'স্যাৎ' পদের দ্বারা যুক্ত হওয়া প্রয়োজন; অর্থাৎ এই বর্ণনা সত্য হ'লেও একমাত্র সত্য বা নিত্য সত্য নয়। সংস্কৃতে 'অস্' ধাতু বিধিলিঙে প্রথম পুরুষের এক বচনে 'স্যাৎ' হয়। সুতরাং স্যাৎ পদের আক্ষরিক অর্থ 'হউক'। একই বস্তুর নানা পর্যায়ভেদ হওয়া সম্ভব। সুতরাং একান্ত দৃষ্টিতে বিচার করলে তা অসম্পূর্ণ হয়। এই কারণেই জৈনরা অনেকান্তবাদী। আর অনেকান্ত 'স্যাৎ' শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা হয় বলে এঁদের স্যাদবাদীও বলা হয়।

(iv) মোক্ষমার্গ—জৈনরা কোন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। এঁদের মতে মানুষ তার নিজের তপস্যার দ্বারা সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান হয়ে দেবত্ব লাভ করতে পারে। কর্মবন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হ'লেই জীবের দেবত্ব লাভ হয়। এর জন্য প্রয়োজন জ্ঞান, বিশ্বাস ও অভ্যাসের। তাই জৈন ধর্মে সম্যগ্‌জ্ঞান, সম্যগ্‌দর্শন ও সম্যক্ চরিত্রের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এই তিনটিকে 'রত্নত্রয়' বলা হয়। সম্যগ্‌জ্ঞান বলতে জৈন দর্শন ও জৈন ধর্ম সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞান বোঝানো হয়। সম্যগ্ দর্শনের অর্থ জৈন গুরু ও জৈন নীতিতে অচল বিশ্বাস।[1] জৈনধর্মে সম্যগ্‌দর্শনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। কারণ, জৈন নীতিতে বিশ্বাস অচল না হ'লে, ঐ নীতি জীবনে অনুসরণ করা সম্ভব নয়। এই বিশ্বাসের জন্য মানুষ সব সন্দেহ ও সংশয় উত্তীর্ণ হ'তে পারে। তবে এই বিশ্বাস ঠিক অন্ধ বিশ্বাস নয়, জ্ঞান ও বিচারনির্ভর বিশ্বাস। সম্যক্ চরিত্র বলতে জৈন নীতি জীবনে প্রয়োগ ও অভ্যাস বোঝানো হয়। সম্যক্ চরিত্রের ব্যাবহারিক মূল্য সর্বাধিক। কারণ, এর দ্বারাই জীবের পক্ষে কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে মোক্ষলাভ করা সম্ভব। এই ব্যাপারে জৈনরা 'পঞ্চব্রত' বা পাঁচটি নীতি অভ্যাসের কথা বলেন। এগুলি হ'ল অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ।

(v) পঞ্চব্রত—(a) পঞ্চব্রতের মধ্যে অহিংসার স্থান সবার উপরে। জৈন দর্শনে সমস্ত জীবের মৌল সমত্ব স্বীকার করা হয়েছে। সুতরাং ছোট বা বড় যে-কোন জীবের প্রতি হিংসাই অন্যায় বলে মানা হয়। এই অহিংসা কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা পালনীয়। ব্রতচারী যে শুধু শারীরিক ব্যবহারে

1 Hiriyanna, Outlines of Indian Philosophy, page 166.

অপরের দুঃখের ও আঘাতের কারণ হ'বেন না, তাই নয়, তাঁর বাক্যে ও চিন্তায়ও তিনি অপর জীবের দুঃখের কারণ হ'বেন না। তিনি এমন বাক্য উচ্চারণ করবেন না যা'তে অপরে আহত হয় বা দুঃখ বোধ করে। এমন কি অপরকে আঘাত দেওয়ার চিন্তাও তিনি কখন করবেন না। সুতরাং কৃত কারিত ও অনুমত এই তিন রকম হিংসা থেকে তিনি বিরত হ'বেন। অর্থাৎ, তিনি প্রত্যক্ষ্যভাবে হিংসা করবেন না, অপরের দ্বারা হিংসাত্মক কাজ করাবেন না, ও কোন হিংসায় তিনি অনুমতিও দেবেন না। এক কথায়, জৈনমতে হিংসার চিন্তাও হিংসার আচরণের মতই অন্যায়। এখানে লক্ষ্য করা দরকার যে, জৈনধর্মে কেবল ব্যক্তিগত উন্নতি বা মুক্তির কথা চিন্তা করা হয় নি। সকল জীবের প্রতি অহিংসার অর্থ কেবল হিংসা থেকে বিরত হওয়া নয়, সকলের মঙ্গলের চেষ্টা করা। যেখানে অপরের দুঃখ দূর করার ক্ষমতা আমার আছে, সেখানে তা না করাও তা'র প্রতি হিংসারই নামান্তর।

(b) সত্য বলতে জৈনমতে শুধুমাত্র যথার্থ-কথনই নয়, সুখকর ও মঙ্গলকর বাক্য-কথন। অন্য সব ব্রতই অহিংসানির্ভর। সুতরাং যে যথার্থ-কথন জীবহিংসার কারণ হয় তা এড়িয়ে চলা উচিত। সত্যও অহিংসার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন হ'লে চলবে না।

(c) অস্তেয় অর্থে বিনা অনুমতিতে অপরের সম্পত্তি গ্রহণ না করা বোঝানো হয়। কিন্তু অস্তেয় শুধুমাত্র অচৌর্য নয়। যে-কোন অন্যায় উপায়ে অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করাকেই অস্তেয়ের লঙ্ঘন বলে।

(d) ব্রহ্মচর্য হ'ল সম্পূর্ণরূপে যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত হওয়া। কোন কোন জৈন নীতিবিদের মতে ব্রহ্মচর্য বলতে সকল ইন্দ্রিয়ভোগ থেকে বিরত হওয়া বোঝানো হয়।

(e) অপরিগ্রহের অর্থ জাগতিক সমস্ত অর্থ ও সম্পদ ত্যাগ। এই পঞ্চব্রত সকলের পক্ষে সমানভাবে পালনীয় নয়। তাই জৈনধর্মে দু'রকমের ব্রত পালনের উল্লেখ আছে—অনুব্রত ও মহাব্রত। সাধারণ গৃহী বা 'শ্রাবক' (যে শ্রবণ করে)-এর পক্ষে পালনীয় অণুব্রত। অনুব্রতের কঠোরতা কিছু কম। সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে কঠোরভাবে অহিংসাব্রত পালন করতে গেলে সমাজ-জীবন অচল হয়। সুতরাং তাঁরা স্বেচ্ছাকৃত-জীবহত্যা করবেন না। যাঁরা চাষের কাজ করেন তাঁরা কেবল অচল একেন্দ্রিয় বৃক্ষজাতীয় জীবের ঊর্ধ্বতন জীবের ক্ষেত্রেই অহিংসা পালন করবেন। গৃহীর পক্ষে ব্রহ্মচর্য বলতে একদারব্রত বোঝানো হয়। অপরিগ্রহের ব্যাপারেও অল্পে সন্তুষ্ট থাকাই গৃহী বা শ্রাবকের পক্ষে বাঞ্ছনীয়। অপরপক্ষে, মহাব্রতী বা শ্রমণদের পক্ষে পঞ্চব্রত

কঠোরভাবে পালনীয়। তাঁরা কায়মনোবাক্যে অহিংসা পালন করবেন। সকল রকমের ইন্দ্রিয়ভোগ থেকে বিরত হ'বেন ও সমস্ত জাগতিক সম্পদ, এমন কি ভিক্ষাপাত্রও নিজের অধিকারে রাখবেন না। কোন কোন মতে শ্রমণ তাঁর পরিধান-বস্ত্রও ত্যাগ করবেন। অনুব্রতীরা একটি বা দুটি ক্ষেত্রে কোন একটি বিশেষ ব্রত পালন করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কেউ হয়ত খাদ্যের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অহিংসা পালন করতে পারেন।

জৈন ধর্ম প্রধানত মঠধারী-শ্রমণ-ধর্ম। সুতরাং গৃহীর ধর্মের তুলনায় শ্রমণের ধর্ম মহৎ। কিন্তু এই দু'টি ধর্মের মধ্যে কোন গুণগত ভেদ নেই, ভেদ শুধু মাত্রাগত। গৃহীর অনুব্রত শ্রমণের মহাব্রতের প্রস্তুতিমাত্র। সুতরাং মোক্ষলাভের জন্য মহাব্রতই আবশ্যক। পঞ্চব্রত পালনের মধ্য দিয়ে জীব কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয় এবং সর্বশেষে দেহ নষ্ট হ'লে দেবত্ব লাভ করে লোকাকাশের ঊর্ধতম দেশে বিরাজ করে। এই অবস্থায় কোন কর্মের মধ্যে লিপ্ত না হ'লেও, মুক্ত জীবের জীবন অপর বদ্ধজীবের আদর্শস্বরূপ হয়। কিন্তু দেবত্বলাভের পূর্বেও কর্মবন্ধনমুক্ত 'কেবলী' জগতের সেবা করতে পারেন, যেমন করেছেন মহাবীর। এই রকম জীবন্মুক্ত অবস্থায় জীবকে 'অর্হৎ' বলে। জৈনধর্ম ও জৈনদর্শনে অর্হৎ-জীবনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তাই জৈন দর্শনের আর এক নাম 'আর্হত-দর্শন'। জীবের বন্ধন থেকে মোক্ষ পর্যন্ত কর্মের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধের পাঁচটি দশা কল্পনা করা হয়েছে। এই পাঁচটি দশা হ'ল আশ্রব, বন্ধ, সংবর, নির্জর ও মোক্ষ বা নির্বাণ। জীবের প্রবণতা, প্রবৃত্তি ইত্যাদির জন্য কর্ম-পুদ্গলের জীবের প্রতি ধাবমানতাকে বলে 'আশ্রব'। এর ফলে জীব কর্মের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবৃত হয়। এই অবস্থার নামই 'বন্ধ'। সংযম ও যোগের দ্বারা নতুন কর্মের জীবের প্রতি আগমনকে স্তব্ধ করার নাম 'সংবর'। কিন্তু সংবরের সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তি হয় না। জীবের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মগুলি ফলদানের পর জীব থেকে ঝরে পড়ে। এই অবস্থার নাম 'নির্জর'। সমস্ত কর্ম এইভাবে নিঃশেষ হ'লেই 'মোক্ষ' বা 'নির্বাণ' লাভ হয়। কর্মমুক্ত জীব লঘুত্ব প্রাপ্ত হয়ে ঊর্ধমুখী হয়।

(vi) **জৈনধর্মের শাখা**—মহাবীরের মৃত্যুর কয়েক শ' বছর পরে জৈনরা ক্রমশ দু'টি শাখায় বিভক্ত হ'ন। এই দু'টি শাখার নাম শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর। শ্বেতাম্বর শ্রমণরা শ্বেতবস্ত্র পরেন, আর দিগম্বর শ্রমণরা বস্ত্রও ত্যাগ করেন। এ ছাড়া এই দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে আচরণ ও মতবাদের ব্যাপারেও কিছু সূক্ষ্ম প্রভেদ আছে। শ্বেতাম্বররা স্ত্রীলোকের মুক্তিতে বিশ্বাস করেন, কিন্তু দিগম্বররা তা' করেন না। জৈনধর্মের বিস্তার

ভারতবর্ষের বাইরে কোথাও হয় নি। ভারতবর্ষে রাজস্থান মহারাষ্ট্র, ও গুজরাট অঞ্চলে প্রধানত জৈন ধর্মের প্রসার দেখা যায়। এই সব জায়গায় জৈনদের অনেক মন্দির আছে। এগুলিতে মহাবীর ও পার্শ্বনাথের পূজা ও প্রার্থনা হয়। এগুলিতে মহাবীরের মূর্ত্তি রাখা হয়।

(C) বৌদ্ধধর্ম

গৌতমবুদ্ধের জীবনী ও বাণীই বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি। গৌতমবুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে উত্তর-পূর্ব ভারতের বর্তমান নেপাল ও বিহারের সীমান্তবর্তী রাজ্যে। পিতা ছিলেন ঐ অঞ্চলের ক্ষত্রিয় রাজা শুদ্ধোধন। তাঁর রাজধানী ছিল কপিলবাস্তু। মাতা ছিলেন মায়া। গৌতমবুদ্ধের পূর্ব নাম ছিল সিদ্ধার্থ, বংশের নাম শাক্য। এই কারণে পরবর্তী যুগে তিনি শাক্যমুনি নামেও পরিচিত হ'ন। সিদ্ধার্থ যৌবনে যখন সংসার ত্যাগ করেন, তখন তিনি বিবাহিত ছিলেন ও রাহুল নামে তাঁর একটি পুত্র ছিল। স্ত্রীর নাম ছিল যশোধারা। সিদ্ধার্থ সংসার জীবনে মানুষের নানা ধরনের দুঃখ কষ্ট দেখে বিচলিত হ'ন এবং সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করেন ও দুঃখ-ত্রাণের উপায় আবিষ্কারের চেষ্টায় দীর্ঘকাল তপস্যা করেন। অবশেষে তিনি সত্যলাভ করে 'বুদ্ধ' বা জ্ঞানী বলে প্রচারিত হ'ন, ও তাঁর উপলব্ধ জ্ঞান সাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। তার জীবিতকালেই তাঁর অনেক শিষ্য ও ভক্ত বৌদ্ধধর্মের প্রচাকার্যে তাঁর অনুগামী হ'ন। ফলে সৃষ্টি হয় সংঘের। দীর্ঘকাল ধর্ম প্রচারের পর আশী বছর বয়সে কাশীতে দেহরক্ষা করেন গৌতমবুদ্ধ। এর পর তাঁর শিষ্যরা তাঁরই বাণী ও উপদেশ প্রচার করেন।

(i) **ত্রিপিটক**—বুদ্ধ নিজে কোন গ্রন্থ রচনা করেন নি। তাঁর উপদেশ ও আলোচনাগুলি তাঁর জীবিতকালেও সংগৃহীত হয় নি। সুতরাং বুদ্ধের যে উপদেশ ও আলোচনা-সংগ্রহ পাওয়া যায় তার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। বুদ্ধের জীবিতকালেই তাঁর উপদেশ ও মতবাদের ব্যাপারে তাঁর শিষ্য ও ভক্তদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। এই কারণেই তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পরে মগধের কাছে রাজগৃহে তাঁর শিষ্য ও ভক্তদের এক মহাসভা আহ্বান করা হয়। এই মহাসভায় বুদ্ধের উপদেশ ও মতবাদ সম্বন্ধে ভক্ত শিষ্যরা মতৈক্যে আসার চেষ্টা করেন ও এই সভায় 'ত্রিপিটক' সংকলিত হয়। 'পিটক' শব্দের অর্থ পেটিকা বা বাক্স। সুতরাং বৌদ্ধ-ধর্মের ত্রিপিটক বলতে ধর্মের তিনটি পেটিকা বা বাক্স বোঝানো হয়। ত্রিপিটকের প্রচার প্রথমে ছিল মৌখিক। কিন্তু পরবর্তীকালে খ্রীষ্ট পূর্ব 80

অব্দে ত্রিপিটক বর্তমান আকারে লিখিত হয়। ত্রিপিটকের সংকলন থেকে লিখিত হওয়ার সময় পর্যন্ত যে কয়েকশ' বছর পার হয়ে যায়, তার ফলেও এর মধ্যে পরিবর্তন আসাই স্বাভাবিক। কিন্তু এ-সব সত্বেও বৌদ্ধধর্মে এই ত্রিপিটককেই বুদ্ধের উপদেশের মূল সংকলন বলে স্বীকার করা হয়। এটি মগধ ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলের কথিত ভাষা পালিতে রচিত। ত্রিপিটকে যে ধর্ম প্রবর্তিত হয়েছে তা 'থেরবাদ' বলে পরিচিত। কারণ এটি 'থের' বা স্থবির, অর্থাৎ বৃদ্ধদের সভায় সংগৃহীত হয়েছিল। ত্রিপিটকের তিনটি ভাগ: সুত্ত, বিনয় ও অভিধম্ম। সুত্ত-পিটকে আছে বুদ্ধের উপদেশ ও নানা কাহিনী ও উপকথা। এর পাঁচটি অংশ বা নিকায় আছে। বিনয়-পিটকে আছে বৌদ্ধ নীতি ও শ্রমণদের পালনীয় নানা বিধি-নিষেধ। এর আছে তিনটি ভাগ। অভিধম্ম-পিটকে আছে মনস্তত্ত্ব বা অন্যান্য তাত্ত্বিক আলোচনা। এর আছে সাতটি ভাগ।

(ii) আর্যসত্য—বুদ্ধের ঐতিহাসিক পটভূমি বিচার করলে দেখা যায় যে, পরস্পর-বিরোধী নানা মতবাদ ও প্রথা সে যুগের জনজীবনকে বিভ্রান্ত করেছিল। আত্মা, ঈশ্বর, জগৎ ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা মত পরস্পরকে খণ্ডন করবার চেষ্টা করত। ফলে সৃষ্টি হ'ত সূক্ষ্ম তর্কজালের। একদিকে যেমন ছিল বেদের ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসার ও বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান-সর্বস্বতা ও প্রাণী-হত্যা ইত্যাদি নিষ্ঠুরতা, আর একদিকে তেমনই ছিল বেদবিরোধী মতের প্রসার। ছিল নির্গ্রন্থ, ছিল শ্রমণ যারা বেদকে অস্বীকার করত, সংসার ত্যাগ করত ও কঠোর তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন করে শান্তি ও মুক্তির অন্বেষণ করত। ছিল জড়বাদী, ছিল অবিশ্বাসী, ছিল তার্কিক যার যুক্তি জাল সমস্ত বিশ্বাস, সমস্ত প্রচলিত মতকে ছিন্ন করত। চিন্তা জগতে এসেছিল এক সর্বনাশী ও সর্বগ্রাসী অরাজকতা। ফলে মানুষের নৈতিক জীবনের ভিত্তিও দুর্বল হয়ে পড়ছিল। উপনিষদের উচ্চ আদর্শ চাপা পড়েছিল ধর্মান্ধতা, আনুষ্ঠানিকতা ও কঠোর আত্মনিগ্রহ আর কৃচ্ছ্রসাধনের আড়ালে। যে পুরোহিত সম্প্রদায় সাধারণের উৎসর্গ করা খাদ্য বা সম্পদের উপর নির্ভর করে জীবনধারণ করত, তাদেরই নির্দিষ্ট পথে মানুষ ধর্মের নামে জীবহিংসা ও কঠোর আত্মনিগ্রহে ব্রতী হ'ত। সাধারণ মানুষের সামনে এমন কোন মহৎ নৈতিক আদর্শ ছিল না, যা অবলম্বন করে মানুষ সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপন করে। এই যুগে বুদ্ধ সমস্ত অনাবশ্যক তাত্ত্বিকতা, শূন্য আনুষ্ঠানিকতা ও মিথ্যা আত্মনিগ্রহ ও কৃচ্ছ্রসাধনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হ'লেন। প্রচার করলেন 'মধ্যম পন্থা', তুলে ধরলেন ত্যাগ ও সংযমের যথার্থ মহিমা। গৃহত্যাগের পর দীর্ঘ ছ' বছর নানা কঠোর তপস্যা

করলেন তিনি। শেষে আত্মনিগ্রহের মূল্যহীনতা অনুভব করলেন, অনুভব করলেন আনুষ্ঠানিকতার শূন্যতা, তাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণের মিথ্যাত্ব। এই-ভাবে তিনি যখন 'জ্ঞান'লাভ করলেন, তখন সর্বসাধারণকে সেই জ্ঞান দান করে শান্তি ও মুক্তির পথ দেখাতে চাইলেন। তিনি প্রচার করলেন চারটি 'আর্য-সত্য'। তাঁর পরিচিত পাঁচজন সন্ন্যাসীকে তিনি বেছে নিলেন এবং তাঁদেরই 'ধর্মচক্রপ্রবর্তন'-এর প্রথম উপদেশ দিলেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে বুদ্ধদেবের এই নবনীতি প্রচারকে 'ধর্মচক্কপ্পবত্তন'[1] বলা হয়। এর মধ্যে আছে চারটি প্রধান সত্য। প্রকৃত শান্তির জন্য এই চারটি সত্যের উপলব্ধি ও এই চারটি সত্যে বিশ্বাস একান্তভাবে আবশ্যক। এই চারটি আর্য-সত্য হ'ল—দুঃখ, দুঃখসমুদয়, দুঃখনিরোধ ও দুঃখনিরোধমার্গ।

(a) **দুঃখ**—চারটি আর্য-সত্যের প্রথমটি হ'ল, 'জীবন দুঃখময়।' জন্ম দুঃখময়, ক্ষয় দুঃখময়, রোগ দুঃখময়, মৃত্যুও দুঃখময়। অপ্রীতিকর বস্তুর সঙ্গে মিলন দুঃখজনক, প্রীতিকর বস্তুর বিচ্ছেদও দুঃখজনক এবং যে-কোন অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাই দুঃখজনক। জীবনের দুঃখকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন গৌতম বুদ্ধ। এইজন্য তাঁর ধর্মকে দুঃখবাদী ধর্ম বলা হয়। অবশ্য জীবনের দুঃখময়তার কথা কেবল বৌদ্ধধর্মেরই বৈশিষ্ট্য নয়, সমস্ত ভারতীয় দর্শনেই জীবনে দুঃখের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উপনিষদেও জীবনকে দুঃখময় বলা হয়েছে। কিন্তু বৌদ্ধদর্শনে ও ধর্মে জীবনের এই দিকটিকেই বিশেষ-ভাবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

(b) **দুঃখ-সমুদয়**—জীবনকে দুঃখময় বলে বর্ণনা করলেও, দুঃখই যে জীবনের শেষকথা নয়, তাও বলা হয়েছে আর্যসত্যের মধ্যে। দ্বিতীয় আর্য-সত্যে বলা হয়েছে এই দুঃখের কারণের কথা। এখানে, বৌদ্ধধর্মের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা এসে পড়ে। বুদ্ধ বিশ্বাস করতেন যে, প্রত্যেক বস্তুরই এক বা একাধিক কারণ আছে। বস্তু সম্পূর্ণরূপে কারণ-নির্ভর। সুতরাং কোন বস্তুর স্বরূপ বুঝতে গেলে তার কারণের পরিপ্রেক্ষিতেই বুঝতে হ'বে। জগতে আত্মা বা অনাত্মা কোন বস্তুই নিত্য নয়। আমরা যাকে আত্মা বলি তা' কতকগুলি মানসিক বৃত্তি ও দেহের সংঘাত ছাড়া আর কিছুই নয়। নিত্য আত্মা আমরা প্রত্যক্ষে পাই না। প্রত্যক্ষে যা' পাই তা' দেহ, মন বা ইন্দ্রিয়। কিন্তু এগুলির কোনটিই নিত্য নয়। বৌদ্ধ-ধর্মের এই অনাত্মবাদের উপর উপনিষদের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। উপনিষদে আত্মাকে প্রত্যক্ষের অগোচর বলা হয়েছে। দেহ বা মন বা

1 Radhakrishnan. Indian Poilosophy. Vol. I, Page, 349.

দুয়ের সমন্বয়, কোনটিই আত্মা নয়। আত্মা দেহ ও মনের অতীত ও প্রত্যক্ষের অগোচর (অবাঙ্মনসগোচরম্)। বুদ্ধ এই প্রত্যক্ষের অতীত বস্তুটিকে মানতে প্রস্তুত ন'ন। তাই তাঁর মতে আত্মা নেই। নিত্য ও অপরিণামী আত্মা সম্বন্ধে যে-কথা সত্য, যে-কোন বাহ্যবস্তু ও জড়-জগৎ সম্পর্কেও সে-কথা সত্য। অর্থাৎ, স্থির ও অপরিবর্তনীয় বলে জগতে কিছু নেই। পরিবর্তনই বস্তুর স্বরূপ। সত্তা বলতে বিভিন্ন অবস্থার সন্তান বা ধারাবাহিকতা বোঝানো হয়। সমস্ত বস্তুই 'উৎপাদ', 'স্থিতি', 'জরা' ও নিরোধ' এই ক'টি অবস্থার মধ্য দিয়ে যায়। সুতরাং বস্তুমাত্রই অনিত্য; পদার্থ নয়, একটি কার্য-কারণের ধারা। একেই বলা হয় 'ধর্ম'।[1] এই ধর্মকে বৌদ্ধধর্মে বিশেষ মূল্য দেওয়া হয়েছে। বস্তুর এই ধর্ম জানলে তবেই মানুষ দুঃখ-মুক্তির পথে চলতে পারে। বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে এই মতকেই সংস্কৃতে বলা হয় 'প্রতীত্য সমুৎপাদবাদ'। এটিকে এইভাবে প্রকাশ করা হয়—'ঐটি আছে বলেই এইটি হয়, ঐটির উৎপত্তি থেকেই এইটির উৎপত্তি। ঐটি না থাকলে এইটি হয় না; ঐটি নষ্ট হ'লে, এইটিও নষ্ট হয়।'[2] জগতে যা-কিছু ঘটছে, তার সমস্তই পরিবর্তনশীল অবস্থার উপর নির্ভর করে ঘটছে। তাই সব কিছুই অনিত্য।

জগতের সব কিছুর মতই দুঃখও কারণনির্ভর, দুঃখেরও প্রতীত্যসমুৎপাদ আছে। দুঃখের কারণেরও একটি ধারা আছে, আর এই ধারায় আছে বারটি 'নিদান' বা কারণ। এগুলি হ'ল অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নাম-রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি ও জরা-মরণ। জরা ও মরণ দুঃখের। কিন্তু এই দুঃখের কারণ স্বরূপ আছে জাতি বা জন্ম। কিন্তু জীবের জন্মের ও জাগতিক অস্তিত্বের কারণ তৃষ্ণা। তৃষ্ণা থেকে আসে উপাদান বা জীবনের প্রতি আকর্ষণ। যেখানেই আছে তৃষ্ণা, সেখানেই আছে জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধ। এই আকর্ষণ বা সম্বন্ধই জন্মের কারণ। অবশ্য জন্মের প্রত্যক্ষ কারণ বলা হয় 'ভব'কে। কারও কারও মতে এই ভব হ'ল কর্ম। তৃষ্ণা ও উপাদান জন্মের মধ্যে বিশেষ রূপ নেয় এই 'ভব'র মাধ্যমে। সুতরাং দ্বাদশ নিদানের মধ্যে তৃষ্ণার স্থান বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কিন্তু দুঃখের মূল বা আদি কারণ অবিদ্যা। আত্মা ও অনাত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে অবিদ্যা বা অজ্ঞানই হ'ল তৃষ্ণা ও আকর্ষণের কারণ। জাতির বা জন্মের পরে মানুষ অবিদ্যাবশত যে-সব কর্ম করে সেগুলি আবার অবিদ্যারই সৃষ্টি

1 পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা, 371

2 'মজ্‌ঝিম নিকায়' (সুত্তপিটক) ii, 32, (রাধাকৃষ্ণন কর্তৃক উদ্ধৃত)।

করে। ফলে জরা-মরণের সঙ্গে দ্বাদশ কারণের ধারা শেষ হয় না, নতুন ধারার সৃষ্টি হয়; দ্বাদশ নিদান চক্রাকারে আবর্তিত হয়, আর সেই কারণেই এর আর এক নাম 'ভব-চক্র'। এই ভবচক্র থেকে মুক্তির উপায় হ'ল মূল কারণটিকে স্তব্ধ করা বা দূর করা, অর্থাৎ অবিদ্যা দুব করা। অবিদ্যা দূর হ'লেই প্রতীত্যসমুৎপাদের সাধারণ নিয়মে এর কার্যগুলিও একে একে নষ্ট হয়, ও শেষ পর্যন্ত জন্ম ও জরা-মরণেরও অবসান ঘটে। তাই বৌদ্ধ-ধর্মে অবিদা দূর করার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। অবশ্য অবিদ্যাকে যাবতীয় দুঃখের কারণ বলে কল্পনা করা একমাত্র বৌদ্ধধর্মেরই বৈশিষ্ট্য নয়। অন্যান্য ধর্মেও অবিদ্যা দূর করার কথা বলা হয়। কিন্তু বৌদ্ধমতে আত্মা ও অনাত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে যে অবিদ্যার কথা বলা হয় তা এই মতেরই বৈশিষ্ট্য। আত্মাকে সাধারণত আমরা স্থিতিশীল ও অপরিবর্তনীয় বলে বিশ্বাস করি। ফলে আত্মার রক্ষার ও সুখ উৎপাদনের চেষ্টা করি। অনাত্মবস্তু সম্বন্ধেও ঐ একই ধরনের বিশ্বাস আমাদের আছে। বস্তুকেও আমরা স্থিতিশীল ও অপরিণামী বলে মনে করি। ফলে আমরা বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করি। কিন্তু আত্মা ও অনাত্মা সম্পর্কে আমাদের এই ধারণা মিথ্যা। আত্মা কোন নিত্য পদার্থ বা দ্রব্য নয়। বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার, এই চারটি মানসিক বৃত্তি ও দেহ বা 'রূপ'-এর সংহতিই হ'ল আত্মা। প্রথম চারটিকে 'নাম' ও দেহকে 'রূপ' বলা হয়। তাই আত্মার আর এক নাম 'নাম-রূপ'। পাঁচটি স্কন্ধের বা অংশের সমন্বয় বলে আত্মাকে 'পঞ্চ-স্কন্ধ'ও বলা হয়। এই পাঁচটি স্কন্ধই নিত্যপরিবর্তনশীল; বিশেষত প্রথম চারটি, 'নাম স্কন্ধ', অতি দ্রুত পরিবর্তিত হয়। সুতরাং আত্মা স্থিতিশীলও নয় এবং আত্মাকে অপরিবর্তনীয়রূপে বক্ষা করাও যায় না। আত্মার রক্ষা ও সুখের চেষ্টা ব্যর্থ হ'তে বাধ্য। আর এই ব্যর্থতাই দুঃখের কারণ। আত্মা সম্বন্ধে যে কথা সত্য, অনাত্মা সম্বন্ধেও সেই কথাই সত্য। কোন বাহ্যবস্তুই, সে জড়বস্তুই হ'ক বা প্রাণীই হ'ক, অপরিবর্তনীয় নয়। সুতরাং কোন বস্তু লাভ করার চেষ্টাও ব্যর্থ হ'তে বাধ্য। বস্তু নিত্যপরিণামী হওয়ার ফলে আমরা যে বস্তু চা'ই, তা' পাই না। আর আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভের ব্যর্থতায় আছে দুঃখ। সুতরাং বস্তুর এই নিত্যপরিনামী রূপটি যদি আমরা যথার্থভাবে উপলব্ধি করি, তাহ'লে বস্তুর প্রতি আমাদের তৃষ্ণা বা আকর্ষণ থাকে না। তৃষ্ণা ও আকর্ষণ না থাকলে বস্তুর ভোগের জন্য জন্ম-লাভও হয় না। কেননা, জন্মের তীব্র আকাঙ্ক্ষা না থাকলে জন্ম হয় না। সুতরাং দুঃখ দূর করার উপায়ের প্রথম ধাপ হ'ল দুঃখের কারণ যে অবিদ্যা, এ-সম্বন্ধে স্থির বিশ্বাসে আসা।

(c) দুঃখনিরোধ—তৃতীয় আর্য-সত্যে বলা হয়েছে দুঃখের নিরোধের কথা। বৌদ্ধ দর্শনে কারণতার বিশেষ রূপ দেখা যায় প্রতীত্যসমুৎপাদবাদে। কারণ উৎপন্ন হ'লে, কার্য উৎপন্ন না হয়ে পারে না, একথা সত্য, কিন্তু কারণের উৎপত্তি ও অস্তিত্বের ব্যাপারে কোন আবশ্যিকতা নেই। সুতরাং অবিদ্যাই জাগতিক অস্তিত্বের দুঃখের কারণ, কিন্তু অবিদ্যা দুরপনেয় নয়। মানুষ নিজের চেষ্টায় এই অবিদ্যা দূর করতে পারে। আর কারণ নষ্ট হ'লেই কার্য নষ্ট হয়, এ-ও প্রতীত্যসমুৎপাদের আর একটি দিক। সুতরাং অবিদ্যা নষ্ট হ'লে সংস্কার ও কর্ম নষ্ট হয়, সংস্কার ধ্বংস হ'লে বিজ্ঞান বা চেতনার ধ্বংস; চেতনার ধ্বংসের ফলে ধ্বংস হয় নাম-রূপ; নাম-রূপ নষ্ট হ'লে নষ্ট হয় ষড়ায়তন বা ছ'টি ইন্দ্রিয় (মন সমেত); ফলে ধ্বংস হয় স্পর্শ বা ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংস্পর্শের। এর ফলে নষ্ট হয় বেদনা বা ইন্দ্রিয়ানুভূতির; বেদনা নষ্ট হ'লে তৃষ্ণা নষ্ট হয়; উপাদান ও ভবের ধ্বংস হয় যথাক্রমে; ভব না থাকলে জাতি বা জন্ম হয় না এবং জন্ম না হ'লে জরা-মরণরূপ দুঃখ ভোগ হয় না। আর এই দুঃখভোগের অবসানেই মুক্তি বা নির্বাণ।

(d) দুঃখনিরোধ-মার্গ—চতুর্থ আর্য-সত্যে দুঃখ-নিরোধ-মার্গ ও উপায় সম্বন্ধে বলা হয়েছে। এই মার্গের আটটি অংশ। এই জন্য এটিকে 'অষ্ট-মার্গ' বলা হয়। বৌদ্ধনীতির বিশদ ব্যাখ্যা মেলে 'অষ্ট মার্গে'। এই আটটি হ'ল:

'সম্যগ্‌দৃষ্টি', অর্থাৎ আত্মা ও জগৎ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান। মিথ্যাজ্ঞান বা মিথ্যাদৃষ্টিই দুঃখের কারণ। সুতরাং চারটি আর্য-সত্য সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞানকেই সম্যগ্‌দৃষ্টি বলা হ'য়েছে।

কিন্তু নির্বাণের পক্ষে যথার্থ জ্ঞানই যথেষ্ট নয়। এই জ্ঞানের উপযুক্ত প্রয়োগ চাই জীবনে। আর সেই প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন **সম্যক্‌সঙ্কল্পের**।

এই সঙ্কল্পের প্রথম পদক্ষেপ হ'ল বাক্যকে সংযত করা; অর্থাৎ, মিথ্যাভাষণ ও অপ্রিয়ভাষণ থেকে বিরত হওয়া। এরই নাম **সম্যগ্‌বাক্‌**।

শুধু বাক্যে নয় অন্য ব্যবহারেও সংযম একান্ত আবশ্যক। তাই অহিংসা, অস্তেয় বা অচৌর্য, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ ইত্যাদি শীলও অভ্যাস করা প্রয়োজন। সুতরাং সম্যগ্‌বাক্‌-এর সঙ্গে চাই **সম্যক্‌ কর্মান্ত**।

সম্যক্‌সঙ্কল্পের উপযুক্ত প্রয়োগের জন্য সম্যগ্‌বাক্‌ ও সম্যক্‌কর্মান্ত ছাড়াও প্রয়োজন **সম্যগাজীব**, অর্থাৎ জীবনধারণের জন্য সৎ ও সহজ উপায় অবলম্বনের। জীবনরক্ষার জন্যও সম্যক্‌সঙ্কল্পের পথ পরিত্যাগ করা যায় না।

সম্যক্‌সঙ্কল্পের পথে চলতে আছে অনেক বাধা। প্রবৃত্তি ও আকাঙ্ক্ষা

মানুষের সৎ জীবনকে বারে বারে ব্যাহত করে। তাই প্রয়োজন সম্যগ্-ব্যায়াম বা অবিরত চেষ্টার। সুতরাং অসফলতা যেন নৈতিক জীবনে হতাশা না আনে। উপযুক্ত চেষ্টার দ্বারাই মানুষ বাধা অতিক্রম করে।

সম্যগ্‌ব্যায়ামের জন্যই প্রয়োজন সম্যক্‌স্মৃতির। প্রবৃত্তি ও ভ্রান্ত ধারণা যা'তে সম্যক্‌সঙ্কল্পের রূপায়ণে বাধা না হয়, তার জন্য মোক্ষকামী যে সত্য জেনেছে তা যেন সর্বদা স্মরণে রাখে।

জীবনে আর্য-সত্যগুলির সুপ্রতিষ্ঠা ও সফল প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন সম্যক্‌সমাধির। সমাধির দ্বারা জ্ঞান 'প্রজ্ঞায়' পর্যবসিত হয়, বিশ্বাস রূপান্তরিত হয় প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে। এই প্রজ্ঞাই জীবনে প্রশান্তি আনে, জীবনকে সার্থক ও সফল করে। নির্বাণের পথ প্রশস্ত করে।

অষ্টমার্গকে বিশ্লেষণ করলে তিনটি প্রধান নীতি লক্ষ্য করা যায়। বৌদ্ধনীতিতে এই তিনটিরও উল্লেখ পাওয়া যায়[1]। এই তিনটি নীতি হ'ল, প্রজ্ঞা, শীল ও সমাধি। 'প্রজ্ঞা'র অর্থ জীবনে আর্য-সত্যগুলির প্রত্যক্ষ অনুভূতি বা উপলব্ধি; 'শীল'-এর অর্থ অহিংসা, সত্য, অস্তেয় ইত্যাদি ব্যাবহারিক নীতি; এবং 'সমাধি'র অর্থ চারটি আর্য-সত্যের ব্যাপারে গভীর মনোনিবেশ ইত্যাদি।

(iii) **কর্মবাদ**—বৌদ্ধধর্মের আর একটি মৌল ধারণা হ'ল কর্মের ধারণা। কর্ম ও জন্মান্তরের ধারণা ভারতীয় আর্য ধর্মগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য, এ-কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু যাঁরা কর্মবাদ ও জন্মান্তর মানেন তাঁরা সকলেই আত্মার নিত্যত্ব স্বীকার করেন। নিত্য আত্মাই কর্মের আশ্রয়; নিত্য আত্মাই দেহ থেকে দেহান্তর গ্রহণ করে। বৌদ্ধধর্মের অনাত্মবাদের সঙ্গে কর্ম ও জন্মান্তরবাদের সামঞ্জস্য হয় কি করে? বৌদ্ধ মতে বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না, স্বীকার করা হয় বস্তুধারা বা 'সন্তানের'। আত্মা বা অনাত্মা যে-কোন বস্তুই একটি পরিবর্তনের ধারামাত্র। এই ধারার অতীত ও বর্তমান অবস্থা দু'টি পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। কারণতা ঠিক যান্ত্রিক (Mechanical) কারণতা নয়। অতীত বর্তমানে পরিণত হয় সংস্কারের মাধ্যমে। সুতরাং অতীত অবস্থা নষ্ট হ'লেও, তার সংস্কার থেকে যায় বর্তমানের মধ্যে। এইভাবে যা' থাকে তা' এই ধারাটিই। এই ধারাটিই এগিয়ে চলে জন্ম থেকে জন্মান্তরে সংস্কারের মাধ্যমে। সুতরাং আত্মা না থাকলেও জন্মান্তর আছে বৌদ্ধধর্মে; কর্তা না থাকলেও কর্ম আছে। অতীত কর্ম তার সংস্কার রেখে যায় বর্তমানে,

1 Hiriyanna. Outlines of Indian Philosophy, page 150

বর্তমান তার সংস্কার রেখে যাবে ভবিষ্যতের মধ্যে। সুতরাং কর্মের ফল কোন অতীন্দ্রিয় সত্তার নির্দেশে ভোগ হয় না, বা আত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়ে কর্ম আত্মাকে তার উচ্চ অবস্থান থেকে নামিয়েও আনে না[1], তার নিজের নিয়মেই নৈতিক জীবনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলে। সুতরাং জীবনকে বুদ্ধ-প্রদর্শিত পথে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করলে এই সংস্কার ও কর্মের ধারা চিরকালের মত বন্ধ হয়ে নির্বাণ লাভ হয়।

(iv) বৌদ্ধধর্মের শাখা—আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, বুদ্ধের জীবিতকালেই তাঁর অনুগামীদের মধ্যে বুদ্ধের উপদেশের প্রকৃত অর্থ বা তাৎপর্য নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়। কিন্তু বুদ্ধের মহান ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এই মতভেদ দলভেদ বা গোষ্ঠীভেদের রূপ নিতে পারে নি। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এই মতভেদ আবার প্রকট হয়ে ওঠে। ফলে আহুত হয় রাজগৃহের প্রথম ধর্মমহাসভা। এই মহাসভায় সন্ন্যাস ধর্মের কঠোরতা হ্রাস করা যাবে কিনা, এ-সম্বন্ধে আলোচনা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ বা স্থবিরদের মতই গৃহীত হয় ও ত্রিপিটক সংকলিত হয়। এই মতবাদই স্থবিরবাদ বা পালিতে 'থেরবাদ' বলে পরিচিত। এর প্রায় একশ' বছর পরে দ্বিতীয় মহাসভায় 'বিনয়' সম্বন্ধে কোন রকম শিথিলতা স্বীকার করা যাবে কিনা, এ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর শেষ পর্যন্ত স্থবিরদের কঠোরতাবাদই গৃহীত হয়। কিন্তু প্রগতিবাদী বা 'মহাসঙ্ঘিকরা'ও সংখ্যায় নেহাৎ অল্প ছিলেন না। তাঁরা পরে একটি তৃতীয় মহাসভা আহ্বান করেন। এর নাম হয় 'মহাসঙ্গীতি'। এখানে থেরবাদের কঠোরতা অনেক হ্রাস করা হয় এবং বৌদ্ধধর্মকে সাধারণের গ্রহণযোগ্য করে তোলা হয়। এর পর সম্রাট অশোকের সময় পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার পর এই ধর্ম ক্রমশ একটি বিশ্বজনীন ধর্মে পরিণত হয়। কিন্তু বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে এই ধর্মের মধ্যে অনেক পরিবর্তন আসে এবং ধারণা, চিন্তা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এই ধর্ম বিশেষ প্রসারিত হয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য বিদেশী রাজা ও বিজেতারাও ক্রমশ এই ধর্মগ্রহণ করতে থাকেন। অবশেষে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে কুষাণরাজ কণিষ্কের সময় নাগার্জুন মহাসঙ্ঘিক মতকে এক নির্দিষ্ট রূপ দেন। ফলে সৃষ্টি হয় 'মহাযান' ধর্মের। মহাযানপন্থীরাই পরবর্তীকালে থেরবাদকে 'হীনযান' নাম

1 জৈনমতে কর্মের গুরুত্বের জন্য কর্মযুক্ত জীব তার স্বাভাবিক উন্নত অবস্থা থেকে নেমে আসে। (এই গ্রন্থে জৈনধর্মের আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

দেন। মহাযান শব্দের অর্থ মহৎ যান বা বাহক (গাড়ী)। হীনযান বলতে হীন বা ক্ষুদ্র যান বোঝানো হয়। থেরবাদের গ্রন্থগুলি পালি ভাষায় রচিত; কিন্তু মহাযান-মতের গ্রন্থ দেশী সংস্কৃত ভাষা ও বিদেশী চীনা, তিব্বতী ইত্যাদি ভাষায় রচিত।

(a) **থেরবাদ বা হীনযান মত**--থেরবাদীরা বুদ্ধের জীবন ও শিক্ষাকে (ধম্ম) বিশেষ মূল্য দেন। এঁরা মুক্তির ব্যাপারে কোন ঐশ্বরিক শক্তিতে বিশ্বাস করেন না। বুদ্ধের আদর্শ ও জীবনই সাধারণের কাছে যেমন পথের দিশারী, তেমনই মুক্তির আশ্বাসও বটে। জৈনদের মত এঁরাও মানেন যে, মানুষ একমাত্র নিজের চেষ্টায়ই মুক্তিলাভ করতে পারে। এ ব্যাপারে শ্রমণের পক্ষে অষ্টমার্গ কঠোরভাবে পালনীয়, গৃহীর পক্ষে যতদূর সম্ভব পালনীয়। নির্বাণই এঁদের একমাত্র কাম্য। বুদ্ধ এঁদের মতে অন্য অনেকের মতই সাধারণ মানুষ ছিলেন। সুতরাং তাঁর মতই নিজের চেষ্টায় শ্রমণের পক্ষে বুদ্ধত্ব লাভ করা সম্ভব। আর শুধু সম্ভবই নয়, নিজের চেষ্টায়ই তা করতে হ'বে, অন্যের সাহায্যে নয়। সুতরাং থেরবাদী বৌদ্ধধর্ম আত্মনির্ভরতার ধর্ম; অতিমানবীয় বা অতিজাগতিক শক্তির স্থান এতে নেই।

(b) **মহাযান মত**—মহাযানপন্থীরা বুদ্ধ ও বুদ্ধের উপদেশ মানেন; কিন্তু এঁরা বুদ্ধের শিক্ষার তুলনায় গুরুত্ব দেন বুদ্ধের করুণাময় চরিত্রের উপর। তাই এঁদের আদর্শ হ'ল 'বোধিসত্ত্ব'। হীনযানপন্থীদের নির্বাণের জন্য সাধনাকে এঁরা স্বার্থপরতা বলে মনে করেন। বুদ্ধ স্বয়ং নিজের মুক্তির চেয়ে অন্য সকলের দুঃখ দূর করাকেই শ্রেয় বলে মনে করেছেন। তাই বুদ্ধত্ব লাভের পরও তিনি তাঁর সাধনালব্ধ জ্ঞান অন্যকে দিতে চেয়েছেন। বোধিসত্ত্ব বুদ্ধ ন'ন, তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করতে চলেছেন। কিন্তু তিনি বারে বারে জন্মগ্রহণ করেন শুধু নিজের মুক্তির জন্য নয়, সকলের কল্যাণের জন্য।

মহাযানীদের মতে বুদ্ধ এক ন'ন, বহু। সমস্ত আত্মা বা জীব এক পরমাত্মা বা 'তথাতা' (তথাগত)-রই প্রকাশ। সেই মহাত্মাই বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হ'ন বারে বারে। এই পরমাত্মা নিজেকে 'ধর্মকায়' বা বুদ্ধরূপে প্রকাশ করেন জগতের কল্যাণের জন্য। জগতের প্রতি তাঁর অসীম করুণা ও প্রীতি। এই করুণাময় 'ধর্মকায়'ই 'ভগবান তথাগত' বা 'অমিতাভ বুদ্ধ' বলে খ্যাত। সুতরাং মহাযানীরা অবতারবাদ মানেন ও গৌতমবুদ্ধকেই 'ধর্মকায়'-এর অবতার বলে স্বীকার করেন।

মহাযানপন্থীরা মনে করেন নির্বাণের জন্য মানুষের প্রয়োজন বোধিসত্ত্বের করুণার। বোধিসত্ত্ব নিজের জ্ঞান ও ঐশ্বর্য অন্যকে দান করেন তার

কল্যাণের জন্য। তাই হীনযান মতে 'শ্রদ্ধা' বলতে বোঝানো হয় বুদ্ধের উপদেশ ও নিজের সাধনার দ্বারা উপলব্ধ সত্যে বিশ্বাস। কিন্তু মহাযান মতে 'শ্রদ্ধা' বলতে অমিতাভ বুদ্ধ বা 'অবলোকিতেশ্বরের' করুণায় বিশ্বাসকেই বোঝানো হয়। আর সেই কারণেই অমিতাভ বুদ্ধকে ঈশ্বররূপে পূজা করা হয়। সুতরাং গৌতমবুদ্ধের উপদেশের মধ্যে ঈশ্বর বা জগৎ-স্রষ্টার উল্লেখ না থাকলেও, মহাযান মতে পরে বুদ্ধকেই ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করা হয়েছে পরম করুণাময় অমিতাভ বুদ্ধরূপে। গৌতমবুদ্ধকে কল্পনা করা হয়েছে পরমাত্মার অবতার বলে।

পরবর্তী যুগে বৌদ্ধধর্মের আরও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে দেশী ও বিদেশী নানা মতবাদ ও বিশ্বাসের সাহচর্যে। অনেক শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়েছে বৌদ্ধধর্ম। এমন কি বৌদ্ধদের মধ্যে তন্ত্রেরও প্রভাব পড়ে। ফলে দেখা দেয় নানা ধরনের বৌদ্ধতান্ত্রিক সমপ্রদায়। কিন্তু এই সব ধর্ম মূল বৌদ্ধধর্ম থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছে। এগুলিকে অনেকে বৌদ্ধ ধর্মের অবনতি বলে বর্ণনা করেন। তাই বৌদ্ধধর্মের মূল কথার মধ্যে এদের আলোচনা অবাঞ্ছনীয়। চীন, জাপান, তিব্বত, ব্রহ্মদেশ, সিংহল ইত্যাদি দেশে বহু বৌদ্ধ মন্দির, মঠ ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে থেরবাদী ও মহাযান উভয়পন্থীদেরই কীর্তি আছে। ভারতবর্ষের নানা জায়গায় আছে উভয় বৌদ্ধমতেরই বহু মন্দির, মঠ ও গুহা। এই সব গুহা, চৈত্য, বিহার ও মন্দিরগুলি শিল্পের অপূর্ব নিদর্শনরূপে আজও সমাদৃত। এই সব পর্বতগুহা বা গুম্ফের কোন কোনটিতে দেখা যায় স্তূপ; এগুলি থেরবাদীদের সৃষ্টি। আবার কোনটিতে বা দেখা যায় বুদ্ধের মূর্তি। থেরবাদীরা উপাসনাগৃহে স্তূপ রাখতেন, আর মহাযানপন্থীরা বুদ্ধের মূর্তি কল্পনা করেছেন ও উপাসনাগৃহে মূর্তি রাখতেন। সুতরাং বুদ্ধের মূর্তি কল্পনা করা হয় মহাযান মতে বুদ্ধের জন্মের প্রায় ছ'শ বছর পরে। বর্তমানে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা অল্প। চীন, জাপান, তিব্বত, ব্রহ্মদেশ, বলিদ্বীপ, সিংহল ইত্যাদি দেশেই বৌদ্ধদের বেশী সংখ্যায় দেখতে পাওয়া যায়।

(D) খ্রীষ্টধর্ম

যীশুখ্রীষ্টের জীবন ও বাণীই খ্রীষ্টধর্মের উৎস। অবশ্য ঐতিহাসিক বিচারে খ্রীষ্টধর্মকে ইহুদী ধর্মেরই অনুসৃতি বলা যায়। যীশু ইস্রায়েলের যদীয়া (Judœa) রাজ্যের বেথ্‌লেহেম্‌ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। এই সময়

এই রাজ্যের রাজধানী ছিল জেরুজালেম (Jerusalem)। এখানে ইহুদী রাজা হেরড (Herod) রাজত্ব করতেন। যীশু নিজেও ইহুদী ছিলেন। পিতা ছিলেন জোসেফ (Joseph) ও মাতা মেরী (Mary)। যীশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ঈশ্বর-প্রেরিত বা ঈশ্বর-নির্বাচিত (খ্রীষ্ট) বলে প্রচারিত হ'ন। ফলে রাজা হেরড তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ ভীত হ'ন। কারণ তিনি শোনেন যে, এই শিশুই ইহুদীদের রাজা। তিনি বেথ্‌লেহেম্‌ ও তার সীমান্তবর্তী অঞ্চলের দু'বছর পর্যন্ত বয়সের সমস্ত পুরুষ শিশুদের-হত্যার আদেশ দেন। জোসেফ মেরী ও যীশুকে নিয়ে মিশরে চলে যান এবং হেরডের মৃত্যুর পর আবার ইস্‌রায়েলে ফিরে আসেন। কিন্তু হেরডের পুত্র জুদীয়ায় রাজত্ব করছে শুনে সেখানে না গিয়ে গ্যালিলী (Galilee) প্রদেশের ন্যাজারেথ (Nazareth) নগরে বাস করতে থাকেন। এই সময় জন (John) নামে এক অবধূত জুদীয়ার প্রান্তরে প্রচার করছিলেন, 'অনুশোচনা কর, কেননা, স্বর্গরাজ্য আগতপ্রায়।'[1] যাঁরা তাঁর কাছে আসত তাঁদের সকলকেই তিনি জর্ডন নদীর জলে স্নান করিয়ে পবিত্র করতেন, তাদের অনুশোচনার উপযুক্ত করে তুলতে। তিনি বলতেন, 'আমার পরে যিনি আসছেন তিনি অনেক মহৎ এবং আমি তার পাদুকা বহনেরও যোগ্য নই।' এই সময়ে যীশু পবিত্র-করণের জন্য তাঁর কাছে আসেন। এবং জনের আপত্তি সত্বেও জনকে তিনি তাঁকে (যীশুকে) পবিত্র করতে অনুরোধ করেন। এই অনুষ্ঠানের পর ঈশ্বরের আদেশ হয়, 'ইনি আমার প্রিয়পুত্র, এবং এঁর প্রতি আমি বিশেষভাবে প্রীত।' এরপর যীশু প্রান্তরে চলে যান। এখানে তিনি চল্লিশ দিন উপবাস করেন ও শয়তানের দ্বারা নানা ভাবে প্রলুব্ধ হ'ন। সাধনার শেষে যীশু ঈশ্বরের বাণী প্রচার করতে বেরিয়ে পড়েন। কিছু ভক্তকে তিনি নির্বাচন করেন তাঁর সঙ্গে প্রচারের কাজ করবার জন্য। তাঁর প্রচারকার্যের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বার জন শিষ্য সংগ্রহ করেন। কিন্তু প্রেম ও মানবতার ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে যীশু ধর্মের অনুষ্ঠানসর্বস্বতাকে সমালোচনা করতে থাকেন ও সেই সঙ্গে সমালোচনা করতে থাকেন পুরোহিতদের। নানা ক্রিয়াকাণ্ডের মাধ্যমে এই সব পুরোহিতরাই সাধারণের অর্থ হরণ করত। যীশুর উক্তি ও সমালোচনা স্বাভাবিকভাবেই পুরোহিত-সমাজকে ক্রুদ্ধ ও ঈর্ষান্বিত করে তুলল। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে ঈশ্বরদ্রোহিতার নালিশ হ'তে লাগল। শেষ পর্যন্ত যীশু ধৃত হ'লেন ও সর্বসমক্ষে তাঁর বিচারের পর তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করার শাস্তি দেওয়া

1 St. Matt. iii., 2, 3. (New Testament).

হ'ল। ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর তিন দিন পরে যীশু গ্যালিলীতে তাঁর শিষ্যদের দেখা দেন ও দেশে দেশে তাঁর উপদেশ ও বাণী প্রচার করতে নির্দেশ দেন। যীশু তাঁর ধর্মমত সাধারণের মধ্যে অতি সরল ভাষায় গল্পের আকারে প্রচার করতেন ও সাধারণের নানা প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার উত্তর দিতেন। তিনি অলৌকিক উপায়ে অনেককে রোগমুক্তও করেন। যীশুর জীবন ও বাণী বাইব্‌লের 'নবীনধর্মগ্রন্থের' মধ্যে বিধৃত আছে।

(i) **বাইব্‌ল**—বাইব্‌ল খ্রীষ্টধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। এর দু'টি প্রধান অংশ—প্রাচীন ও নবীন। প্রাচীন (Old Testament) গ্রন্থটি বৃহৎ। এতে প্রাচীনকাল থেকে ইহুদী জাতির ও ইহুদী ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষদের কাহিনী লিখিত আছে। এ ছাড়া এই গ্রন্থে ঈশ্বর-তত্ত্ব, জগতের উৎপত্তি, ঈশ্বর-পুত্র মানুষের স্বর্গরাজ্য থেকে পতন ও পাপজীবনের আরম্ভ, সমাজ-জীবনের নানা রীতিনীতি, ও প্রার্থনাগীতিও আছে। নবীন (New Testament) গ্রন্থটি প্রাচীন গ্রন্থের তুলনায় আকারে অনেক ছোট। এতে তিনটি প্রধান ভাগ—সুসমাচার (Gospels), কার্যাবলী (Acts) ও পত্রাবলী (Epistles)। সেণ্টম্যাথ্যু, সেণ্ট মার্ক, সেণ্ট লিউক ও সেণ্ট জন রচিত চারটি সুসমাচারে যীশুর জীবনী ও প্রচারকার্যের বর্ণনা পাওয়া যায়। এইগুলিই খ্রীষ্টধর্মের ভিত্তি। কার্যাবলীতে যীশুর নির্বাচিত শিষ্য (সেণ্ট পিটার ইত্যাদি) ও পলের প্রচারকার্যের বর্ণনা পাওয়া যায়। পত্রাবলীর মধ্যে বিভিন্ন খ্রীষ্ট-ধর্মসভার জন্য রচিত নির্দেশনাগুলি পাওয়া যায়। এগুলি যীশুর বিভিন্ন শিষ্য ও পলের রচনা। বাইব্‌লের এই নবীন অংশে প্রাচীন অংশের অনেক দৈবপুরুষ ও তাঁদের নানা উক্তি ও দৈববাণীর উল্লেখ পাওয়া গেলেও নবীনগ্রন্থটিকেই খ্রীষ্টধর্মের মৌল গ্রন্থ বলা যায়। কারণ, পরবর্তী-কালে খ্রীষ্টধর্ম বলে যে ধর্ম প্রচারিত হয়েছে, তা প্রধানত এই গ্রন্থের কাহিনী, উক্তি, উপদেশ ও আদেশকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। এই গ্রন্থ মূলত হীব্রু ভাষায় রচিত ; কিন্তু পৃথিবীর প্রায় সমস্ত প্রধান ভাষাতেই এটি অনুবাদিত হয়েছে।

(ii) একেশ্বরবাদ—এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ঈশ্বরের কর্ম-পদ্ধতিতে আস্থাই হ'ল খ্রীষ্টধর্মের মূল কথা। এই ধর্মে ঈশ্বরের প্রত্যা-দেশের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। খ্রীষ্টানদের মতে ইস্রায়েলের ইতিহাসে ও খ্রীষ্টীয় ধর্মসংঘের (Church) ইতিহাসে এবং বিশেষ করে যীশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের কর্ম-পদ্ধতি প্রকাশিত হয়েছে ;[1] আর

1 Encyclopaedia Britanncia, 1969, Vol. 5 Art. Christianity.

ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ এই কম-পদ্ধতিরই পূর্বপ্রকাশ। একেশ্বরবাদ মানলেও খ্রীষ্টধর্মে সর্বেশ্বরবাদের স্থান নেই। ইহুদীদের মত খ্রীষ্টানরাও বিশ্বাস করেন ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় এবং তিনি সব কিছুর একমাত্র স্রষ্টা; তিনি সর্বশক্তিমান। তাঁর সমস্ত সৃষ্টির ব্যাপারে তিনি সক্রিয়। তবু তিনি তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে এক ন'ন। তাঁর সৃষ্ট জগৎ থেকে তিনি পৃথক্। সুতরাং নিজের সৃষ্টিজালে তিনি আবদ্ধ ন'ন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি মানুষের মধ্যেই আছে স্রষ্টার উপস্থিতি ও কীর্তির চিহ্ন। এই শ্রেষ্ঠ-সৃষ্টির মধ্যেই প্রতিফলিত হয় স্রষ্টার মন। কিন্তু তবুও মানুষের জীবন ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী চলে না, তা' ঈশ্বর থেকে দূরে সরে যায় নিম্নতর ও ক্ষুদ্রতর স্বার্থের আশায়। ঈশ্বরের প্রতিরূপে সৃষ্টি হয়েছে যে মানুষ তার আধ্যাত্মিক সত্তা ও জাগতিক সত্তার যে দ্বন্দ্ব, ঈশ্বরের কীর্তি শ্রেষ্ঠ পুণ্যাত্মা মানুষ ও পতিত আদমের সন্তান পাপী মানুষের যে বিরোধ, তা কেবল মানুষের বুদ্ধি বা নীতিজ্ঞান দিয়ে দূর হ'বার নয়। মানুষ তার স্বরূপ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, ন্যায়পরতার নীতিকে সে লঙ্ঘন করেছে; তাই সে মৃত্যুর পদানত। কিন্তু স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হ'তে গেলে মানুষের প্রয়োজন ঈশ্বরের করুণা। এই করুণাই তাকে পাপ ও মৃত্যু থেকে উদ্ধার করতে পারে, তাকে দিতে পারে এক শান্তিময় নতুন জীবন। তাঁর পুত্র যীশুখ্রীষ্টের অবতারের মধ্যেই রূপায়িত হয়েছে ঈশ্বরের সেই করুণা। যীশুর জীবন ও যীশুর মৃত্যুই পাপদগ্ধ মানুষকে দেয় অনন্ত শান্তিময় জীবনের আশ্বাস।

(iii) ঈশ্বরের ত্রিত্ব—খ্রীষ্ট-ধর্মের আর একটি উল্লেখযোগ্য ধারণা হ'ল ত্রিত্বের (Trinity) ধারণা। ঈশ্বর এক হ'লেও তাঁর অভিব্যক্তি তিনটি [1]—ঈশ্বর পিতা, ঈশ্বর পুত্র এবং ঈশ্বর পবিত্র শক্তি। ঈশ্বর পুত্র খ্রীষ্ট স্বয়ং ঈশ্বর ছাড়া আর কেউই ন'ন। কিন্তু কুমারী মেরীর পুত্ররূপে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে তিনি প্রকৃত মানুষেরই রূপ নিয়েছিলেন। মানুষের জীবন যেমন হওয়া উচিত বলে ঈশ্বর ইচ্ছা করেছিলেন, এই পৃথিবীতে যীশুখ্রীষ্টের জীবন তারই মূর্ত প্রকাশ। শুধু তাই নয়, ঈশ্বর যেভাবে মানব-জীবনে তাঁর করুণা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে ও মৃত্যুর শক্তিকে পরাস্ত করতে চেয়েছিলেন, খ্রীষ্টের জীবন তারও অভিব্যক্তি। তাই যীশু তাঁর শিক্ষা ও উপদেশের মধ্যে ভবিষ্যতে 'ঈশ্বরের রাজ্য' প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেছেন ও মানুষকে তার পুরোনো অভ্যাস ত্যাগ করে নতুন

1 পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ।

করে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী চলবার আহ্বান জানিয়েছেন। যীশু যে-সব করুণা করেছেন, সেগুলি মানুষের প্রতি ঈশ্বরের করুণারই নিদর্শন। যে মানুষ তাঁর করুণা ও তাঁর আশ্রয় কামনা করে তাঁর কাছে আসবে, তাকেই যে ঈশ্বর করুণা করবেন ও রক্ষা করবেন, এই সত্যই যীশুর করুণার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। ঈশ্বরের করুণার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন, ক্রুশবিদ্ধ হয়ে যীশুর মৃত্যুবরণ। ঈশ্বর যে মানুষের সব অপরাধ ক্ষমা করেন ও তাকে রক্ষা করেন, যীশুর মৃত্যুই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মৃত্যুর পর যীশুর পুনরভ্যুত্থান মৃত্যুর পরাজয় ঘোষণা করে, ও মানুষের জন্য ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার সম্ভাবনাও ঘোষণা করে। মানুষের এই মুক্তির সম্ভাবনা ও তার পথনির্দেশের ঘোষণাই হ'ল ঈশ্বরের তৃতীয় প্রকাশ বা 'পবিত্র শক্তির' কাজ। ঈশ্বর তাঁর বাণী দৈবপুরুদের মাধ্যমেই প্রেরণ করেন। এই পবিত্র শক্তিই মানুষের ধর্মপ্রচারের ইচ্ছা, ও এই শক্তিই মুক্তির মধ্যে মানুষের পরিণতির কথা ঘোষণা করে। মানুষের মুক্তির কথা প্রচার করে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-সংঘের মধ্যে দিয়ে এই পবিত্র শক্তিই কাজ করে চলেছে। খ্রীষ্টানরা বিশ্বাস করেন, জগতের মুক্তি আসবে মানুষের ইতিহাসের পরিসমাপ্তিতে। তখন যীশু আসবেন মানবজাতির বিচারক ও মৃতদের পুনরভ্যুত্থানরূপে। মানবতার এই পরিণতি যেমন একদিকে খ্রীষ্টধর্মর মৌল বিশ্বাস, তেমনই আর এক দিকে এই ধর্মের পরম আশ্বাস।

(iv) অনুশোচনা ও প্রার্থনা—খ্রীষ্টধর্মের প্রার্থনার মূল কথা হ'ল ঈশ্বরের করুণা ও ইতিহাসের মধ্যে মানবতার মুক্তিতে বিশ্বাস। তাই ঈশ্বরের মহিমা ও পবিত্রতার কীর্তনই প্রাধান্য পেয়েছে খ্রীষ্টধর্মের প্রার্থনায়। মানুষের সাধারণ জাগতিক জীবন পাপ ও অপবিত্রতার জীবন, এ জীবন ঈশ্বর থেকে বিচ্যুতি, এই পতনের ফল বা শাস্তি মৃত্যু। কিন্তু ঈশ্বর পরম-করুণাময়। তিনি পিতা, মানুষের সমস্ত অপরাধ, সমস্ত বিচ্যুতি ও পাপ তিনি ক্ষমা করেন। মানুষকে তিনি মৃত্যু থেকে উদ্ধার করেন। তাঁর সৃষ্টির মূল কথাই হ'ল মানুষকে তার পাপ জীবন থেকে মুক্ত করা। তাই খ্রীষ্টধর্মের প্রার্থনায় আছে মানুষের পাপের জন্য অনুশোচনা, অপরাধের স্বীকৃতি; কিন্তু তার সঙ্গে আছে ঈশ্বরের পবিত্রতা ও মহিমার গুণগান, আছে আকুতি, 'হে ঈশ্বর, আমাদের করুণা কর', 'তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক'। খ্রীষ্টানরা বিশ্বাস করেন, ইতিহাসের অবসানের মধ্য দিয়ে জগতে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও মানুষকে পাপ ও মৃত্যুর পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত করাই ঈশ্বরের অভিপ্রায়। আর এই অভিপ্রায়ই সিদ্ধ হ'তে চলেছে জাগতিক ঘটনার মাধ্যমে। তাই প্রার্থনা করা হয় ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের সিদ্ধির। সুতরাং

মানুষের ব্যক্তিগত কোন প্রয়োজন বা স্বার্থসিদ্ধি নয়, ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণের প্রার্থনাই প্রাধান্য পেয়েছে খ্রীষ্টধর্মে। মানুষের ব্যক্তিগত প্রয়োজন সাধনের প্রার্থনা সেখানে গৌণ। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, খ্রীষ্টধর্মে মানুষের দৈহিক ও জাগতিক প্রয়োজনকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে। মূল কথা হ'ল, ঈশ্বর সবার উপরে এবং তাঁর করুণা ছাড়া জীবন সম্ভব নয়। সুতরাং ঈশ্বরের তুলনায় আর সবই অপ্রধান।

(v) অনুগ্রহ ও প্রেম—নৈতিক জীবনে খ্রীষ্টধর্মে অনুগ্রহ ও প্রেমের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই প্রেম একাধারে মানুষের ভগবৎপ্রেম এবং মানব-প্রেম ; তবে প্রধানত ভগবৎপ্রেম। ঈশ্বর শুধু জগৎ-স্রষ্টা ন'ন, তিনি পিতা ও রক্ষাকর্তা, ত্রাতা ও প্রভু। ঈশ্বরপ্রেমই মানব-প্রেমের যথার্থ ভিত্তি। মানুষের প্রতি ঈশ্বরের আছে অসীম প্রেম, অসীম করুণা। এই প্রেম শুধু ন্যায়-ধর্ম নয়, তার চেয়েও উন্নত, তায় চেয়েও মহৎ। মানুষের ঈশ্বরপ্রেম বা মানব-প্রেমও ন্যায়-ধর্মের চেয়ে মহত্তর। ঈশ্বরের অনন্ত অনুগ্রহের প্রকাশ হয়েছে যীশুখ্রীষ্টের মধ্যে। মানুষের প্রতি তাঁর অনন্ত প্রেমের জন্যই তিনি তাদের রক্ষাকর্তারূপে যীশুকে প্রেরণ করেছেন। তাই মানুষেরও কর্তব্য ঈশ্বরের এই অনুগ্রহ, এই করুণাধারা, এই প্রেম নিজের জীবনে প্রতিফলিত করা, অপরের প্রতি অহৈতুক অনুগ্রহ ও প্রেম বর্ষণ করা। বিশ্বাস, আশ্বাস ও অনুগ্রহ, এই তিনটিই খ্রীষ্ঠ-ধর্ম ও খ্রীষ্ঠ-নীতির মূল কথা। বিশ্বাসের অর্থ খ্রীষ্টের মধ্যে মানুষের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহের স্বীকৃতি ; আশ্বাসের অর্থ ভবিষ্যতে ঈশ্বরের আরও অনুগ্রহ লাভের আশা ; এবং অনুগ্রহের অর্থ সক্রিয় ও সফল প্রেম। বিশ্বাস ও আশ্বাস ঈশ্বরের অহৈতুক অনুগ্রহই সূচিত করে। সুতরাং অনুগ্রহই খ্রীষ্ট-নীতির প্রাণ।

(vi) খ্রীষ্টধর্মের শাখা—আধুনিক পৃথিবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক খ্রীষ্ট-ধর্মে দীক্ষিত। প্রাচ্যের তুলনায় পাশ্চাত্য দেশগুলিতেই এই ধর্মের প্রভাব বেশি। কিন্তু প্রায় সব দেশেই খ্রীষ্টান সম্প্রদায় ও সংঘ দেখতে পাওয়া যায়। যীশুর দেহাবসানের পর তাঁর শিষ্যরা খ্রীষ্টধর্মসংঘ তৈরি করেন ও তার মাধ্যমে ও বিভিন্ন ধর্ম-সভার মাধ্যমে যীশুর জীবনী ও বাণী প্রচার করেন। সুতরাং খ্রীষ্টান ধর্ম-প্রচারের ইতিহাস প্রায় দু'হাজার বছরের ইতিহাস। এর মধ্যে খ্রীষ্টানদের বহু ধর্ম-সভা আহ্বান করা হয়েছে ও নানা ব্যাপারে প্রচারকদের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে সৃষ্টি হয়েছে বহু ধর্মসংঘের। অতি প্রাচীনকাল থেকেই, অর্থাৎ গ্রীক-রোমীয় সংঘের মধ্যেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংঘের মতভেদ দেখা দেয় প্রধানত ভাষাকে কেন্দ্র করে, ও পরে অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। আজকের পৃথিবীতে খ্রীষ্টীয়

ধর্ম-সংঘগুলি প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত—প্রাচ্য ধর্মসংঘ, রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্ট। প্রাচীনতার দিক থেকে রোমান ক্যাথলিক সংঘের স্থানই সবার আগে। রোমান ক্যাথলিকরা যীশুর শিষ্য 'পিটার'কেই আদি প্রচারক বলে স্বীকার করেন। এই মতে 'পোপ'ই হ'লেন যাজকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ও পোপই যীশুর প্রকৃত প্রতিভূ। সুতরাং অন্যান্য সমস্ত ধর্ম-যাজকের স্থান পোপের নীচে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের বিভিন্ন ব্যাপারে রোমান ক্যাথলিকরা প্রাচীনপন্থী। এঁরা গীর্জা বা উপাসনামন্দিরকে মানুষ ও ঈশ্বরের মিলনক্ষেত্র বলে স্বীকার করেন। প্রাচ্য সংঘের লোকেরা পিটারকেই প্রথম যাজক বলে স্বীকার করলেও সবার উপর পোপের প্রাধান্য মানেন না। কিন্তু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের অধিকাংশের ব্যাপারেই এঁরা রোমান ক্যাথলিকদের মত মানেন। প্রোটেষ্ট্যাণ্ট মতের সৃষ্টি প্রধানত রোমান ক্যাথলিক মতের বিরোধিতার মধ্য দিয়ে। রোমান ক্যাথলিকদের মত সমস্ত খ্রীষ্টীয় সংঘের ঐক্যে বিশ্বাস করলেও ও তার জন্য সচেষ্ট হ'লেও, বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ব্যাপারে এঁরা রোমান ক্যাথলিকদের বিরোধী। এঁদের মতে ধর্মের অনেক ব্যাপারেই রোমান ক্যাথলিকরা রক্ষণশীল ও যুগপরিবর্তনের অনুপযোগী। প্রোটেষ্ট্যাণ্টদের মধ্যেও নানা ভাগ আছে; যেমন, লুথারপন্থীসংঘ, ইংলণ্ডের ধর্মসংঘসমূহ। ধর্মের আনুষ্ঠানিকতার ব্যাপারে ও বিভিন্ন সূক্ষ্ম ধারণা ও বিশ্বাসের ব্যাপারে এঁদের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও খ্রীষ্টধর্মের মূল নীতি ও বিশ্বাসের ব্যাপারে এঁরা সকলেই একমত। আর এই মূলনীতি হ'ল ঈশ্বরের অনুগ্রহে বিশ্বাস ও জীবনে অনুগ্রহ ও প্রেমের নীতির অনুসরণ।

খ্রীষ্টানদের গীর্জা ও প্রার্থনামন্দির সারা পৃথিবীতেই দেখতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে অনেক গীর্জাই গঠন-বৈচিত্র্যের জন্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন বলে বিখ্যাত।

(E) ইসলাম ধর্ম

কোরানে বহুব্যবহৃত 'ইসলাম' শব্দের অর্থ হ'ল 'ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পন',[1] আর যে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পন করে সেই 'মুশলিম'। খ্রীষ্টধর্মের মত ইসলাম ধর্মও এই ধর্মের প্রবক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদের জীবন, বাণী ও নির্দেশকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এই

1 Encyclopaedia Britannica Vol. 12. Art., Islam.

ধর্মমতে মহম্মদকে বলা হয় ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ বা 'নবী'। আল্লা অর্থাৎ ঈশ্বর মহম্মদের মাধ্যমেই তাঁর বাণী প্রচার করেছিলেন। মহম্মদ-প্রকাশিত ঈশ্বরের এই বাণীই কোরানে বিধৃত আছে বলে রক্ষণশীল মুসলিমদের মত। আরব দেশের মক্কা শহরে 570 খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদের জন্ম হয়। পিতা আবদুল্লা ছিলেন মক্কার বিখ্যাত হাসিম পরিবারভুক্ত। মহম্মদ জন্ম-গ্রহণ করার পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়। মহম্মদের ছ' বছর বয়সে তাঁর মাতার মৃত্যু ঘটে। প্রথমে পিতামহ ও পরে খুল্লতাত আবু তালিব-এর কাছে তিনি মানুষ হ'ন। এই সময় হাসিম পরিবারের আর্থিক বিপর্যয় ঘটে। ফলে বাল্যকালে মহম্মদকে অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাতে হয়। পরে তিনি মক্কার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বাণিজ্য যাত্রায় তাঁর সততা ও সফলতার জন্য বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। ফলে খাদিজা নামে এক বিধবা তাঁর উপর সমস্ত সম্পত্তির ভার দেন ও পঁচিশ বছর বয়সে মহম্মদ তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক বড় খাদিজাকে বিবাহ করেন। খাদিজা আমৃত্যু মহম্মদের অত্যন্ত বিশ্বস্ত ছিলেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম-ধর্ম গ্রহণ করেন। খাদিজার মৃত্যুর পর মহম্মদ একাধিক বিবাহ করেন। কিন্তু একমাত্র খাদিজারই সন্তানরা জীবিত ছিলেন। এঁরা সকলেই কন্যা। এঁদের মধ্যে পরবর্তী কালে খাদিজার কন্যা ফতিমার সঙ্গে আলির বিবাহ হয়। আলি মহম্মদের নিকট আত্মীয় ছিলেন ও পরে মহম্মদের উত্তরাধিকার লাভ করে খলিফা নির্বাচিত হ'ন। এঁদের সন্তান ছিলেন হাসান ও হুসেন। চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত মহম্মদ সাধারণ গৃহীর জীবন যাপন করেন। এই সময়ে তিনি প্রায়ই পাহাড় ও নির্জন স্থানে প্রার্থনা করতে যেতেন। একদিন রাত্রে 'হিরাপর্বতে' তাঁর দিব্যদর্শন হয়। তিনি ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ লাভ করেন। এর পর থেকেই তাঁর জীবনে ক্রমশ পরিবর্তন আসে ও তিনি অনুভব করেন যে, তাঁকে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করতে হ'বে। ছ' শ' তের খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রচারকার্য আরম্ভ করেন। প্রথমে তিনি প্রচার করেন নিকট আত্মীয় ও বন্ধুদের মধ্যে। পরে যখন সাধারণের মধ্যে তাঁর উপলব্ধ সত্য প্রচার করতে আরম্ভ করেন, তখনই ধীরে ধীরে তাঁর বিরুদ্ধে বিরোধিতা দানা বেঁধে উঠতে থাকে। এই বিরোধিতা প্রথমে ছিল তামাসা ও বিদ্রূপ, কিন্তু পরে রূপ নিল প্রত্যক্ষ অত্যাচারের। এই সময় ইয়াথ্রিব শহরে দু'টি আরব জাতির মধ্যে বিরোধের মীমাংসার জন্য মহম্মদ আমন্ত্রিত হ'ন, কারণ তিনি ছিলেন ক্ষুদ্র গোষ্ঠী-বিরোধের উর্ধে। ইয়াথ্রিব শহরে তখন বেশ কিছু ইহুদীর বাস ছিল। ফলে মহম্মদ মনে করেন যে, তাঁদের মধ্যে তাঁর একেশ্বরবাদ প্রচার করা উপযুক্ত হ'বে।

তিনি মক্কা থেকে ইয়াথ্রিব যাত্রা করেন। এই ইয়াথ্রিবই পরে 'মদিনা' বলে পরিচিত হয়, ও ইসলাম-ধর্মীদের দ্বিতীয় প্রধান তীর্থক্ষেত্র হয়ে ওঠে। মহম্মদের ইয়াথ্রিবে আগমনের সময় থেকেই মুসলমানরা সাল গণনা করেন (16-ই জুলাই, 622 খ্রীষ্টাব্দ)। ইয়াথ্রিবেই ধীরে ধীরে মুসলমানরা বসতি করতে আরম্ভ করে। মহম্মদের প্রচারের ফলে স্থানীয় অধিবাসীদের অনেকেই ইসলাম-ধর্ম গ্রহণ করে। ইয়াথ্রিবে ক্রমশ মুসলমান সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। মহম্মদ এখানে একাধারে ধর্ম্মপ্রচারক, রাষ্ট্রনায়ক ও সমাজ সংস্কারকের রূপ নেন। তিনি মুসলমানদের ভ্রাতৃত্বের কথাও প্রচার করেন। অনেক আইন-কানুনের প্রবর্তন করে মুসলমানদের জীবনযাত্রায় তিনি শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করেন। এর পর মক্কার সঙ্গে তাঁর একাধিকবার যুদ্ধ হয়। প্রায় আট বছর ধরে নানা যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয়ে মক্কায় মহম্মদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ইয়াথ্রিবে থাকার সময়ই ইহুদীরা মহম্মদের নবীত্ব অস্বীকার করায় ইহুদীদের সঙ্গে ক্রমশ বিরোধ বাধে। শেষে মহম্মদ নিজেকেই আব্রাহাম (ইহুদীদের প্রথম ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ)-এর একেশ্বরবাদের যথার্থ প্রচারক বলে বর্ণনা করেন। এর পর উপাসনার দিক জেরুজালেম থেকে মক্কায় পরিবর্তিত হয়। (পূর্বে মুসলমানেরা জেরুজালেমের দিকে মুখ ফিরিয়ে উপাসনা করত, কিন্তু পরে মক্কার মন্দিরে যে 'কৃষ্ণ-প্রস্তর' আছে তার দিকে ফিরে উপাসনার ব্যবস্থা হয়।) মহম্মদের মক্কা জয়ের পর সেখানকার প্রায় সব অধিবাসীই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। মক্কার মন্দিরে সমস্ত মূর্তি ও প্রতিমাগুলিকে বিদূরিত করা হয়। এইভাবে মক্কা ও মদিনায় ইসলামের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর 632 খ্রীষ্টাব্দের 8-ই জুন মহম্মদ মদিনায় দেহরক্ষা করেন ও তাঁর জায়গায় হজরত আবুবকর মুসলমানদের খলিফা নির্বাচিত হ'ন। ধর্মীয়ভাবে ভাবিত অবস্থায় মহম্মদ যে-সব উক্তি করেন, সেগুলি সবই প্রায় কোরানে বিধৃত আছে। মহম্মদের পর ইসলাম ধর্ম ক্রমশ সমস্ত আরব দেশে বিস্তার লাভ করে এবং আরব জাতিগুলি ইসলাম ধর্মের মধ্য দিয়ে এক-জাতিতে পরিণত হয়। সুতরাং ইসলামের প্রচারের ইতিহাসকে এক অর্থে আরব জাতির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ইতিহাস বলা যায়।

(i) কোরান—ইসলাম ধর্মের মূল ও পবিত্র গ্রন্থ হ'ল কোরান। রক্ষণশীল ও কঠোর ধর্মবিশ্বাসী মুসলমানেরা সকলেই কোরানকে আল্লার বাণী বলে স্বীকার করেন। কোরানের প্রবক্তা ছিলেন মহম্মদ। তিনি ছিলেন পয়গম্বর বা ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ। তাঁর মাধ্যমেই ঈশ্বর নিজেরই বাণী প্রচার করেছেন। (কোরানে ১১৪টি 'সুরা' বা অধ্যায় আছে।

এইগুলি ছোট বড় নানা আকারের। সমগ্র গ্রন্থটি আরবী ভাষায় দীর্ঘ ছন্দে রচিত। অবশ্য পরে অন্যান্য ভাষায়ও কোরান অনুবাদিত হয়। বর্তমান আকারে রচিত হওয়ার পূর্বে কোরানের বিভিন্ন অংশ আরবী ভাষায় বিভিন্ন জায়গায় লিখিত ছিল। এগুলি ভক্তরা স্মরণ ও পাঠের সুবিধার জন্য এইভাবে রক্ষা করতেন। মহম্মদের দেহরক্ষার পর এগুলি সম্পূর্ণ পাঠের জন্য সংকলিত হয়, এবং কোরান শব্দের অর্থও তাই।[1] মহম্মদের দেহরক্ষার প্রায় কুড়ি বছর পরে কোরানের বিভিন্ন পাঠের মধ্যে একটি বিশেষ পাঠকেই খলিফা ওশমান প্রামাণিক বলে প্রকাশ করেন। এর ত্রিশ বছর পরে ইরাকের শাসনকর্তা অল্‌হাজাজ্‌ এটিকে আরও পরিমার্জিত আকারে প্রকাশ করেন। এই সংকলনটিই সাধারণত মুসলিম জগতে প্রামাণিক বলে গৃহীত হয়। কোরানের প্রথম সুরাটি প্রার্থনার আকারে রচিত। নানা অনুষ্ঠানে এটি ঈশ্বরের কাছে ভক্ত মুসলিম-এর প্রার্থনারূপে গীত হয়। বাকি সুরাগুলি মানুষের প্রতি ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ আকারেই পাওয়া যায়। এগুলি কখনও বা সাধারণভাবে সকল মানুষকে উদ্দেশ্য করে, কখনও বা বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্য করে, আবার কখনও বা অবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্য করে উত্তম পুরুষে উক্ত হয়েছে। যাদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে তাদের মধ্যম পুরুষের বহু বচনে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে আবার কোন কোনটি মহম্মদকে উদ্দেশ্য করেও বলা হয়েছে।

(ii) **একেশ্বরবাদ**—কোরানে আল্লা বা ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় বলে স্বীকার করা হয়েছে। তিনি জগৎ-স্রষ্টা; মনুষ্যেতর জগতের জন্য তিনি কতকগুলি বিধি ও নিয়ম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সুতরাং মনুষ্যেতর জগৎ এই বিধি অনুযায়ী চলে। মানুষের জন্যও তিনি নির্দিষ্ট বিধি নির্দেশ করে দিয়েছেন। কিন্তু মনুষ্যেতর জগতের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য হ'ল এই যে, মানুষকে তিনি করেছেন সচেতন ও স্বাধীন; অর্থাৎ ঈশ্বর-নির্দিষ্ট পথে চলা বা না চলার ব্যাপারে মানুষের স্বাধীনতা আছে। ঈশ্বর-তত্ত্বের ব্যাপারে ইসলামের সঙ্গে ইহুদী যুদাবাদ বা খ্রীষ্টধর্মের কোন মৌল প্রভেদ নেই। ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের মত মুসলিমরাও বিশ্বাস করেন যে, জগতের ইতিহাসের শেষে আসবে মানুষের বিচারের দিন। মুসলিমরা বিশ্বাস করেন, মানুষের পাপ ও অপরাধ থাকলেও ঈশ্বর মানুষকে ক্ষমা করেন। কিন্তু মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা ও ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা বা যথেচ্ছাচারিতার ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে মতভেদ আছে। মুতাজিলবাদীরা

1 পূর্বোক্ত গ্রন্থ Vol. 13, Art., Koran.

মানুষের স্বাধীনতা ও ঈশ্বরের শক্তি ও স্বরূপের মধ্যে ঐক্য স্বীকার করেন। তাঁদের মতে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে, আছে স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা। তা ছাড়া ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ ; সুতরাং তিনি কখনও পাপাচারীকে ক্ষমা করবেন না ও সদাচারীকে শাস্তি দেবেন না। রক্ষণশীল মুসলিমরা এই মতের বিরোধিতা করেন। তাঁদের মতে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা নেই ; এবং ঈশ্বর স্বরূপত ন্যায়পরায়ণ হ'লেও যথেচ্ছাচারের শক্তি তাঁর আছে। ইসলাম ধর্ম খ্রীষ্টধর্মের মতই পৌত্তলিকতা বা প্রতিমা-পূজার বিরোধী। মুসলিমদের মতে বহুদেবতায় বিশ্বাস ও প্রতিমাপূজার অর্থ কোরানের একেশ্বর-বাদের বিরোধিতা করা, সুতরাং এই ধরনের আচরণ ঈশ্বরের ইচ্ছার পরিপন্থী ও শাস্তির যোগ্য। মিথ্যা ধর্মের বিরুদ্ধে সত্যধর্ম প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে মুসলমানরা অস্ত্রধারণ করতে প্রস্তুত। কারণ হজরত মহম্মদ নিজে এই কারণেই অস্ত্রধারণ করেছিলেন ও দীর্ঘকাল ধরে বহু যুদ্ধ করেছিলেন।

(iii) **প্রত্যাদেশ ও পয়গম্বর**—ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের মত মুসলিমরাও ধর্মের ব্যাপারে প্রত্যাদেশের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। ঈশ্বর জগতের ঊর্ধে হ'লেও জগৎকে তিনি ভালবাসেন এবং মানুষকে উদ্ধার করবার জন্য তিনি মানুষের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন প্রত্যাদেশের মাধ্যমে। তিনি কখন এই প্রত্যাদেশ কোন বিশেষ নির্বাচিত ব্যক্তির কাছে দেবদূতের দ্বারা প্রেরণ করেন। আবার কখনও বা তিনি তাঁর প্রেরিত-পুরুষদের মাধ্যমে তাঁর নীতি ও ইচ্ছা মানুষের কাছে প্রকাশ করেন। মানুষের মধ্যে তিনি যাঁদের প্রত্যাদেশ দেন, অথবা তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করার জন্য নির্বাচন করেন তাঁরাই হ'লেন, পয়গম্বর বা নবী। ঈশ্বর মানুষকে তাঁর নীতি সম্বন্ধে সচেতন করবার জন্য বারে বারে পয়গম্বর ও নবী প্রেরণ করেন। তাঁদের মাধ্যমেই মানুষ ঈশ্বরের ইচ্ছার কথা জানতে পারে ; কিন্তু আবার বিস্মৃত হয়। মানব-ইতিহাসে এ রকম বহুবার ঘটেছে। ইসলাম ধর্মে এই রকম বহু নবীর আবির্ভাব স্বীকার করা হয়েছে। এই মতে আদম (প্রথম মানব পুরুষ)-ই প্রথম ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ। তারপর নোয়া, আব্রাহাম, মোসেস্, ইসায়া থেকে আরম্ভ করে যীশু পর্যন্ত সকলেই ঈশ্বরপ্রেরিত বা নবী। এই সব নবীদের মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর অভিপ্রায় ও জগৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে মানুষকে জানিয়েছেন। কিন্তু মানুষ বারে বারেই তা বিস্মৃত হয়েছে। তাই প্রয়োজন হয়েছে নতুন কোন নবীর। মহম্মদ এই রকমেরই একজন নবী, এ-কথা কোরানে বলা আছে। সুতরাং ইসলাম মতে ঈশ্বর অনাদিকাল থেকেই মানুষের কাছে নিজেকে প্রকাশ করে আসছেন ; এবং নবীদের মাধ্যমে তিনি যে প্রত্যাদেশ দেন তা স্থান, কাল ও পাত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

ঈশ্বরের বাণী চিরসত্য ও সব মানুষের কাছে নিত্যকালের বাণী। কোরান কেবলমাত্র ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা প্রত্যাদেশ বা ইচ্ছাই নয়, ঈশ্বরের প্রকাশও বটে। ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা, এ দু'টি পৃথক নয়; তাঁর ইচ্ছার মধ্য দিয়েই তিনি প্রকাশিত হয়েছেন মানুষের কাছে। সুতরাং কোরানের মধ্যে ঈশ্বরেরই প্রকাশ ঘটেছে। ইসলাম-ধর্মবিশ্বাসে পাঁচটি জিনিষের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই পাঁচটি হ'ল: (1) এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাস, (2) দেবদূতে বিশ্বাস, (3) ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ-গ্রন্থে বিশ্বাস, (4) পয়গম্বর বা নবীতে বিশ্বাস এবং (5) মানুষের শেষ বিচারের দিনে বিশ্বাস। এই ধর্মের মূল মন্ত্রটি (সাহাজা) হ'ল: 'আল্লা ব্যতীত আর কোন ঈশ্বর নেই এবং মহম্মদ হ'লেন তাঁর প্রেরিতপুরুষ[1]।'

(iii) ব্যবহার-বিধি (সারিয়া)—ইসলাম ব্যবহার-বিধির প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, মানুষের জীবনের সমস্ত দিকই এর পরিধির মধ্যে পড়ে; অর্থাৎ শুধু ধর্মীয় নয়, মানুষের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনও এই ব্যবহার-বিধির (সারিয়া) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই সারিয়ার প্রধান ভিত্তি হ'ল কোরান এবং হজরত মহম্মদের ব্যক্তিগত জীবন ও আদেশ। মহম্মদ একাধারে ধর্মের প্রবক্তা, রাষ্ট্রনায়ক ও সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। বিভিন্ন বিধি ও সংস্কারের মাধ্যমে তিনি মুসলিম সমাজকে সুগঠিত করেন। তৎ-কালীন আরব সমাজের অনেক প্রচলিত রীতি তিনি বর্জন করেন ও অনেক নতুন রীতির প্রবর্তন করেন।

ধর্মজীবনে মুসলিমরা পাঁচটি কর্তব্যকে অবশ্য পালনীয় বলে মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে এগুলিকে ইসলাম ধর্মের পাঁচটি স্তম্ভ বলা যায়। এই পাঁচটি ধর্মীয় কর্তব্য হ'ল: (1) ইসলাম-ধর্মের মূল মন্ত্র গান, (2) প্রার্থনা, (3) 'জাকৎ'-কর প্রদান, (4) উপবাস ও (5) মক্কাতীর্থ-যাত্রা।

(i) ইসলাম ধর্মের মূল-মন্ত্রটি (সাহাজা) শুদ্ধ উচ্চারণে, সম্পূর্ণ তাৎপর্য উপলব্ধি করে, অন্তরের গভীর অনুভূতি দিয়ে সোচ্চারে গান করা কর্তব্য।

(2) বিধিমত শুদ্ধ হয়ে প্রতিদিন পাঁচবার নামাজ পাঠ করা ও প্রার্থনা করা প্রয়োজন। নামাজ সাধারণভাবে কোন ইমাম (পুরোহিত)-এর পরিচালনায় দলবদ্ধভাবে পাঠ করাই কর্তব্য। তবে ক্ষেত্রবিশেষে ব্যক্তিগত নামাজেরও ব্যবস্থা আছে। নামাজের সময় মক্কার কাবার দিকে মুখ ফিরে থাকতে হ'বে, কোরানের অংশবিশেষ পাঠ করতে হ'বে। নামাজের সময়

1 পূর্বোক্ত গ্রন্থ, Vol, 12, Art., Islam.

বিশেষ প্রার্থনা ইত্যাদি উচ্চারণের জন্য বিশেষ ধরনের আসন করবার পদ্ধতি আছে।

(3) নিজের আয়ের নির্দিষ্ট অংশ খাদ্য, অর্থ ইত্যাদি আকারে দান করা কর্তব্য। এরই নাম 'জাকৎ'-কর প্রদান। এই করের থেকে সংগৃহীত অর্থ দরিদ্র ও নিঃস্বদের সেবায় নিয়োগ করতে হ'বে। জাকৎ ছাড়াও ব্যক্তিগত দানের (সাজাকৎ) নির্দেশও কোরানে আছে।

(4) কোরানে সমস্ত রমজান মাসেই উপবাসের বিধান আছে। বলা হয়েছে এই রমজান মাসেই কোরান প্রেরিত হয়। এই উপবাস প্রতিদিনের আরম্ভের সঙ্গে আরম্ভ হয় ও শেষ হয় সন্ধ্যায়। সক্ষম লোকেদের পক্ষে এই সময়ে দরিদ্রদের ভোজন করানোর বিধি প্রচলিত আছে।

(5) ইসলামের পঞ্চম কর্তব্য হ'ল হজ্‌জ্‌ যাত্রা বা মক্কাতীর্থযাত্রা। মক্কার এই তীর্থযাত্রা উৎসব 'দুল হিজ্জা' মাসের সপ্তম থেকে দশম দিন পর্যন্ত চলে। এই তীর্থযাত্রায় কাবার স্তূপ প্রদক্ষিণ, কৃষ্ণ-প্রস্তর (অল হাজার আল আসওয়াদ)—চুম্বন ইত্যাদি করণীয় আছে। হজ্‌জ্‌-যাত্রাকে ইসলাম-ধর্মে একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বলে বিবেচনা করা হয়। সেই কারণে ধার্মিক মুসলমান জীবনে অন্তত একবার হজ্‌জ্‌-যাত্রা করার চেষ্টা করেন। তবে হজ্‌জ্‌-যাত্রার সময় নিজের ও পরিবারবর্গের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করাও বিশেষ কর্তব্য বলে বিবেচনা করা হয়।

(iv) **ইসলাম-ধর্মের শাখা**—ইসলামধর্মের প্রথম যুগ থেকেই এই ধর্মের মধ্যে প্রধানত রাজনৈতিক প্রাধান্য নিয়ে বিভেদ দেখা দেয়। ফলে এর মধ্যে দু'টি প্রধান শাখার সৃষ্টি হয়—সুন্নি ও শিয়া।

সুন্নি—'সুন্নি' শব্দের অর্থ পয়গম্বরের অনুগামী। একেবারে প্রাথমিক যুগ থেকে ইসলাম ধর্মে ঈশ্বরতত্ত্ব ইত্যাদি ব্যাপারে মতভেদ দেখা গেলেও এই মতভেদ মূল ইসলাম সম্প্রদায়ের মধ্যে শাখা বা সম্প্রদায়বিভাগের রূপ নেয় নি। মুতাজিলরা ধর্মের ব্যাখ্যার ব্যাপারে এক ধরনের মত পোষন করতেন বটে, কিন্তু তাঁদের এক বিশেষ ধরনের মতবাদী বলা যায়, ধর্মীয় সম্প্রদায় বলা যায় না। সুফিদের সম্বন্ধেও ঐ একই মত প্রযোজ্য। তাঁরা ধর্মের বিভিন্ন বিধি, ব্যবহার ও বিশ্বাসের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন মাত্র, কিন্তু মূল ইসলাম ধর্ম থেকে বিচ্যুত হ'ন নি। সুফিরা কোরানের একেশ্বরবাদ বলতে অদ্বৈতবাদ বোঝেন। তাঁদের মতে সমস্ত ভেদ ও বিভিন্নতাই মিথ্যা। প্রার্থনার পূর্বে যে শুদ্ধির ব্যবস্থা আছে, তার প্রকৃত তাৎপর্য হ'ল আত্মিক শুদ্ধি, শুধু দৈহিক শুদ্ধি নয়। প্রার্থনার সময় কোরান পাঠের অর্থ কোরানের অন্বয়ের সঙ্গে নিজেকে এক বলে উপলব্ধি

করা।[1] ইসলাম ধর্মের বিধি-ব্যবহারের এই ধরনের আরও অনেক সূক্ষ্ম ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় সুফিবাদে। এক কথায় বলা যায় সুফিবাদ ধর্মের স্থূল আনুষ্ঠানিকতার পরিবর্তে গভীর তাৎপর্যের উপরই গুরুত্ব আরোপ করে। সুতরাং এই সব মতবাদের সব ক'টিই মূল ইসলাম ধর্মেরই অন্তর্ভূত। এই কারণে এদের সকলকেই সুন্নি বলা হয়।

(b) শিয়া—ইসলাম ধর্মের আর একটি প্রধান শাখা শিয়া। 'শিয়া' শব্দের অর্থ দল। শিয়া-সম্প্রদায়ের লোকেরা বিশ্বাস করেন, খলিফা কেবলমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান ন'ন, তিনি প্রধান ইমাম (পুরোহিত)। তাঁর মধ্যে দৈবশক্তি থাকা প্রয়োজন এবং একমাত্র হজরত জামাতা হজরত আলির পরিবারের মধ্যেই তা আছে। সুতরাং এঁরা পয়গম্বরের পরেই আলিকে স্বীকার করেন। এঁরা মক্কা ছাড়াও শিয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত অন্যান্য মহাপুরুষ পীরের সমাধিক্ষেত্রেও তীর্থযাত্রা করেন। কারবালায় হুসেনের সমাধিক্ষেত্র (ইরাক) এঁদের কাছে একটি বিশেষ পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। কারবালাতেই আলির পুত্র হুসেন প্রাণ বিসর্জন দেন। এঁদের মধ্যে প্রধান গোষ্ঠীর লোকেরা বিশ্বাস করেন, এঁদের দ্বাদশ বা শেষ ইমাম মহম্মদ অল্ মুন্তাজার অন্তর্ধান করেন এবং তিনি আজও জীবিত আছেন। মানব-ইতিহাসের শেষ দিনে তিনি জগৎকে রক্ষা করবার জন্য আবার আবির্ভূত হ'বেন। শিয়ামতে বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে আত্মগোপন করা পাপ নয়। এঁদের মতে দলগত প্রার্থনা আবশ্যিক নয়, কারণ বর্তমানে কোন ইমাম নেই।[2] শিয়া-সম্প্রদায়ের আরও একটি উপশাখা ইসমাইল-সম্প্রদায়। এঁরা ইসমাইলকেই সপ্তম ইমাম ও প্রধান বলে স্বীকার করেন। এঁদের নেতা ও গুরু আগা খাঁ। আর একটি শাখা ভারতের বোহ্‌রা সম্প্রদায়। এ ছাড়া হুসেনপুত্র জইদের অনুগামী জইদপন্থীরাও এই সম্প্রদায়েরই এক উপশাখা।

আধুনিক যুগে ইসলামের আরও দু'টি শাখার সৃষ্টি হয়েছে—একটি বাহায়-সম্প্রদায় ও অপরটি আহ্‌ম্মদিয়-সম্প্রদায়। অহ্‌ম্মদিয়-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন মির্জা গোলাম আহ্‌ম্মদ। ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানে এই সম্প্রদায়ের লোকেদের দেখতে পাওয়া যায়।

প্রধানত মধ্য এশিয়ার আরব রাষ্ট্রসমূহ, আফ্রিকার কিছু অংশ, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্থান, চীন ও রাশিয়ায় ইসলাম-ধর্মীদের বাস। কিছু কিছু ব্যাপারে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মতপার্থক্য

---

1 পূর্বোক্ত গ্রন্থ Vol. 21, Art., Sufism.

2 পূর্বোক্ত গ্রন্থ, Vol. 12, Art., Islam.

থাকলেও ইসলাম ধর্মের আচরণ-বিধি ও বিশ্বাসের ব্যাপারে ঐক্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কেবল রাজনীতির ক্ষেত্রেই নয়, শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রেও ইসলামধর্মের অবদান অনেক। মধ্যএশিয়া, ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানে ইসলাম-ধর্মের মস্‌জিদ, সমাধিক্ষেত্র ও অন্যান্য স্থানে শিল্পের যে-সব নিদর্শন আজও দেখতে পাওয়া যায়, শিল্পের ক্ষেত্রে তাদের স্থান খুবই উচ্চে।

(F) শিখধর্ম

'শিখ' শব্দটি সংস্কৃত 'শিষ্য' থেকে গৃহীত।[1] শিখেরা নিজেদের দশজন গুরুর শিষ্য বলে স্বীকার করেন। এঁদের প্রথম গুরু হ'লেন নানক। ইনিই প্রকৃতপক্ষে শিখধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। নানক 1469 খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবে (বর্তমানে পাকিস্থান) এক হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়স থেকেই তিনি সাধু ও সন্ন্যাসীদের সঙ্গ করতেন। বিবাহিত ও সংসার জীবন যাপন করলেও প্রধানত আধ্যাত্মিক ব্যাপারেই তাঁর আগ্রহ ছিল। ত্রিশ বছর বয়সে তিনি ধর্মশিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। তিনি ধর্মের ব্যাপারে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। ভক্তিমার্গে বিশ্বাসী নানক ধর্মের অনুষ্ঠান-সর্বস্বতা ও জাতিভেদের বিশেষ বিরোধী ছিলেন। হিন্দুধর্মের বহু বিশ্বাস, ধারণা ও ব্যবহারবিধি তিনি অস্বীকার করেন, এবং এগুলির জায়গায় ইসলামধর্মের ধারণা, বিশ্বাস ও ব্যবহার-বিধির অনেকগুলিই ধর্মজীবনে পালনীয় বলে গ্রহণ করেন। নানক 1539 খ্রীষ্টাব্দে দেহরক্ষা করেন। তাঁর পর আরও ন'জন গুরু শিখধর্মের প্রচার করেন। দশম গুরু গোবিন্দ সিং-এর পর শিখেরা আর কোন গুরু স্বীকার করেন না, এঁদের ধর্মগ্রন্থ 'গ্রন্থসাহেব'কেই গুরু বলে স্বীকার করেন। সুতরাং শিখধর্মের ইতিহাসে দু'টি পর্যায় দেখতে পাওয়া যায়। নানক থেকে গোবিন্দ সিং পর্যন্ত দশ গুরুর পর্যায় ও গ্রন্থসাহেব পর্যায়।

(i) **দশগুরু**—শিখধর্মের প্রথম গুরু নানক। তাঁর রচিত প্রার্থনা গ্রন্থসাহেবে বিধৃত আছে। শিখধর্মের প্রত্যেক গুরু তাঁর পরবর্তী গুরু নির্বাচন করতেন। নানক তাঁর এক শিষ্য 'অঙ্গদ'কে তাঁর পরবর্তী গুরু নির্বাচন করেন। অঙ্গদ 1504 খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই 'গুরুমুখী' বর্ণলিপির প্রবর্তন করেন। বর্তমানে শিখ ও পাঞ্জাবী ভাষা এই বর্ণলিপিতেই লেখা হয়। অঙ্গদই প্রথম শিখ-ভজনালয় 'গুরুদ্বার' স্থাপন করেন,

---

1 পূর্বোক্ত গ্রন্থ, Vol. 20, Art., Sikhism.

এবং এই গুরুদ্বার থেকেই তাঁর গুরুর বাণী প্রচার করতে থাকেন। বর্তমানেও শিখেদের প্রার্থনা মন্দিরকে গুরুদ্বারই বলা হয়। তাঁর মৃত্যুকালে (1552 খ্রী:) তিনি তাঁর এক শিষ্য অমরদাসকে (1479-1574) শিখেদের তৃতীয় গুরুরূপে নির্বাচন করেন। অমরদাস তাঁর পৌত্র রামদাসকে (1534-1581) চতুর্থ গুরু নির্বাচন করেন। এর পর থেকে গুরুরা একই পরিবার থেকে আসেন। রামদাস এক বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করেন। এই পুষ্করিণীকে ঘিরে তাঁর পুত্র পঞ্চম গুরু অর্জন (1563-1606) অমৃতসর নামে এক সহর গড়ে তোলেন। অমৃতসর শিখেদের প্রধান তীর্থক্ষেত্র। অর্জন গ্রন্থসাহেব সংকলন করেন। এই গ্রন্থে পূর্ববর্তী গুরুদের রচনা, গুরুদের বাণী ও মতের সঙ্গে সামঞ্জস্য আছে, এমন কিছু কিছু হিন্দু ও মুসলিম সাধু-সন্তদের বচনা এবং অর্জনের স্বরচিত কিছু প্রার্থনাগীতি সংকলিত হয়। ধর্ম ও ভক্তির ব্যাপারে শিখরা যে হিন্দু ও মুশলিমদের মধ্যে প্রভেদ স্বীকার করতেন না, গ্রন্থসাহেবের সংকলনই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তিনি অনেক গুরুদ্বার স্থাপন করেন। মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর অর্জনের প্রভাবের কথা জানতে পেরে বিচলিত হ'ন এবং তাঁকে কর-অপ্রদান ও ইসলাম-অবমাননার দায়ে বন্দি করেন। তাঁর উপর অত্যাচার করা হয় ও তিনি লাহোরে দেহরক্ষা করেন। অর্জনের মৃত্যুর পর শিখেরা শান্তি-ধর্মের বদলে ক্রমশ যোদ্ধৃ-ধর্মের দিকে ঝোঁক দেন। অর্জনের পুত্র হরগোবিন্দ (1595-1644) মুঘলদের বিরোধিতা করার ফলে বন্দি হ'ন। এর পর হরগোবিন্দের পৌত্র হররায় (1630-1662) তাঁর পুত্র হরিকৃষণ (1656-1664) যথাক্রমে সপ্তম ও অষ্টম গুরু নির্বাচিত হ'ন। হরগোবিন্দের পুত্র নবম গুরু তেগ বাহাদুর (1621-1675) ঔরঙ্গজেবের আদেশে নিহত হ'ন। তেগবাহাদুরের মৃত্যুতে গোবিন্দ রায় (1666-1708) শিখেদের দশম বা শেষ গুরু নির্বাচিত হ'ন। তিনি মুঘলদের বিরুদ্ধে শিখ সম্প্রদায়কে সংগঠিত করেন। পাঁচজন শিষ্যকে তিনি দীক্ষা দেন। এঁদের নতুন নামকরণ হয় সিং (সিংহ)। এঁরা সকলে পরস্পরের ভ্রাতা বলে শপথ নেন। এর পর তিনি নিজেও এঁদের দ্বারা দীক্ষিত হ'ন ও সিং পদবী গ্রহণ করেন। গোবিন্দ সিং-এর শিষ্যদের নিয়ে যে গোষ্ঠী তৈরী হয়, তার নাম দেওয়া হয় 'খালসা' (পবিত্র)। গুরু গোবিন্দ সিং-এর চার পুত্রই মারা যায়। তিনি আদেশ দেন তাঁর পরে আর কোন গুরু নির্বাচিত হ'বেন না, গ্রন্থসাহেবকেই শিখেরা চিরকালের গুরু বলে স্বীকার করবেন। তিনি গ্রন্থসাহেবের সম্পূর্ণ ও বর্তমান রূপ দেন। তাঁর স্বরচিত প্রার্থনাগুলি 'দশমগ্রন্থ' নামের গ্রন্থে সংকলিত আছে।

(ii) গ্রন্থসাহেব—গ্রন্থসাহেব শিখেদের মূল ধর্মগ্রন্থ ও গুরু গোবিন্দ সিং-এর পর থেকে গুরু-গ্রন্থ বলে স্বীকৃত। গ্রন্থসাহেবের প্রথম সংকলন করেন পঞ্চম গুরু অর্জন। সম্পূর্ণ ও শেষ সংকলন হয় দশম গুরু গোবিন্দ সিং-এর হাতে। এটি দ্বিতীয় গুরু অঙ্গদ প্রবর্তিত গুরুমুখী বর্ণলিপিতে লিখিত; ভাষা প্রধানত পাঞ্জাবী ও হিন্দি; কিছু কিছু মারাঠী, পার্শী ও আরবী শব্দও পাওয়া যায়। অর্জন যে আদি-গ্রন্থ সংকলন করেন তা'তে নানক, অঙ্গদ, অমরদাস ও রামদাস রচিত প্রার্থনাগীতি, কিছু হিন্দু ও মুসলিম ভক্তের প্রার্থনাগীতি ও তাঁর স্বরচিত কিছু প্রার্থনাগীতি সংকলিত হয়। গুরু গোবিন্দ সিং এর সঙ্গে গুরু তেগবাহাদুরের (নবম) কিছু রচনা যুক্ত করেন। এই প্রার্থনা সঙ্গীতগুলির প্রধান বিষয় হ'ল মানুষের অহঙ্কার সম্পূর্ণরূপে দূর করে স্রষ্টার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার প্রার্থনা। পরমার্থ লাভের জন্য সৎ জীবন যাপন করতে বলা হয়েছে, ও এই উদ্দেশ্যে জাগতিক কর্তব্য ত্যাগ করতে নিষেধ করা হয়েছে। গুরু গোবিন্দ সিং-এর দেহরক্ষার পর তাঁর রচনা ও উপদেশগুলি 'দশম গ্রন্থ' নামে একটি পৃথক গ্রন্থে সংকলিত হয়।

(iii) একেশ্বরবাদ—শিখধর্মে ঈশ্বরকে এক ও অদ্বিতীয় বলে স্বীকার করা হয়। তিনি সর্বশক্তিমান ও জগতের সব কিছুরই স্রষ্টা। শিখধর্মের মধ্যে বহু হিন্দু দেব-দেবীরও উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ইত্যাদির বিষয়ে আলোচনা শিখধর্মে পাওয়া যায়। সুতরাং ইসলামের তুলনায় হিন্দুধর্মের সঙ্গেই শিখধর্মের নৈকট্য বেশি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে স্বীকার করলেও, এদের মধ্যে কোনটিকেই শিখধর্মে প্রধান ও আদি বলে স্বীকার করা হয় নি। হিন্দুধর্মের মায়া, শক্তি, প্রকৃতি ইত্যাদির ধারণাও শিখধর্মে দেখা যায়। এই তিনটিই এঁদের মতে এক। একই জড়তত্ত্ব এই তিনরূপে প্রকাশিত হয়। হিন্দুধর্মে প্রণব 'ওঁ'কার অর্থে পরম ব্রহ্মকে বোঝানো হয়। নানক এই ওঁকারের আগে 'ইক' (এক) শব্দ প্রয়োগ করে তাঁর চরম একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন[1]। শিখ-মতে পরমেশ্বর ও পরমব্রহ্ম অসীম। তিনি যে শুধু মানুষের বুদ্ধির অগোচর তাই নয়, দেবতাদেরও বুদ্ধির অগোচর। তাঁর তুলনায় দেবতাদের স্থান মানুষের চেয়ে উপরে নয়। এই পরমেশ্বরে লীন হওয়াই মানুষের জীবনের পরমার্থ। এই পরমার্থ লাভ মানুষের জন্ম-জন্মান্তরের চেষ্টায়ই সম্ভব। সুতরাং হিন্দু বা অন্যান্য ভারতীয় ধর্মের মত শিখধর্মেও জন্মান্তর স্বীকার করা হয়।

1 দর্শন, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৭৫ সাল, প্রবন্ধ 'শ্রীচৈতন্য ও গুরু নানকের ধর্মে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের স্থান', লেখক, সুনীল কুমার দাস।

(iv) ভক্তিবাদ—ভক্তিই শিখধর্মের প্রাণ। জাতিভেদ, ক্রিয়াকাণ্ড, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদির কোন মূল্যই নেই। পরমেশ্বরের কাছে সকলেই সমান। সন্ন্যাস বা শ্রমণ-জীবনের কোন মূল্য শিখধর্মে নেই। বরং স্বাভাবিক ও সরলভাবে সংসার-জীবন যাপন করা ও সাংসারিক কর্তব্য পালন করাকেই বেশি মূল্য দেওয়া হয়েছে। শিখগুরুদের কেউই সন্ন্যাসী ছিলেন না। শিখমতে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও অনুশাসন মেনে চলাই মানুষের কর্তব্য। আচার-অনুষ্ঠানের বদলে সরল ভগবদ্‌ভক্তিরই মূল্য বেশি। নম্রভাবে ঈশ্বরের কাছে জন্মান্তরে তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য প্রার্থনাই মানুষের প্রধান কর্তব্য। নিরহঙ্কার হয়ে পরমেশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করাই শিখ প্রার্থনার মূল মন্ত্র।

(v) পঞ্চ 'ক'—গুরু গোবিন্দ সিং মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য শিখদের বিশেষভাবে সংগঠিত করেন। তিনি গ্রন্থসাহেবকেই গুরু বলে স্বীকার করার নির্দেশ দেন ও শিখ বালক-বালিকাদের বয়ঃসন্ধিকালে বিশেষ দীক্ষার ব্যবস্থা করেন। এই দীক্ষার পর তারা পঞ্চ 'ক' পালন করে। এই পঞ্চ 'ক' হ'ল কেশ (দীর্ঘকেশ রাখা), কংঘ (চিরুণী), কচ্ছ (যোদ্ধাদের পরিধেয় ছোট নিম্নবাস), কড় (দক্ষিণ মণিবন্ধে লৌহ বলয়) ও কৃপাণ (ছোরা)। দীক্ষান্তে পুরুষেরা সিং (সিংহ) পদবী গ্রহণ করে ও নারীরা গ্রহণ করে কাউর পদবী। দীক্ষা বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের জন্য শিখ-সমাজে পুরোহিত বা যাজক নিয়োগের ব্যবস্থা নেই। পুরুষ বা নারী যে কেউই এ কাজ করতে পারে[1]। অবশ্য বৃহৎ শিখ-সম্প্রদায়ের মধ্যে গ্রন্থসাহেব পাঠ ও গান করার জন্য বিশেষ এক শ্রেণীর লোক থাকে।

শিখধর্মের উপর হিন্দু ও ইসলাম উভয় ধর্মের প্রভাব থাকলেও হিন্দু ধর্মের সঙ্গেই এই ধর্মের বেশি নৈকট্য দেখতে পাওয়া যায়। পাঞ্জাব অঞ্চলের হিন্দুরা শিখগুরুদের মানেন। আবার হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দিনগুলিতে শিখেরাও নিজেদের গুরুদ্বারে গ্রন্থসাহেব পাঠ ও প্রার্থনা করেন। গুরু অর্জন প্রতিষ্ঠিত অমৃতসরের গুরুদ্বার শিখেদের প্রধান তীর্থক্ষেত্র। কিন্তু অমৃতসর ছাড়াও আরও অনেক জায়গায় গুরুদ্বার আছে। এগুলির সব ক'টিতেই গ্রন্থসাহেব সুরক্ষিত থাকে ও গুরুদের জন্মদিন ইত্যাদি বিশেষ অনুষ্ঠানে এই গ্রন্থসাহেব পাঠ করা হয়। প্রার্থনাগুলি সাধারণ সুরে গাওয়া হয়। তাছাড়া বিশেষ উৎসবের দিনে গ্রন্থসাহেব নিয়ে নগর পরিক্রমারও বিধি আছে। ভারতবর্ষের পাঞ্জাব অঞ্চলেই শিখেদের প্রধান বসতিক্ষেত্র। অন্যান্য রাজ্যেও

---

[1] Encyclopaedia Britannica, 1969, Vol, 20, Art., Sikhism.

শিখেদের গুরুদ্বার ও শিখ-সম্প্রদায়ের লোকেদের দেখতে পাওয়া যায়। শিখ সম্প্রদায়ের লোকেরা সৈন্যবাহিনী ও প্রয়োগবিদ্যার কাজে (যে কাজে সাহস ও শক্তি দুই-ই সমান প্রয়োজন) বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে সুনাম অর্জন করেছেন।

(G) পারসীক ধর্ম

বর্তমান পৃথিবীতে প্রভাব ও বিস্তারের দিক থেকে নগণ্য হ'লেও, প্রাচীনতার বিচারে পারসীক ধর্ম বা পারসী-ধর্ম বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। তাছাড়া ইতিহাসের অনেক পরিবর্তন ও ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও পারসীধর্ম আজও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত নয়, বরং তার নানা বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে তার অস্তিত্ব আজও বজায় রেখেছে। পারসীক ধর্মের উৎপত্তি হয় প্রাচীন পারস্যদেশে। এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন 'জরথুষ্ট্র'। জরথুষ্ট্রের জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। প্রাচীন ইরাণীয় মত অনুযায়ী তিনি আলেকজাণ্ডারের ইরাণ জয়ের (330 খ্রীঃপূঃ) প্রায় 258 বছর পুর্বে জীবিত ছিলেন[1]। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী তিনি প্রায় 77 বছর জীবিত ছিলেন, ও রাজা হাইস্তাসপীসের সভায় বহুদিন ছিলেন। তাজিকিস্থান ও উত্তর বেলুচিস্থান হাইস্তাসপীসের রাজত্বের অন্তর্ভূত ছিল। তিনি প্রচলিত ইরাণীয় বহুদেববাদের সংস্কার করে একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, এবং প্রচলিত ধর্মকে তিনি নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ধর্মকে সমাজ-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে তিনি সংস্কার করতে চান নি। এই জন্য তিনি সাধারণ মানুষকে যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করে চাষ-বাসের কাজে নিযক্ত হ'তে নির্দেশ দিতেন। পুরোহিতদের 'দৈত্যদের পূজারী' বলে সমালোচনা করায় তাঁর বিরুদ্ধে বিরোধিতা দেখা দেয়। কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত ইরাণীয় রাজা হাইস্তাসপীসকে নিজের মতে ধর্মান্তরিত করতে সক্ষম হ'ন; এবং রাজসভার আরও কিছু লোক তাঁকে স্বীকৃতি দেয়। ফলে তাঁর প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। পারসী মূল ধর্মগ্রন্থ 'আবেস্তা'র 'গাথা' অংশ তাঁরই রচনা বলে পরিচিত। এই গাথার মধ্যে যে শুধু তাঁর দর্শন ও ধর্মের পরিচয় পাওয়া যায় তাই নয়, তাঁর বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের আশা, আকাঙ্ক্ষা, ভয়, দ্বন্দ্ব ইত্যাদিরও পরিচয় মেলে। ফলে জরথুষ্ট্র যে ঐতিহাসিক পুরুষ ছিলেন, এ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। জরথুষ্ট্রের মৃত্যুর

---

1 পূর্বোক্ত গ্রন্থ, Vol 23, Art., Zoroastrianism

পর অবশ্য তাঁর সম্পর্কে নানা অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত হয়। এই সব কাহিনীর প্রধান ভিত্তি খ্রীষ্টীয় নবম শতকের 'পহ্লবী' রচনাবলী। ইহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্মে জরথুষ্ট্রকে ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ বলে স্বীকার করা হয়।

(i) আবেস্তা—'আবেস্তা' পারসীদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। ইউরোপে এটি জেন্দ্-আবেস্তা বলে পরিচিত। কিন্তু 'জেন্দ্' পদের অর্থ 'ব্যাখ্যা' এবং জেন্দ্-আবেস্তা বলতে পারসীরা পরবর্তীকালে পহ্লবী ভাষায় রচিত আবেস্তার ব্যাখ্যা, টীকা ইত্যাদিই বোঝেন। আবেস্তার একাধিক বিভাগ আছে। এগুলিতে আছে, পরম দেবতা 'অহুর মাজদার' প্রার্থনা, বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া-অনুষ্ঠানের জন্য নির্দিষ্ট মন্ত্র ও প্রার্থনা, নানা কাহিনী ও উপকথা, জরথুষ্ট্রবাদের ধর্মীয় ও সামাজিক নানা উপদেশ ও বিধান, জরথুষ্ট্রের বাণী, বিচার, আলোচনা ও প্রত্যাদেশ। এর মধ্যে প্রধান অংশ হ'ল 'গাথা'। এই গাথাগুলি ছন্দে রচিত। এইগুলির মধ্যেই ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ জরথুষ্ট্রের ব্যক্তিগত অনুভূতি, আবেগ, আলোচনা ও প্রত্যাদেশ-গুলি পাওয়া যায়। চিন্তা ও প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে এগুলির সঙ্গে আবেস্তার যথেষ্ট পার্থক্য আছে। মূল আবেস্তার অল্প কিছু অংশই পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় নবম শতকের পহ্লবী রচনায় বৃহত্তর আবেস্তার উল্লেখ পাওয়া যায়।

(ii) একেশ্বরবাদ—জরথুষ্ট্র বহুদেববাদকে সমালোচনা করেন। সুতরাং পার্সীধর্ম একেশ্বরবাদী ধর্ম। জরথুষ্ট্রের যুগে ইরাণীয় ধর্মে (ইন্দো-ইরাণীয়) বহু 'দৈব' (সংস্কৃত 'দেব') স্বীকার করা হ'ত। এগুলির মধ্যে কতকগুলি 'অসূর' বা প্রধান। এদের মধ্যে মিত্র ও বরুণের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং এই ধর্ম আসলে ভারতীয় বৈদিক ধর্মেরই সমগোত্রীয়। তা'ছাড়া মানুষের মধ্যে তিনটি প্রধান শ্রেণীবিভাগ স্বীকার করা হ'ত—নেতা ও পুরোহিত, যোদ্ধা, এবং চাষী ও পশুপালক। এই তিনটির সঙ্গে স্থানীয় অনার্যদের নিয়ে ভারতবর্ষে আর্যরা চারটি শ্রেণীবিভাগ করেন। এক একটি শ্রেণীর সঙ্গে বিশেষ শ্রেণীর দেবতাদের সম্বন্ধ থাকত। কিন্তু জরথুষ্ট্র একমাত্র অহুর মাজ্‌দা (জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বর) ছাড়া আর কোন দেবতাকেই স্বীকার করেন নি। এদের সকলকেই তিনি দৈত্য বলেছেন। অহুর মাজ্‌দা সব কিছুরই-স্রষ্টা। অন্য 'অসূর' বা দেবতাদের স্বীকার না করলেও বহু দেব-বাদের প্রভাব জরথুষ্ট্রের উপরও ছিল। তাই তিনি 'পবিত্র অমর' ছ'টি দেবতা তা'দের পিতা অহুর মাজ্‌দাকে বেষ্টন করে থাকে বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে এই ছ'টি দেবতা পৃথক্ শক্তিতে শক্তিমান বলে স্বীকৃত হ'ন। জরথুষ্ট্রের মতে জগৎ খুব শীঘ্রই অগ্নিদগ্ধ হ'বে। এর মধ্যে

যারা মঙ্গলের অনুসরণ করে তারাই কেবল উদ্ধার পা'বে। এরাই আবার নতুন সৃষ্টির মধ্যে প্রবেশ করবে। জগতের এই মহাপ্রলয়ের পূর্ব পর্যন্ত মৃতদের মধ্যে যারা সৎ তা'রা স্বর্গে ও যারা অসৎ তা'রা নরকে অপেক্ষা করবে। পরবর্তী যুগে জগতের এই পরিসমাপ্তি দূর ভবিষ্যতে আসবে বলে কল্পনা করা হয় ; এবং অসৎ আত্মারা সেই মহাপ্রলয়ের আগুনে পুড়ে পূত হ'বে ও নব সৃষ্টির মধ্যে প্রবেশ করবে বলে পারসীকধর্মে বিশ্বাস করা হয়।

(iii) দ্বৈতবাদ—ধর্মতত্ত্বে এক ঈশ্বরের স্বীকৃতি থাকলেও, জরথুষ্ট্রের নীতিতত্ত্ব দ্বৈতবাদী। সৃষ্টির আদিতে অহুর মাজ্‌দার দুই পুত্র সৎ ও অসৎ এই দুই পথ বেছে নিল। প্রথমে 'স্পেন্তা মৈন্যু' গ্রহণ করল মঙ্গলকে। তাই তা'র সঙ্গে রইল সত্য, ন্যায় ও জীবন। আর দ্বিতীয় 'অংগ্র মৈন্যু' গ্রহণ করল অমঙ্গলকে। তা'র সঙ্গে রইল ধ্বংস, অন্যায় ও মৃত্যু। জরথুষ্ট্রের পরবর্তী যুগে অহুর মাজ্‌দাকে স্পেন্তা মৈন্যুর সঙ্গে এক ও সসীম বলে কল্পনা করা হয়। সেই হিসেবে তাঁ'র বিরুদ্ধ শক্তি হ'ল অংগ্র মৈন্যু। সুতরাং নৈতিক দ্বৈতবাদ শেষপর্যন্ত রূপান্তরিত হয় ধর্মীয় দ্বৈতবাদে। এক কথায় বলা যায়, পারসীকধর্মে জগতের মূলে মঙ্গল ও অমঙ্গল এই দু'টি শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে ; এবং ভবিষ্যতে মঙ্গলের প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা থাকলেও জগতে সর্বদাই এই দুই শক্তির বিরোধ চলেছে।

(iv) কর্মফল—পারসীকরা কর্মফল স্বীকার করেন। জীবনে সৎ ও অসৎ কাজ অনুযায়ী মানুষ মৃত্যুর পর স্বর্গ বা নরক ভোগ করে। তাই জীবনে সৎ-চিন্তা, সৎ-বাক্য ও সৎ-কর্মের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। জীবন সম্বন্ধে এঁদের মত হ'ল, জীবনকে রক্ষা করতে হ'বে, সুতরাং চাষ করতে হ'বে ও সন্তানোৎপাদন করতে হ'বে। আবার নৈতিক জীবনে যা অসৎ যা অমঙ্গলকর তাকে পরাস্ত করতে হ'বে ; তার জন্য যুদ্ধ করতে, হ'তে পারে। অপরাধের স্বীকৃতি ও তপস্যার মধ্য দিয়ে পাপের আংশিক স্খালন হয়। ক্রিয়া-অনুষ্ঠানের পুণ্যফলেও দোষের স্খালন হয়। এই কারণেই মৃতদের জন্য নানা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। এই সব ক্রিয়ার অনুষ্ঠাতা যেই হোক না কেন, এই সব ক্রিয়ার ফলদানের ক্ষমতা আছে। মৃতেরা এই ক্রিয়ার ফল ভোগ করে। সুতরাং পারসীক ধর্মে আত্মার অবিনশ্বরতায় বিশ্বাস করা হয়। পারসীক ধর্মে অগ্নির বিশেষ স্থান আছে। অগ্নি সত্যের প্রতীক। বিভিন্ন ক্রিয়া-অনুষ্ঠানে অগ্নির কাছে 'হোম' (পবিত্র পানীয়—বেদে 'সোম' বলা হয়েছে) উৎসর্গ করা হয়। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের মত পারসীকদের ধর্মেও অনেক জটিল ক্রিয়া-কর্মের ব্যবস্থা আছে।

বর্তমান পৃথিবীতে পারসীকদের সংখ্যা অতি অল্প। খ্রীষ্টীয় অষ্টম

শতকের পর পারসীরা মুশলিম আক্রমণের ভয়ে স্বদেশ ছেড়ে আশ্রয় নেয় ভারতবর্ষের পশ্চিমভাগে। বম্বে অঞ্চলেই প্রধানত পারসীদের বাস। পাকিস্থানের করাচিতে কিছু সংখ্যায় পারসী দেখা যায়। ধর্মের ব্যাপারে এঁরা অত্যন্ত রক্ষণশীল এবং বিবাহ ইত্যাদির ব্যাপারে নিজেদের সম্প্রদায়ের বাইরে যা'ন না। এঁদের ধর্মীয় রক্ষণশীলতা ও গভীর সাম্প্রদায়িকতা-বোধের জন্যই এঁরা আজও নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছেন।

বিভিন্ন ধর্মের মূল কথা সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হ'ল, তা'তে একটি জিনিষ স্পষ্ট হয় যে, বর্তমান পৃথিবীর প্রধান ধর্মগুলি সবই মূলত একেশ্বর-বাদী। হিন্দুধর্মে বহু দেব-দেবীর উল্লেখ থাকলেও এবং একাধিক দেব-দেবীর পূজার প্রচলন থাকলেও, পূজার সময় পূজিত দেবতাকে সর্বপ্রধান বলে পূজা করা হয়। পারসীক ধর্মে একাধিক দেবতার উল্লেখ থাকলেও, এগুলিকে জরথুস্ত্র দেবতা বলে স্বীকার করেন নি। অনেকের মতে হিন্দুধর্মের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল পৌত্তলিকতা। এই ধর্মে বিভিন্ন দেবদেবীর প্রতিমা গড়িয়ে পূজা করার বিধি আছে। এর উত্তরে বলা যায় যে, প্রতিমা পদের অর্থ যদি প্রতীক বলে বোঝানো হয়, তা'হলে সব ধর্মেই প্রতীক পূজার ব্যবস্থা আছে। যে-সব ধর্মে (খ্রীষ্ট, ইসলাম ইত্যাদি) পৌত্তলিকতাকে বিশেষভাবে সমালোচনা করা হয়েছে, সেই সব ধর্মেও কোন না কোন প্রতীককে সম্মান দেখানোর বিধি আছে। এর প্রধান কারণ মানসিক। সাধারণ মানুষ মূর্ত বস্তু ছাড়া কল্পনা করতে বা চিন্তা করতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বরের মূর্ত্তি কল্পনা না করলেও কোন একটি প্রতীককে আশ্রয় করেই মানুষ তার ধর্মীয় আবেগ ও অনুভূতিকে প্রকাশ করে। সুতরাং সাধরণভাবে মানুষের ধর্মজীবনে প্রতীকের স্থান ও মূল্য অস্বীকার করা যায় না। হিন্দুধর্মে অবশ্য এই প্রতীকের স্থান নিয়েছে প্রতিরূপ (Image) বা প্রতিমা ; এবং এই প্রতিমাগুলিতে মনুষ্যরূপেরই দৈবীকরণ করা হ'য়েছে।

নির্বাচিত পুস্তক-তালিকা

1. Articles in Encyclopaedia of Religion and Ethics.
2. Articles in Encyclopaedia Britannica.
3. S. Radhakrishnan—Indian Philosophy Vol. I.
4. M. Hiriyanna—Outlines of Indian Philosophy.
5. Articles in History of Philosophy Eastern and Western.

পরিশিষ্ট

ভারতীয় দর্শনে ঈশ্বরবাদ

প্রাচীন ঐতিহ্যানুসারে ভারতীয় দর্শনগুলিকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—আস্তিক দর্শন ও নাস্তিক দর্শন। যে সব দর্শন বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে, অর্থাৎ, জগতের চরম তত্ত্ব, ধর্ম ও নীতি সম্বন্ধে বেদে যে সব উক্তি করা হয়েছে, সেগুলিকে অভ্রান্ত সত্য বলে বিশ্বাস করে তাদের আস্তিক, এবং যারা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে না তাদের নাস্তিক দর্শন বলা হয়। প্রধান আস্তিক দর্শন ছ'টি—ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, (পূর্ব) মীমাংসা এবং বেদান্ত (উত্তর মীমাংসা), আর প্রধান নাস্তিক দর্শন হ'ল তিনটি—চার্বাক, বৌদ্ধ এবং জৈন। কালক্রমে এই সব দর্শনের নানা ভাষ্য টীকা প্রভৃতি লিখিত হ'বার ফলে অনেক উপশাখার সৃষ্টি হয়েছে। নাস্তিক দর্শনের কোনটিতেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় নি, আবার আস্তিক দর্শনগুলির মধ্যেও সাংখ্য এবং পূর্ব মীমাংসায় ঈশ্বরের কোন স্থান নেই। যে সব দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত সেগুলিতেও ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্বন্ধে অল্প-বিস্তর মতভেদ দেখা যায়।

এই জগতের একজন স্রষ্টা, পালক ও নিয়ন্তা আছেন, তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, করুণাময় ও ন্যায়পরায়ণ—এই বিশ্বাস বৈদিক যুগের প্রথম থেকেই আর্যদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। অনেকের ধারণা এই যে, বৈদিক আর্যগণ প্রথমে প্রকৃতি-পূজক (Nature-worshippers) ছিলেন এবং পরে কালক্রমে তাঁরা এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়েছিলেন। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। বৈদিক আর্যরা অতি সুস্পষ্ট ভাষায় প্রচার করেছিলেন যে, তাঁরা "যে দেব অগ্নিতে জলে, বায়ুতে, বৃক্ষ-লতায়, জগতের সর্বত্রই আছেন", তাঁরই পূজা করেন, এবং পূজার সময়ে উপাস্য দেবতার বিভিন্ন নাম ব্যবহার করলেও তাঁরা প্রকৃতপক্ষে একই দেবতার উপাসনা করেন। "একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি" (একই সদ্বস্তুকে বিপ্রেরা বিভিন্ন নাম দিয়ে থাকেন)। জাগতিক শৃঙ্খলা ও নৈতিক নিয়ম ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে, ঈশ্বরের স্বরূপ জানা, তাঁর সঙ্গে যুক্ত হওয়াই মানুষের চরম ইষ্ট—এই সব বিশ্বাসও বহুকাল পূর্বেই প্রচলিত ছিল। পরবর্তী কালে ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখায় ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সব মতবাদ প্রচলিত হয়েছিল, যথা, অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ,

অন্তর্বর্তী ঈশ্বরবাদ, সর্বেশ্বরবাদ, কেবলাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—এই সব বিভিন্ন মতবাদের মূলই বেদ ও উপনিষদে পাওয়া যায়।

চার্বাক দর্শন জড়বাদী, সুতরাং এতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হ'বে, এটা আশা করা যায় না। বৌদ্ধ দর্শন শূন্যবাদী, সুতরাং এই দর্শনেও ঈশ্বরের প্রসঙ্গ নেই, যদিও প্রচলিত বৌদ্ধধর্মে বুদ্ধকেই প্রকারান্তরে ঈশ্বরের আসনে বসানো হয়ে থাকে। জৈন দর্শনে জীবাত্মার অস্তিত্ব এবং জড়দেহ ও আত্মার পার্থক্যও স্বীকৃত, কিন্তু জগৎ-স্রষ্টা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করবার প্রয়োজন অনুভূত হয় নি, যদিও জৈনধর্মে তীর্থঙ্করেরা দেবতা বলে পূজা পেয়ে থাকেন। আস্তিক দর্শনগুলির মধ্যে প্রাচীন সাংখ্য ও পূর্ব-মীমাংসায় ঈশ্বরের প্রসঙ্গ নেই। সাংখ্যমতে সচেতন অথচ নিষ্ক্রিয় পুরুষ এবং জড়-প্রকৃতির সংযোগের ফলে জগতের অভিব্যক্তি আরম্ভ হয়, এ সম্বন্ধে কোন পরমপুরুষের কর্তৃত্ব নেই। পুরুষের অজ্ঞানের নিবৃত্তি হওয়ার ফলে যখন সে নিজেকে প্রকৃতি থেকে পৃথক বলে উপলব্ধি করে, তখন সে স্বরূপে অবস্থান করে এবং তার ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত-নিবৃত্তি হয়। এই অবস্থাকে কৈবল্য বলা হয়, এবং এটাই পরম পুরুষার্থ। কিন্তু এই পরম পুরুষার্থ লাভের জন্য ঈশ্বর-চিন্তা, ঈশ্বরের পূজা, উপাসনা বা ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য কোন রকম সাধনার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং, সাংখ্যে ঈশ্বর-প্রসঙ্গ নেই। পূর্ব-মীমাংসা বেদের কর্মকাণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই দর্শনের মতে বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া যথাযথভাবে সম্পাদন করলে মানুষ পুণ্য লাভ করে, এবং সেই পুণ্যের ফলে মৃত্যুর পর স্বর্গলাভ করে। এই স্বর্গবাসই জীবের পক্ষে পরম পুরুষার্থ এবং এই পুরুষার্থ লাভের জন্য ঈশ্বরের সাহায্যর কোন প্রয়োজন নেই। সুতরাং মীমাংসাদর্শনেও ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন আলোচনা নেই। বেদান্তের দুই প্রধান শাখা—অদ্বৈতবাদী বেদান্ত, আর বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বেদান্ত। অদ্বৈতবেদান্তে বলা হয় যে, ব্রহ্ম নির্গুণ, নির্বিকার, চৈতন্যস্বরূপ। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁতে বিজাতীয়ভেদ, সজাতীয়ভেদ বা স্বগতভেদ নেই। তিনি এই অর্থে জগতের কারণ যে, ব্রহ্ম ভিন্ন জগতের কোন অস্তিত্ব নেই। এই নির্গুণ, নির্বিশেষ ব্রহ্মকে ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট পুরুষ (Person) বলা যায় না। ধর্মীয় চেতনায় আমরা যাকে ঈশ্বর বলি ব্রহ্ম তা ন'ন। বিশিষ্টদ্বৈতবাদে ব্রহ্মের সজাতীয় ও বিজাতীয়ভেদ অস্বীকৃত হ'লেও স্বগত ভেদ স্বীকার করা হয়েছে। ব্রহ্ম এক হ'লেও জগৎ এবং জীবাত্মা ব্রহ্মের অংশ। ব্রহ্ম সগুণ, সকল শ্রেষ্ঠ গুণের আশ্রয় এবং কেবলমাত্র তারই চরম সত্তা আছে। তিনিই ঈশ্বর এবং আমাদের উপাস্য। তিনি জগতের স্রষ্টা, পালক ও নিয়ন্তা ; ঈশ্বরের

সদৃশ হওয়া এবং ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করে পরমানন্দ লাভ করাই জীবাত্মার পক্ষে পরম পুরুষার্থ। ন্যায়, বৈশেষিক ও যোগ দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়। এই ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সকল শ্রেষ্ঠ গুণের অধিকারী পরম পুরুষ। ন্যায়, বৈশেষিক ও যোগদর্শনের মতে ঈশ্বর জগতের উপাদান কারণ ন'ন, নিমিত্ত কারণ মাত্র। পাশ্চাত্য দর্শনে যাকে "Creation out of nothing" বলা হয়, এ সব দর্শনে তা স্বীকার করা হয় নি। ন্যায়-বৈশেষিক মতে চার প্রকার পরমাণু, দেশ, কাল, আকাশ ও জীবাত্মা ঈশ্বরেরই মত নিত্য। ঈশ্বর এদের সৃষ্টি করেন না। যোগদর্শন মতে পুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মা এবং প্রকৃতিও নিত্য এবং ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট নয়। ঈশ্বরের কাজ হ'ল অসংখ্য পরমাণুকে নানাভাবে মিলিত করে বিভিন্ন বস্তু নির্মাণ করা অথবা পুরুষ এবং প্রকৃতির সংযোগ ঘটিয়ে জাগতিক প্রক্রিয়া আরম্ভ করা। অর্থাৎ, ঈশ্বর জগতের নির্মাতামাত্র, স্রষ্টা নয়। ঈশ্বরের প্রেম বা করুণা লাভ করা, অথবা তাঁর সান্নিধ্যে পরমানন্দ লাভ করা জীবাত্মার পক্ষে পরম পুরুষার্থ। অপবর্গ বা কৈবল্যদশাতে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি বা ভালবাসা এবং তজ্জনিত আনন্দের কোন স্থান নেই। ঈশ্বর জীবাত্মাকে এই অবস্থা লাভ করতে সাহায্য করতে পারেন এই মাত্র।

বেদান্ত দর্শনের দুই প্রধান ব্যাখ্যাতা শঙ্কর ও রামানুজ, প্রধানত শ্রুতি-বাক্যের উপর নির্ভর করে ব্রহ্ম অথবা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন এবং তার প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এঁদের মতে যুক্তির সাহায্যে ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না, বা তাঁকে লাভও করা যায় না। একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি যদি যুক্তির সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন, তাহ'লে তাঁর অপেক্ষা বুদ্ধিমান অপর এক ব্যক্তি বলবত্তর যুক্তির সাহায্যে সেই সিদ্ধান্ত খণ্ডন করতে পারেন। সুতরাং ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে হ'লে আমাদের শ্রুতির উপর নির্ভর করতে হ'বে। শ্রুতি-বাক্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের উপায়। ন্যায় বৈশেষিক ও যোগ দর্শনে ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্য শ্রুতি-বাক্যের উপর নির্ভর করার প্রয়োজন স্বীকৃত হ'লেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য কতকগুলি যুক্তি দেওয়া হয়েছে। য়ুরোপীয় দার্শনিকরা এই প্রসঙ্গে যে সব যুক্তি দিয়ে থাকেন, তাদের সঙ্গে এগুলির অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে।

ন্যায় দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য প্রধানত প্রত্যক্ষ ও বিচার বুদ্ধির ভিত্তিতে একটি অনুমানের ব্যবহার করা হয়। একে কার্যত্ব-লিঙ্গক অনুমান (The causal or cosmological argument) বলা হয়। যথা :—

পর্বত, সাগর, চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতির কোন কর্তা আছেন, কারণ, তারা কার্য।

কার্য মাত্রেরই কর্তা অবশ্যই থাকবে, যেমন, ঘটরূপ কার্যের কর্তা কুম্ভকার।

পর্বত, সাগর, প্রভৃতি কার্য।

সুতরাং পর্বত, সাগর প্রভৃতির কর্তা আছেন।

পর্বত, সাগর, প্রভৃতি যে কার্য তার দুটি হেতু আছে; প্রথমত, এগুলি অনেক অংশ বা অবয়বের সংযোগে গঠিত; এবং দ্বিতীয়ত, এরা দেশ, কাল, আকাশের মত অতি-মহৎ (সর্বাপেক্ষা বৃহৎ পরিমাণবিশিষ্ট) অথবা পরমাণুর মত অতি-ক্ষুদ্র নয়। যারা অতি মহৎ বা অতি ক্ষুদ্র তাদের উৎপত্তি নেই। যারা মধ্যম পরিমাণ কেবল তাদেরই উৎপত্তি আছে, সুতরাং সমুদ্র, পর্বত প্রভৃতি কার্য।

এই সব বস্তুর কারণ কোন অচেতন পদার্থ (যেমন অদৃষ্ট) বা জড়দ্রব্য (যেমন প্রকৃতি) হ'তে পারে না। কতকগুলি উপাদানকে একত্র করে একটি বস্তু নির্মাণ করতে গেলে সেই সব বস্তু সম্বন্ধে নির্মাতার জ্ঞান থাকা আবশ্যক, কোন উদ্দেশ্য সাধনের ইচ্ছা এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী প্রযত্ন থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ, পর্বত, সাগর প্রভৃতির কর্তা নিশ্চয়ই কোন চৈতন্যবিশিষ্ট পুরুষ হ'বেন। জগতে যে ঐক্য, শৃঙ্খলা ও কলাকৌশল লক্ষ্য করা যায় তা থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, জগতের কর্তা একজন এবং তিনি অনন্ত জ্ঞান, বুদ্ধি ও শক্তির অধিকারী। এই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান পুরুষই ঈশ্বর।

অদৃষ্টলিঙ্গক অনুমান—প্রত্যেক মানুষ তার নিজ কর্মফল ভোগ করে। একজন্মে যে কর্মের ফলভোগ হয় না, পরজন্মে তা হয়ে থাকে। শুভকর্মের ফল পুণ্য আর অশুভ কর্মের ফল পাপ। পুণ্য ও পাপের সমষ্টি অদৃষ্ট। সুতরাং অদৃষ্টই সব মানুষের সুখ-দুঃখের কারণ। কিন্তু অদৃষ্ট অচেতন, তার নিজের কিছু করবার শক্তি নেই। অদৃষ্টকে পরিচালনা করতে সমর্থ একজন সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান পুরুষ অবশ্যই থাকবেন। তিনি ঈশ্বর।

বেদের প্রামাণ্য ও ঈশ্বর—উপরে যে বুদ্ধিগ্রাহ্য যুক্তির কথা বলা হ'ল, তা ছাড়া শ্রুতি বা বেদের উপর নির্ভর করেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়।

(a) বেদ বহু জ্ঞানের আকর এবং বেদে যা কিছু বলা হয়েছে তা অভ্রান্ত সত্য। অন্য গ্রন্থের মত বেদের একজন রচয়িতা অবশ্যই থাকবেন। কিন্তু অল্পজ্ঞ, সসীম ক্ষমতাবিশিষ্ট মানুষ এই গ্রন্থের রচয়িতা হ'তে পারে না,

একমাত্র অশেষ শক্তিমান সর্বজ্ঞ পুরুষের দ্বারা বেদ রচিত হওয়া সম্ভব। এই সর্বজ্ঞ পরম পুরুষই ঈশ্বর।

(b) বেদে ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথা বার বার ঘোষণা করা হয়েছে। বেদের উক্তি কখনও মিথ্যা হ'তে পারে না। সুতরাং ঈশ্বর আছেন। শ্রুতি-বাক্যই ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ।

আধুনিক কালের দার্শনিকেরা এ ধরনের যুক্তিকে বিশেষ গুরুত্ব দেন না। যে সিদ্ধান্ত অন্ধবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত, বিচার-বুদ্ধির উপর নয়, সে সিদ্ধান্তের বিশেষ মূল্য নেই।

বৈশেষিকদের মতে জগতের উপাদান কারণ হ'ল অসংখ্য পরমাণু। এই পরমাণুগুলি চার শ্রেণীর-পৃথিবী-পরমাণু, জল-পরমাণু, বায়ু-পরমাণু ও তেজ-পরমাণু। এই সকল পরমাণু নানাভাবে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার ফলে বিভিন্ন বস্তু উৎপন্ন হয়। কিন্তু পরমাণুগুলি অচেতন ও তাদের নিজস্ব কোন গতি নেই; তাদের গতিশীল করবার জন্য একটি সচেতন শক্তির প্রয়োজন। কয়েকটি অচেতন পরমাণু আকস্মিকভাবে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে কোন বস্তু, বিশেষত যে বস্তু হিতকর, সুন্দর ও সুবিন্যস্ত, নির্মাণ করতে পারে না; কারণ, পরমাণুগুলি অচেতন হওয়াতে একই ঈপ্সিত বস্তুর ধারণা একই সময়ে বহু পরমাণুতে উপস্থিত থাকবে, এটা অসম্ভব। কোন একটি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান চেতন পুরুষই পরমাণুগুলিকে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একত্র করে, এই নিয়ম-শৃঙ্খলাযুক্ত জগৎ নির্মাণ করতে পারেন। সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব অবশ্যস্বীকার্য।

যোগদর্শনেও ঈশ্বরের অস্তিত্বের অনুকূলে কয়েকটি যুক্তি দেখা যায়।

(a) যে সব পদার্থের তারতম্য আছে, অর্থাৎ যাদের পরিমাণ বা গুণের কম বেশী হ'তে পারে তাদের মধ্যে কোন একটি সর্বাপেক্ষা অধিক (নিরতিশয়) হ'বে। চেতন পুরুষদের জ্ঞান এবং শক্তির তারতম্য দেখা যায়, সুতরাং এমন একজন সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান পুরুষ অবশ্যই থাকবেন যিনি সকল পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান পুরুষই ঈশ্বর।

(b) পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগের ফলে জাগতিক প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়, সাংখ্যদর্শনের এই তত্ত্ব যোগদর্শনে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু পুরুষ ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বভাবের। পুরুষ চেতন ও নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতি অচেতন ও সক্রিয়। সুতরাং এই দুইটি কি উপায়ে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, সেই প্রশ্ন ওঠে। এই সংযোগ-সাধনের জন্য একজন সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান পরম-পুরুষের প্রয়োজন। তিনিই ঈশ্বর।

এই দুইটি যুক্তির বিরুদ্ধে অন্যান্য দর্শনে নানারকম আপত্তি করা হয়েছে। একটি প্রধান আপত্তি এই যে, আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, কোন চেতন পুরুষের পক্ষে কোন কর্ম করতে গেলে একটি দেহের প্রয়োজন, কিন্তু পরমেশ্বরের কোন দেহ আছে বলে আমাদের জানা নেই, সুতরাং ঈশ্বর কি করে জগৎ-সৃষ্টিরূপ কার্য করতে পারেন ? ন্যায়-বৈশেষিক মতবাদের সমর্থকেরা এই সব আপত্তির উত্তর দিয়েছেন। স্বল্প পরিসরের মধ্যে এগুলির আলোচনা করা সম্ভব নয়।

নির্ঘণ্ট

DHARMA-DARSAN

(Outlines of a Philosophy of Religion)

Synopsis

The importance of the religious consciousness and the various beliefs which are intimately connected with it cannot be overestimated. The main task of a philosophy of religion is to enquire into the real nature of the religious consciousness and to form a correct estimate of the value and validity of the religious beliefs. It has been suggested by some thinkers that only empirical investigations of the origin and development of the religious consciousness as a psychical and social phenomenon can adequately bring out the nature of religion and its significance in human life. But such a view cannot be accepted. Though we cannot ignore the fact that the religious consciousness is a psychical and social phenomenon and an empirical study of its origin and development is important, yet it is necessary to point out the defects of those psychological and anthropological theories of the nature and value of religion which make extravagant claims.

The most fundamental religious beliefs are those which are concerned with the existence and nature of God, the human soul, the relation between God and the finite individual, Divine providence, freedom of the will, the validity and objectivity of moral laws and ideals and the ultimate destiny of man. In order to determine the real nature of the religious consciousness and its true worth we must examine these beliefs and try to find out whether they fit in with a coherent system of philosophical ideas and theories concerning the ultimate nature of the universe.

There are certain well-known views with which these religious beliefs are clearly incompatible. These are anti-theistic and anti-religious theories, such as, Agnosticism, Positivism, Materialsim and the Psycho-analytic theory of human mind. If these theories are true our religious conceptions must be pronounced to be mere subjective fictions

and all religious beliefs must be abandoned as exploded myths and superstitions. Hence these theories deserve our serious attention.

A philosophy of religion would be incomplete without a comparative study of the different historical religions which have played important roles in the many-sided development of human society and even in these days exercise considerable influence on men's thoughts and activities. Hence a discussion of the fundamental tenets of living faiths should be included in our study.